শারদীয়া
কিশোর ভারতী
১৩৭৭
সম্পাদক
দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

• এই সংখ্যার অভাবনীয় বিষয়-সম্ভার •

• ছয়টি সম্পূর্ণ উপন্যাস •

অমৃত-সমান উপন্যাসে বিশ্ববন্দিত ঘনাদা॥ রহস্য উপন্যাসে রহস্যভেদী কিরীটী রায়॥ রক্তে দোলা লাগানো উপন্যাসে ব্রিটিশত্রাস রঘু ডাকাত॥ অবিস্মরণীয় দেশপ্রেমের উপন্যাসে চিরস্মরণীয় বাঘা যতীন॥ উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠায় ভরপুর অভিযান-উপন্যাস॥ রূপময় অতীত ভারতের ঝলমলে রঙিন উপন্যাস॥

• পনেরটি উপন্যাসোপম গল্প সহ অজস্র গল্প-কাহিনী •

হর্ষবর্ধনের গল্প॥ টেনিদার গল্প॥ ঝন্টুকোবাবুর গল্প॥ দাম্বাবুর গল্প॥ ভৌতিক গল্প॥ বিজ্ঞাননির্ভর গল্প॥ ইতিহাসনির্ভর গল্প॥ মানবতার গল্প॥ হাসির গল্প॥ মিষ্টি গল্প॥ গোয়েন্দা কাহিনী॥ সামাজিক গল্প॥ জীবজগতের গল্প॥ রহস্য গল্প॥ শিকার কাহিনী॥ বরণীয় লেখকের স্মরণীয় গল্প॥ জল-স্থল-অন্তরীক্ষের গল্প॥ দুঃসাহসের গল্প॥ রূপকথা ও রূপকথাধর্মী গল্প॥ ভ্রমণ কাহিনী॥ করুণ গল্প॥ আজব গল্প॥ মজার গল্প॥ আবিষ্কার কাহিনী ইত্যাদি॥

•জ্ঞানবিজ্ঞানসংবাদ •ছড়া-কবিতা-লিমেরিক •নাটক-ছড়ানাটক-নাট্যনকশা •নট-সূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর সরস আত্মকথা •পূর্ব বাংলার কবিতা •সাগরতলে পর্যটনের অপরূপ কল্প-কাহিনী •সমুদ্রগর্ভে বাস্তব অভিযানের পরমাশ্চর্য ইতিকথা •রূপরঙ্গ-সওয়াল জবাব ইত্যাদি আশ্চর্য সব ফিচার

এবং

- চিত্রে সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস
- চিত্রে হাস্য-রহস্য মেশানো কাহিনী
- চিত্রে যুগলমূর্তির বিচিত্র সরস কাহিনী
- চিত্রে আজব হাসির কাহিনী

এই সংখ্যায় প্রায় শত লেখক ও শিল্পী সমাবেশ

প্রেমেন্দ্র মিত্র
শিবরাম চক্রবর্তী
নরেন্দ্র দেব
আশাপূর্ণা দেবী
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
বিমলচন্দ্র ঘোষ
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
ঈশ্বরচন্দ্র
আশা দেবী
অহীন্দ্র চৌধুরী
সংকর্ষণ রায়
অধীরকুমার রাহা
ডঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী
নচিকেতা ভরদ্বাজ
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
মনোজিৎ বসু
রঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
কিশোর বিজ্ঞানী
সরল দে
বিশ্বপ্রিয়
করুণাময় বসু
ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী
নটরাজন
প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়
আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়
অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
নীহাররঞ্জন গুপ্ত
মন্মথ রায়
দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শক্তিপদ রাজগুরু
স্বপনবুড়ো
ইন্দিরা দেবী
বঙ্কিমচন্দ্র
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
মনোরঞ্জন ঘোষ
প্রদীপকুমার রায়
নারায়ণ দেবনাথ
কুমারেশ ঘোষ
ধীরেন বল
সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত
শৈবাল চক্রবর্তী
রাম চট্টখণ্ডী
পঞ্চপ্রদীপ
বেণু গঙ্গোপাধ্যায়
অতীন মজুমদার
মানব বড়ুয়া
শান্তশীল দাস
দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়
পরেশ ভট্টাচার্য
সন্দীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
রেজাউল হক আল্‌কাদরী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
সূর্য রায়
ধীরেন্দ্রলাল ধর
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
শৈল চক্রবর্তী
অদ্রীশ বর্ধন
রমেশচন্দ্র
শ্রীধর সেনাপতি
জ্যোতিভূষণ চাকী
বাউল দাশ
মোহিত রায়
দুর্গাদাস সরকার
নীলরতন চট্টোপাধ্যায়
বাণী মৌলিক
কিশোর জাদুকর
তমাল চট্টোপাধ্যায়
নির্মলেন্দু গৌতম
প্রভাকর মাঝি
শামসুল করিম কয়েস
অমলেন্দু সেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
শৈলেশ ভড়
সন্দীপকুমার চট্টোপাধ্যায়
রণজিৎকুমার সেন
দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়

এবং আরো অনেকে ॥

শারদীয়া কিশোর ভারতী ● আশ্বিন ১৩৭৭ ॥ তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা
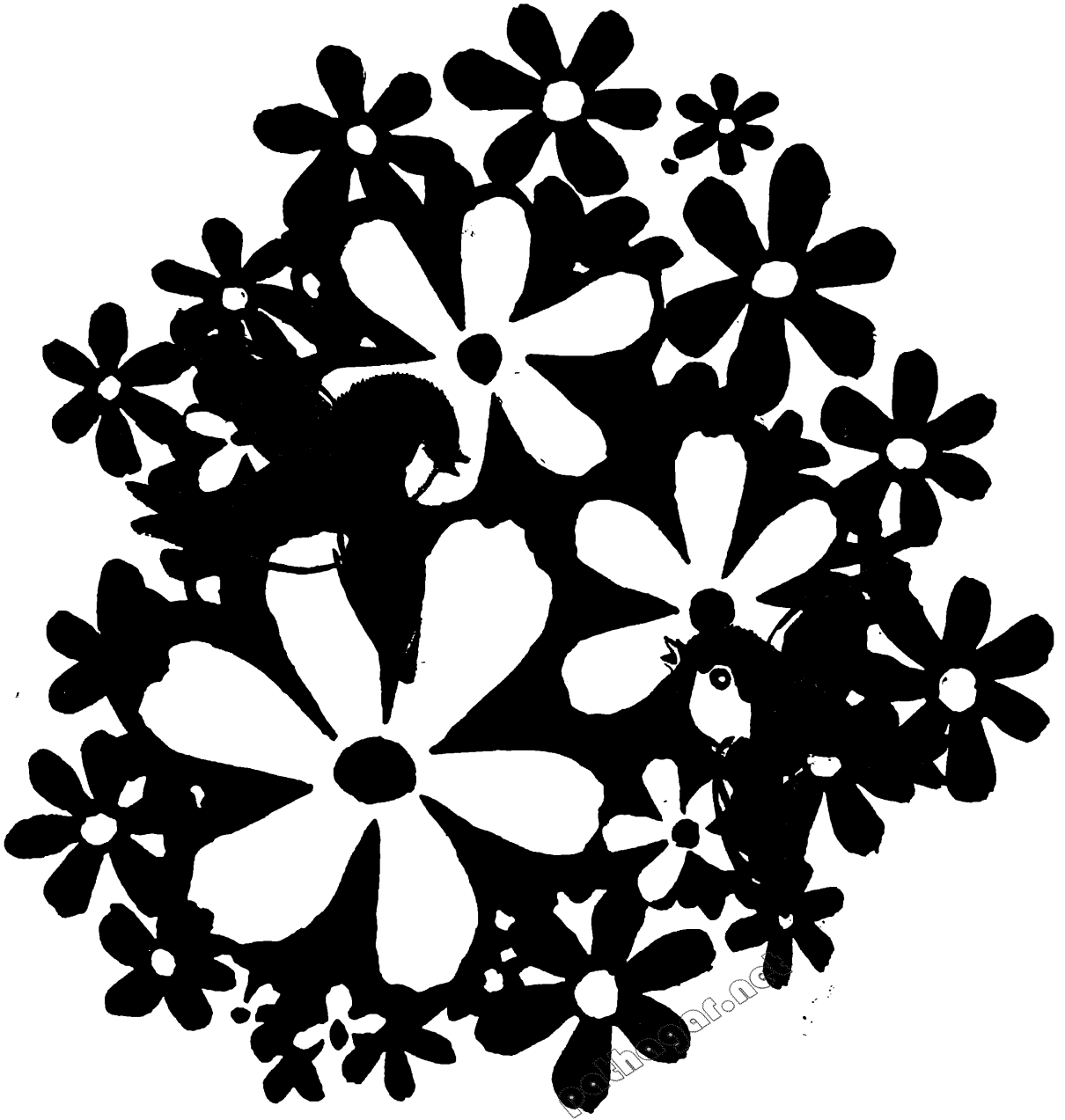
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত [২৬. ৬. ৬৯ তারিখের টি. বি. নং ১ দ্রষ্টব্য]

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ কর্তৃক স্কুল লাইব্রেরীসমূহে ব্যবহারের জন্য ও প্রাইজ-পুস্তক হিসাবে সুপারিশকৃত। [২৫. ৯. ৬৯ তারিখের ২২/৬৯ নং সার্কুলার দ্রষ্টব্য]
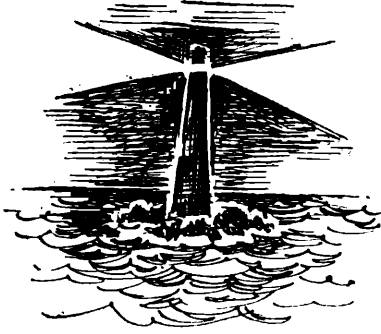
'পত্র-ভারতী'র প্রকাশনায়

কিশোর ভারতী

তৃতীয় বর্ষ ● প্রথম সংখ্যা

আশ্বিন ১৩৭৭ ॥ অক্টোবর ১৯৭০

সূচীপত্র

কল খুলতেই জল কী!
গ্যাস জ্বালাতে চাই আগুনের
একটি শুধু ফুলকি।
জল আনতে স্টীলের পাইপ
গ্যাস আনতেও তাই
ইলেক্‌ট্রিকের তার ঢাকতেও
স্টীলের পাইপ চাই।
গাড়ি বলে, তেল বিনা
এক-পা আমি চলছি না—
স্টীলের পাইপ-লাইনে তেল
আসছে, দেখ জবর খেল্।
স্টীলের পাইপ টপাটপ
টেনে তুলছে কয়লার টব।
স্টীল পাইপে রাস্তার বাতির
লোক-সমাজে কত না খাতির।
ভাবছি যাব এক দৌড়ে
চাঁদে সটান পাইপ জুড়ে।
স্টীল পাইপ সব রকম রকম
সরু মোটায় নানান বেশ কম।
সর্বঘটে বাড়ায় বল
থাকে যদি লোহার নল।
জিনিস সেরা, কাজের খুব
টাটার তৈরি ইণ্ডিয়ান টিউব।
ITC-99 BEN

স্বপ্নগাথা

বিজ্ঞাননির্ভর রোমাঞ্চকর গল্প

মানবতার গল্প

ভৌতিক গল্প

মজার গল্প

কবিতাগুচ্ছ ঃ ১

বিদ্যোদয়ের বই

তোমরা আমাকে গল্প-লেখক বলেই জানো। কিন্তু আমি যে একজন ভালো শিকারী, এ খবর নিশ্চয়ই তোমাদের জানা নেই। শুধু ভালুকই নয়, পাঁচ-পাঁচটা জলজ্যান্ত বাঘও আমি মেরেছি। এই দুটি হর্ষবর্ধক শিকার-কাহিনীসহ 'ঘটোৎকচ বধ', 'কাষ্ঠ-কাশির চিকিৎসা' 'পঞ্চাননের অশ্বমেধ' ইত্যাদি আরো দশটি হাসির তুবড়িতে যে বইটি ঠাসা, আড়াই টাকা দামের সেই বইটির নাম **আমার ভালুক শিকার।**

শিবরাম চক্রবর্তী

● এই লেখকেরই আর একখানি গল্প-সংকলন ●

চোরের পাল্লায় চকর্‌বর্‌তি [তিন টাকা]
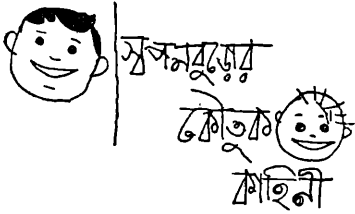
● ছোটদের আরো কয়েকখানা গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধের বই ●

স্বপনবুড়ো ॥ ২·৮০

ভয়ঙ্কর সেই মানুষটি

সমরজিৎ কর ॥ ৩·২৫

বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র [সংকলন]

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ ৬·০০

অথ ভারত কথকতা

শ্রীকথকঠাকুর ॥ ৩·০০

স্বর্ণমুকুট

গোপেন্দ্র বসু ॥ ২·৫০

সুন্দরবনের চিঠি

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ ১·৬২

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯ * ফোন : ৩৪-৩১৫৭

হাতে মসী মুখে মসী
মেঘে ঢাকা শিশু শশী
সুলেখা ওয়ার্কস্ লিমিটেড
সুলেখা পার্ক কলিকাতা-৩২

প্রাচীন সাহিত্যের গল্প

রহস্য গল্প

হাস্যরসাত্মক ছড়া-নাটক

দরদী গল্প

সাগরতলে পর্যটনের অমর বিশ্বসাহিত্য-কাহিনী

সমুদ্রগর্ভে বাস্তব অভিযানের পরমাশ্চর্য কাহিনী

নাট্যনকশা

স্মরণীয় সঙ্কলন

কবিতাগুচ্ছ ঃ ২

রূপকথা

নটসূর্যের আত্মস্মৃতিকথা

নাটক

অভিযানমূলক কাহিনী

উপকথা

জীবজগতের কাহিনী

ইতিহাস-নির্ভর গল্প

ভ্রমণ-কাহিনী

মিষ্টিমধুর গল্প

গল্পের যাদুঘরে

সংবাদ-বিচিত্রা

টুকরো হাসি

মূল্য ঃ ছয় টাকা

'পত্র-ভারতী'র পক্ষে দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত এবং অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস, ১৭ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

কিশোর ভারতী কার্যালয় ॥ ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

কিশোর ভারতী

এজেন্ট হবার নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়

১। 'কিশোর ভারতী' প্রতি বাংলা মাসের মাঝামাঝি বা প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথমে প্রকাশিত হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার দাম ৭৫ (পঁচাত্তর) পয়সা।

২। বাংলা আশ্বিন বা ইংরেজী অক্টোবর মাস থেকে 'কিশোর ভারতী'র বর্ষারম্ভ।

৩। ভারতের সর্বত্র 'কিশোর ভারতী'র এজেন্সি দেওয়া হয়।

৪। ১০ কপির কমে পত্রিকার এজেন্সি দেওয়া হয় না।

৫। মফঃস্বলের এজেন্টদের কাছে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়। তবে যাঁরা আমাদের কার্যালয় থেকে নগদ মূল্যে সরাসরি পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক, তাঁদের পত্রিকা-প্রকাশের অন্ততঃ ১৫ দিন আগে জানাতে হবে।

৬। যেসব এজেন্ট ডাকযোগে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক, তাঁদের ৫্ টাকা অগ্রিম জমা রাখতে হয়। তবে যাঁরা আমাদের কার্যালয় থেকে নগদ মূল্যে সরাসরি পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক, তাঁদের ক্ষেত্রে এই টাকা জমা রাখার প্রশ্ন ওঠে না।

৭। শতকরা ১০ খানা পর্যন্ত অবিক্রীত কপি ফেরৎ নেওয়া হয়। পরবর্তী ইংরেজী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে উক্ত কপি আমাদের কাছে পৌঁছানো দরকার। যে ক'খানা কপি ফেরৎ পাঠানো হবে, পরবর্তী সংখ্যায় তা পূরণ করা হবে।

৮। এজেন্টের কাছে প্রেরিত ভি. পি. ফেরৎ হলে এবং তার সন্তোষজনক কারণ না দেখালে, এজেন্সি বাতিল করা হবে এবং জমার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৯। এজেন্সি সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে হলে, কর্মাধ্যক্ষের নামে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে।

গ্রাহক / গ্রাহিকা হবার নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়

১। 'কিশোর ভারতী' প্রতি বাংলা মাসের মাঝামাঝি বা প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথমে প্রকাশিত হয়।

২। বাংলা আশ্বিন বা ইংরেজী অক্টোবর মাস থেকে 'কিশোর ভারতী'র বর্ষারম্ভ।

৩। 'কিশোর ভারতী'র গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম দিতে হয়। চাঁদার হার (সডাক) বার্ষিক ৯ (নয়) টাকা। বছরে 'কিশোর ভারতী'র অন্যূন একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। বার্ষিক গ্রাহক/গ্রাহিকাকে এর জন্য কোন অতিরিক্ত দাম দিতে হবে না।

বৃহৎ-কলেবর বিশেষ সংখ্যার জন্য রেজেস্ট্রী ডাকব্যয় বাবদ অতিরিক্ত এক টাকা পাঠাতে হবে। নচেৎ সাধারণ বুক-পোস্টে পাঠালে বিশেষ সংখ্যাটি যথাস্থানে না পৌঁছাবার সম্ভাবনা।

৪। চাঁদার টাকা মানি-অর্ডার করে পাঠাতে হয়, বা পত্রিকার কার্যালয়ে ঐ বাবদ নগদ টাকা জমা দিতে হয়। নগদ টাকা জমা দিলে অবশ্যই রসিদ নিতে হবে।

৫। বছরের যে কোন বাংলা মাস বা পত্রিকার যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

৬। মানি-অর্ডার কুপনে বা পত্রে সম্ভাব্য গ্রাহক বা গ্রাহিকার পুরো নাম, ঠিকানা, বয়স, পিতার নাম বা অভিভাবকের নাম এবং পত্রিকার কোন্ সংখ্যা থেকে গ্রাহক হতে ইচ্ছুক তা সুবোধ্য ভাষায় স্পষ্ট করে লিখে জানাতে হবে।

৭। প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সেই মাসের পত্রিকার সংখ্যা না পেলে, ঐ মাসের ২২ তারিখের মধ্যে পত্রিকার কার্যালয়ে তা অবশ্যই জানাতে হবে।

৮। কোন গ্রাহক বা গ্রাহিকা, ইচ্ছা করলে, গ্রাহক নিদর্শনপত্র বা চাঁদা জমার রসিদ দেখিয়ে পত্রিকার কার্যালয়ে এসে সরাসরি পত্রিকা নিতে পারবে। সরাসরি কার্যালয় থেকে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক গ্রাহক-গ্রাহিকাদের পত্রিকার সেই সংখ্যা প্রকাশের অন্ততঃ ১৫ দিন আগে পত্রিকার কার্যালয়ে সেই মর্মে জানাতে হবে। কোন গ্রাহক বা গ্রাহিকা তার কপি রেজেস্ট্রী ডাকযোগে নিতে চাইলে, তাকে রেজেস্ট্রী খরচ বাবদ বছরে অতিরিক্ত বারো টাকা অগ্রিম জমা দিতে হবে।

৯। গ্রাহক-গ্রাহিকারা সমস্ত চিঠিপত্রাদিতেই গ্রাহকনিদর্শন-পত্র অনুযায়ী গ্রাহক-নম্বর, নাম, ঠিকানা প্রভৃতি স্পষ্টভাবে লিখবে। যাদের তখনও গ্রাহক-নিদর্শনপত্র দেওয়া হয়নি, তারা নিজেদের 'নতুন গ্রাহক' বলে এবং কোন্ মাস থেকে গ্রাহক হয়েছে, তা উল্লেখ করবে।

১০। ঠিকানা বদল হলে, সংগে সংগেই অন্ততঃ সেই ইংরেজী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পত্রিকার কার্যালয়ে জানাতে হবে।

১১। এতৎসম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে কর্মাধ্যক্ষের নামে কার্যালয়ের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে।

লেখা, ছবি ইত্যাদি পাঠাবার নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়

১। লেখা বা রচনা (গল্প, কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ ইত্যাদি), আঁকা ছবি প্রভৃতি প্রকাশের জন্য পাঠাবার সময় লেখক বা শিল্পীর পুরো নাম ও ঠিকানা অবশ্যই দিতে হবে, নচেৎ তা বিবেচিত হবে না।

২। মনোনীত লেখা বা রচনা, আঁকা ছবি প্রভৃতি কোন্ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে, তা জানানো সম্ভব নয়।

৩। লেখা বা রচনাদি সম্পাদনা করার বা পরিবর্তনাদি সাধনের পূর্ণ অধিকার পত্রিকা-সম্পাদকের থাকবে।

৪। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট ভাবে কালি দিয়ে লিখে পাঠাতে হবে। বানানে রেফের পর দ্বিত্ব বর্জন বাঞ্ছনীয়।

৫। হাতে আঁকা ছবি ভাল সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চাইনিজ কালিতে পরিষ্কার ভাবে এঁকে পাঠাতে হবে।

৬। লেখা, ছবি প্রভৃতির সংগে উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে জানানো বা অমনোনীত লেখা, ছবি প্রভৃতি ফেরৎ পাঠানো কিংবা ঐ সংক্রান্ত চিঠিপত্রের জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। সংগে ডাকটিকিট না থাকলে অমনোনীত রচনাদি নষ্ট করে ফেলা হয়।

৭। গ্রাহক-গ্রাহিকারা লেখা, ছবি, ধাঁধা, প্রশ্নোত্তর, ইত্যাদি বা ঐসব সংক্রান্ত চিঠিপত্র পাঠাবার সময় গ্রাহক-নম্বর, পুরো নাম, ঠিকানা, বয়স পরিষ্কার করে লিখবে। যাদের তখনও গ্রাহক-নম্বর দেওয়া হয় নি, তারা নিজেদের 'নতুন গ্রাহক' বলে এবং কোন্ মাস বা সংখ্যা থেকে গ্রাহক হয়েছে, তা উল্লেখ করবে।

৮। এতদসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে সম্পাদক বা কর্মাধ্যক্ষের নামে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে:

কিশোর ভারতী **৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯** ফোন: ৩৪-৩১৫৭ ও ৩৫-১৯৪৪

আমাদের কথা

স্নেহের বন্ধুগণ,—এক বছর পরে আনন্দ-উৎসবের মধুর বার্তা বুকে নিয়ে আবার ফিরে এল আশ্বিন। আজ কানে আসছে শারদ উৎসবের আগমনী সুর। আর বিচিত্র উপচারের ডালি সাজিয়ে দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে তোমাদের বড় সাধের পত্রিকা শারদীয়া কিশোর ভারতী।

এই আশ্বিন বা অক্টোবর মাসে তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করলো কিশোর ভারতী। বর্তমান শারদীয়া সংখ্যা তার প্রথম সংখ্যা।

দুই বছর সময় একটি পত্রিকার জীবনে কিছুই নয়। অথচ তারই মধ্যে কিশোর ভারতী আজ তোমাদের—দেশের অগণিত সবুজসাথী বন্ধুদের হৃদয়ের কতখানি জুড়ে বসেছে, কী বিপুল তার জনপ্রিয়তা, তা বোধহয় বলার দরকার করে না।

এত অল্প সময়ের মধ্যে কিশোর ভারতী কি করে এই অসাধ্য সাধন করলো, কি করে সে তোমাদের মনের সবটুকু জায়গা দখল করে নিল, অন্যদের কাছে তা দুর্বোধ্য কিনা জানি না, কিন্তু আমরা জানি এর কারণ। আত্মপ্রকাশের প্রথম দিন থেকেই কিশোর ভারতী কায়-মনোবাক্যে তোমাদের মুখপত্র হিসাবে তার দায়িত্ব পালন করে চলেছে নিরলসভাবে, সজ্ঞানে কোথাও তা থেকে বিচ্যুত হয় নি, আর তার ফলেই কিশোর সমাজে তার এই অপ্রতিহত প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা।

আজ এই যাত্রারম্ভের শুভলগ্নে দাঁড়িয়ে কিশোর ভারতী আবার ঘোষণা করছে, সবুজ প্রাণের আপন পত্রিকা হিসাবে সে এ পর্যন্ত তোমাদের কাছে যেভাবে অনাবিল আনন্দ ও চিন্তার খোরাক পরিবেশন করে এসেছে, তা সে করে যাবে তেমনিভাবেই সচেতন নিরলস মন নিয়ে।

এই যাত্রালগ্নে কিশোর ভারতী তোমাদের—তার সবুজসাথীদের—জানায় প্রাণভরা শুভেচ্ছা ও ভালবাসা। শুভার্থী পৃষ্ঠপোষকদেরও জানায় তার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রীতি-অভিনন্দন। সে কায়মনোবাক্যে আশা করে, অতীতের মতো ভবিষ্যতেও সে যেমন তোমাদের কাছ থেকে, তেমনি শুভানুধ্যায়ী পৃষ্ঠপোষক বন্ধুদের কাছ থেকেও লাভ করবে হৃদয়ভরা ভালবাসা, আন্তরিক পরামর্শ ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা।

কিন্তু বন্ধু, এত সত্ত্বেও মনে আজ শান্তি নেই, সে-আনন্দও নেই।

কিছুদিন আগে অতি বর্ষণের ফলে পশ্চিমবাংলায় যে ভয়াবহ সর্বনাশা বন্যা হয়ে গেল, ব্যাপ্তি ও গভীরতায় তার বুঝি তুলনা নেই—অন্ততঃ স্মরণকালের ইতিহাসে তার নজির মিলবে কিনা সন্দেহ। এই বন্যার ফলে জেলার পর জেলায় সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে লক্ষ লক্ষ্য মানুষের ঘর ভেঙেছে, সংসার ভেসে গেছে, প্রাণহানি হয়েছে, স্থাবর-অস্থাবর সব সম্বল প্রায় ধ্বংস হয়েছে, গবাদি গৃহপালিত পশু ডুবে মরেছে আর মাঠের ও বাগানের ফসলের অর্থাৎ ধান ও শাক-সব্‌জির যে ক্ষতি হয়েছে, তার পরিমাপ করা দুঃসাধ্য।

এই লক্ষ লক্ষ সর্বস্বান্ত আর্ত ছাপোষা মানুষ আমাদেরই আপনজন। বিনা অপরাধে আজ তারা সর্বহারা। আমাদের আজ সবচেয়ে বড় কর্তব্য, অবিলম্বে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, সর্বশক্তি দিয়ে তাদের সাহায্য করা।

কিন্তু যে গুরুতর প্রশ্নটি আমাদের সবচেয়ে বেশী বিচলিত ও অস্থির করে তুলেছে, তা হলো—এর থেকে নিষ্কৃতি কোথায়? প্রতি বছর দেশের কোন-না-কোন অঞ্চলে একটু বেশী বৃষ্টি হলেই এই যে ভয়াবহ বন্যা নামছে, ধনপ্রাণ নষ্ট হচ্ছে বিপুল পরিমাণে, এটাকে কি আমরা বিধাতার রুদ্ররোষ ও অখন্ডনীয় বিধিলিপি হিসাবে গ্রহণ করবো, না গ্রহণ করবো একদল মানুষের চরম অপদার্থতা, দুর্নীতি ও হৃদয়হীনতার ভয়ঙ্কর নিদর্শন হিসাবে?

এর উত্তর দেবার কথা দেশের সরকারের। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা, তা দেবার মতো মনোবল তাদের বোধহয় নেই।

অত্যধিক বৃষ্টি হলে দেশের ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে এভাবে বিধ্বংসী বন্যা হবে কেন? দেশের অসংখ্য নদী-নালা-খাল যদি হেজে মজে ভরাট হয়ে না গিয়ে থাকে, তাদের খাত যদি গভীর থাকে এবং সুষ্ঠু স্রোত-চলাচলে যদি কোন বাধা না ঘটে, তাহলে যত বৃষ্টিই হোক, জল তো ঐ নদী-নালা-খাল দিয়ে বেরিয়ে যাবে। দেশের জল-নিষ্কাশনের এটাই তো স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ব্যবস্থা।

নদী-নালা-খাল ঠিকমতো চালু ও বহতা থাকলে, খরা-অনাবৃষ্টিতে যেমন জলের অভাবে ফসল না হবার ভয় থাকে না, তেমনি অতিরিক্ত বৃষ্টিতে ফসল ও ধনপ্রাণ নষ্ট হবারও আশঙ্কা থাকে না।

আমাদের দেহের রক্তবহা শিরা-উপশিরার মতো এগুলিই দেশের জলবহা শিরা-উপশিরা। দেশের শিরা-উপশিরায় রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটলে, যেমন গুরুতর রোগ ও শেষ পর্যন্ত মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি নদী-নালা-খাল যদি ঠিকমতো চালু না থাকে, তাহলে দেশের ক্রমাগত ক্ষয় ও শেষ পর্যন্ত ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে।

আমাদের দেশও আজ সেই ধ্বংসের দিকে অনিবার্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। গুরুতর ক্ষয়রোগ ধরেছে তাকে অনেক দিন। কিন্তু কেন এই অবস্থা হলো, তার জবাব যাদের দেবার কথা, তারা কিন্তু নীরব।

দুনিয়ার প্রতিটি সভ্য অগ্রসর দেশের সরকার নিজের দেশের এই সব প্রাকৃতিক শিরা-উপশিরা যাতে পুরোপুরি চালু ও বহতা থাকে, তার দিকে খরদৃষ্টি রাখেন। তাদের খাত যাতে ভরাট হয়ে না যায়, তার জন্য 'ড্রেজার' নামক অতিকায় যন্ত্র দিয়ে খাত থেকে মাটি কেটে তোলার নিয়মিত ব্যবস্থা করেন। উপরন্তু নতুন নতুন গভীর খাল কেটে তাঁরা দেশের শিরা-উপশিরার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হন।

যে কোন প্রকৃত দায়িত্বশীল সরকারের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। আর এই স্বাভাবিক কাজ করার ফলে, অনাবৃষ্টি হোক আর অতিবৃষ্টি হোক, জলসেচ বা জলনিকাশের কোন দুর্ভাবনা থাকে না।

পরমাণবিক যুগে মানুষ আজ যেখানে মহাবিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখানে নদী-নালা-খালের এই গভীরতা ও স্রোত-চলাচল ঠিক রাখা তাদের কাছে কোন সমস্যাই নয়।

কিন্তু তা, মনে হয়, বিষম সমস্যা আমাদের দেশের সরকারের কাছে। কেন? তেইশ বছর পরে দেশের এই ভয়ংকর সর্বনাশ ও বিপর্যয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নটাই আমাদের মনকে বিদ্রোহী করে তুলছে।

বন্ধু, আগামী দিনে এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করতে হবে তোমাদের, বাঁচাতে হবে আমাদের এই সোনার জন্মভূমিকে। তার জন্যেই আজ তৈরী হও তোমরা। তাহলেই সার্থক হবে কিশোর ভারতীর আত্মপ্রকাশ, তার এই দুর্গম পথ-পরিক্রমা আর ঐকান্তিক চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম।

আবার তোমরা আমাদের প্রাণভরা শুভেচ্ছা ও ভালবাসা গ্রহণ করো। শারদীয়া কিশোর ভারতী কেমন লাগলো, অবশ্যই জানাবে কিন্তু। ইতি—

তোমাদের চিরশুভার্থী
সম্পাদক বন্ধু
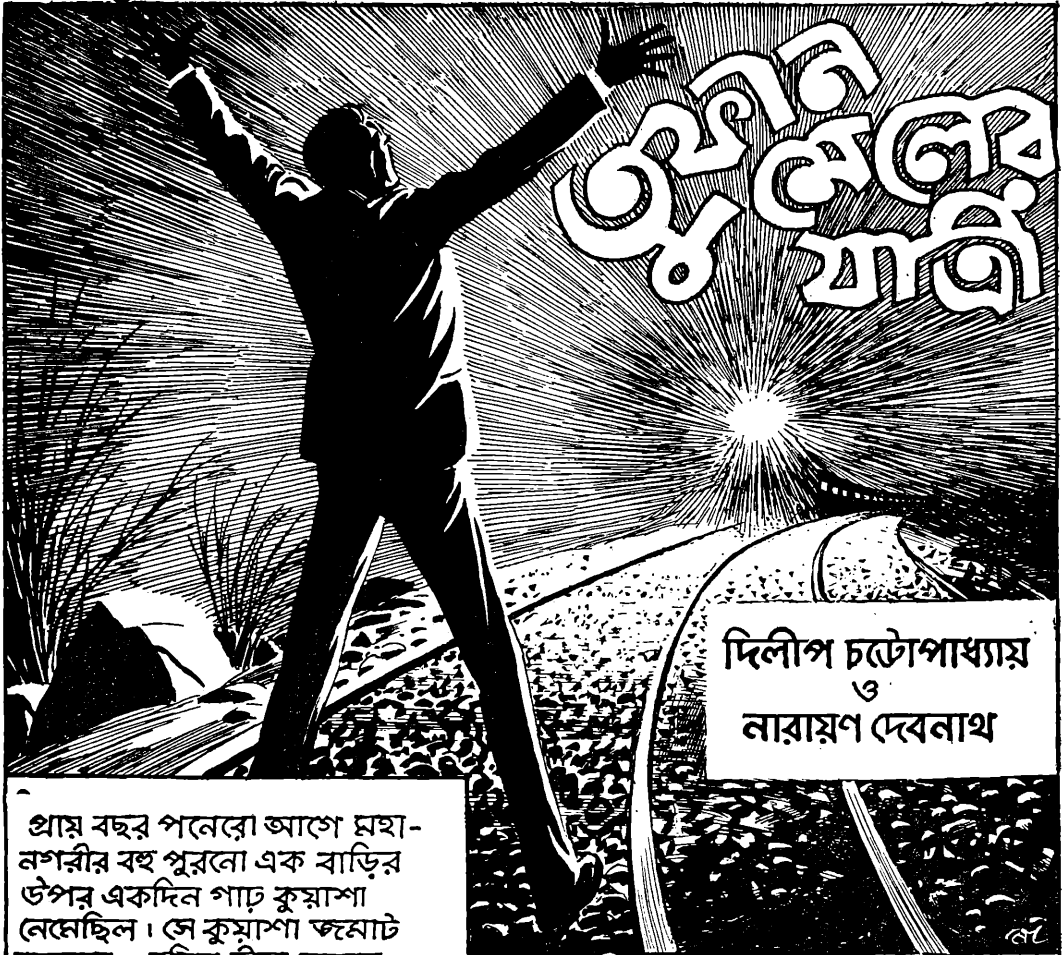
প্রায় বছর পনেরো আগে মহানগরীর বহু পুরনো এক বাড়ির উপর একদিন গাঢ় কুয়াশা নেমেছিল। সে কুয়াশা জমাট রহস্যের। বুদ্ধির তীক্ষ্ণ ফলায় দুর্ভেদ্য সেই রহস্যজাল ছিন্ন করে একজন তরুণ গোয়েন্দা রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়েন। নাম তাঁর ইন্দ্রজিৎ রায়। 'ব্ল্যাক ডায়মণ্ড'-এর সঙ্গে সেই তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার। ঐ দুর্বৃত্ত তখনো অবশ্য ছদ্মনামটি নেয়নি। স্বনামেই নেহাতই ভালো মানুষ সেজে সমাজে নিঃশঙ্কভাবে সে তখন বিচরণ করে বেড়ায়। অপরাধীর আসল নামটি এখন উহ্যই থাক। কিশোর ভারতীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত চিত্র-কাহিনী 'রহস্যময় সেই বাড়িটা'-র পাঠকেরা যথাসময়েই তা জানতে পারবেন। আপাতত এটুকু বলা যায় যে, সেবার অপরাধীকে ধরা পড়ে কঠোর শাস্তি পেতে হয় এবং শাস্তির মেয়াদ শেষ হলে কিছুকাল আত্মগোপন করে থাকবার পর আবার সে আত্মপ্রকাশ করে 'ব্ল্যাক ডায়মণ্ড' ছদ্মনামের অন্তরালে। তারপর থেকে বারবার তার ঠোকাঠুকি বাঁধে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে, কয়েকবার সে ধরা পড়তে পড়তে অদ্ভুত তৎপরতায় ফসকে পালায়। কিন্তু ধরা তাকে একদিন পড়তেই হয়। আর তা ঐ ইন্দ্রজিৎ রায়েরই হাতে। সদাসতর্ক প্রহরার মধ্যে থেকেও সে কি আশ্চর্য এক কৌশলে চম্পট দেয়। ইন্দ্রজিতের অপূর্ব বুদ্ধিচাতুর্যে কিভাবে সে অবশেষে ধরা পড়েছিল, সুদীর্ঘ সেই কাহিনী চিত্রিত হয়েছে গত শারদীয়ায়। ইন্দ্রজিৎ রায় ও ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের বছর পাঁচেক পূর্বের এক রোমাঞ্চকর সাক্ষাৎকার এখানে দেওয়া হলো।

রাত্রির জমকালো আঁধার-
যবনিকার ওপর তীব্র
সার্চ লাইট ফেলে তুফান-
বেগে ছুটে চলেছে তুফান
মেল !

যাত্রীরা সবাই নিদ্রামগ্ন ।

তিনজন ছাড়া। প্রখ্যাত শিল্পপতি
মিঃ সান্যালের চোখে ঘুম নেই ।

হাতে দুখানা চিঠি। একখানাতে লেখা—
প্রিয় মিঃ সান্যাল
ব্ল্যাক জয়ন্ত বলছি।
আমার হাজার পঞ্চাশেক
টাকার খুবই দরকার।
টাকাটা একটা বড় খামে
ভরে পরশু সকালে
আপনার ড্রইংরুমে
ফুলদানির ভেতর রেখে
দেবেন। অন্যথা করবেন
না। করলে টাকার চেয়ে
প্রাণ বড়।
ইতি—
দুর্নীত
ব্ল্যাক জয়ন্ত।

দ্বিতীয় চিঠিখানা আরো সংক্ষিপ্ত —
প্রিয় মিঃ সান্যাল—
আমার কথা না শুনে
ভালো করলেন না।
ইন্দ্রজিৎ টিকটিকি
আপনাকে বাঁচাতে
পারবে ভেবেছেন?
ইতি—
দুর্নীত
ব্ল্যাক জয়ন্ত

সান্যালের পাশের কামরায় রয়েছেন পাঞ্জাবীর ছদ্মবেশে আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন তরুণ গোয়েন্দা ইন্দ্রজিৎ রায়। তাঁর চোখেও ঘুম নেই।

সান্যালের সামনের কামরায় আরো একজন জেগে। লোকটি আর কেউ নয়— স্বয়ং ব্ল্যাক ডায়মণ্ড !

সহসা চালকের নজরে পড়ে —
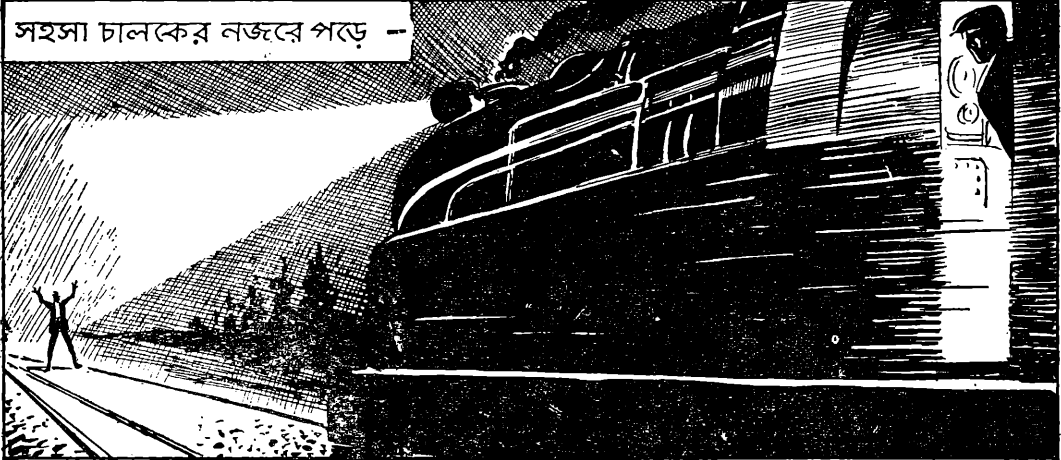
সঙ্গে সঙ্গে সে ব্রেক কষে দিল। আচমকা ব্রেক কষায় প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হয় ট্রেনটি।
আরে - আরে, এ কী ব্যাপার ?

ট্রেনের গার্ড ও অন্যান্যরা তাড়াতাড়ি নেমে সামনে এগিয়ে যায়।

এমন সময় মিঃ সান্যালের ঘরে একজন প্রবেশ করে।

একি ইন্দ্র ? তুমি এ—

কিন্তু তার বাকি কথা চাপা দিয়ে প্রচণ্ড শব্দে হুইসল্ বাজিয়ে পাশ দিয়ে আর একটা গাড়ি বেরিয়ে যায়।

পরদিন ভোরবেলা পুলিশ কমিশনারের বাড়িতে।
ক্রিড়ড়ড়রিং ক্রিং!
ক্রিড়ড়রিং ক্রিং!

হ্যালো!
TRUNK CALL FROM ALLAHABAD. SPEAK HERE.
এই ভোরে এলাহাবাদ থেকে ট্রাঙ্ক কল!

হ্যালো!
ব্ল্যাক ডায়মণ্ড বলছি!
WHAT!

উত্তেজিত হবেন না। শুনুন, গতকাল রাত নটায় একটা ঘটনা ঘটেছে।
কি ঘটনা ঘটেছে? WHAT HELL HAS OCCURED?

এরপর অপর প্রান্ত থেকে যা বলল, তা শুনে পুলিশ কমিশনার 'রাবিশ! অ্যাবসার্ড!' বলে ফোন ছেড়ে দিলেন।
রাস্কেলটা সকাল বেলাতেই মেজাজ খারাপ করে দিলে।

মিনিট দশেক পরেই কমিশনার পত্নী ঘরে ঢোকেন।
হ্যাঁ গো শুনছো, কি কাণ্ডই না হয়েছে!

দেখ দেখ, কি লিখেছে।

এ কী! এই খবরইতো একটু আগে ফোনে ব্ল্যাক ডায়মণ্ড আমাকে জানালো।

যুগান্তর
প্রখ্যাত শিল্পপতি রামজীবন সান্যাল আততায়ী কর্তৃক নিহত।
দিল্লীগামী তুফানমেলে নারকীয় ঘটনা।
হত্যাকারী সন্দেহে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গোয়েন্দা ইন্দ্রজিৎ রায় গ্রেপ্তার।

কিন্তু পরদিন কাগজে যে খবর বেরুল, তা আরো চমকপ্রদ —
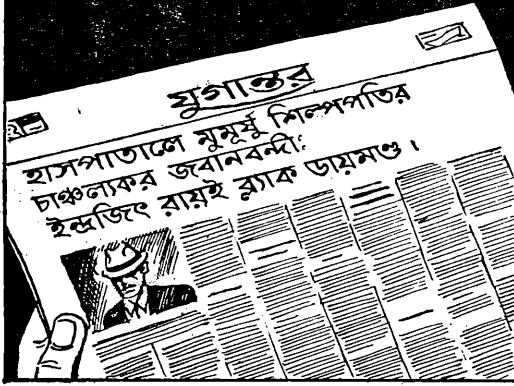
সেইদিন রাত্রেই বেতারে শোনানো হোলো টেপরেকর্ডারে গৃহীত স্বর্গত সান্যালের অন্তিম জবানবন্দী।

ইন্দ্রজিৎ রায়ের পরিবারের সঙ্গে কমিশনার ও তাঁর স্ত্রীর অনেক কালের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। ইন্দ্রজিতের স্ত্রী সুবীরা এখন বাইরে। বছর কয়েক আগে সে বিলেত গেছে ব্যারিস্টারী পড়তে। ব্যারিস্টারী পাশও করেছে সে। কাছেপিঠের দু-একটা জায়গা ট্যুর করে মাসখানেক বাদে তার দেশে ফেরার কথা। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আয়ার্ল্যাণ্ডের মাস্ক লেক থেকে বেড়িয়ে হোটেলে ফিরেই একটা টেলিগ্রাম পেল সুবীরা।

দিন দুয়েক বাদে কমিশনারের ফ্ল্যাটে বসে কমিশনার, অমিতা দেবী ও সুবীরা কথা বলছিল।
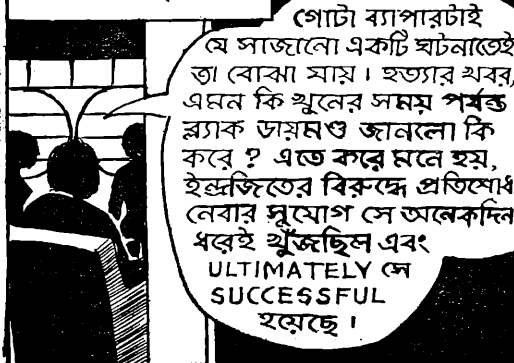
কমিশনার আবার বলতে থাকেন —

NOW THE POINT IS THIS — ঘটনাগুলো এমনভাবে ঘটে গেছে যাতে করে ব্ল্যাক ডায়মণ্ডকে — I MEAN আসল ব্ল্যাক ডায়মণ্ডকে সন্দেহ করার প্রশ্নই ওঠে না। ইন্দ্রজিতের বিরুদ্ধে যা সব থেকে মারাত্মক POINT তা হলো মৃতের শেষ জবানবন্দী— ইন্দ্রজিৎ রায়ই ব্ল্যাক ডায়মণ্ড! সব ব্যাপারটাই এমন ধোঁয়াটে যে, বুদ্ধি দিয়ে কোন থৈই পাওয়া যায় না!

কি আশ্চর্য যোগাযোগ দেখেছ সুবীরা! বছর পনেরো আগে এই ইন্দ্রজিৎকেই ট্রাঙ্ক কল করে আনাতে হয়েছিল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে। সে এসে তোমাকে বাঁচিয়েছিল ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের কবল থেকে — সাক্ষাৎ মৃত্যুর ছোবল থেকে। কি গো, তোমার মনে নেই রহস্যময় সেই বাড়িটার কথা?

মনে নেই আবার! ও রকম জট-পাকানো কেস আমার সুদীর্ঘ পুলিশী জীবনে আর দুটি পাই নি। প্রেতলোক থেকে প্রেতাত্মার ঘন ঘন আবির্ভাব, লটারির টিকিট উধাও, খুন — সে এক জগাখিচুড়ি কাণ্ড। রহস্য-সমুদ্রে পড়ে আমি তখন ক্রমাগত হাবুডুবু খাচ্ছি। শেষে আমিই ইন্দ্রজিতের নাম SUGGEST করি।

ভাগ্যিস তখন ঠিক সময়ে ইন্দ্রজিতকে খবর দেওয়া হয়েছিল, নইলে সুবীরার যা হতো, ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়!

কি আর হোতো? গীটার সেন্টার-এর একদা প্রধানা শিক্ষিকা সুবীরা মিত্রকে সারাজীবন মিত্র হয়েই থাকতে হোতো—রায়বাঘিনী হওয়া আর চলত না!
ঠাট্টা নয়। শোনো সুবীরা, একদিন যে স্বামী ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের মরণফাঁদ থেকে তোমাকে উদ্ধার করেছিল স্ত্রী হয়ে তুমিও কি আজ পারবে না তোমার সেই স্বামীকে ঐ ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের চক্রান্তজাল থেকে বাঁচাতে?

সুবীরা কি বলবে বুঝে উঠতে পারে না। অমিতা দেবী আবার বলেন —
ব্ল্যাক ডায়মণ্ড যত কুচক্রীই হোক না কেন, যত বড় চালই এক্ষেত্রে সে চেলে থাকুক, তুমিও তো বোন যথেষ্ট বুদ্ধিমতী আর বিদুষী।

তুমি ঠিকই বলেছো অমিতা! শোন সুবীরা! এটাই তোমার আইন-শিক্ষার আসল পরীক্ষা — অগ্নি-পরীক্ষাও বলতে পারো। আমরা আশা করবো, কোর্টে তুমি ইন্দ্রজিতের হয়ে PLEAD করবে, AND FINALLY YOU WILL COME OUT SUCCESSFULLY!
বেশ

হাইকোর্ট সেদিন লোকে লোকারণ্য। আজ রামজীবন সান্যাল হত্যা কেসের শুনানীর প্রথম দিন। প্রথমে সরকার পক্ষের বাঘা উকিল মিঃ দেশমুখ্য উঠে আসামী ইন্দ্রজিৎ রায়কে জেরা শুরু করলেন।
আপনার নাম?
ইন্দ্রজিৎ রায়।

আপনার আসল নামটা জানতে চাইছি। যেটা বললেন ও তো সবাই জানে।
আসল নকল বুঝিনা, ইন্দ্রজিৎ রায়ই আমার বাপ-মায়ের দেওয়া নাম।
ব্ল্যাক ডায়মণ্ড তবে আপনার ছদ্মনাম?

ইন্দ্রজিৎ রায়ের ছদ্মনামের প্রয়োজন হয় না।
আই সি। আচ্ছা, মিঃ সান্যালের সঙ্গে আপনি তো তার দেহরক্ষী হিসাবে যাচ্ছিলেন তাই না?
হ্যাঁ।

যে রক্ষক সেই ভক্ষক, কেমন?
এটা শব্দ-হেঁয়ালির জায়গা নয়।

তাই নাকি! আচ্ছা, আপনি মিঃ সান্যালের সঙ্গে একই কামরায় না থেকে পাশের কামরাটি বেছে নিয়েছিলেন কেন?
কি হলো—জবাব দিন। পাশের কামরায় যাচ্ছিলেন কেন? খুনের ব্যাপারটা যাতে নির্ঝঞ্ঝাটে সারা যায় সেই জন্যে? জবাব দিন!

পাশের কামরায় যাচ্ছিলাম, কারণ আমি যে মিঃ সান্যালের সঙ্গে যাচ্ছি সেটা অপরকে জানতে দিতে চাই নি।
ব্ল্যাক ডায়মণ্ড — ধরে নেওয়া যাক সে আলাদা ব্যক্তি, আপনাকে কি চেনে না?
চেনাই তো স্বাভাবিক।

সেক্ষেত্রে শুধু কামরা বদল করে তার চোখে ধুলো দেওয়া কি সম্ভব?
না। আর তা সম্ভব নয় বলেই আমি পাঞ্জাবীর ছদ্মবেশে ছিলাম। একমাত্র মিঃ সান্যালই সেটা জানতেন। তা ছাড়া —
তা ছাড়া কি?

আমার ছদ্মবেশ নেবার আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল।
কি রকম?
ব্ল্যাক ডায়মণ্ড যাতে ইন্দ্রজিৎ রায় সেজে মিঃ সান্যালকে ধোঁকা দিতে না পারে।

আই সি! আই সি! অর্থাৎ আপনি বলতে চান — ব্ল্যাক ডায়মণ্ড খুনের সময় মিঃ সান্যালের সামনে আর যে বেশেই এসে থাকুক না কেন, ইন্দ্রজিৎ রায়ের অর্থাৎ আপনার ছদ্মবেশে কখনো নয়?
হ্যাঁ।
তাহলে ব্যাপারটা এই রকমই দাঁড়াচ্ছে যে, মিঃ সান্যাল তাঁর আততায়ীকে 'ইন্দ্র' নামে সম্বোধন করেছেন আপনাকেই দেখে। কেমন?

ইন্দ্রজিৎ এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। তাকে কেমন অসহায় দেখায়।
ইওর অনার! আমরা মুখে প্রায়ই বলে থাকি — TRUTH IS STRANGER THAN FICTION. কিন্তু মনে প্রাণে বিশ্বাস করি কজন? ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে আমরা কি দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারতাম দুর্বৃত্ত ব্ল্যাক ডায়মণ্ড ও গোয়েন্দা ইন্দ্রজিৎ রায় অভিন্ন ব্যক্তি? পারতাম না। পারা সম্ভব ছিল না, কারণ অতীতে এই ইন্দ্রজিৎ রায়কেই বারবার আমরা দেখেছি ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের শত্রু হিসাবে। আজ যে আমরা তার সত্যিকার স্বরূপ জানতে পারলাম তা শুধু ঈশ্বরের কৃপায় — YES, SIMPLY BY GOD'S GRACE! তিনিই মৃত্যুপথযাত্রী মিঃ সান্যালকে কয়েকটি ঘন্টা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন নির্মম এক সত্য তাঁর মুখ দিয়ে বলাবার অপেক্ষায়। যত নির্মমই হোক —

—সেই সত্য আমাদের মাথা পেতে নিতে হবে মী লর্ড, ঐ ঘৃণ্যতম অপরাধীর মস্তকে কঠোরতম শাস্তি আমাদেরই তুলে দিতে হবে ! THAT'S ALL MY LORD !

মাস ছয়েক পর এক মেঘ-মলিন প্রভাতে ।
জোর খবর ! জোর খবর ! হাইকোর্টের রায়ে ব্ল্যাক ডায়মণ্ড ওরফে ইন্দ্রজিৎ রায়ের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর !

সেদিন সকালেই কমিশনার ও তাঁর স্ত্রী ইন্দ্রজিতের বাড়িতে গেলেন ।
আমাদের আশঙ্কা ছিল সুবীরা, তুমি না ভেঙে পড়।
এতে ভেঙে পড়বার কি আছে ? সুপ্রীম কোর্ট তো রয়েছে এখনও ।

সেদিন সন্ধ্যায়
এক বুড়ো ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান মা জননী। এই কার্ডটা তিনি দিলেন ।

Mr. I. AICH.
Chief Adviser to the Board of Directors
SANYAL TUBE

একটু পরে ড্রইংরুমে ঢুকে যে ভদ্রলোককে দেখল সুবীরা, তাঁকে এক বিরাট ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের প্রধান উপদেষ্টা বলে ভাবা কঠিন ।
আমাকে দেখে খুবই নিরাশ হয়েছেন, তাই না মিসেস রায় ?
না, ঠিক তা নয়— মানে—

এরপর আইচ প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে নিম্নস্বরে সুবীরার সঙ্গে সান্যাল-হত্যার প্রসঙ্গ আলোচনা করে বিদায় নিলেন।

দিন কয়েক বাদে সুবীরাকে এলাহাবাদের একটি ট্রাঙ্ক কল বুকিং অফিসে দেখা গেল। সঙ্গে পুলিশ কমিশনার স্বয়ং।

মিনিট পাঁচেক বাদে তিনি একটি কাগজ সুবীরার হাতে দিলেন।
এই নিন, সবই এতে লিখে দিয়েছি।

যিনি কমিশনারের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন, তার নামটি পড়ে সুবীরা ও পুলিশ কমিশনার দুজনেই ভীষণভাবে চমকে গেলেন
ইন্দ্রজিৎ রায়! আমি কি স্বপ্ন দেখছি!

যে পাবলিক বুথ থেকে ফোন করা হয়েছিল, সুবীরা ও পুলিস কমিশনার এরপর সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।
আমি কলকাতার পুলিশ কমিশনার-
আসুন, আসুন— ভেতরে এসে বসুন।

আচ্ছা, গত বাইশে জুলাই রাত্রে কলকাতায় ট্রাঙ্ক কল করবার জন্যে ইন্দ্রজিৎ রায় নামে এখানে কেউ এসেছিলো?
খাতা দেখতে হবে।

হ্যাঁ, এসেছিলো।
আচ্ছা, তার চেহারার একটা বর্ণনা দিতে পারেন?
কত লোকই তো আসছে, আলাদা করে প্রত্যেকের চেহারা মনে রাখা কি সম্ভব স্যার?

ওরা দুজনে বেরিয়ে যখন রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় সেই ভদ্রলোকটি ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত।
এই ডাইরীখানা স্যার ঐ লোকটা ফেলে যায়। এতে তার নাম-ধাম না থাকায় আমদের কাছেই এটা পড়ে আছে সেই থেকে।

সান্যাল হত্যা মামলার শুনানীর ষষ্ঠ দিন আজ। সুপ্রীম কোর্ট লোকে লোকারণ্য! হাইকোর্টে সরকার পক্ষে ও আসামী পক্ষে যে দুজন উকিল দাঁড়িয়েছিলেন, সুপ্রীম কোর্টেও তাঁরাই পরস্পরের মুখোমুখী হয়েছেন। সেই মিঃ দেশমুখ্য ও সুবীরা রায়। আগের কদিনের আদালত-নাট্যে মিঃ দেশমুখ্যই জবরদস্ত ভূমিকা নিয়েছেন। কখনো তারস্বরে কখনো নিম্নস্বরে কখনো বা ভগ্নস্বরে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করে তিনি এ কদিন ভালোভাবেই আসর মাত করেছেন। তাঁর আজ নতুন করে বলার কিছু নেই। তাই সুবীরাই উঠলো প্রথমে।

ইওর অনার! এই জবানবন্দীর ভিত্তিতেই ইন্দ্রজিৎ রায়কে ব্ল্যাক ডায়মণ্ড তথা, মিঃ সান্যালের হত্যাকারী সন্দেহে প্রথমে গ্রেপ্তার ও পরে হাইকোর্টের রায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। অথচ একবারও জবানবন্দীতে ইন্দ্রজিৎ রায়—এমন কি ইন্দ্রজিৎ শব্দটিও উচ্চারণ করা হয়নি। জবানবন্দীতে বারবার যে নামটি শোনা গেছে তা হলো ইন্দ্র। ইন্দ্র আর ইন্দ্রজিৎ কি এক MY LORD? দ্বিতীয়ত, জবানবন্দী আরো সাক্ষ্য দেয়— মিঃ সান্যাল আততায়ীকে দেখে 'ইন্দ্র তুমি' বলে সম্বোধন করেন। অথচ যেদিন এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় তার মাত্র দুদিন আগে অর্থাৎ ২০শে জুলাই তারিখে তাঁরই লেখা একটি চিঠিতে তিনি ইন্দ্রজিৎ রায়কে বেশ কয়েকবার 'মিস্টার রায়' এবং আগাগোড়া 'আপনি' বলে সম্বোধন করেছেন। সেই চিঠি আমি মহামান্য আদালতের সমীপে পেশ করছি।

ইওর অনার! এবার আমার দ্বিতীয় সাক্ষী শ্রীতপেন বসু।

তপেন বসু এসে কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন।
আচ্ছা মিঃ বসু, ইন্দ্রজিৎ রায় বলে আত্মপরিচয় দিয়ে যে ভদ্রলোক ২২শে জুলাই তারিখে গভীর রাত্রে আপনাদের টেলিফোন বুথে আসেন কলকাতার পুলিশ কমিশনারের কাছে ট্রাঙ্ক কল করবার জন্যে, এই ডাইরিখানা কি তিনিই ভুল করে ফেলে গেছলেন?
হ্যাঁ!

আচ্ছা এবার আপনি যেতে পারেন। মহামান্য আদালতের কাছে ডাইরিটা আমি পেশ করছি।
এবার আমার তৃতীয় সাক্ষী কলকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ আর. কে. সিনহা।

আচ্ছা মিঃ সিনহা, ব্ল্যাক ডায়মণ্ড যে দুখানা চিঠি রামজীবন সান্যালকে লিখেছিল, সে চিঠিদুটো কি আপনি দেখাতে পারেন?
নিশ্চয়ই। এই যে।

আমি রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে ভেসে এলো — ব্ল্যাক ডায়মণ্ড বলছি। গতকাল রাত নটা নাগাদ দিল্লীগামী তুফান মেলে প্রখ্যাত শিল্পপতি রামজীবন সান্যাল নিহত হয়েছেন। হত্যাকারী আপনাদের গোয়েন্দাচূড়ামণি ইন্দ্রজিৎ রায়।

ইওর অনার! ইন্দ্রজিৎ রায় ও ব্ল্যাক ডায়মণ্ড যে এক ব্যক্তি নয়, এটা তার আর একটা প্রমাণ। অথচ আমরা জানি যে, ব্ল্যাক ডায়মণ্ডই খুনী এবং নিহত সান্যালের জবানবন্দী শুনলে বোঝা যায়, ব্ল্যাক ডায়মণ্ড তার পূর্ব-পরিচিত, অবশ্য স্বরূপে নয়— ইন্দ্র রূপে। কে এই ইন্দ্র? কে এই ইন্দ্র তা আমরা জানতে পারবো আমার চতুর্থ এবং শেষ সাক্ষী মিঃ আই. আইচের মুখে।

কোন HAND WRITING EXPERT-এর প্রয়োজন হবে না ইওর অনার! ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের চিঠি, ডাইরি এবং মিঃ আইচের কার্ডের নীচে তাঁর লেখা BUSINESS PERSONAL– তিনটিই যে একই ব্যক্তির লেখা– তা সাদা চোখেই ধরা পড়ে। কিন্তু মী লর্ড, আমি আগেও বলেছি আবার বলছি এই বয়সের একজন ভদ্রলোককে মিঃ সান্যাল কি করে 'ইন্দ্র' সম্বোধন করেন? বয়সে ছোট হলে সেটা সম্ভব ছিল— অন্যথা অসম্ভব। কিন্তু অসম্ভবও অনেক সময় সম্ভব হয় মী লর্ড! আর সেই চেষ্টাই আমাকে এখন করতে হবে।

!

[সমাপ্ত]

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

ঘনাদা-উপন্যাস

হ্যাঁ মুলো। আর কিছু নয় মুলো।

তাই নিয়েই তুমুল কান্ড!

আমাদের শিবু নেহাত মরমে মরে আছে তাই, তা না হলে তার অনুপ্রাসের বাতিকে নিশ্চয় বলত মূলো,—বানানটা হ্রস্ব উ দিয়েই করলাম—তা থেকেই আমাদের বাহাত্তর নম্বরের আমূল পরিবর্তন। কিংবা এখান থেকে আমাদেরই নির্মূল হবার অবস্থা।

সামান্য মুলো! বাজারে নতুন উঠেছে। শিবু তাই খুব খুশি মনে গণ্ডা দুয়েক কিনে এনে আড্ডা ঘরে তাই নিয়ে আবার একটু জাঁক করেছিল।

আজ একটা জিনিস যা খাওয়াব! মরশুমের একেবারে প্রথম ফলন!

আমরা সকলেই একটু অবাক হয়ে শিবুর দিকে চেয়েছিলাম। সেই সঙ্গে একটু সন্দিগ্ধও।

শিবুর মুখে বাজার সম্বন্ধে এরকম বাহাদুরীর দাবি বেশ অস্বাভাবিক! বাজার করার নাম শুনলেই আগে সে ত ব্যাজার হয়ে থাকত। বাজারের পালা পড়লে প্রথমে সে নানা অজুহাতে এ দায় এড়িয়ে আর কারুর ঘাড়েই চাপাবার চেষ্টা করত। তাতে সফল না হলে এমন বাজার করে আনত যে আমাদের পাচক চূড়ামণি রামভুজের রান্নার যাদুর হাতেও সে সব জিনিস মুখে তোলবার যোগ্য হত না।

একটা দিন ঘনাদার মুখ আষাঢ়ের মেঘ হয়ে থাকত। সে মেঘ কাটাতে পরের দিন আমাদের বাজার খরচটা বাধ্য হয়েই যে ডবল করতে হত তা বলাই বাহুল্য।

নিজেদের খাওয়া নষ্ট হওয়া আর এই উপরি খরচার সমস্ত গায়ের ঝাল শিবুর ওপর গিয়ে পড়ত।

কিন্তু সব গাল মন্দ দাঁত-খিচুনি শিবু ঠেকাত করুণ মুখের একটি ছোট্ট জবাবে—আমি কি বাজার করতে জানি! কিছু যে চিনি না!

ওই এক বাজারের ধাক্কাতেই তার পর পারতপক্ষে শিবুর ওপর বহুদিন ও ভার দেওয়া হত না।

কিন্তু সম্প্রতি হঠাৎ শিবুর এক অদ্ভুত পরিবর্তনে আমরা বেশ একটু অবাক অবশ্য হয়েছি। কদিন হল শিবু নিজে থেকেই বাজারের ভারটা নিতে এগিয়ে আসছে!

এ সুমতির রহস্যটা শিশিরের কাছেই জানা গেছে। শিবু নাকি কোথায় শুনেছে বা পড়েছে যে ভীম সেনের স্বাস্থ্য নিয়ে, মার্কণ্ডেয়-র পরমায়ু পেতে হলে নিজে হাতে বাজার করতে হয়। সব দীর্ঘজীবী বড় বড় লোকেরা নাকি তাই করেছেন ও করেন। এই কিছু কাল আগেই স্যার যদুনাথ সরকার পর্যন্ত।

তা শিবুর বাজারে আমরা খুব কষ্টে আছি এমন কথা বলতে পারব না। এই সেদিন পর্যন্ত পোকা ধরা বেগুন, পাকা ঢেঁড়স, পচা আলু আর বাসি মাছ ছাড়া বাজারে আর কিছু যে খুঁজে পেত না এখন তার পছন্দর তারিফই করতে হচ্ছে মনে মনে। বাজারের টাটকা সওদা তার সঙ্গে এটা ওটা নতুন কিছু প্রায় রোজই আমাদের ভাগ্যে জুটছে।

বাজার নিয়ে তার হামবড়াইটা কিন্তু এই প্রথম!

বিস্ময়ের সঙ্গে সন্দেহটা সেই জন্যেই।

কি অবাক চিজ খাওয়াবি! গৌর মুখ টিপে হেসে জিজ্ঞাসা করেছিল,—তেরো হাত বীচির বারো হাত কাঁকুড়!

না, না!—শিশির সে ঠাট্টায় যোগ দিয়েছিল,—নতুন ফসল বলছে যে! নির্ঘাত তাহলে কচু শাক! বর্ষার শেষে মাঠ বন এখন ছেয়ে গেছে না!

এখন কচু বলো ঘেঁচু বলো,—শিবু নিজের সাফল্যে নিশ্চিন্ত থেকে বলেছিল,—খাওয়ার সময় দুবার চেয়ে খাবে!

বটে! আমাকে এবার ফোড়ন কাটতে হয়েছিল,—এমন আজব মাল কি নতুন উঠেছে বাজারে! প্লুই মেট্নুলী নাকি!

না, ব্রকোলি!

আমরা চমকে যথাস্থানে চোখ তুলেছিলাম।

হ্যাঁ, এ সরল সমাধান আর কারুর নয়, স্বয়ং ঘনাদার। শিশিরের দেওয়া জ্বলন্ত সিগারেট হাতে আসর ঘরের বিশেষ আরাম কেদারায় অর্ধ নিমীলিত চোখে শায়িত তাঁর উপস্থিতির কথাটা ভুলে যাওয়া আমাদের উচিত হয় নি।

কিন্তু ব্রকোলি? সে আবার কি!

আমাদের প্রায় সকলেরই মনের প্রশ্নটা কিন্তু মনের মধ্যেই চাপা থেকেছে।

গৌর ওর মধ্যে একটু ওয়াকিবহাল হবার চাল দেখিয়ে মুরুব্বির মত বলেছে,—ব্রকোলি কি জানিস ত? এক রকম কি বলে,—কি বলে......

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই ত যাকে বলে......আমি বিজ্ঞের মত গৌরের পন্থাই ধরেছি।

শিশির আর এক ধাপ এগিয়ে ঘনদাকেই যেন সমর্থন করে জানিয়েছে,—ঠিক ধরেছেন ঘনাদা! শিবু হাঁ করতেই বুঝেছি যে ব্রকোলি ছাড়া কিছু নয়। বাজারে এখন ত ব্রকোলিরই ওঠবার সময়।

ঘনাদার ভুরু জোড়া একটু কি কুঁচকেছে!

শিবুকে হার মানাবার উৎসাহে অতটা লক্ষ্য করি নি তখন। তার বদলে শিবুর চেহারাটাই যেন কেমন কেমন লেগেছে। নতুন সওদায় তার চমকে দেওয়ার প্যাঁচটা ধরা পড়ে গেছে ঠিকই। কিন্তু তাইতেই মুখ-খানা কি অমন ভ্যাবাচাকা দেখায়।

দুপুর বেলা খেতে বসে ব্রকোলি হঠাৎ মুলো হয়ে যাওয়ায় হতাশ কিন্তু খুব হইনি। পালঙশাক দিয়ে নতুন মুলোর ঘন্ট বেশ তৃপ্তি করেই খেতে খেতে শিবুকে তারিফ করেছি।

তা, তোর ব্রকোলি'ত সত্যিই খাসা দেখছি শিবু!

শিবু ডাইনে বাঁয়ে না চেয়ে নিজের থালাটার ওপরেই অখণ্ড মনোযোগ দেওয়ায় আরো তাতিয়ে বলেছি,—এরকম ব্রকোলি রোজ রোজ এখন আনিস।

ব্রকোলি!—ভাতের তালের ওপর মুলো পালঙ ঘন্টর একটি ছোটখাট পাহাড় সাফ করতে করতে ঘনাদা আমাদের দিকে ভ্রূকুটিভরে চেয়ে বলেছেন, কই ব্রকোলি কোথায়!

কোথায় আর! আপনার পাতে! শিশির বাঁকা হাসির সঙ্গে জানিয়েছে—শিবুর ব্রকোলির ঘন্টই ত খাচ্ছেন!

ব্রকোলির ঘন্ট খাচ্ছি! ঘনাদার গলা ভারী হয়ে উঠেছে, এ ঘন্টে ব্রকোলি আছে!

আছে বই কি!—গৌরের হঠাৎ বেয়াড়া রসিকতার ঝোঁক চেপেছে। এখন শুধু অন্য নামে আছেন মর্ত্য-লোকে! আপনার যা ব্রকোলি তাই এখানে মুলো!

মুলো! ঘনাদা মুলো পালঙের শেষ গ্রাসটা যথা-স্থানে পাঠিয়ে যেন শিউরে উঠে বললেন,—ব্রকোলি আর মুলো এক! জানো ব্রকোলি কাকে বলে? জানো বাঁধাকপির গাঞী আর ফুল কপির মেল মিলিয়ে ব্রকোলির বিবর্তন ঘটাতে কত যুগের সাধনা লেগেছে? জানো......

অত জানাজানির দরকার কি ঘনাদা!—ঘনাদাকে তাঁর ভাষণের মধ্যে থামিয়ে দিয়ে শিশির সব চেয়ে মারাত্মক ভুলটি এবার করে ফেলেছে,—যার নাম ভাজা চাল তার নামই মুড়ি। ও মুখে যখন ভালো লাগছে তখনও ব্রকোলিও যা মুলোও তাই ধরে নিন না!

ধরে নেব? ব্রকোলি আর মুলো এক বলে ধরে নেব!—ঘনাদার ধাপে ধাপে ওঠা গলায় মেঘ গর্জন শোনা গেছে,—তার মানে ব্রকোলির নামে আমায় মুলো খাওয়ানো হয়েছে! মুলো!

শেষ কথাটা যেন চাপা আর্তনাদের মত বেরিয়েছে ঘনাদার গলা থেকে।

আমরা এই বার প্রমাদ গণেছি। শিবু কাতর হয়ে বলেছে,—কেন ঘনাদা, মুলোগুলো ত খারাপ ছিল না।

বলেছিলাম কি ঘনাদা!—গৌরও অনুতপ্ত হয়ে শান্তির সাদা পতাকা উড়িয়েছে,—খাওয়া যখন হয়েই গেছে তখন আজকের মত ক্ষমা ঘেন্না করে নিন।

ঘনাদার কানে যেন এসব কথা পৌঁছোয়ই নি। আমাদের উপস্থিতিই ভুলে গিয়ে জলদগম্ভীর স্বরে তিনি ডাক দিয়েছেন,—রামভুজ!

রামভুজ ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে সভয়ে বলেছে,—হ্যাঁ বোলিয়ে বড়া বাবু!

কি বলবেন আর কি করবেন এবার ঘনাদা? আমরা দুরু দুরু বুকে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ইষ্টনাম জপ করেছি।

ঘনাদা কি খাওয়া ছেড়ে উঠে যাবেন? সেই কথাই বলতে ডেকেছেন রামভুজকে?

না, তা নয়। মুলোর ঘন্টের চাঁছা পোঁছা থালাটা

শুধু বদলে দিতে বলেছেন ঘনাদা।

তারপর নিঃশব্দে সব খাওয়া শেষ করে সেই যে টঙের ঘরে উঠে গেছেন আর আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপই নেই বললেই হয়।

চেষ্টার ত্রুটি আমরা কি কিছু করেছি? মোটেই না। সকালে বিকেলে গিয়ে ধন্না দিয়েছি তাঁর দরজায়।

তাতে ঘনাদার আবাহনও নেই বিসর্জনও না। আমাদের যেন দেখেও দেখেন নি। নেহাত আমরা নাছোড়বান্দা হলে হুঁ হাঁ দিয়ে সেরেছেন।

বালাখানা থেকে এই সব চেয়ে সরেস অম্বুরি তামাক আনলাম ঘনাদা!—আমরা স্বস্ত্যয়নের নৈবেদ্যটা তাঁর সামনে ধরে দিয়েছি কখনো।

হুঁ,—তিনি সেটার দিকে একবার দৃক্‌পাত করে আবার নোট বুকের মত ছোট কি একটা বই-এর পাতা উল্টাতে তন্ময় হয়ে গেছেন।

কি এমন বই-এ ঘনাদার হঠাৎ মনোযোগ? সকালে বিকেলে বার কয়েক তাঁকে সেই বই-এই ডুবে থাকতে দেখে অনেক চেষ্টা করেও সেটার মর্ম উদ্ধার করতে পারিনি।

সংক্ষিপ্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নিশ্চয়!—ঘনাদার ঘর থেকে ফেরার পর শিবুর অনুমানটা আমাদের মনে লেগেছে। কিন্তু ঘনাদার হঠাৎ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় এত আঠা কেন?

রহস্যটা কিছু বোঝা গেছে পরের দিনই। আমরা যথারীতি সকালে নিষ্ফল হাজিরা দিয়ে ফিরে এসেছি। খানিকবাদেই ওপর থেকে সেই পেটেণ্ট গলা শুনে উৎসুক হয়ে কান খাড়া করতে হয়েছে।

ঘনাদা বনোয়ারীকে ডেকে কি বলছেন। কথাটা জনান্তিকেই বলা হচ্ছে নিশ্চয়, তবে বাহাত্তর নম্বরের বাইরের গলি ছাড়িয়ে সদর রাস্তা পর্যন্ত কারুর কাছে তা অশ্রুত থাকা উচিত নয়।

হ্যাঁ, বলবি ডাক্তারখানায় যাচ্ছি, বুঝলি!—ঘনাদা তারস্বরে তাঁর গোপন সংবাদটা জানিয়েছেন,—যারা সব আসবে তারা যতই কাকুতি মিনতি করুক, বড়বাজারে যে গেছি তা বলবি না। তাতেও যদি না শোনে ত আর দেখা হবে না বলে বিদেয় করবি, বুঝেছিস?

আমাদের হাত পা প্রায় ভেতরে সেঁধিয়ে যাবার অবস্থা।

না, ঘনাদার দর্শনপ্রার্থীদের ভিড়ের ভয়ে নয়, বড়-বাজার ডাক্তারখানা এই সব গোলমেলে কথা শুনে।

হঠাৎ তাঁর ডাক্তারখানায় যাবার কি দরকার পড়ল?

টঙের ঘর থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে তাই তাঁকে ঘিরে ধরি।

—ডাক্তারখানায় কেন ঘনাদা? কি হয়েছে!

মানুষের শরীরের কথা কিছু বলা যায়—নীরব না থেকে আমাদের ওপর কৃপা করে ঘনাদা উদাসীন দার্শনিক হয়ে ওঠেন,—শরীর থাকলেই ব্যাধি আছে!

ও বাবা! আমরা সেইখানেই প্রায় বসে পড়ি আর কি! এর চেয়ে কথা বন্ধ যে ভালো ছিল, কিংবা জ্বলন্ত গলার বকুনি! এ মূর্তিমান বৈরাগ্যশতককে সামলাব কি করে?

তবু যা হোক একটা চেষ্টা করতেই হয়।

অসুখ করেছে আপনার? আমরা শশব্যস্ত হয়ে উঠি,—তা আপনি ডাক্তারখানায় যাবেন কি! আর সেই বড়বাজারে! আমরা এখুনি ডাক্তার ডেকে আনছি!

ডাক্তার!—ঘনাদা এমন একটা গলার স্বর আর মুখ-ভঙ্গী করেন যেন নতুন হাওড়া ব্রীজ বানাতে আমরা নাপিত ডাকবার কথা বলেছি।

কেন?—আমরা অপ্রস্তুত হয়ে নিজেদের মূঢ়তার কৈফিয়ৎ হিসেবে বলি,—ডাক্তার কিছু করতে পারবে না? ডবল এম. আর. সি. পি. এফ. আর. সি. এস. ডেকে আনব!

না, তাতে লাভ নেই।—ঘনাদা পরম তিতিক্ষার সঙ্গে জানান—ওদের গালভরা ডিগ্রিই আছে, আসল যা জিনিস তা পাবে কোথায়! দেখি যোগাড় হয় কি না! পারি যদি ত ফিরব।

অ্যাঁ!—আমরা একেবারে আঁৎকে উঠি ভয়ে। ঘনাদা বলেন কি?

আপনার সঙ্গে তাহলে যাই?—আমরা আকুল আগ্রহ জানাই।

কিন্তু ঘনাদা যেন শিউরে ওঠেন,—সঙ্গে যাবে! তার মানে মুলো খেয়ে যে সর্বনাশটা হয়েছে তা একেবারে মোক্ষম করতে চাও? সঙ্গে কেউ থাকলে ও জিন-সেঙের সন্ধান আর পাব! এমনিতেই এক কণা যদি পাই তাহলে বুঝব নেহাত পরমায়ুর জোর।

এর পর বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় কি!

আচ্ছা চলি!—বলে ঘনাদা যেন ফাঁসিকাঠে উঠতে যাওয়ার মত করে উদাস মুখে বিদায় নিয়ে যান।

বারান্দায় সিঁড়ির মাথাতেই একবার শুধু ফিরে দাঁড়ান।

দেখো নেহাতই যদি ফিরি—ঘনাদা নিরাশ শুকনো গলাতেই বলেন,—তাহলে জোরালো একটু পাথ্যির

দরকার হ'তে পারে। জিন-সেঙের ধাক্কা সামলানো ত সোজা কথা নয়।

*   *   *

আর আমাদের কিছু বলতে হয়?

জিন-সেঙ কি চিজ্ জানি না। তাতে কি হয়েছে! জোরালো পথ্যি বলতে যা কিছু মাথায় আসে সব কিছুরই যোগাড় রাখতে ত্রুটি করি না।

জোরালো পথ্যি মানে কি?—নিজেদেরই জিজ্ঞাসা করি।

উত্তরটাও নিজেরাই দেবার চেষ্টা করি;—গরম দুধ, শিঙ্ মাগুর কই-এর ঝোল?

মনটা খুঁত খুঁত করে। ও সব ত দুব্‌লা পাৎলা পেট-রোগাদের পথ্যি। তেমন জবরদস্ত কিছুর ধাক্কা কি ওই পানসে পথ্যিতে সামলানো যাবে? তার জন্যে তন্দুরী নান, মটনের রগন জোস গোছের কিছু না হলে চলে? অন্ততঃ মটন দোপেঁয়াজা, চিকেন কাটলেট ত বটেই।

বড় ফাঁপরেই পড়তে হয়। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা রাখব? শেষ পর্যন্ত মীমাংসায় হার মেনে জল-সাবু

খাবার আগলাতে টেবিলের ওপরই ঝাঁপিয়ে......

থেকে সুরু করে শিক্‌কাবাব, শোহন হালুয়া পর্যন্ত সব কিছুর যোগাড়েই লেগে যাই।

যোগাড়ের সঙ্গে সঙ্গে হা-হুতাশ আর পরস্পরের দোষ ধরা চলে।

আর ঘনাদা ফিরবেন? কোন আশাই নেই!

যাবার সময় মুখটা কেমন ফ্যাকাশে মেরে গেছে দেখলি না!

কিন্তু হঠাৎ হলটা কি? দিব্যি ত বহাল তবিয়তে ছিলেন!

হবে আর কি? হয়েছে ওই মুলো! ওই মুলোই সর্বনাশ বাধিয়েছে।

হ্যাঁ মুলোতে নিশ্চয় অ্যালার্জি!

তা অ্যালার্জির ওষুধ খেলেই ত হয়।—শিবু নিজের অপরাধটা একটু হালকা করবার চেষ্টা করে।

তুই, আর তোর ওই মুলোই ত সব নষ্টের মূল!—আমরা তার ওপর খেঁকিয়ে উঠি,—মুলো আনবার কি দরকার ছিল? আবার কি চিজ খাওয়াব বলে বাহাদুরী!

তা মুলো উনি খেলেন কেন?—শিবু দুর্বল ভাবে একটু তর্ক তোলে।

খেলেন, মানে...ব্রকোলি ভাবতে ভাবতে ভুলে খেয়ে ফেলেছেন নিশ্চয়।—আমরা শিবুর বেয়াড়া প্রশ্নটাকে আমলই দিই না—আর ওই ভুল করে খেয়েই আরো সাংঘাতিক হয়েছে বোধহয় অ্যালার্জি!

আমার ত ভয় হচ্ছে রাস্তাতেই মুখ থুবড়ে না পড়েন।

আমাদের সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু যেতে দিলেন কই? কেউ সঙ্গে থাকলেই নাকি সেই জংশন নাকি আর পাওয়া যাবে না।

জংশন নয়, জিন-সেঙ!—শিশির সংশোধন করে।

জংশন বা জিন-সেঙ যাই হোক,—হতাশ হই আমরা,—ও জিনিস কি আর পাওয়া যাবে! শুনলি না, এক কণার জন্যে সারা বড়বাজার চষে ফেলতে হবে!

তাহলে?—আমাদের গলা ধরে আসে।—তাহলে ওই এক কণা জিন-সেঙ না পাওয়া মানে ত ঘনাদার আর না ফেরা! মানে এ বাহাত্তর নম্বর অন্ধকার!

অন্ধকার আবার কিসের? বাহাত্তর নম্বরে আর থাকছি নাকি!

হ্যাঁ বাহাত্তর নম্বর ত ছার এ বনমালী নস্কর লেনেই আর ঢুকতে পারব না।

মেসের জন্যে নতুন বাড়ি কোথাও...শিবু কথাটা

সুরু করতেই আমরা তাকে এই মারি ত সেই মারি!

আবার বাড়ি, আবার মেস! লজ্জা করে না?

আমি ত দেশ ছেড়েই চলে যাব ঠিক করলাম!—শিশির তার অটুট সংকল্প জানায়।

কোথায় যাবি?—আমি শিশিরের সংগী হবার জন্যে তৈরী হই,—কটক না কাটামুণ্ডু?

কটক না কাটামুণ্ডু?—শিশির যেন অপমানে জ্বলে ওঠে,—তার বদলে বেহালা বঁড়শে বললেই পারতিস! ওর নাম দেশ ছেড়ে যাওয়া! যাব কঙ্গো কি কটোপাক্সি!

এই?—আমিই বা কম যাই কেন?—তোকে একটু পরীক্ষা করে দেখলাম। দেশ যদি ছাড়তেই হয় তাহলে কঙ্গো আর কটোপাক্সি কেন?—যাবো আঙগারা বেসিন কি কুইন মড রেঞ্জ!

ও আর এমন কি!—শিশির হালে পানি না পেলেও ভাঙে তবু মচকাতে চায় না,—আরো দূর গেলেই হয়!

আর দূর এ পৃথিবীতে যাবার কোথাও নেই যে!—ঘনাদাকে তাতাবার আশায় সেদিন সকালেই ভূগোল হাঁটকানো বিদ্যের জোরে আমি শিশিরকে পেড়ে ফেলি,—আঙগারা বেসিনটা হল উত্তর মেরুতে, আর কুইন মড রেঞ্জ দক্ষিণ মেরুতে।

বেশ একটু থমথমে অবস্থা। ঘনাদার অভাবের শোকটা এমন একটা মোক্ষম টেক্কা দেওয়ার বাহাদুরীতে একটু যে হাল্কা করব তার কি যো আছে তবু?

ও মেরু টেরু কিছু নয়!—গৌর বিদ্যে জাহির করবার আর যেন সময় পেল না,—যেতে হলে যাও আল আজিজিয়া, নয়ত নর্থ ভোস্টক!

আমরা সবাই কি একটু ভ্যাবাচাকা?

ভেতরে যাই হই বাইরে ধরা দেবে কে?

আমি ঘনাদার নাসিকা ধ্বনিরই অক্ষম অনুকরণ করে অবজ্ঞা ভরে বলি,—তা, ওর চেয়ে ভালো জায়গা ভেবে না পাও ত ওই দুটোয় একটাতেই যাও।

ভালো নয়, সবচেয়ে খারাপ জায়গা বলেই যেতে চাইছি!—গৌর আমার খোঁচাটাকে ভোঁতা করে দিয়ে বলে,—একেবারে জ্বলন্ত চুলোয় ঝলসাতে চাও ত যাও লিবিয়ার আল আজিজিয়া। থার্মোমিটারের পারা ১৩৬·৪ ফারেন হাইটে গিয়ে পোঁছোয়, আর মাইনাস ১২৬·৯-এ যদি জমে বরফের চাঁই হতে চাও ত যাও দক্ষিণ মেরুর নর্থ ভোস্টক-এ। দুনিয়ার সব চেয়ে ঠাণ্ডা জায়গা।

ওইমিয়াকন্!

হৃদযন্ত্রগুলো লাফ দিয়ে প্রায় মুখের হাঁ দিয়েই বেরিয়ে যায় আর কি! ক্ষীণ হলেও গলাটা শুনেই চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি বৈঠক-ঘরের দরজায় সশরীরে স্বয়ং ঘনাদা। কিন্তু যেভাবে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এখুনি পড়ে যাবেন যে! কি যেন কোন মিঞার সম্বন্ধে ভুলও বকছেন ত!

ধরাধরি করে এনে তাঁর মৌরসী কেদারায় বসিয়ে পাখাটা ফুলস্পীডে চালিয়ে দেবার পর আসল কথাটা খেয়াল হয়। আরাম-কেদারার হাওয়ায় কি হবে? দরকার ত এখন অন্য কিছুর!

আপনার পথ্যিগুলো এখানেই আনতে বলি, ঘনাদা?—ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করি।

পথ্যি শুনে ঘনাদার মুখে ক্ষণেকের জন্যে একটু যদি ছায়া নেমে থাকে ত গৌরের ব্যাখ্যাতেই তা কেটে যায়!

অত পথ্যি আবার এখানে ধরানো মুশকিল!—গৌর বেশ চিন্তিত হয়ে বলে,—মটন আর চিকেনের কটা প্লেটেই ত এ ছোট টেবিল ভরে যাবে!

সব প্লেট আনবার দরকার কি?—শিশির সুযুক্তি দেয়,—বাছাই করে গোটা কয়েক আনলেই ত হয়! ঘনাদা ত আর সব খাবেন না!

শিশিরের প্রস্তাবটা শেষ হতে না হতেই ঘনাদার উদ্বিগ্ন কণ্ঠ শোনা যায়,—না, না খাবার ঘরেই চলো। এতটা যখন এসেছি তখন এটুকুও পারব!

গলাটা সাতদিনের সাবু খাওয়া রুগীর মত চিঁ-চিঁ করলেও ঘনাদা আমাদের সমর্থনের অপেক্ষায় না থেকে নিজে নিজেই ইজি চেয়ার থেকে উঠে বেশ চটপটে পা বাড়িয়ে দেন।

পিছু পিছু গিয়ে খাবার ঘরে তাঁর সংগে এবার বসতে হয়।

তা টেবিলটা যে ভালোই সাজানো হয়েছে ঘনাদার চোখ দেখেই তা বোঝা যায়। ঘনাদা কোন্ দিকে যে প্রথম হাত বাড়াবেন যেন ঠিক করতে পারেন না। গলাটা অবশ্য তাঁকে এখনো চামচিকের মতই রাখতে হয়।

এত সব খাবার করতে গেলে কেন?—ঘনাদার করুণ গলার মৃদু অনুযোগ।

তাহলে দু-একটা তুলে রাখি!—গৌর যেন সে অনু-যোগে লজ্জা পেয়ে [illegible] শোধরাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

আহা! আবার [illegible]সাতুলির কি দরকার!—চিঁ-চিঁ গলা প্রায় চিঁহি হয়ে ওঠে ঘনাদার। খাবার আগলাতে টেবিলের ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়েন বুঝি!

তা, সাজানো টেবিলের মান ঘনাদা রাখলেন। খাওয়া

শেষ করে শিশিরের দেওয়া সিগারেট ধরিয়ে যখন তিনি আবার আসর ঘরের আরাম-কেদারার শোভা বাড়ালেন তখন টেবিলের প্লেটগুলোয় পিঁপড়ে কেঁদে যাচ্ছে বললে খুব বাড়িয়ে বলা হয় না। তাঁর চিঁ-চিঁ গলাও তখন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে অবশ্য।

বনোয়ারীকে খাবার জল দিয়ে যাবার হাঁকে গলার এই উন্নতি দেখেই ভরসা পেয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম,—শেষ পর্যন্ত জংশন তাহলে পেলেন?

জংশন নয় জিন-সেঙ—শিশির সংশোধন করলে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই জংশনই হোক্‌—আমি সংশোধনটার এমন কিছু দাম না দিয়েই বললাম,—আর জিন-সেঙ-ই বলি, ঘনাদা যে পেয়েছেন এই আমাদের ভাগ্য!

কিন্তু কই আর পেলাম!—ঘনাদা আমাদের মুখের হাঁ-গুলো খানিক বুজতে না দিয়ে বললেন,—জিন-সেঙ এই কলকাতা শহরে ত ছার, ইন্ডিয়াতেই কোথাও আছে কিনা বলতে পারি না।

কিন্তু জিন-সেঙ না পেলে ত আপনার...

শিবু ঘনাদার দিকে চেয়ে উদ্বেগে আশঙ্কায় কথাটা আর শেষ করতে পারলে না।

জিন-সেঙ না পেয়ে থাকলে ঘনাদা এক টেবিল খানা সাফ করে কিসের ধাক্কা সামলালেন সে প্রশ্নটাও তখন আমাদের মনে উঁকি দিচ্ছে।

ঘনাদা সব উদ্বেগ আশঙ্কা কৌতূহলই ঠাণ্ডা করলেন।

বনোয়ারীর নিয়ে আসা জলের গেলাসটা প্রায় এক চুমুকেই খালি করে কোঁচার খুঁটে জলের সঙ্গে মুচকি হাসিটাও যেন মুছে বললেন,—হ্যাঁ উপায় নেই, তাই জিন-সেঙের সস্তা বদলী দিয়েই কাজ সারতে হল।

জিন-সেঙের সস্তা বদলী!—ঘনাদা যেন একটু মাত্রা ছাড়াচ্ছেন! গৌরের উচ্চারণের ধরনে সেই সন্দেহটা একেবারে লুকোন রইল না।

হ্যাঁ জিন-সেঙের বিকল্প রিন-সেন!—ঘনাদা কিন্তু নির্বিকার ভাবে জানালেন,—তাও দাঁও বুঝে চার আঙুলের দাম চাইল চার হাজার...!

চার হাজার টাকা! চার আঙুল মাপের জিনিসের দাম!

তার মানে এক আঙুল পরিমাণ হাজার টাকা?

আমাদের চোখগুলো তখন যেমন কপালে, গলা-গুলো তেমনি আর খুব মোলায়েম নয়। সন্দেহের বদলে তাতে শঙ্কাটাই প্রধান হয়ে উঠছে।

জিন-সেঙ না রিন-সেন ওই ছাই পাঁশ কিছু সত্যি খেয়ে থাকুন বা না খেয়ে থাকুন ঘনাদার মাথাটাতে হঠাৎ একটু গোলই বাধল না কি!

ফিরে এসে আসর ঘরে ঢোকার মুখেই তাঁর প্রথম আবোল-তাবোল কথাটাও মনে পড়ে গেল। প্রলাপ বকা তখনই ত সুরু হয়ে গেছে মনে হয়!

তবু অবস্থাটা ঠিকমত বোঝবার জন্যে একবার জিজ্ঞাসা করলাম,—তা, ওই হাজার টাকা আঙুল মানে ইঞ্চির রিন-সেন-ই কিনলেন? ওই কোন মিঞার কথা বলছিলেন তার কাছেই বুঝি!

মিঞার কথা বলছিলাম!—ঘনাদা ক্ষণেক একটু হকচকিয়ে গিয়ে তারপর অনুকম্পার হাসি হাসলেন,—না, কোন মিঞার কথা বলিনি, শুধু ওইমিয়াকন-এর নাম করেছিলাম।

আমাদের হতভম্ব মুখগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে করুণা করে তারপর ব্যাখ্যা যা করলেন, তাতে অবস্থা আরো কাহিল,—সব চেয়ে ঠাণ্ডা জায়গার কথা কি হচ্ছিল না তোমাদের? তাই শুনে ওইমিয়াকন-এর কথা মনে পড়ল। পাঁচ পাঁচটা আঁটি সেখানে যদি অমন দাতাকর্ণ হয়ে না দিয়ে আসি তাহলে আজ বিক্রম থাপাকে তার বাবার কথাটা মনে করিয়ে দিতে হয়!

জিন-সেঙ, রিন-সেন পাঁচ আঁটি, দাতাকর্ণ ওইমিয়া-কন, বিক্রম থাপা, আবার তার বাবা,—সব মিলিয়ে মাথা-গুলো যে আমাদের তখন চক্কর খাচ্ছে তা নিশ্চয় বলবার দরকার নেই।

তারই মধ্যে একটু সামলে উঠে গৌরই প্রথম জিজ্ঞাসা করলে, কিসের আঁটি দান করে এসেছিলেন? ওই জিন-সেঙের? ওখানে কারখানা আছে বুঝি?

কারখানা? ওখানে জিন-সেঙের কারখানা! অ্যাপোলো ইলেভ্‌ন-এর আর্মস্ট্রংকে চাঁদে চিনে বাদামের দর যেন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, ঘনাদা গৌর আর সেই সঙ্গে আমাদের মূঢ়তায় সেই রকম যেন ব্যথা পেয়ে বললেন,—ওইমিয়াকন বলতে কি বোঝায় তা জানো? ওইমিয়াকন হল একটা শহরের নাম। পৃথিবীর সব চেয়ে ঠাণ্ডা শহর। তখন দুনিয়ার সব চেয়ে ঠাণ্ডা জায়গার কথা বলছিলে না? সে জায়গা অবশ্য অ্যান্টারটিক মানে দক্ষিণ মেরুর নর্থ ভোস্টক। সেখানে এক দশমিক কম মাইনাস একশ সাতাশেও থার্মোমিটারের পারা নামে। কিন্তু সে জায়গা ত ধু-ধু তুষারের তেপান্তর। মানুষের পাকা বসতি আছে এমন শহর ত নয়। সে রকম শহর হল সাইবিরিয়ায় এই ওইমিয়াকন। আর্কটিক সার্কল যাকে বলে সেই সুমেরু বৃত্তের বাইরে ও দক্ষিণে হলেও

এ শহরে শীতকালে থার্মোমিটারের পারা মাইনাস ছিয়ানব্বুইও ছোঁয়। আর সে শীত ত আমাদের মত পৌষ মাসেই কাবার নয়। বছরের আট মাসই যা কিছু তরল সব জমে পাথর হয়ে থাকে।

এই ওইমিয়াকন-এই সমশের-এর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তখন তার নাম অবশ্য সমশের নয়, সেমেন রজুনিকভ্। তাকে ও অঞ্চলের আদিবাসী ইয়াকুট বলেই ধরে নিয়ে সাইবেরিয়ায় অজানা অসীম 'টাইগা' অঞ্চলের গাইড ও সঙ্গী হিসেবেই সবে বহাল করেছি।

খটকা লেগেছে অবশ্য গোড়াতেই। ওইমিয়াকন শহর হিসেবে এখনো কিছু নয়। কম বেশী হাজার তিনেক লোকের সেখানে বসতি। যাকে রুপোলী শেয়াল বলা হয় মহামূল্য পশমী ছাল ফ্যর-এর জন্যে উত্তর মেরু অঞ্চলের সেই প্রাণীটি পোষবার একটা ফার্ম-ই ও শহরের প্রাণ বলা যায়।

যখনকার কথা বলছি তখন শেয়াল পোষা ফার্মের সবে পত্তন হয়েছে। মেরু অঞ্চলের ফ্যর শিকারী আর বল্গা হরিণের পাল অসীম 'টাইগা'-য় যারা চরিয়ে বেড়ায় সেই ইয়াকুট রাখালদের ওটা একটা সময় অসময়ের মেলবার আস্তানা মাত্র।

আধ পোষা বল্গা হরিণের পাল থেকে শুরু করে 'টাইগা' অঞ্চলের পশু-প্রাণীর একটু বিস্তারিত খোঁজ নেবার জন্যে ওইমিয়াকন-ই কদিনের জন্যে প্রধান ঘাঁটি করেছিলাম। অভিযানে বার হলে নাগাড়ে অন্ততঃ দু-তিন হপ্তা টহল দেবার মত রসদ সঙ্গে রাখা দরকার। সেই ব্যবস্থা করতে গিয়েই সেমেন মানে সমশের-এর ওপর প্রথম সন্দেহ জাগল একটু। আমার নির্দেশ মত কয়েকটা জিনিস সেমেন সেদিন ওইমিয়াকন ঘুরে সওদা করে এনেছে। সেগুলো দেখতে দেখতে অবাক হয়ে বললাম, তুমি ত আসল জিনিসই ভুলে গেছ দেখছি! কই স্ট্রোগানিনা কই?

কি বললেন?

না, প্রশ্নটা সেমেন ওরফে সমশেরের নয়। আমাদেরই।

মুখে কিছু না বললেও, ঘনাদা আমাদের অজ্ঞতার প্রতি করুণা কটাক্ষ করে বললেন,—সমশেরের চোখেও সেই প্রশ্নই দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম।

স্ট্রোগানিনার কথা কি ভুলে গিয়েছিলে নাকি? মনের ক্ষীণ সন্দেহটাকে তবু প্রশ্রয় দিই নি,—শুধু ত দুটো জিনিসই আনতে দিয়েছি চোখন আর স্ট্রোগানিনা। তারই আসলটা ভুলে গেলে?

...এক রাশ কমলা রঙের ক্ষুদে ক্ষুদে পেরেকের মাথা যেন জটলা পাকিয়ে...

আজ্ঞে?—এবারও কাতর বিহ্বল প্রশ্নটা আমাদেরই —ওগুলো কি খাবার দাবারের নাম?

হ্যাঁ,—আমাদের এইটুকু বুদ্ধির পরিচয়েও যেন কৃতার্থ হয়ে ঘনাদা ব্যাখ্যা করলেন,—চোখনকে মালাই চীজ-এর একরকম কুলপি বলতে পারো। তবে নোনতা। আর স্ট্রোগানিনা হল কাঁচা বরফে জমানো মাছ।

ইয়াকুট হয়ে তাদের সব চেয়ে পেয়ারের খাবার স্ট্রোগানিনা জানবে না! এমনটা হতেই পারে না। ভুলে যাবার কারণ তাই অন্য কিছু বলে ধরে নিয়েছিলাম।

কিন্তু 'টাইগা'-য় টহলদারীতে বার হবার পর কয়েক দিনের মধ্যেই সমশের সম্বন্ধে সন্দেহটা আর উড়িয়ে দেওয়া গেল না। ওইমিয়াকন থেকে রওনা হয়ে তখন দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় খান্দিগার কাছাকাছি ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ ফার গাছের জঙ্গলের মাঝে একটা জায়গা চোখ দুটোকে যেন চুম্বকের মত আটকে দিলে। বরফের মত ঠাণ্ডা মাটির সঙ্গে প্রায় লেপটে এক রাশ কমলা রঙের ক্ষুদে ক্ষুদে পেরেকের মাথা যেন জটলা পাকিয়ে আছে।

নিজের চোখকে সত্যিই বিশ্বাস করতে পারছি না তখন। তন্ময় হয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ সমশেরের কথায় চমক ভেঙেছে।

কি দেখছেন কি এত?

অবাক হয়ে সমশেরের দিকে খানিক চেয়ে থেকে তার কথাটা বিশ্বাস করতে না পেরে বলেছি,—কি দেখছি, সত্যি জিজ্ঞাসা করছ?

হ্যাঁ করছি ত!—আমার গলার স্বরে একটু অস্বস্তি বোধ করে সমশের বলেছে,—ওদিকে একটা 'মিঙ্ক' ভাম চলে গেল কি না, তাই ভাবছি কি এত দেখছেন?

আমিও একটা কথা ভাবছি সেমেন!—তার চোখে চোখ রেখে বেশ একটু কড়া গলায় বলেছি,—তুমি কি সত্যি ইয়াকুট?

কেন? কেন? সমশের বেশ একটু অস্থির হয়ে বলেছে, আমি ইয়াকুট নয়ত কি?

কি, তাইত ভাবছি! ইয়াকুট হয়ে তুমি স্ট্রোগানিনা কাকে বলে জানতে না, এই কদিন টাইগা-য় ঘুরে দেখলাম তুমি এ অঞ্চলের নদী-পাহাড় বন কিছুই ঠিক মত চেন না। এখন আবার আমি কি দেখছি জিজ্ঞাসা করলে অম্লান বদনে। তোমার পক্ষে ইয়াকুট হওয়া অসম্ভব। সত্যি করে বলো ত সেমেন রুজনিকভ্ তোমার আসল নাম কি না?

আরো কিছুক্ষণ পরিচয় লুকোবার বৃথা চেষ্টা করে সমশের শেষ পর্যন্ত সব কথাই স্বীকার করেছিল। সেমেন রুজনিকভ্ নয়, নাম তার সমশের থাপা। এমনিতে বেশ ভালো ঘরের ছেলে। শিক্ষা দীক্ষাও অবহেলা করবার মত নয়, শুধু পেশাটা যা বেছে নিয়েছে তা অত্যন্ত নোংরা। সমশের গুপ্তচর হিসেবে এ অঞ্চলে এসেছে। এখানকার আদিবাসীদের সঙ্গে চেহারায় মিল দেখে ভাষা ইত্যাদিতে যথাসম্ভব তালিম দিয়ে—কোন শত্রুপক্ষের শক্তি তাকে ইয়াকুট সেজে ওখান থেকে সব রকম দরকারী খবর সংগ্রহ করে আনতে পাঠিয়েছে।

কাজ সে ইতিমধ্যে খুব কম করেনি। তার ওপর আমার কাছে চাকরি বাগিয়ে তার সুবিধে হয়েছে খুব বেশী। আমি যখন তাকে সহায় সঙ্গী হিসেবে বহাল করেছি-ভেবেছি তখন আসলে সেই আমায় বাহন করেছে তার কার্যোদ্ধারের জন্যে। এ অজানা অঞ্চলে নিরাপদে নির্ভয়ে ঘোরাফেরার জন্যে আমার মত কাউকেই তার দরকার ছিল।

সব শুনে আমি তাকে দুটি রাস্তার একটি বেছে নিতে বলেছি। হয় তাকে গুপ্তচর হিসেবে ধরা পড়তে হবে, নয় এ পর্যন্ত যা কিছু সে সংগ্রহ করেছে সমস্ত আমার সামনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

সমশের থাপা শেষ পথটাই বেছে নিলে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিয়তিই তার সংকল্পে চরম বাদ সাধবে বলে ভয় হল।

টাইগা থেকে ফিরে ওইমিয়াকন-এর ভেতরে তখন ঢুকেই পড়েছি। আর পো খানেক পথ গেলেই আমাদের আস্তানায় পৌঁছে যাই।

হঠাৎ আপনা থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে এল আমার গলা থেকে,—নাক! তোমার নাক সামলাও সমশের!

নাক! সমশের চমকে উঠে নাকে হাত লাগালো।

চমকে উঠলাম আমরাও,—নাকে হাত হঠাৎ? কি সামলাতে?

নাক চুরি যাচ্ছিল নাকি? গৌরের বেয়াড়া প্রশ্ন।

গোঁফ চুরির মত নাক চুরিও যায় বোধ হয়!—শিশিরের তার ওপর ফোড়ন।

অন্য দিন হলে এই বেয়াদবিটুকুতেই বৈঠক বানচাল হয়ে যেতে পারত। আজ পথ্যিগুলোর পয়েই ঘনাদার খোস-মেজাজে চিড় ধরল না।

নাক চুরিই বলতে পারো!—আমাদেরই এরকম সমর্থন জানিয়ে ঘনাদা গলায় যেন ভয়ের কাঁপুনি তুললেন,—তার চেয়েও বুঝি সাংঘাতিক।

দু সেকেন্ড আমাদের মনে কথাটা বসবার সময় দিয়ে ঘনাদা আবার শুরু করলেন,—চুরি গেলে তবু ফেরৎ পাবার আশা থাকে। এ একেবারে জন্মের মত লোপাট হবার ভয়। অস্থির হয়ে তাই সমশেরকে প্রাণপণে নাক ঘষতে বললাম। প্রাণপণে ঘষে ঠাণ্ডায় জমে সাদা হয়ে যাওয়া নাকটায় যদি রক্ত চলাচল করাতে পারে। তা না হলে ও নাক আর বাঁচানো যাবে না। পচে খসে যাবে। সাইবিরিয়ার টাইগা-র ঠাণ্ডার এই এক বিভীষিকা। সমশেরকে আর দুবার বলতে হল না। রাস্তার ধারে পিঠের বোঝা নামিয়ে দাঁড়িয়ে সে তখন ক্ষ্যাপার মত নাক ঘষতে শুরু করেছে।

নাকটা তাতে বাঁচল কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যতক্ষণ নাক ঘষেছে তাতে একটা পা-ই গেছে ঠাণ্ডায় জমে। সে পা-টা শেষ পর্যন্ত কেটে বাদই দিতে হল। তাতেও সমশেরকে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি। সে টানাটানির মধ্যে তার গুপ্তচরগিরির কীর্তিগুলো সম্বন্ধেই দারুণ ভাবনায় পড়লাম। কথা ছিল ওই-

মিয়াকন-এ পৌঁছেই তার সে গোপন কাগজপত্রের পুঁজি সে আমার হাতে তুলে দিয়ে আমার সামনেই জ্বালিয়ে দেবে। রাস্তায় নাক জমে যাওয়ার পর থেকে সে পুঁজি কোথায় যে লুকোন তা বলবার ফুরসুতই সে পায় নি। বলবার মত অবস্থাও তার ছিল না।

তার মরণ-বাঁচন-দোলার অসুখের মধ্যে নিজেই একদিন তার ডেরায় গিয়ে জিনিসপত্র থেকে শুরু করে তার কামরায় খুঁজতে কিছু বাকি রাখি নি। তখন ওখানকার সব বাড়িই ছিল কাঠের বড় বড় গাছের রোলা কেটে তৈরী। সে কাঠের কামরায় চোরা ফোকর কোথাও থাকতে পারে ভেবে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ঠুকে ঠুকে হয়রাণ হয় গেছি। কোন হদিসই মেলে নি।

সমশেরকে যদি না বাঁচানো যায়, শেষ পর্যন্ত তার গোপন পুঁজির খবর সে যদি না দিয়ে যেতে পারে তাহলে কি হওয়া সম্ভব তাই ভেবেই বুকটা কেঁপে উঠেছে বার বার! আমি এখন সন্ধান না পেলেও, পরে কোনদিন কোন লুকোন জায়গা থেকে সমশেরের গুপ্তচরগিরির কীর্তি বার হয়ে পড়া কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। সমশেরের সঙ্গে আমার নামটাও তখন এই কুৎসিত জঘন্য ব্যাপারের সঙ্গে যে জড়িয়ে ভাবা হবে! সমশের আমার কাছেই কাজ করেছে, তাকে নিয়েই আমি টাইগা অঞ্চলের দুর্গম সব জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। আমিই যে খোদ চক্রী নই কে বিশ্বাস করবে তখন সে কথা! বিশেষ করে সমশের ত তখন সব ধরা ছোঁয়ার ওপারে চলে গেছে!

যেমন করে হোক সমশেরের বেঁচে ওঠা তাই একান্ত দরকার। কিন্তু সেইটেই অসম্ভব মনে হয়েছে। ওইমিয়াকন-এর আধা হাতুড়ে ডাক্তারের ওপর ভরসা না রেখে দুশ পঁচিশ মাইল দূরের আরো বড় ঘাঁটি খানডিগা থেকে ঘোড়ায় চড়িয়ে সত্যিকার বড় সার্জন এনেছি। যতদূর সম্ভব চেষ্টা করে তিনিও একদিন হাল ছেড়ে দিয়ে বলেছেন,—না আর আশা নেই। নাড়িই ছেড়ে যাচ্ছে!

সত্যিই চোখে অন্ধকার দেখেছি!

কিন্তু সেই অন্ধকারেই একটা ছবি যেন ভেসে উঠেছে। মাটির সঙ্গে প্রায় লেপটানো ক্ষুদে ক্ষুদে কমলা রঙের থোক থোক একরাশ বুটির জটলা।

সমশেরের তারপর নাড়ি ফিরে এসেছে। শেষ পর্যন্ত সেরেও উঠেছে পুরোপুরি, একটা পা বাদে অবশ্য।

সারল বুঝি ওই আপনার জংশন-এ! আমি সবিস্ময়ে বললাম।

জংশন নয় জিন-সেঙ,—সংশোধন করলে শিশির।

ঘনাদা সায় দিয়ে বললেন,—হ্যাঁ ওই হল জিন-সেঙ। নেহাত দৈবের দয়া না হলে ও বস্তুর দেখা পাওয়া যায় না। পেলেও চেনা শক্ত। ভাগ্যক্রমে যা পেয়েছিলাম সবটাই মাটি কেটে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। তা পরিমাণে খুব অল্প কি? প্রায় পাঁচশ গ্রাম। সাইবিরিয়ায় টাইগা-য় এমন কি জিন-সেঙের খাস মুল্লুক খাবার-ভস্ক অঞ্চলেও যে সব পেশাদার সন্ধানী এ জিনিস খুঁজে ফেরে তাদের এক মরশুমের সংগ্রহও চারশ গ্রামের ওপরে কখনো ওঠে না। চারশ গ্রাম ত চারটি খানি কথা নয়। সরেস মাল হলে চারশ গ্রামের দামেই দালান তোলা যায়। সত্যিই জিনিসটা সাতরাজার ধন কিনা! সব কিছুই তার শাহানশাহী চালের। বীজ থেকে ফল বার হতেই দু বছর লাগে। বাড় এমন আস্তে যে বোঝাই যায় না। বছরে দেড় গ্রাম ওজন যদি বাড়ে তাহলেই যথেষ্ট। কিন্তু গুণ? তিল পরিমাণ বেটে খাওয়ালে একটা তাগড়া জোয়ান হার্ট-ফেল করে মরে যায়। তিলের কণার কণা খাওয়ালে মরতে বসা রোগী জ্যান্ত হয়ে ওঠে। সমশেরও তাই হল।

কিন্তু,—শিবু আমাদের সকলের মনের ধোঁকাটাই ব্যক্ত করলে,—এক তিলের কণার কণাতেই যখন অমন কাজ হল তখন আপনার কি বলে পাঁচ পাঁচটা আঁটি দাতব্য করতে গেলেন কেন? করলেনই বা কাকে?

কাকে আর? ওই সেমেন রুজনিকভ্ মানে সমশের থাপাকেই!—ঘনাদা যেন রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রক্সি দিয়ে বললেন,—আমার বাসাতেই সমশেরের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলাম। সেরে সুরে ওঠবার পর তার প্রতিজ্ঞাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললাম,—এবার তাহলে লুকোনো মালগুলো কোথায় রেখেছ বার করে দেবে চলো। ও-গুলো না পোড়ানো পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

আজ্ঞে হ্যাঁ তা ত বটেই!—মুখে স্বীকার করলে সমশের। কিন্তু তবু তার নড়বার নাম নেই!

একটু অধৈর্যের সঙ্গে বললাম,—'তা ত বটেই' ত, চুপ করে বসে আছ কেন? বেশী দূর কোথাও যদি হয় ত খোঁড়া পায়ে তোমার যাবার দরকার নেই। শুধু জায়গাটার হদিস দাও, আমিই খুঁজে বার করে আনছি।

আজ্ঞে না, আপনাকে অত কষ্ট করতে হবে না!

সমশেরের এই ভুয়ো তোয়াজের কথায় জ্বলে উঠলাম

এবার,—আমার যদি কষ্ট না করতে হয় ত তুমি-ই করো! যেখানে যেতে হয় যাও তাড়াতাড়ি!

আজ্ঞে যাব আর কোথায়!—বলে সমশের যেখান থেকে তার লুকোন মাল বার করে আনল তা দেখে আমি তাজ্জব!

সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হিসেবে সমশের কোনো সুযোগে আমার কামরায় আমারই বিছানার পুরু গদির নিচে তার সব কিছু লুকিয়ে রেখেছিল এতদিন!

বেশ সুশীল সুবোধ হয়ে বার করে দিলেও তার লুকোনো পুঁজি পোড়াতে যাবার সময় সমশের প্রায় কাঁদোকাঁদো।

সত্যিই এগুলো পোড়াবেন?

পোড়াবো না ত কি এখানকার পুলিসকে উপহার দেব?—আমি কামরা গরম করার চুল্লিতে এক এক করে সেগুলো ফেলতে শুরু করলাম।

কিন্তু আমার কথা একবার ভেবেছেন!—সমশের আকুল আবেদন জানালে।

তোমার কথা ভেবেছি বলেই ত গুপ্তচর বলে ধরিয়ে না দিয়ে তোমায় ভালোয় ভালোয় দেশে ফেরার সুযোগ দিচ্ছি!

...এই হল সাত রাজার ধন জিন-সেঙের...

কিন্তু ফিরে আমি করব কি!—সমশের এবার প্রায় ডুকরে উঠল।—এই খোঁড়া পা নিয়ে আমার ত তিলে তিলে উপোষ করে মরতে হবে! তার চেয়ে এখানে মরাই আমার ভালো ছিল। ও ধন্বন্তরীর গুঁড়ো দিয়ে কেন আমায় বাঁচাতে গেলেন?

সমশেরের আক্ষেপের মধ্যেই মনঃস্থির আমি করে ফেলেছি।

কিট ব্যাগ খুলে কাগজের প্যাকেটটা তার সামনে ধরে দিয়ে বললাম,—নাও।

নেব?—প্যাকেটটা খুলেই সমশের কিন্তু আঁৎকে উঠল ভয়ে,—এ কি! এ তো ম্যমী দেখছি! পেটের ভেতর জন্মাবার আগে যেমন থাকে তেমনি সব বাচ্চার ম্যমী!

ম্যমী নয়।—অনেক কষ্টে তাকে বোঝাতে হল,—এই হল সাত রাজার ধন জিন-সেঙের শেকড়। এই পাঁচ আঁটি নিয়ে দেশে চলে যাও সারা জীবন খাবার ভাবনা আর তোমায় ভাবতে হবে না। আর এগুলোও যদি নেহাত ফুরোয় কি হারায় তখন তোমাদের নেপালেরই রিন-সেন খুঁজে বার কোরো। জিন-সেঙ যে জানে রিন-সেন চিনতে তার অসুবিধা হবে না।

সমশের আমার কথা যে ভোলে নি আজ তার বড় প্রমাণ পেলাম। জিন-সেঙ ফুরিয়ে ফেলে তার ছেলে বিক্রম থাপাই এখন বাপের হয়ে রিন-সেন-এর ব্যবসা করছে। না জেনে শুনে ন্যায্য দামই চেয়েছিল আমার কাছে। সমশের থাপার নাম করে পুরোন দুটো কথা বলতেই একেবারে অন্যমূর্তি। একটু পরিচয় পেতেই একেবারে জোড় হস্ত হয়ে রিন-সেনের গুঁড়ো আমায় সেবন করিয়ে তবে ছেড়েছে। তা না হলে তোমাদের ওই সর্বনাশ মুলোর বিষক্ষয় আজ হয়. না, আমি আর ফিরে আসি?

কত বড় ফাঁড়া যে আমাদের গেছে তা ভালো করে বোঝবার সময় দেবার জন্যেই ঘনাদা টঙের ঘরে এবার চলে গেছেন। শিশিরের সিগারেটের টিনটাও সেই সঙ্গে গেছে অবশ্য।

হঠাৎ দিব্যজ্ঞান পেয়ে আমি সবিস্ময়ে বলেছি,—ও! মুলো দিয়েই তাহলে মুলোর বিষক্ষয়! জিন-সেঙও ত আসলে একরকম মুলো!

জিন-সেঙ নয়,—শিশির গম্ভীরভাবে সংশোধন করেছে,—জংশন!

হর্ষবর্ধনের দিব্যদর্শন

শিবরাম চক্রবর্তী

হর্ষবর্ধন তাঁর বাল্যকালের কাহিনী শোনাচ্ছিলেন। সেদিনের খবরকাগজটা পড়েছিল সামনে, তাই থেকেই উঠল কথাটা।

তিনি কাগজের একটা জায়গা আমাকে দেখালেন।—

না, সেখানে তাঁর বাল্যবৃত্তান্ত ছিল না, মহামনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেলের জীবনকথার উল্লেখ রয়েছে দেখলাম।

রাসেল তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন যে পনের বছর বয়সেই তিনি দর্শনশাস্ত্রের পরিচয় পেয়েছিলেন। তখন থেকেই তিনি দার্শনিক।

'সেদিক দিয়ে আমি তাঁর থেকে পাঁচ বছর এগিয়ে।' হর্ষবর্ধন আমাকে জানালেন, 'দশ বছর বয়সেই দর্শনের সঙ্গে আমার পরিচয়।' বললেন তিনি সহর্ষে।

কথাটা শুনেই আমার তাক লাগে, তাঁর দিকে তাকাই। আমার মুখে কোনো কথা সরে না। অবাক হয়ে তাঁকে দেখি।

তিনিই তখন আমার কাছে দর্শনীয়।

'কী করে এই পরিচয়টা ঘটলো বলি তাহলে, শুনুন।' তিনি বলতে থাকেনঃ 'তখন আমি মামার বাড়ী শিলঙে। সেখানে থেকে পড়াশুনা করি ইস্কুলে।

মামা সরকারী চাকুরে। সাড়ে নটা বাজতেই না বেরিয়ে পড়েন আপিসে। রোজই তাই। আর ফেরেন সেই বিকেল সাড়ে পাঁচটায়।

আর আমি সাড়ে দশটায় ইস্কুলে যাই। ফিরি সাড়ে চারটেয় ছুটি হবার পর।

সেদিন কিন্তু মামার কাণ্ড দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। সাড়ে নটা বেজে গেছে তবু কিন্তু তাঁর আপিস যাবার কোনো তাড়া দেখা গেল না। দশটা বাজলো, তবু তিনি চানটান সারা দূরে থাক্, একখানা মোটা বই হাতে নিয়ে আরাম করে নিজের বিছানায় গড়াচ্ছেন!

ব্যাপারটা আমায় বেশ নাড়া দিল বলতে কি! এমন বিসদৃশ দৃশ্য কখনো দেখা যায় না। দশটা বাজে, আর মামা আপিসে না গিয়ে বাজে বই নিয়ে বিছানায় আয়েস করছেন ভাবতেই পারা যায় না এমনটা।

মামীমাকে খবরটা দিতে আমি রান্নাঘরের দিকে দৌড়ালাম।......'মামিমা! ও মামিমা!!'

'রান্না হয়নি এখনো।'

'না না, সেকথা নয়......'

'হলে ডাকবখন তোমায়।'

'খেতে আসিনি আমি। খাবার কথা বলছি না।'

'ওই চন্দ্রপুলির মতলবে এসেছ বুঝি? বুঝেচি। তাকের দিকে তাকালেই এক ঘা খাবে। হাত বাড়িয়েছ কি, দেখেচ ত? এই খুন্তির এক ঘা......বুঝলে?'

'তাকের দিকে তাকাচ্ছি না আমি। চন্দ্রপুলির তাকেও আসিনি...মামার কথাটা বলতে এসেছিলাম...।'

'দেব তোমায় চন্দ্রপুলি...এখন না...বিকেলে...... ইস্কুল থেকে ফিরে এলে......'

'সেজন্যে আমি আসিনি, বলছিনা?'

'কী জন্যে এসেছ শুনি তাহলে? আমার সাত জন্মের শত্তুর!'

'মামা এখনো আপিসে বেরয়নি।'

'না, বেরয়নি।'

'গড়াচ্ছে নিজের বিছানায়।'

'কেন, বিছানায় না গড়িয়ে মাটিতে গড়াবে নাকি?'

'কখন যাবে তাহলে আপিসে?'

'যাবে না।'

'কেন যাবে না মামীমা?'

'তাতে তোমার কী?'

'জানতে চাইছিলাম এমনি।'

'সে খবরে তোমার দরকারটা কী শুনি একবার?'

'এমনি জানতে চাইছিলাম। ইচ্ছে করে না জানতে?'

'আপিস থেকে উনি ছুটি নিয়েছেন এক হপ্তার।'

'পুরো এক হপ্তার ছুটি?' শুনে তো আমি হতবাক! 'এক সপ্তাহ ধরে উনি আপিস যাবেন না, কাজটাজ কিচ্ছু নেই কোনো, শুধু বাজে বই পড়া আর বিছানায় গড়ানো...বলো কি মামীমা? আরাম করে বেশ মজায় শুয়ে শুয়ে কাটাবেন এই সাতদিন?'

'শরীরটা ভালো যাচ্ছে না কিনা, ছুটি নিয়েছেন তাই।'

'মোটেই খারাপ দেখাচ্ছে না মামাকে। বেশ ভালোই রয়েছে শরীর। দিব্যি আছেন। আমি দেখলাম।'

আমার দিব্যদর্শনের কথাটা আমি দিব্যি গেলে

জানালাম। কিন্তু মামীমা আমার কথায় কান দিলেন না—'বাহির দেখে শরীরের কিছু বোঝা যায় না রে। বাইরে খারাপ না দেখালেও ভেতরে ভেতরে খারাপ হতে পারে শরীর।'

'মামার কোনো অসুখ করেছে আমি বিশ্বাস করিনে।' আমি স্পষ্টবাক্যে প্রকাশ করি—'মামার কখনো কোনো অসুখ করতে পারে বিশ্বাস হয় না আমার। ঐ চেহারা! অসুখ কখনো মামার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে নাকি? কোনো অসুখের বাবার সাধ্য নেই।'

'তুমি এখান থেকে যাও তো এখন। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। ভাত রান্নাই বাকী। তোমাকে খেতে দিতে হবে, ইস্কুলে পাঠাতে হবে—কতো কাজ!'

'অসুখের ছলনা করছেন মামা। একদম কোনো অসুখ করেনি......' বলতে গিয়েই ধাক্কা খাই।

ঘাড়ধাক্কা!......'একদম কোনো অসুখ করেনি? অসুখের ছলনা করছি! বটে!' ঘাড় ধরে মামা রান্নাঘরের বার করে আনেন আমায়। 'আবার যদি তোমার মুখে এ ধরনের কথা শুনি তাহলে এক থাপ্পরে ত্রিভুবন অন্ধকার করে দেব। ইয়ার্কি পেয়েছো?'

কথাটা আমার কানে লাগে—কানমলে লাগিয়ে দেন মামা। প্রাণে যে লাগে তা না বললেও চলে। 'দূর হয়ে যা আমার সামনের থেকে।'

আরেক ঘাড়ধাক্কায় আমি একেবারে সদর রাস্তায়।

আমার বন্ধু পলির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ি।

'কিরে! ইস্কুল যাবিনে?' আমার চোট সামলে সে শুধোয়।

'আলবৎ যাব।' আমি বলি, 'ইস্কুলে না গিয়ে রক্ষে আছে?'

'আমি যাচ্ছিনে।'

'কারণ?'

'কারণ একটা লম্বা কবিতা। সেটা ঝাড়া মুখস্থ বলতে হবে আজ। এদিকে ওটা মুখস্থই হয়নি আমার। এক স্ট্যান্জাও না।'

চকোলেটের একটা ভগ্নাংশ মুখস্থ করতে করতে সে জানায়।

'মুখস্থ হয়নি একদম?'

'কই আর হোলো! একটানা অত বড়ো পদ্য কারো মুখস্থ হয় নাকি? করতে পারে কেউ? তাছাড়া সময়ই পাইনি মুখস্থ করার। করব কি!'

'ইস্কুলে যাবি আবার কী করবি!'

'হ্যাঁ, ইস্কুলে যাই আর থার্ডসারের রুলপেটা খাই! মরে যাই আর কি!'

'ওই যা! কবিতাটার কথা তো আমি ভুলেই গেছি ভাই রে! মনেই ছিল না আমার। কী হবে!' খাবার আগেই যেন রুলের ঘা আমার মাথায় লাগে—'কী হবে! —থার্ড টীচার যে ভারী কড়া মাস্টার ভাই!'

'তাই তো আমার পেট কামড়াচ্ছে এখন থেকেই।' পলি জানায়ঃ 'এখনো বলিনি মাকে। বললে পরে খেতে দেবে না, সাবু বার্লি খাইয়ে রেখে দেবে সারাটা দিন। ভাত খাবার পর পাড়ব কথাটা।'

'তাই তো, কী করি এখন—বল্ তো!' আমি ভাবনায় পড়ি।

'পেট কামড়াতে পারিস তুইও!' সে বাতলায়।

'নিজের পেট নিজে কামড়াবো, তুই বলছিস্?'

'নিজের পেট কেউ কামড়ায়? কামড়ানো যায়? কামড়াতে পারে কেউ? অবাক করলি বাবা!' পলি বলে—'পেট তো নিজের থেকেই কামড়ায় রে! যখন খুসি কামড়ায়। যাকে খুসি! এই যেমন কামড়াচ্ছে আমার এখন।'

'আমার পেট কামড়ালেও নিস্তার নেই। যেতেই হবে ইস্কুলে। গেলে পরে থার্ড টীচারের মার, আর বাড়ীতে বসে থাকলে মামার ধুন্ধুমার! মামা আজ সারাদিন বাড়ি থাকবে কিনা! এখন সাতদিন ধরে থাকবে।'

আমার উভয় সংকটের কথাটা ব্যক্ত করি। খাইবার পাশের সংকট পার হয়েই না হয় পাড়লাম কথাটা। খাবার দাবার সারবার পরেই পেট কামড়ানির আমদানি করা গেল না হয়। কিন্তু মামা? মামার পাশ কাটাবার উপায়?

'মাস্টারের মারের চেয়ে মামার মার ঢের ভালো।'

'আমার মামার মার কখনো খেয়েছিস?' আমি জিগ্যেস করি।

'কবে আর খেলাম! তোর মামার ত্রিসীমানাতেই যাইনি কখনো। নিজের মামারই মার খাইনি! মামাই নেই ভাই আমার!'

'বেঁচে গেছিস বেজায়।' ওর প্রতি আমার হিংসে হয়।

'তোর বরাতকে আমি হিংসে করি বরং! মারধোর করেও যদি আমার একটা মামা থাকতো, কী ভালোই যে হোতো রে! মামার বাড়ি যেতে পেতাম কেমন! তাই তাই তাই মামার বাড়ি যাই......' সে ছড়া আওড়ায়।—'মামীর আদর খেতাম কেমন!'

'ইস্কুলে না গেলে তোর বাবা কিছু বলবে না?'

'বাবা বাইরে গেছে ডিউটিতে। দিন সাতেক পরে ফিরবে। সাত দিনের জন্যে নিশ্চিন্তি। ইচ্ছে করলে সাতদিনই আমার পেট কামড়াতে পারি......'

'সাতদিনই পেট কামড়ায় নাকি কারো?'

'দাঁত কন্‌কন্‌ মাথা ঝন্‌ঝন্‌—পিঠ টন্‌টন্‌—এসব আমি ইস্টকে রেখেছি। ছাড়বো আস্তে আস্তে।'

'ইস্টকের মতই ছাড়বি? যার মাথায় লাগে লাগুক!' ওর কথায় আমার হাসি পায়। যদিও ওর ওই সাতদিনের নিশ্চিন্তিতে আমার বেশ ঈর্ষা হতে থাকে বলতে কি! আর এই সাতদিনই আমার দুর্ভোগ! বাড়ির থেকে মামার নট্‌ নড়ন চড়ন!

'তোর মা কিছু বলবে না?'

'মা আমাকে খাইয়ে দাইয়েই মাসির বাড়ি যাবে আজ বেড়াতে। ইস্কুলের জন্যে তাড়া লাগাবার কেউ থাকবে না আর। আর, বলেছি তো, খাবার পরেই আমার পেট কামড়াবে। দারুণ কামড়াবে।'

...বলেই না হাতের মোটা বইখানা...

'আর তোর মা যদি দুপুরে হঠাৎ ফিরে এসে দেখতে পায় যে তুই যাসনি আজ ইস্কুলে? বাড়িতে বসে রয়েছিস? বলে দেবে না তোর বাবা এলে?'

'আমার মা সেরকম না। বাবাকে এসব কথা লাগাতে যায় না কখনো।'

'আহা! আমার মামীর বদলে তোর মাকে যদি পেতাম রে!' আমি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ি।

চানটানের পালা সেরে চেটেপুটে সব খাবার পর এঁটো থালার ওপরেই আমি মুখ থুবড়ে পড়লাম।

'কী! হোলো কি আবার?' গর্জে উঠলেন মামীমা।

'উঃ! আঃ! উঃ! মারা গেলাম।' গোঙাতে লাগলাম আমি।

'আদিখ্যেতা হচ্ছে?'

'পেট কামড়াচ্ছে যে! আমি কী করব!' কাৎরে উঠি আমিঃ এমন যন্ত্রণা হচ্ছে পেটে যে......! আর আমি বলতে পারি না। উঃ! আঃ! উঃ! যত অব্যয় শব্দ ব্যয় করে জানাতে হয়।

'অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে মামীমা! সইতে পারছি না আমি।' সেইখানেই আমি শুয়ে পড়লাম।

আমার কাতরোক্তি ওঘরে মামার কানে গেছল বোধ করি।—'কী! হয়েছে কি ওর?' সেখান থেকেই তিনি প্রশ্ন ছুড়লেন।

'পেট কামড়াচ্ছে ছেলেটার।'

'পেট কামড়াচ্ছে? ছোঁড়াটাকে পাঠিয়ে দাও এখানে। আমি দুমিনিটে ওর পেটের ব্যথা সারিয়ে দিচ্ছি এক্ষুণি।'

'যা তোর মামার কাছে। ভালো ওষুধ আছে,—দেবে'খন।'

যোয়ানের আরক ফারক...

যোয়ান বলতে মামাকেই মনে হয় আমার। আরক কী জিনিস জানিনে, তবে যোয়ানের সঙ্গে মামার বিশেষ ফারাক নেই। তা জানি।

ভয়ে ভয়ে এগুতে হল আমায়।

'কিরকম কামড়াচ্ছে দেখি? দেখি পেটটা?' হাঁকড়ান মামা।

'বাহির দেখে কি ভেতরের কিছু বোঝা যায় মামা? দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে আমার?'

তারপর দেখি কি, মামা একটা টাটকা টিনের বাক্স খুলে বিস্কুট মুখে তুলে যাচ্ছেন—একটার পর একটা।

দেখেই না আমি পেটের যন্ত্রণা ভুলে গেছি। গোঙানি ছেড়ে হাত বাড়িয়েছি বিস্কুটের দিকে—'এক-খানা দাওনা মামা আমায়!'

'হতভাগা ছেলে! এই তোমার পেট কামড়াচ্ছে! বিস্কুট কামড়াতে পেলে আর পেট কামড়ায় না বুঝি! মজা দেখাচ্ছি, দাঁড়া!'

বলেই না মামা হাতের মোটা বইখানা ছুঁড়ে মেরেছেন আমায়। লাগ্‌সই তাক্ বলতে হবে, তার ধাক্কায় মাথা ঘুরে পড়ে গেছি তৎক্ষণাৎ!

'নিয়ায় বইটা!'

শুনেই না, পাছে আমাকে আর এক ঘা তার খেতে হয় আবার, তাই বইটা নিয়েই আমিই উধাও হয়েছি বাইরে।

বাইরে গিয়ে দেখি, সেটা আর কিছু নয়, একটা অঙ্কের বই কেবল।

'অঙ্কের বই?' আমি অবাক হয়ে শুধোই। অঙ্কের বই পড়ে কেউ অবসর বিনোদন করে আমার জানা ছিল না।

'হ্যাঁ, আঁকের বই? যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগের কথাই লেখা ছিল বইটায়, সূচীপত্র পড়ে যা বোঝা গেল। আঁকের বই আবার দর্শনের বইও বলা যায়! সেই প্রথম আমার দর্শনের সঙ্গে পরিচয়। সেই ধাক্কায়।'

'কী নাম ছিল বইটার?' আমি জিগ্যেস করি।

'পাতঞ্জলের যোগদর্শন।' জানান আমায় হর্ষবর্ধন। —'যোগটোগ মানে আঁকফাঁক নিয়ে কোনো দার্শনিক বই হবে হয়ত। তবে পাতঞ্জল যে, সেবিষয়ে কোনো ভুল নেই।'

'কি করে বুঝলেন?'

'তার ধাক্কায় আমি পপাত হয়ে গেলাম না? বলছি তাই। আরেকবার ঐ বইয়ের চোট খেলে আর উঠতে হোতো না আমাকে—নিপাত হয়ে যেতাম।'

'কী ছিল বইটায়, পড়ে দেখেছিলেন?'

'সূচীপত্র দেখেই আমার হয়ে গেছল। অষ্টাঙ্গ যোগের কথা লেখা ছিল সূচীতে। বলে একরকমের যোগ কষতেই যা হিমশিম খাই, তার ওপরে আবার আট রকমের যোগ! চোখে যেন অন্ধকার দেখলাম, তারপরে ওই দুর্ভেদ্য বইয়ের ভেতরে আর আমি পা বাড়াই—সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে?'

'ভেতরেই গেলেন না, তাহলে আর দর্শনশাস্ত্রের পরিচয়টা পেলেন কী!'

'যা পেয়েছিলাম তাই ঢের। তাতেই মাথা ঘুরে গেছল আমার। আরেকটু হলে বেকায়দায় আছাড় খেয়ে পড়লে হাত-পায়ের হাড় ভাঙত। হাতটা ছড়ে গেছল। মাথার পেছনটা ফুলে উঠেছিল ঢাউস হয়ে—সেই বইয়ের চোট খেয়েই। দর্শন বস্তুটা কী তখনই আমি টের পেয়ে গেলাম।'

'টের পেয়ে গেলেন?'

'পেলাম বইকি। হাত পা-র হাড় ভাঙলে হাড়ে হাড়ে টের পেতাম। তখনই আমি বুঝেছি যে দর্শনের কাজ হচ্ছে মগজে ঘা মারা—মাথার ঘিলু এদিক ওদিক করে দেওয়া। সহজে আর এশর্মা ওদিকে এগুচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, বলতে হবে যে, রাসেল সাহেবের পাঁচ বছর আগেই আমি দর্শনের পরিচয় পেয়েছি। এটা আমার দিব্যদর্শনও বলতে পারেন।'

'দিব্যদর্শন বলছেন আপনি?'

'বলছিই ত! বলবই ত! মোটা বইখানার মলাটে গোটা গোটা হরফে ছাপানো ছিল—পাতঞ্জলের যোগ-দর্শন। দিব্যি আমি দেখলাম। এই স্বচক্ষে। তারপরে সূচীপত্র ভেদ করে ভূমিকাতেই ঐ অষ্টাঙ্গ যোগের কথা না দেখেই আমি আর এক পাও এগোইনি! তারপরেও, মানে ঐ আট রকমের যোগের ওপরেই বাইশ রকমের বিয়োগ, আটষট্টি রকমের গুণ আর ছিয়াত্তর রকমের ভাগ ছিল কিনা কে জানে! কিন্তু ঐ দর্শনেই আমার দিব্যজ্ঞান হয়েছিল যে অত যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগ আমার ভাগ্যে নেই। ওসবের ধারে কাছে থাকা আমার চলবে না। দারুণ শিরঃপীড়া নিয়ে ইস্কুলের পাট চুকিয়ে তার-পরেই আমি ফিরে এলাম বাড়িতে। পৈতৃক কাঠের কারবারে লেগে গেলাম। আপনাদের ভাষায় একটা গো-মুখ্যু আকাঠ হয়ে রইলাম আর কি!'

'না না! কে বলছে আপনাকে আকাঠ? বলেছি আমি?' আমার প্রতিবাদ।

'না বলুন! কিন্তু আমি বলব. দার্শনিক হিসেবে ঐ রাসেল সাহেব আমার কাছে নেহাত ছেলেমানুষ! অন্ততঃ পাঁচ বছরের ছোট আমার চাইতে।'

★

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চোরবাগান টাইগার ক্লাবের সঙ্গে পটলডাঙ্গা থাণ্ডার ক্লাবের ফুটবল ম্যাচ হয়ে গেল। প্রথমে টাইগার ক্লাব ঝাঁ-ঝাঁ করে আমাদের ছ'টা গোল ঢুকিয়ে দিলে, ওদের সেই ট্যারা ন্যাড়া মিত্তির একাই দিলে পাঁচখানা। আর বাকীটা দিলে আমাদের ব্যাক্ বলটুদা—সেমসাইডে।

তারপরেই পটলডাঙা থাণ্ডার ক্লাব পর পর ছ'টা গোল দিয়ে দিলে। টেনিদা দুটো, ক্যাব্লা তিনটে, দলের সবচেয়ে ছোট্ট আর বিচ্ছু ছেলে কম্বল দিলে একটা। তখন ভারী একটা গোলমাল বেধে গেল, আর খেলাই হল না—রেফারী ফুর্‌র্‌ করে হুইসিল বাজিয়ে খেলা শেষ করে দিলেন।

ব্যাপারটা এই ঃ

আমাদের গোলকীপার পাঁচুগোপাল চশমা পরে। সেদিন ভুল করে ওর পিসিমার চশমা চোখে দিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। তারপরে আর কী—একসঙ্গে তিন-দিকে তিনটে বল দেখতে পায়, ডাইনের বলটা ঠেকাতে যায় তো বাঁয়েরটা গোল হয়ে যায়। বলটুদা আবার বুদ্ধি করে একটা ব্যাক পাস করেছিল, তাতে করে একটা সেমসাইড!

এখন হল কী, ছ'টা গোল দিয়ে টাইগার ক্লাব কি রকম নার্ভাস হয়ে গেল। আনন্দের চোটে ওদের তিন-জন খেলোয়াড় অজ্ঞান হয়ে পড়ল, বাকীরা কেবল লাফাতে লাগল, সেই ফাঁকে ছ'টা বল ফেরৎ গেল ওদের গোলে। তখন সেই ফুর্তির চোট লাগল থাণ্ডার ক্লাবে—আর কে যে কোন্ দলে খেলছে খেয়ালই রইল না। টেনিদা বেমক্কা হাবুল সেনকেই ফাউল করে দিলে, আর ন্যাড়া মিত্তির তখন নিজেদের গোলে বল ঢোকা-বার জন্যে মরিয়া—থাণ্ডার ক্লাবের দু-জন তাকে জাপটে ধরে মাঠময় গড়াগড়ি খেতে লাগল। ব্যাপার দেখে রেফারী খেলা বন্ধ করে দিলেন, আর কোত্থেকে একটা চোঙা এনে সমানে ভাঙা গলায় চ্যাঁচাতে লাগলেন ঃ 'ড্র—ড্র—ড্রন গেম—এক্ষুণি সব মাঠ থেকে কেটে পড়ো, নইলে পুলিশ ডাকব—হুঁ!'

সেদিন সন্ধ্যের পর এই নিয়ে দারুণ আলোচনা চলছিল আমাদের ভেতরে। হঠাৎ টেনিদা বললে, ছোঃ, বারোটা গোল আবার গোল নাকি? একবার একাই আমি বত্রিশটা গোল দিয়েছিলুম একটা ম্যাচে।

অ্যাঁ!—চুয়িং গাম চিবুতে চিবুতে ক্যাবলা একটা বিষম খেলো।

হাবুল বললে, হ, ফাঁকা গোলপোস্ট পাইলে আমিও বায়ান্নখান গোল দিতে পারি।

—নো স্যার, নো ফাঁকা গোল বিজনেস! দু-দলে এ ডিভিসন বি ডিভিসনের কম্‌সে কম বারোজন প্লেয়ার ছিল। যা-তা খেলা তো নয়—ঘুঁটেপাড়া ভার্সাস বিচালিগ্রাম।

—খেলাটা কোথায় হয়েছিল?

—ঘুঁটেপাড়ায়। কী পেলে, ইউসেবিয়ো, মুলার নিয়ে লাফালাফি করিস! জীবনে একটা ম্যাচে কখনো বত্রিশটা গোল দিয়েছে তোদের রিভেরা, জেয়ার-জিন্‌হো? ববি চার্লটন তো আমার কাছে বেবি রে!

একটা মোক্ষম চাল মারতাছে—বিড় বিড় করে আওড়ালো হাবুল সেন।

হাবলার কপাল ভালো যে টেনিদা সেটা ভালো করে শুনতে পেলো না। বললে, কী বললি, মোক্ষদা মাসী? কী করে জানলি রে? ওই মোক্ষদা মাসীর বাড়ীতেই তো আমি গিয়েছিলুম ঘুঁটেপাড়ায়। সেই-খানেই তো সেই দারুণ ম্যাচ। কিন্তু মোক্ষদা মাসীর খবর তোকে বললে কে?

আমি জানি—হাবুল পণ্ডিতের মতো হাসল।

ওর ওস্তাদী দেখে আমার রাগ হয়ে গেল। বললুম, বল্ দেখি ঘুঁটেপাড়া কোথায়?

—ঘুইট্যাপাড়া আর কোথায় হইবো? গোবরডাঙার কাছেই। গোবর দিয়াই তো ঘুইট্যা হয়।

ইয়াহ্!—টেনিদা এত জোরে হাবুলের পিঠ চাপড়ে দিলে যে হাবুল চ্যাঁ করে উঠল। নাকটাকে জিভে-গজার মতো উঁচু করে টেনিদা বললে, প্রায় ধরেছিস। তবে ঠিক গোবরডাঙার কাছে নয়, ওখান থেকে দশ মাইল হেঁটে, দুই মাইল দৌড়ে—

দৌড়োতে হয় কেন?—ক্যাব্‌লা জানতে চাইল।

—হয়, তাই নিয়ম। অত কৈফিয়ৎ চাস্‌নি বলে দিচ্ছি। ওখানে সবাই দৌড়োয়। হল?

ক্যাব্‌লা বললে, হল। আর পথের বিবরণ দরকার নেই, গল্পটা বলো।

গল্প!—টেনিদা মুখটাকে গাজরের হালুয়ার মতো করে বললে, এমন একটা জলজ্যান্ত সত্যি ঘটনা, আর তুই বলছিস গল্প! শিগ্‌গীর উইথড্র কর—নইলে এক চড়ে তোর নাক—

আমি বললুম, নাগপুরে উড়ে যাবে।

ক্যাব্‌লা বললে, বুঝেছি। আচ্ছা আমি উইথড্র করলুম। কিন্তু টেনিদা—ইংরিজীতে উচ্চারণ উইদ্‌ড্র —উইথ্ ড্র নয়।

আবার পণ্ডিতী!—টেনিদা গর্জন করল ঃ টেক কেয়ার ক্যাব্‌লা, ফের যদি বিচ্ছিরি একটা কুরুবকের মতো বকবক করবি তো এক্ষুণি একটা পুঁদিচ্চেরি হয়ে যাবে—বলে দিচ্ছি তোকে। যা—শিগ্‌গীর আট আনার ঝাল-মুড়ি কিনে আন—তোর ফাইন!

আলুভাজা-আলুভাজা মুখ করে ক্যাব্‌লা ফাইন আনতে গেল। ওর দুর্গতিতে আমরা কেউ দুঃখিত হলুম না—বলাই বাহুল্য। সব কথাতেই ক্যাব্‌লা ও-রকম টিকটিকির মতো টিকটিক করে।

বুঝলি—ঝালমুড়ি চিবুতে চিবুতে টেনিদা বলতে লাগল ঃ ছ দিনের জন্যে তো বেড়াতে গেছি মোক্ষদা মাসীর বাড়ীতে। মেসোমশাই ব্যবসা করেন আর মাসীমা যা রাঁধেন না, খেলে অজ্ঞান হয়ে যাবি। মাসীর রান্না বাটি-চচ্চড়ি একবার খেয়েছিস তো ওখান থেকে নড়তেই চাইবি না—ঘুঁটেপাড়াতেই ঘুঁটের মতো লেপ্‌টে থাকবি।

আমার খুব মনের জোর, তাই বাটি-চচ্চড়ি আর ক্ষীরপুলির লোভ কাটিয়েও কলকাতায় ফিরে আসি। সেবারেও গেছি—দুটো দিন একটু ভালোমন্দ খেয়ে আসতে। ভরা শ্রাবণ, থেকে থেকেই ঝুপঝাপ বৃষ্টি। সেদিন সকালে মাসীমা তালের বড়া ভেজে ভেজে তুলছেন আর আমি একটার পর একটা খেয়ে যাচ্ছি, এমন সময় ক'টা ছেলে এসে হাজির।

অনেকবার তো ঘুঁটেপাড়ায় যাচ্ছি, ওরা সবাই আমায় চেনে। বললে, 'টেনিবাবু, বড়ো বিপদে পড়ে আপনার কাছে ছুটে এলুম। আজ বিকেলে শিবতলার মাঠে বিচালিগ্রামের সঙ্গে আমাদের ফুটবল ম্যাচ। ওরা ছ'জন প্লেয়ার কলকাতা থেকে হায়ার করেছে, আমরাও ছ'জন এনেছি। কিন্তু মুশকিল হল, আমাদের এখানকার একজন জাঁদরেল খেলোয়াড় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আপনাকেই আমাদের উদ্ধার করতে হচ্ছে দাদা।'

জানিস তো, লোকের বিপদে আমার হৃদয় কেমন গলে যায়। তবু একটু কায়দা করে বললুম, 'সব হায়ার করা ভালো ভালো প্লেয়ার, ওদের সঙ্গে কি আর আমি খেলতে পারব? তা ছাড়া এ বছরে তেমন ফর্ম নেই আমার।' ওরা তো শুনে হেসেই অস্থির।

'কী যে বলেন স্যার, আপনি পটলডাঙার টেনিরাম শর্মা—আপনার ফর্ম তো সব কাজে, সব সময়েই থাকে। প্রেমেন মিত্তিরের ঘনাদা, হেমেন্দ্রকুমারের জয়ন্ত, শিব্রামের হর্ষবর্ধন—এদের ফর্ম কখনো পড়তে দেখে-ছেন?' আমি হাতজোড় করে প্রণাম করে বললুম, 'ঘনাদা, জয়ন্ত, হর্ষবর্ধনের কথা বলবেন না—ওঁরা দেবতা—আমি তো স্রেফ নস্যি। ওঁরা যদি গরুড় পাখি হন, আমি স্রেফ চড়ুই।'

ওরা বললে, 'অত বুঝিনে দাদা, আপনাকে ছাড়ছিনে। আমাদের ধারণা মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল

তো তুচ্ছ—আপনি ইচ্ছে করলে বিশ্ব একাদশে খেলতে পারেন। আর আপনি যদি চড়ুই পাখি হন, আমরা তো তা হলে—কী বলে মশা!'

আমি বললুম, 'ঘুঁটেপাড়ার মশাকে তুচ্ছ করবেন না মশাই, এক-একটা প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা।'

ওরা হেঁ-হেঁ করে চলে গেল, কিন্তু আমাকে রাজী করিয়েও গেল। আমার ভীষণ ভাবনা হল রে। থান্ডার ক্লাবে যা খেলি—তা খেলি, কিন্তু অতগুলো এ-ডিভিশন বি-ডিভিশন খেলোয়াড়ের সামনে! ওরা না হয় আপ করে গেল, কিন্তু আমি দাঁড়াব কী করে?

কিন্তু ফিরিয়েও তো দেওয়া যায় না। আমার নিজের প্রেস্টিজ—পটলডাঙার প্রেস্টিজ সব বিপন্ন! কোন্ দেবতাকে ডাকি ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মা নেংটীশ্বরীকে মনে পড়ে গেল। আরে সেই নেংটীশ্বরী—আরে সেই যে রে—"কম্বল নিরুদ্দেশে"র ব্যাপারে যে দেবতাটির সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে বলতে লাগলুম, এ বিপদে তুমিই দয়া করো মা—গোটা কয়েক নেংটী ইঁদুর পাঠিয়ে দাও তোমার—খেলার সময় ওদের পায়ে কুটুর কুটুর করে কামড়ে দিক। নিদেন পক্ষে পাঠাও সেই "অবকাশরঞ্জিনী" বাদুড়কে—সে ওদের সকলের চাঁদি ঠুকরে বেড়াক।

এ-সব প্রার্থনা-ট্রার্থনা করে—শ-দেড়েক তালের বড়া খেয়ে আবার বেশ একটা তেজ এসে গেল। কেবল মনে হতে লাগল, আজ একটা এস্‌পার-ওস্‌পার হয়ে যাবে। তখন কি জানি, গুনে গুনে বত্রিশটা গোল দিতে পারব, আমি একাই?

বিকেলে আকাশ জুড়ে কালো কালো হাতির পালের মতো মেঘ। মনে হল, দুর্দান্ত বৃষ্টি নামবে। তবু মাঠে গিয়ে দেখি বিস্তর লোক জড়ো হয়ে গেছে। এক দল হাঁকছেঃ 'বিচালিগ্রাম—হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে—' আর একদল সমানে উত্তোর চড়াচ্ছেঃ 'ঘুঁটেপাড়া—হ্যাপ্-হ্যাপ্-হ্যার্‌রে!'

ক্যাব্‌লা হঠাৎ আঁৎকে উঠলঃ হ্যাপ্-হ্যাপ্-হ্যার্‌রে মানে কী? কখনো তো শুনি নি।

—ওটা ঘুঁটেপাড়ার নিজস্ব স্লোগান। ওরা হিপ্-হিপ্ বলছে কিনা, তাই পালটা জবাব। ওরাও যদি হিপ্-হিপ্ করে, তা হলে এরা বলবে না, এদের নকল করছে? ওরা যদি বলত বিচালিগ্রাম জিন্দাবাদ—এরা সঙ্গে সঙ্গে বলত ঘুঁটেপাড়া মুর্দাবাদ।

—অ্যাঁ, মুর্দাবাদ! নিজেদেরই?

—হ্যাঁ, নিজেদেরই। পরের নকল করে অপমান হওয়ার চাইতে মরে যাওয়া ভালো—বুঝলি না?

—বিলক্ষণ! আচ্ছা—বলে যাও।

...লাইন্‌স্‌ম্যান কপাকপ মাছ ধরতে...

—এতেই বুঝতে পারছিস, দুটো গ্রামে রেষারেষি কি রকম। দারুণ চিৎকারের মধ্যে তো খেলা শুরু হল। দু-মিনিটের মধ্যেই বুঝতে পারলুম, বিচালিগ্রামকে এঁটে ওঠা অসম্ভব। এরা ছ'জনই এ ডিভিশনের প্লেয়ার এনেছে—খেলায় তাদের আগুন ছোটে। আর ওদের গোলকীপার! সে একবারে ছ'হাত লাফিয়ে ওঠে, তার লম্বা লম্বা হাত বাড়িয়ে বল তো বল, বন্দুকের গুলি অবধি পাক্‌ড়ে নিতে পারে।

ঘুঁটেপাড়ায় মাত্র দুজন এ-ডিভিশনের, বাকী চারজনাই বি-ডিভিশনের। এ-মার্কা দুজনও ওদের তুলনায় নীরেস। খেলা শুরু হতে না হতেই বল এসে একেবারে ঘুঁটেপাড়ার ব্যাক লাইনে চেপে পড়ল, মাঝ মাঠও আর পেরোয় না। আর ওদের গোলকীপার শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলঃ 'একটা বালিস আর সতরঞ্চি দাও হে—একটু ঘুমিয়ে নেব।'

আমি আর কী করব—মিড্-ফিল্‌ডে দাঁড়িয়ে আছি, দাঁড়িয়েই আছি। নিতান্তই ঘুঁটেপাড়ার বাকী দশজনই ডিফেন্স লাইনে দাঁড়িয়ে আছে তাই গোল হচ্ছে না—কিন্তু দেখতে দেখতে ওরা গোটা পাঁচেক কর্ণার কিক পেয়ে গেল। আর কতক্ষণ ঠেকাবে!

আমি তখনো মা নেংটীশ্বরীকে ডাকছি তো ডাকছিই। এমন সময় আকাশ ভেঙে ঝমঝম বৃষ্টি। এমন বৃষ্টি যে চারদিক অন্ধকার। কিন্তু পাড়াগেঁয়ে লোক, আর কলকাত্তাই খেলোয়াড়ের গোঁ—খেলা দাপটে চলতে লাগল। বল জলে ভাসছে—ধপাধপ আছাড়—এই ফাঁকেও পর-পর দুখানা গোল খেয়ে গেল ঘুঁটেপাড়া। ভাবলুম—যাঃ, হয়ে গেল!

বিচালিগ্রাম তারস্বরে চিৎকার করছে, হঠাৎ এদিকের লাইন্‌স্‌ম্যান ফ্ল্যাগ ফেলে মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বললে, শিবতলার পুকুর ভেসেছে রে—মাঠ ভর্তি মাছ!

অ্যাঁ—মাছ!

দেখতে দেখতে যেন ম্যাজিক। গাঁয়ের লোকে বর্ষায় পুকুর-ভাসা মাছ তো ধরেই, কলকাতার ছেলেগুলোও আনন্দে ফেঁপে গেল। রইল খেলা, রইল বিচালিগ্রাম আর ঘুঁটেপাড়ার কম্পিটিশন—তিন শো লোক আর একুশজন খেলোয়াড়, দুজন লাইন্‌স্‌ম্যান—সবাই কপাকপ মাছ ধরতে লেগে গেল। প্লেয়াররা জার্সি খুলে ফেলে তাতেই টকাটক মাছ তুলতে লাগল। খেলতে আর বয়ে গেছে তাদের।

'এই রে, মস্ত একটা শোল মাছ পাকড়েছি।'

'আরে—একটা বাটা মাছের ঝাঁক যাচ্ছে রে।'

'ঈস্‌—কী বড়ো বড়ো কই মাইরি! ধর্‌—ধর্‌—'

সে যে একখানা কী কান্ড, তোদের আর কী বলব! খেলার মাঠ ছেড়ে ক্রমেই দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল সবাই। শেষে দেখি, মাঠে আমরা দুজন। আমি আর রেফারী।

রেফারী ওখানকার স্কুলের ড্রিল-মাস্টার। বেজায় মার্‌কুটে, ভীষণ রাগী। দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কী? ইয়ু গো অন্‌ প্লেয়িং!'

ঘাবড়ে গিয়ে বললুম, 'আমি একাই খেলব?'

'ঈয়েস—একাই খেলবে। আমি তো খেলা বন্ধ করি নি।' —ধমক দিয়ে রেফারী বললেন, 'খেলো। প্লেয়াররা মাঠ ছেড়ে মাছ ধরতে দৌড়োলে খেলা বন্ধ করে দিতে হবে, রেফারিগিরির বইতে এমন কোনো আইন নেই।'

তখন শুরু হল আমার গোল দেবার পালা। একবার করে বল নিয়ে গিয়ে গোল দিয়ে আসি, আর রেফারী ফুর্‌র্‌ করে বাঁশি বাজিয়ে আবার সেন্টারে নিয়ে আসে। এই-ই চলতে লাগল।

ওদের দু-একজন বোধ হয় টের পেয়ে ফেরবার কথা ভাবছিল, এমন সময় মা নেংটীশ্বরীর আর এক দয়া। মাঠের কাছেই ছিল সারে সারে তালগাছ। হঠাৎ হু-হু করে ঝোড়ো হাওয়া, আর ঝপাস-ঝপাস করে পাকা তাল পড়তে লাগল।

'তাল পড়ছে—তাল পড়ছে—'

যারা ফিরতে যাচ্ছিল, তারা প্রাণপণে ছুটল তাল কুড়োতে।

এর মধ্যে আমি যা গোল দেবার দিয়ে দিয়েছি—মানে

'...গো অন্‌ গোলিং...'

গুণে গুণে বত্রিশটি। আমি গুণছি না, গোল দিতে দিতে আমার মাথা বোঁ বোঁ করছে, আর ওই ভারী ভেজা বল বার বার সেন্টার থেকে জলের ওপর দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি—চাড্ডিখানা কথা নাকি! একবার বলেছিলুম, 'অনেক তো গোল দিয়েছি স্যার, আর পারছি না—পা ব্যথা করছে!' রেফারী আমায় তেড়ে মারতে এলেন, বিকট মুখ ভেংচে বললেন, 'ইয়ু গো অন্ গোলিং—আই সে!'

গোলিং আবার ইংরেজী হয় নাকি—ক্যাব্‌লা বলতে যাচ্ছিল, টেনিদা একটা বাঘা ধমক দিয়ে বললে, ইয়ু শাট্ আপ! যে মারকুটে মাস্টার, তার ইংরিজীর ভুল ধরবে কে? আমি গোল দিচ্ছি আর উনি গুণেই যাচ্ছেন, 'থার্টি—থার্টিওয়ান—থার্টিটু—'

'ওরে গোল দিচ্ছে বুঝি—' বলে ওদের সেই গোলকীপারটা দৌড়ে এল। সে যে রকম জাঁদরেল, হয়তো একাই বত্রিশটা গোল ফেরত দিত, আমি আটকাতে পারতুম না—বেদম হয়ে গেছি তখন। কিন্তু রেফারী তক্ষুণি ফাইন্যাল হুইসেল বাজিয়ে দিলেন। দিয়ে বললেন, 'খেলা ফিনিস।' তারপর আমাকে বললেন, 'এখন যাও—কই মাছ ধরো গে, তাল কুড়োও গে।'

কিন্তু তখন কি আর মাছ, তাল কিছু আছে? খেলা ফিনিসের সঙ্গে তাও ফিনিস! অতগুলো লোক! টেনিদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল: 'তখন প্রাণের আনন্দে মাছ ধরে আর তাল কুড়িয়ে বিচালিগ্রাম চিল্লোতে লাগল: থ্রী চিয়ার্স ফর বিচালিগ্রাম, আর ঘুঁটেপাড়া চ্যাঁচাতে লাগল: থ্রী টীয়ার্স ফর ঘুঁটেপাড়া!'

টীয়ার্স? মানে চোখের জল?—ক্যাব্‌লা আবার বিস্মিত হল।

হাঁ—হাঁ—টীয়ার্স। পাল্‌টা জবাব দিতে হবে না? সে যাক। কিন্তু একটা ম্যাচে একাই বত্রিশটা গোল দিলুম, পেলে-ইউসেবিয়ো-রিভেরা-চার্লটন সব কাৎ করে দিলুম, কিন্তু একটা কই মাছ, একটা তালও পেলুম না—এ দুঃখ মরলেও আমার যাবে না রে!—আবার বুক ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলল টেনিদা।

তবু

শৈলেন দত্ত

কবে ঐ শিমুলতলা ভরবে ফুলে
কবে তার শীর্ণ পাতা উঠবে দুলে
কবে সে উঠবে জ্বলে দীপ্ত প্রাণের মশাল তুলে—
জানি না তা জানি না তা জানি না।

কবে ঐ ভোরের পাখী আলোর গানে
জাগাবে নতুন জীবন নতুন চেতন আলোক স্নানে
পাঠাবে ক্লান্তি-হারা নতুন দিনের বার্তা কানে
জানি না তা জানি না তা জানি না।

তবু এই ঘূর্ণি হাওয়ার মরণ দাপট
চলবে, চলবে কুটিল সময়-শকট
কীটেরা খেলবে খেলা নিঠুর কপট
মানি না তা মানি না তা মানি না।

ও শিমুল ভাঙার কীটের বিষের করাত
ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবে তিমির এ রাত
মেলবে প্রাণের গানের রঙিন প্রভাত
জানি যে ঠিক জানি তা ঠিক জানি তা।

ও পাখি, সোনার পাখি !—বিমলচন্দ্র ঘোষ

ও পাখি, সোনার ডানা কেন যে গুটিয়ে রাখো
বিজনে হাড়ের খাঁচায়?
হৃদয়ের বিষণ্ণতা কি ক'রে ঘুচবে বলো
তুমি না মেললে ডানা?
কী বিশাল রাতের আকাশ! কী গভীর সমুদ্র নীল!
কী প্রখর সূর্যশিখা! রূপালী শুভ্র মেরু
ওড়ো আজ শূন্যে ওড়ো,

আকাশে জাল পাতা নেই খাঁচাটার নেই দরোজা,
ও পাখি, ভয় পেও না।
ইতিহাস চমকে দেওয়া মৃগয়ার যুগ পেরিয়ে
কত যে রক্তঝরা আমাদের নতুন জীবন
তুমি তো দেখলে সবই।
এতকাল হাড়ের খাঁচায় দু'পায়ে শেকল পরা
মানুষের মরায় বাঁচায় যে যুগে উদাস ছিলে।
সে যুগের ভয়-ভাবনার কেটেছি সকল বাঁধন
ভেঙেছি বন্দীশালা সাগরে বাঁধ বেঁধেছি।
এসেছি চাঁদকে ছুঁয়ে।
ও পাখি ভয় পেও না। ও পাখি এবার ওড়ো।
ওড়ো আজ পাখসাটে নীল পাহাড়ের ঘুম ভাঙিয়ে

তুষারের হিম শীকরে বাতাসের মন রাঙিয়ে
মেঘেরা বর্ষা আনুক,
উদাসী শুকনো মাঠে ফসলের ছন্দে সবুজ
জীবনের ছন্দ আনো।
কত যে অন্ধকারে অহমের জাল বুনেছি
মননের কবর ফুঁড়ে দেখিনি আকাশ মাটি
দেখিনি মায়ের চোখে প্রভাতী আলোর আশিস্
মুকুলে শিশুর হাসি।
তুমিও হাড়ের খাঁচায় কেবলি ধড়ফড়িয়ে
ছিঁড়েছ ডানার পালক।
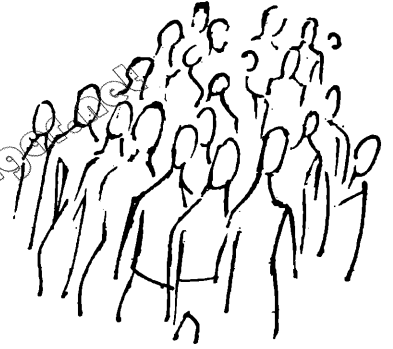
ভুলে যাও সে সব কথা এ যুগে ভয় কি তোমার?
সে জগৎ বদলে গেছে সে জীবন গল্পকথা!
মরেছে দৈত্যদানব
মরেছে রাক্ষসেরা।

মানুষের রূপ দেখেছ সহরে হাজার হাজার
সাদা লাল হলদে কালো আহা কী রঙের বাহার!
তুমি না মেললে ডানা কি ক'রে দেখবে বলো
জীবনের অজস্রতা?

ও পাখি সোনার পাখি, ও পাখি আলোর পাখি!!

কালের জয়ডঙ্কা বাজে

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

॥ এক ॥

অপরাহ্ণ বেলা।

তরুণ এক অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। সশস্ত্র সে—গায়ে বর্ম, মাথায় শিরস্ত্রাণ, পিঠে কাঁধের সঙ্গে বাঁধা তীরপূর্ণ তূণীর ও শরাসন, কোমরে তরবারি। ঘোড়ার পাশে জিনের সঙ্গে আটকানো দীর্ঘ বর্শা।

অস্তগামী সূর্যের রক্তিমাভায় বর্শাফলক জ্বলছে অগ্নিশিখার মতো।

প্রান্তরের ওপর দিয়ে বিদ্যুদ্বেগে ঘোড়া ছুটছে। পেছনে উড়ছে ধুলোর মেঘ।

ক্লান্ত ঘোড়া। ঘর্মাক্ত। মুখ দিয়ে ফেনা ঝরছে।

ক্লান্ত অশ্বারোহী নিজেও। সেই কোন্ ভোরে আলো ফুটবার আগেই রওনা হয়েছে, একটানা ছুটেছে—বিশ্রামের অবসর মেলেনি। ইতিমধ্যে দুবার ঘোড়া পালটাতে হয়েছে, এটি তার তৃতীয় বাহন।

লক্ষ্য তার রাজগৃহ—মগধ রাজ্যের রাজধানী। পূর্ব সীমান্তের প্রত্যন্ত প্রদেশপাল বা অন্তপালের কাছ থেকে সে আসছে। মগধরাজের কাছে অবিলম্বে পৌঁছে দিতে হবে গুরুতর জরুরী বার্তা।

তাই তাকে থামলে চলবে না।

তাছাড়া সন্ধ্যার মধ্যে তাকে যে কোন ভাবে হোক নগরীর প্রাকার-তোরণে পৌঁছতেই হবে, নয়তো এই কার্তিক মাসের ঠাণ্ডায় নগর-প্রাকারের বাইরে তাকে নিরাশ্রয় অভুক্ত অবস্থায় কাটাতে হবে সারা রাত। কারণ সন্ধ্যার পর নির্দিষ্টক্ষণে নগরের চারদিকের চারটি সিংহ-দ্বারই বন্ধ হয়ে যায়, আর বন্ধ হবার পর পরদিন প্রত্যুষে নির্দিষ্ট সময়ের আগে তা খোলা নিষেধ। এমন কি স্বয়ং মহারাজের ক্ষেত্রেও এ বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করা চলে না, আর সে তো কোন্ ছার—প্রত্যন্ত প্রদেশের সামান্য এক সৈনিক মাত্র!

পশ্চিম দিগন্তে আবীরের রং একটু একটু করে গাঢ়তর হয়। কুলায় ফিরছে পাখির ঝাঁক।

নির্জন প্রান্তরের ওপর দিয়ে দুচোখ কুঞ্চিত করে অশ্বারোহী তাকায় পশ্চিম দিগন্ত পানে। কোথায় কত দূরে পঞ্চ পর্বতে ঘেরা মগধ-রাজধানী রাজগৃহ?......

ঘোড়া ছুটে চলে বিদ্যুৎ-গতিতে। ধীরে ধীরে দূরে—বহু দূরে পশ্চিম আকাশের গায়ে মেঘের মতো জেগে ওঠে গিরিতরঙ্গের আভাস।

নতুন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে তরুণ সৈনিকের চোখমুখ। জোরে সে কশাঘাত করে অশ্বপৃষ্ঠে।

সূর্যদেব পাটে নামছে ধীরে ধীরে......

রাজগৃহের গিরিশীর্ষ স্পষ্টতর হয় ক্রমেই......

গোধূলি আলোয় ধীরে ধীরে স্পষ্টতর হয় সুউচ্চ নগর-প্রাকার...সৈনিক ঘোড়ায় চাবুক মারে আরো জোরে। খোলা আছে—সিংহদ্বার খোলা আছে এখনো! তোরণের ভেতর দিয়ে দীপমালাশোভিত নগরীর আভাস চোখে পড়ছে।

অন্ধকারে ঘোড়ার খুরের শব্দ তুলে জমাটবাঁধা আবছা ছায়ামূর্তির মতো ঘোড়সওয়ার ছুটে চলে তোরণ লক্ষ্য করে......

নগরের কোলাহল কানে আসছে। কানে আসে মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যা-আরতির কাঁসর-ঘণ্টা, ভেরি-বাদন ও শঙ্খধ্বনি।

চাঁদ উঠলো। শুভ্র জ্যোৎস্নায় দিগন্তবিসারী প্রান্তরে নামে স্বপ্নপুরীর মায়া—আলোছায়ার খেলা। নগর আর দূরে নয়। প্রাকারের বাইরে পরিখা দেখা যাচ্ছে—তার জলে জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি।

তোরণের দুই পাশে প্রাকারসমান উঁচু দ্বাররক্ষীদের দুই প্রকোষ্ঠ। প্রকোষ্ঠ দুটির দুপাশে দুই দ্বার-অট্টালক অর্থাৎ প্রহরা দেবার জন্য সুউচ্চ দুই মজবুত অট্টালিকা। তার পর থেকেই প্রাকারের আরম্ভ। দ্বার-অট্টালকে আলো জ্বলছে—সশস্ত্র প্রহরীদের ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়।

দীর্ঘ প্রশস্ত এক অলিন্দ দুই অট্টালককে সংযুক্ত করেছে। একজন সশস্ত্র রক্ষী পায়চারি করছে সেখানে। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকায় সামনে প্রান্তরের দিকে। কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করে। তারপরেই সুতীক্ষ্ন শব্দে বেজে ওঠে শৃঙ্গ।

অশ্বারোহী বুঝতে পারে সে রণ-শৃঙ্গের বিপদ-সঙ্কেত।

ততক্ষণে দ্রুতপায়ে অলিন্দে এসে দাঁড়িয়েছে আরো তিনজন প্রহরী। দীর্ঘ ধনুতে বাণ সংযোজন করে সবারই লক্ষ্য স্থির ধাবমান অশ্বারোহীর দিকে।

অট্টালক থেকে চারজন সৈনিক বেরিয়ে এল। তোরণ পার হয়ে পরিখার ওপরকার সেতু অতিক্রম করে অশ্বারোহীর পথ রোধ করে দাঁড়াল তারা। পরক্ষণে

শোনা গেল গম্ভীর কণ্ঠ,—কে আসে ওখানে? পরিচয় না দিয়ে আর এগিও না।

অশ্বারোহী এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। চোখে-মুখে আর উদ্বেগের চিহ্ন নেই।

ঘোড়ার রাস টানতে টানতে সে বললে,—মগধাধিপতি মহারাজ শ্রেণীক বিম্বিসারের জয় হোক! আমি স্বপক্ষ, বিপক্ষ নই। পূর্ব সীমান্তের অন্তপালের কাছ থেকে গুরুতর সংবাদ নিয়ে আসছি। মহারাজের সঙ্গে অবিলম্বে সাক্ষাতের প্রয়োজন।

অভিজ্ঞান-পত্রাদি দেখে নিঃসন্দেহ হবার পর রক্ষী-প্রধান অশ্বারোহীকে নগরে ঢোকার অনুমতি দিল। রাজধানীতে সৈনিকটির এই প্রথম আগমন। তাই সৈনিকদের জন্য নির্ধারিত বিশ্রামশালায় তাকে নিয়ে যাবার জন্য একজন রক্ষী যায় সঙ্গে। তাকে জানানো হয়, মহারাজের কাছে সংবাদ পাঠানো হয়েছে, তাঁর সঙ্গে রাত্রিবেলায় সম্ভবতঃ দেখা হবে না।

এ ঘটনার সময়কাল খৃীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে—আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। এ কাল ভারত-ইতিহাসের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

মহাকাব্যের যুগ শেষ হয়েছে। একচ্ছত্র অধিপতি বা সম্রাট কেউ নেই। ছোট-বড় নানা রাষ্ট্রে বিভক্ত ভারতবর্ষ। ষোড়শ মহাজনপদ বা ষোলটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের কথা বারবার কানে আসে। তার মধ্যে অঙ্গ, মগধ, কাশী ও কোশল, বৃজি ও লিচ্ছবি, বৎস, অবন্তী, গন্ধার প্রভৃতি প্রধান। তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ, ভাঙা-গড়া চলে অবিরাম।

দুইটি রাষ্ট্র-ব্যবস্থা তখন পাশাপাশি বর্তমান। অঙ্গ, মগধ, কোশল, বৎস, অবন্তী, গন্ধার প্রভৃতি রাজ্যে চলেছে রাজতন্ত্র বা রাজার শাসন। তেমনি তাদের পাশেই রয়েছে বৃজি-লিচ্ছবি, মল্ল, শাক্য প্রভৃতি গণ-রাজ্য। সেখানে কোন একজন রাজার শাসন নেই। রাষ্ট্রে ও সমাজে যারা ওপরতলার মানুষ, তারা মিলিত হয়ে পরিষদ বা সংঘ গঠন করে এবং নিজেদের মধ্য থেকে নায়ক নির্বাচন করে সংঘ বা পরিষদের মাধ্যমে রাজ্যের শাসনকার্য চালায়।

এ সময় বৈদিক ধর্মে নিদারুণ অবনতি ঘটেছে। ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ জনসাধারণের মধ্যে আর তেমন সাড়া জাগাতে পারছে না। যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রাণী-হত্যা প্রবল হয়ে উঠেছে—বাহ্যিক আড়ম্বরই প্রধান। বিধি-নিষেধ, আচার-অনুষ্ঠান,মন্ত্রতন্ত্র ও কুসংস্কারে সমাজ আচ্ছন্ন-প্রায়। জাতিভেদ আরো কঠোর হয়েছে, আঘাত করছে জনসাধারণকে। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও অতীতের সেই চারিত্রিক দৃঢ়তা নেই। ধনসম্পদ ও বিলাস-ব্যসনের প্রতি অদম্য লোভ ও আকর্ষণ তাদের জীবনকে কলুষিত করছে, চরিত্রে ঘটেছে নিদারুণ অবনতি।

সুতরাং প্রচলিত এই ধর্মের অনুষ্ঠানে প্রকৃত কল্যাণ হবে কিনা এবং কোন্ পথে মানুষের প্রকৃত জ্ঞান ও মুক্তিলাভ সম্ভব, এ চিন্তা সমাজের অনেককেই ভাবিয়ে তুলেছে। প্রকৃত সত্যের সন্ধান-লাভে আত্মনিয়োগ করেছেন বহুজন। তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হলেন দু-জন মহাপুরুষ—একজন বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ, অন্যজন জৈনধর্মের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর।

এই সময়েরই কোন এক সন্ধ্যায় পূর্ব সীমান্তের প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে মগধের রাজধানীতে এসে উপস্থিত হলো তরুণ ঐ অশ্বারোহী সৈনিকটি।

পরদিন মধ্যাহ্নের কিছু পরে।

রাজগৃহ নগরীর চার সিংহদ্বার থেকে চারটি প্রশস্ত রাজপথ নগরের মাঝখানে গিয়ে মিলিত হয়েছে। রাজ-পথের দুধারে ছায়াঘন দেবদারু-বীথি, ঘরবাড়ি, দোকান-পাট, সুদৃশ্য নানা অট্টালিকা—কোনটা ইটের তৈরী, কোনটা বা কাঠের।

রাজপথগুলির সংগম-স্থলে সুপ্রশস্ত উন্মুক্ত চত্বর। সুবিশাল চত্বরের মাঝখানে মনোরম ফোয়ারা। চত্বর ঘিরে নয়নাভিরাম সুউচ্চ বিশাল মন্দির, অভিজাত-বংশীয়দের বর্ণাঢ্য সুদৃশ্য অট্টালিকা, পুষ্পোদ্যান, পদ্ম-সরোবর, পুষ্করিণী, তরুবীথি ও পুষ্পকুঞ্জ।

অদূরে বিশাল রাজপ্রাসাদ। স্ফটিক, গজদন্ত ও মণিরত্নখচিত রাজপুরী শোভায় অতুলনীয়—ইন্দ্র-পুরীকেও বুঝি হার মানায়।

রাজপ্রাসাদ থেকে দক্ষিণে কিছুদূরে প্রাচীরবেষ্টিত এক বিস্তীর্ণ ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ। শস্ত্রশিক্ষার শেষে রাজ-পরিবারের ও অভিজাতবংশীয় কিশোরদের মধ্যে অস্ত্র-চালনা-প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হচ্ছে সেখানে।

ক্রীড়াক্ষেত্রের একদিকে গণ্যমান্য দর্শকদের বসার ব্যবস্থা। পৃথক পৃথক ব্যবস্থা পুরুষ ও নারীদের জন্য। সেখানে তিলধারণের স্থান নেই। বিশিষ্ট নাগরিকগণ প্রায় সবাই উপস্থিত—একমাত্র মহারাজ বিম্বিসার, মন্ত্রিপরিষদের অমাত্যবর্গ ও রাজকুমার কয়েকজন ছাড়া। অনুপস্থিত রাজকুমারদের মধ্যে অভয় অন্যতম। গতকাল তাঁরা সবাই উপস্থিত ছিলেন।

কিন্তু গত সন্ধ্যায় পূর্ব প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে গুরুতর বিদ্রোহের সংবাদ নিয়ে দূত আসায় তাঁরা জরুরী রাজকার্যে এত ব্যাপৃত যে, আজ উপস্থিত হতে পারেন নি।

প্রতিযোগিতা এখন এসে দাঁড়িয়েছে দুজন কিশোরের মধ্যে—একজন জীবক, রাজকুমার অভয়ের পুত্র; অন্যজন গুপ্তিল, অন্যতম প্রধান অমাত্য যশঃপাণির পুত্র।

ধনুর্বিদ্যা, অসিচালনা, শক্তিনিক্ষেপ, বর্শাচালনা ও গদাযুদ্ধে জীবক গতকালই তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের অনায়াসে পরাজিত করেছে, একমাত্র গুপ্তিলের সঙ্গেই তার বাকি আছে অসিচালনার প্রতিযোগিতা।

সবারই দৃষ্টি জীবকের ওপর। সুঠাম দীর্ঘকায় রূপবান বলিষ্ঠ কিশোর প্রাঙ্গণের একপাশে নত চোখে অপেক্ষা করছে। পরনে যোদ্ধার বেশ—স্বর্ণ ও মণিমুক্তাখচিত মহার্ঘ পোশাকের ওপর বর্ম আঁটা, কানে কুণ্ডল, হাতে কঙ্কণ, গলায় কণ্ঠহার, মণিবন্ধে অলঙ্কার, হাতের আঙুলে আঙ্গুরীয়ক, পায়ে কারুকাজকরা সুদৃশ্য পাদুকা। কোমরে বহুমূল্য কটিবেষ্টনী থেকে কোষবদ্ধ তরবারি ঝুলছে।

উপস্থিত দর্শকরা গতকালই জীবক ও গুপ্তিলের অসিচালনা দেখেছেন। জীবকের জয়লাভ সম্বন্ধে তাই তাঁরা নিঃসন্দেহ। সর্বপ্রকার অস্ত্রচালনায় জীবকের দক্ষতা মনে রাখার মতো—সচরাচর তা চোখে পড়ে না।

জীবক থেকে কিছুদূরে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে গুপ্তিল—বলিষ্ঠ দুর্বিনীত। তারও যোদ্ধার বেশ, অঙ্গে বহুমূল্য পোশাক ও অলঙ্কার। মাঝে মাঝে সে কুটিল চোখে তাকাচ্ছে জীবকের দিকে।

হঠাৎ শঙ্খ বেজে উঠলো। প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে। জীবক ও গুপ্তিল এগিয়ে এল। এগিয়ে এলেন তাদের প্রবীণ শস্ত্রশিক্ষক—প্রধান আচার্য ধর্মধ্বজ।

দুই প্রতিদ্বন্দ্বী এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। জীবকের হাতে উন্মুক্ত তরবারি, কিন্তু গুপ্তিলের অসি কোষবদ্ধ।

সহসা আচার্যকে উদ্দেশ করে গুপ্তিল উচ্চকণ্ঠে বললো,—গুরুদেব, আমি এ প্রতিযোগিতায় নামতে রাজী নই! যে নির্মাতৃক, অজ্ঞাতকুলশীল, তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাকে আমি সম্মানহানিকর বলে মনে করি!

ক্রীড়াঙ্গণে হঠাৎ যেন বজ্রপাত হলো। বিস্ময়ে নির্বাক সবাই। পরক্ষণে কলরব উঠলোঃ কি হলো! কি হলো!

বিস্ময়াহত জীবকও। ক্ষণপরেই জ্বলে ওঠে তার দুই চোখ। ক্রোধে রক্তিম সুগৌর মুখ। এখনি সে বুঝি সিংহবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়বে গুপ্তিলের ওপর। গুপ্তিলও অসি কোষমুক্ত করেছে। জীবকের ওপর নিবদ্ধ তার ক্রূর দৃষ্টি।

স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন আচার্য ধর্মধ্বজ। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। তাড়াতাড়ি দুজনের মাঝে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন। দর্শকরাও ততক্ষণে ছুটে এসেছেন।

জীবকের প্রতি গুপ্তিলের হিংসা ও বিদ্বেষ আচার্য ধর্মধ্বজের অজানা নয়। এমন কি তাঁর নিজের বিরুদ্ধেও গুপ্তিলের অন্যায় অভিযোগ একাধিকবার শুনেছেন তিনি। গুপ্তিলের অভিযোগঃ অন্যদের তুলনায় জীবককে

...সে বুঝি সিংহবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়বে গুপ্তিলের ওপর। গুপ্তিলও অসি...

তিনি বেশী স্নেহ করেন, তাই অস্ত্রশিক্ষা দেবার ব্যাপারে জীবকের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব সহজেই নজরে পড়ে।

গুপ্তিল এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গোপনে অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা কম করে নি।

ধর্মধ্বজ কঠোর হস্তে এই অন্যায় অসন্তোষ দূর করার চেষ্টা করেছেন। গুপ্তিলকেও বুঝিয়েছেন নানা ভাবে। আর নিজের মনকে প্রবোধ দিয়েছেনঃ নিজের অপরাধ গুপ্তিল একদিন নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে, প্রতিভাধর শক্তিমানের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে কুণ্ঠিত হবে না। কিন্তু তাঁর সে আশা যে দুরাশা মাত্র, তা এই পরিবেশে এমনভাবে ধূলিসাৎ হবে, তিনি কল্পনাও করেন নি।

বজ্রকণ্ঠে তিনি বললেন,—তোমার স্পর্ধা ক্ষমারও অযোগ্য, গুপ্তিল! কে অজ্ঞাতকুলশীল? রাজকুমার অভয়ের পুত্র জীবক?

হ্যাঁ, গুরুদেব!—তেমনি উদ্ধত কণ্ঠেই গুপ্তিল জবাব দেয়ঃ কে ওর জননী? কি ওর মাতৃপরিচয়? আপনি জানেন? এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁরাও জানেন কি? কোন্ মায়ের গর্ভে ওর জন্ম, তা যখন জানা নেই, তখন তাকে অজ্ঞাতকুলশীল ছাড়া কি বলা যায়?

কয়েক মুহূর্তের জন্য ধর্মধ্বজের মুখে কথা জোগায় না। কিছু কিছু গুঞ্জন ওঠে দর্শকদের ভিড়ের মধ্যেঃ তাই তো, কথাটা তো একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়। কে ওর গর্ভধারিণী? ওর শৈশবেও তার যদি মৃত্যু ঘটে থাকে, তবু কে সে?

গুঞ্জন শুনে রাগে জ্বলে ওঠেন ধর্মধ্বজ। দৃপ্তকণ্ঠে বলেন,—এখানে তার কী প্রয়োজন? অস্ত্র-প্রতিযোগিতায় শৌর্যবীর্যের পরিচয় দেওয়াই একমাত্র কাজ, মাতৃ-পরিচয় নয়।

লজ্জায় অপমানে বিভ্রান্ত জীবক। অসি ধীরে ধীরে কোষবদ্ধ করে আচার্যের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। আয়ত দুই চোখে অশ্রু টলটল করছে। আচার্যের দুই পা জড়িয়ে ধরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে বললে,—গুরু-দেব, এ প্রতিযোগিতা থেকে আমায় নিষ্কৃতি দিন। অনুমতি দিন, আমি চলে যাই। এখানে আর দাঁড়াতে পারছি না।

ব্যথায় ও সমবেদনায় ধর্মধ্বজের অন্তরাত্মা হাহাকার করে ওঠে। সত্যি, জীবককে তিনি বড় ভালবেসেছিলেন। এমন প্রতিভাধর শক্তিমান ছাত্র লক্ষে একটা মেলে কিনা সন্দেহ। জীবকের মাথায় হাত রেখে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। শেষে আত্মসম্বরণ করে স্নেহ-সজল কণ্ঠে বললেন,—তাই হোক, বৎস! ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে গুরুর এই কথাটা শুধু মনে রেখঃ মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তার কর্মে ও পুরুষকারে—বংশগৌরবে নয়।

তারপর গুপ্তিলের দিকে ফিরে আগুন-ঝরা কণ্ঠে তিনি বললেন,—শোন নিষ্ঠুর মানবক, শৌর্যবীর্য ও প্রতিভাকে হেয় করার চেষ্টা যদি ত্যাগ না করো, উচ্চতর ক্ষমতাধরকে ন্যায্য সম্মান ও স্বীকৃতি দিতে যদি এমনি কুণ্ঠিত থাক, তাহলে তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার, জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবে না কোন দিন। প্রতিযোগিতা এখানেই শেষ হলো। তোমাদের শিক্ষাদাতা হিসাবে আজ আমি ঘোষণা করছি, শুধু অস্ত্রবিদ্যায় নয়, অন্যান্য সমস্ত বিদ্যায় ও মনের ঐশ্বর্যে জীবক তোমাদের বহু ঊর্ধ্বে।

রাজগৃহে সাঁঝের আঁধার নেমেছে।

রাজসভায় গুপ্ত মন্ত্রণা-কক্ষ থেকে বেরিয়ে রাজ-কুমার অভয় গৃহে ফিরছেন। দ্রুত পায়ে হাঁটছেন তিনি। কোন দিকে খেয়াল নেই।

আম্রকানন ও পুষ্পোদ্যান পার হয়ে নিজের প্রাসাদে ঢুকলেন তিনি। দোতলার এক কক্ষে ঢুকতে ঢুকতে ডাকলেন,—জীবক! জীবক!

একজন পরিচারক এগিয়ে এল। বিনীত কণ্ঠে বললে,—কুমারকে তো দেখছি নে।

কেন, প্রতিযোগিতা থেকে সে কি বাড়ি ফেরেনি?—উদ্বিগ্ন কণ্ঠে অভয় জিজ্ঞেস করেনঃ এক্ষুণি খুঁজে দ্যাখ্! বল্, আমি ডাকছি।

তারপর যেন আপন মনেই বললেন,—ঘটনার যে বিবরণ শুনলাম, তাতে সে কি আর বাইরে আছে! লজ্জায় অভিমানে আঁধারে কোথাও হয়তো মুখ লুকিয়ে বসে আছে।

কক্ষমধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকেন তিনি।

সুসজ্জিত কক্ষ। সোনার বড় বড় বাতিদানে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলছে। তাদের উজ্জ্বল আলোয় ঘরের সবকিছু ঝলমল করে। একদিকে নানা কারুকার্যময় গদি-আঁটা সিংহচর্মাবৃত আবলুস কাঠের পালঙ্ক—হেলান দিয়ে বসার হাতল-দেওয়া প্রশস্ত সুখাসন। তার সামনে আরও কতকগুলি সুদৃশ্য উঁচু আসন ও কেদারা। দেওয়ালে বহুবর্ণরঞ্জিত নানা চিত্র—পত্রপুষ্প, পশুপাখি ও নরনারীর বর্ণাঢ্য চিত্রাবলী আলোয়

জীবন্ত মনে হয়। মেজেয় মনোরম রঙিন গালিচা পাতা।

অভয় সুপুরুষ দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ—প্রশস্ত ললাট, যৌবনদৃপ্ত বীরোচিত চেহারা। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মাথার কুঞ্চিত কেশদাম কিছুটা অবিন্যস্ত।

পায়চারি করতে করতে নিজের মনেই তিনি আবার বলেন,—সৈন্যবাহিনী নিয়ে কাল প্রত্যুষেই রওনা হতে হবে পূর্ব সীমান্তের দিকে, আর আজই কিনা এই অঘটন! কী অশান্তি! কী অশান্তি! যশঃপাণির পুত্রটি যে এত নীচ, এত হীন, তা জানতাম না।

অভয় নিষ্ফল আক্রোশে হাত মুষ্টিবদ্ধ করেন ঃ এর আগেও সে খেলাধুলোর সময় জীবককে নির্মাতৃক বলে একাধিকবার উপহাস করেছে। আর ম্লানমুখে জীবক এসে জিজ্ঞেস করেছে, তার মা কে? সবারই মা আছে, তার মা নেই কেন? কে ছিলেন তার জননী? হায় অভাগা সন্তান! কোন উত্তর দিতে পারি নি। অন্য কথায় তাকে ভুলিয়েছি। যশঃপাণির পুত্রকে তখুনি সমুচিত শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল। বালকসুলভ চাপল্য ও ঈর্ষা মনে করে এতে গুরুত্ব দেইনি। কিন্তু নাঃ, আর নয়! বিদ্রোহ দমন করে ফিরে আসি, এবার যথোচিত ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু জীবক গেল কোথায়?

অস্থির পদে তিনি অলিন্দে গিয়ে দাঁড়ান।

—বাবা, আমায় ডাকছেন?

অভয় ঘুরে দাঁড়ালেন ঃ জীবক!

জীবকের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলেন তিনি। বললেন,—এ কী! এ কী চেহারা হয়েছে তোর! মুখে কে যেন কালি লেপে দিয়েছে! বেশভূষা, কেশ-পাশ সব বিপর্যস্ত! কোথায় গিয়েছিলি? কি হয়েছে তোর?

বলতে বলতে তিনি এগিয়ে গিয়ে জীবককে বুকে জড়িয়ে ধরেন। জীবকের ধৈর্যের বাঁধ বুঝি ভেঙে যায়। অশ্রুর বন্যা নামে অবিরল ধারায়। সে নীরবে কাঁদে।

তার মাথায় পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে অভয় বললেন,—শান্ত হ, বাবা। আমি সব শুনেছি। এত বড় অপমানের যথাযোগ্য ব্যবস্থা আমি এই মুহূর্তেই করতাম, কিন্তু আগামী কাল ভোরেই সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমায় বিদ্রোহ-দমনের জন্য পূর্ব সীমান্তে যেতে হচ্ছে। ফিরে এসে এর ব্যবস্থা করবো।

বলতে বলতে তিনি জীবককে নিয়ে সিংহচর্ম-আঁটা হাতলওলা পালঙ্কে গিয়ে বসলেন।

জীবক ততক্ষণে আত্মস্থ হয়েছে। বললে,—বাবা, আজ আমায় আমার মাতৃ-পরিচয় বলতে হবে। আগেও আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু উত্তর পাই নি।

অভয় তাকালেন জীবকের দিকে। ব্যথায় তাঁর বুক মোচড় দিয়ে উঠলো। বললেন,—বেশ তো, আমি ফিরে আসি। তারপর সব বলবো।

না।—শান্ত দৃঢ় কণ্ঠ জীবকের ঃ আজই শুনতে চাই। অনেক দিন অপেক্ষা করেছি। এত দিন ওরা যখন আমায় নির্মাতৃক বলে উপহাস করেছে, আমি তখন নিজেকে মনে করেছি দুর্ভাগা মাতৃহারা বলে। মনে করেছি, শৈশবেই বুঝি মা আমায় রেখে মারা গেছেন। কিন্তু আজকের ঘটনার পর সন্দেহ হচ্ছে, হয়তো আরো কিছু আছে। বাবা—

বলতে বলতে সে অভয়ের পা জড়িয়ে ধরলো। বললো,—আর আমি সহ্য করতে পারছি নে, বাবা! আমার মাতৃ-পরিচয়ে কি এমন রহস্য ও গোপনীয়তা লুকিয়ে আছে, যা সহজে বলা যায় না, যার জন্য আমায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হবে? কাল ভোরেই অত্যন্ত গুরুতর কাজে আপনি রওনা হবেন, জানি। এ সময় আপনাকে বিরক্ত না করতে হলে আমিই বোধহয় সবচেয়ে সুখী হতাম। শুধু একটা কথা বলুন, কে আমার মা ছিলেন।

জীবকের কণ্ঠে যেমন আকুতি তেমনি দৃঢ়তা। অত্যন্ত বিচলিত হন অভয়। মিনতিভরা চোখে জীবক তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। আয়ত দুই চোখে অশ্রু টলটল করছে। অভয় জানতেন, ভবিষ্যতে এমন দিন হয়তো আসবে, যেদিন জীবকের এই মহাজিজ্ঞাসার মুখোমুখি তাঁকে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু আজই তো তিনি এজন্য প্রস্তুত নন।

তাই শেষ চেষ্টা হিসাবে জীবকের মাথায় হাত রেখে আবেগকম্পিত কণ্ঠে তিনি বললেন,—বাবা, কাল ভোরেই যেখানে আমায় দূরদেশে যুদ্ধযাত্রা করতে হচ্ছে, সেখানে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করার মতো অবসর বা মানসিক অবস্থা থাকার কথা নয়। তাছাড়া বয়সে তুমি এখনো বালক। পরেও এ নিয়ে আলোচনা হতে পারে। জীবক! বাবা, জাতকের সবচেয়ে বড় পরিচয়, সে মানুষ। লজ্জা, ঘৃণা ও কলঙ্কের ভয়, সে তো মানুষের মনে। তাকে জয় করাতেই তো পৌরুষ ও মনুষ্যত্ব।

—বাবা!

জীবকের আর্তকণ্ঠে অভয় চমকে উঠলেন। ওর দুই চোখের ব্যথাহত নিষ্পলক দৃষ্টি তাঁর মুখের ওপর নিবদ্ধ। ও বললে,—বাবা, আপনার কাছে জীবনে আর কোনদিনই আমি কোন প্রার্থনা জানাব না। আজই এই শেষ প্রার্থনা। এই দুঃসহ অনিশ্চয়তা থেকে আমায় নিষ্কৃতি দিন। আর বয়স! শুধু বয়স দিয়েই কি মানুষের বিচার চলে?

অভয় যেন পাথর হয়ে যান। সব কথাই বুঝি হারিয়ে ফেলেছেন। দেয়ালের গায়ে আঁকা হরিণ শিশুটির দিকে তাকিয়ে থাকেন নির্বাক চোখে। পলে পলে সময় কেটে যায়। পদপ্রান্তে বসে আছে জীবক, জিজ্ঞাসাভরা চোখে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

শেষ গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন,—বেশ, তাই হোক। নিয়তি! নিয়তি কারো বাধ্য নয়! বেশ, শোন তোমার জন্ম-রহস্য। কিন্তু তার আগে কথা দাও, বীরের দৃঢ়তা নিয়ে খাঁটি মানুষের মতো সে দুঃসংবাদ তুমি গ্রহণ করবে। প্রার্থনা করি, তোমার চরিত্রে যেসব শ্রেষ্ঠ গুণের সমাবেশ দেখেছি, তা যেন তোমায় সদাসর্বদা রক্ষা করে বর্মের মতো।

স্থির অচঞ্চল চোখে জীবক তাকিয়ে আছে। ভেতরে যে উত্তেজনার ঝড় উঠেছে, বাইরে তার প্রকাশ নেই।

অভয় আবার বললেন,—বাবা, তুই-ই আমার সব, আমার ছেলে আমার সবকিছু। তোকে দু দণ্ড না দেখলে আমি যেন অস্থির হয়ে পড়ি। তোর চেয়ে স্নেহের, তোর চেয়ে আপন এ পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই।

শেষ দিকে অভয়ের গলা ধরে এল।

জানি, বাবা।—জীবক বললে।

কথাটা বলতে গিয়েও অভয় বলতে পারেন না। কে যেন তাঁর গলা চেপে ধরেছে। নিষ্পাপ কিশোর! ও কি সহ্য করতে পারবে সে দুঃসংবাদ?

শেষে জোর করে ভাঙা গলায় অস্ফুট কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করলেন,—তোর জন্ম-পরিচয় আমারও জানা নেই! তোকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম!

বুঝি বজ্রপাত হলো! ভয়ঙ্কর চমকে উঠলো জীবক।

কুড়িয়ে পেয়েছিলেন!—যন্ত্রচালিতের মতো সে উচ্চারণ করে কথাটা। পৃথিবী ঘুরে ওঠে তার চোখের সামনে। সে চোখ বুজলো।

নিস্তব্ধ কক্ষ। জীবকের মাথায় হাত রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন অভয়।

জীবক চোখ মেলে এক সময়। চোখে এক ফোঁটা জল নেই। বিমূঢ় শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সে তাকিয়ে থাকে অভয়ের দিকে। শেষে ধীরে ধীরে বললে,—কি ঘটেছিল সে সময়?

তীর ছোড়া হয়ে গেছে, আর ফেরাবার পথ নেই। ভগ্নকণ্ঠে অভয় শুরু করেন রহস্যে ঘেরা সেই অজানা ইতিহাস, বলেন,—আজ থেকে চোদ্দ-পনেরো বছর হবে, একদিন ভোরবেলায় উদ্যানে বিচরণ করছি, এমন সময় দূরের আমবাগান থেকে ভেসে এল এক শিশুর কান্না। অবাক হয়ে ছুটে গেলাম শব্দ লক্ষ্য করে। গিয়ে দেখি এক বিস্ময়কর দৃশ্য! এক বালিস্তূপের উপর পড়ে আছে এক সদ্যোজাত শিশু—রূপবান দেবশিশু যেন। দেখামাত্র কেন জানি না, অপূর্ব স্নেহ-মমতায় আমার অন্তর দুলে উঠলো। শিশুটিকে ঘিরে এক ঝাঁক কাক বসে ছিল। তাদের তাড়িয়ে দিয়ে শিশুটিকে আমি গভীর আবেশে বুকে তুলে নিলাম। তার জনক-জননীর খোঁজ করলাম নানাভাবে। কিন্তু ব্যর্থ সব। শিশুটিকে আমি পুত্রস্নেহে লালন-পালন করতে থাকি। প্রতিকূল পরিবেশে শিশুটি তখনো জীবিত ছিল বলে তার নাম রাখলাম 'জীবক'।

নিশ্চল মূর্তির মতো জীবক বসে থাকে। শূন্য চোখে চেয়ে আছে গবাক্ষ-পথে বাইরের অন্ধকারের দিকে। শেষে ছোট এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে একসময় সে উঠে দাঁড়ায়, পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় দরজার দিকে।

অভয় জিজ্ঞেস করলেন,—কোথায় যাচ্ছিস?

জীবক যেন সম্মোহিত—বাহ্যজ্ঞানরহিত। কথাটা তার কানে গেল কিনা বোঝা যায় না। পায়ে পায়ে সে এগিয়ে যায় আগের মতোই।

অভয় তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন, তাকে টেনে নিলেন বুকের মধ্যে। বললেন,—বাবা, তোর মনের যন্ত্রণা আমি বুঝতে পারছি। কিতু এ তো বিধিলিপি! একে মেনে নিতেই হবে। ওরে, আমি তো আছি! তুই-ই যে আমার সব!

আমায় একটু একলা থাকতে দিন।—যেন বহু দূর থেকে ভেসে এল জীবকের কণ্ঠস্বর। নিজেকে মুক্ত করে সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তার গমন-পথের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকেন অভয়। অস্ফুট কণ্ঠে বললেন,—হায় রে দুর্ভাগা সন্তান!

কিন্তু তিনি এখন কি করবেন? জীবককে এ

অবস্থায় রেখে কি করে দূরদেশে যাবেন ? অস্থির পদে অভয় ঘরময় পায়চারি করতে থাকেন। কিন্তু না গিয়েই বা উপায় কি? পূর্ব সীমান্তের অন্তপাল বিদ্রোহ সম্পর্কে যে সংবাদ পাঠিয়েছেন, তা খুবই গুরুতর। তিনি জানিয়েছেন, সাধারণ বিদ্রোহ এটা নয়। তাঁর দৃঢ় ধারণা, এ বিদ্রোহের মূলে আছে অঙ্গরাজের গভীর চক্রান্ত—এ পর্যন্ত যেসব প্রমাণ তাঁর হাতে এসেছে, তাতে দেখা যায়, অঙ্গ-রাজধানী চম্পা নগরীর রাজসভাই এই বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের মূল উৎস। অন্তপালের এই বিবরণ অনুযায়ী অবস্থা এমনিতেই গুরুতর, তার উপর আছে রাজ-অনুজ্ঞা। মহারাজ বিম্বিসার একাধারে তাঁর পিতা ও রাজা। তিনিই ন্যস্ত করেছেন এই গুরু দায়িত্বভার। এই শেষ মুহূর্তে তার কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। সুতরাং তাঁর না গিয়ে উপায় নেই। কিন্তু জীবক! তার কি হবে? সুতীব্র আঘাতের যন্ত্রণায় তার অন্তর ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। এ সময় তার পাশে থাকা একান্ত দরকার। বুদ্ধি-বিবেচনা তার যতই থাক, বয়সে সে বালক। আঘাতের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে মারাত্মক যদি কিছু করে বসে!

এ অবস্থায় কি করবেন তিনি?......নিরুপায়! নিরুপায়! না গিয়ে উপায় নেই। একদিকে গুরু কর্তব্য ও রাজাদেশ, অন্য দিকে গভীর অপত্যস্নেহ—অন্তর্জ্বালায় ছটফট করতে থাকেন রাজকুমার অভয়।

জ্যোৎস্নাময়ী নিশুতি রাত্রি—নিস্তব্ধ নিথর। পাতলা কুয়াশা নেমেছে পৃথিবীর বুকে। গভীর ঘুমে অচেতন বিশ্বচরাচর—শুধু একজন ছাড়া।

অন্ধকার অলিন্দে দেয়াল ঠেস দিয়ে জীবক দাঁড়িয়ে আছে। প্রহরে প্রহরে দূরে শেয়াল ডেকে গেছে। কিন্তু জীবক নিশ্চল। শূন্য দৃষ্টি তার দূরে নিবদ্ধ, যেখানে উদ্যানে চলেছে আলোছায়ার খেলা। দুই চোখ যেন জ্বলছে অন্ধকারে। জমাটবাঁধা অন্তর্জ্বালা ও নৈরাশ্যের দগ্ধ মরু সমস্ত অশ্রু বুঝি শুষে নিয়েছে।

মনে তুমুল ঝড়—এলোমেলো অসংলগ্ন ভয়ঙ্কর চিন্তার ঘূর্ণিঃ কে সে? বাবা নেই, মা নেই......কার সন্তান—কোন পরিচয় নেই......বিরাট বিশ্বে পরিচয়-হীন নিঃসঙ্গ জীবন...একলা পথচলা...কিন্তু কেন?... রাজকুমার অভয়! তিনি তো পালক-পিতা! সন্ধ্যার পর আরো কয়েকবার এসেছিলেন তিনি, নানাভাবে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর স্নেহের তুলনা নেই। কিন্তু...কিন্তু কি তার পরিচয়?...কোথা থেকে সে এসেছে?...একলা—সম্পূর্ণ একলা...গোত্র-পরিচয়হীন জীবন...সব ফাঁকা—সব শূন্য...উঃ!

দুহাতে মুখ ঢাকে জীবক। মস্তিষ্কের কোষে কোষে ঘূর্ণিঝঞ্ঝার নিদারুণ যন্ত্রণা। সে আবার তাকায় স্তব্ধ রজনীর দিকে।

কুয়াশা...আগেপিছে শুধুই কুয়াশা আর অন্ধকার ...কোথা থেকে সে এসেছে, সে জানে না, অভয় জানেন না, কেউ জানে না...শুধুই গ্লানি, শুধুই কলঙ্ক...কি দরকার এই কলঙ্কময় অস্তিত্বে?......কি দরকার এই গ্লানিকর জীবনধারণে?......

জীবক সোজা হয়ে দাঁড়ায়। মাথার মধ্যে বুঝি আগুন জ্বলছে।

কিন্তু আত্মঘাতী হবে সে? হঠাৎ কানে বাজে গুরুদেবের কথাঃ মনে রেখ, মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তার কর্মে ও পুরুষকারে, বংশগৌরবে নয়......

নীরব ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে জীবকের মুখে। পরিচয়হীন নীড়হীন জীবনে কি হবে ওসব দিয়ে! নাঃ, অসহ্য—অসহ্য এ অস্তিত্ব! কলঙ্কময় জীবনের বোঝা সে বইতে পারবে না—পারবে না—পারবে না!—দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট কণ্ঠে কথাগুলো বলতে বলতে জীবক শয়নকক্ষের দিকে পা বাড়ায়।

কিন্তু ও কী!—দূরে আমবাগানে নজর পড়তেই সে হঠাৎ চমকে দাঁড়িয়ে পড়লোঃ কি ওখানে? পাতলা কুয়াশার মাঝে ক্ষীণ এক আলোক-শিখা—আর—আর কি ও? এক আবছা ছায়ামূর্তি যেন! হ্যাঁ, ছায়ামূর্তিই—ছায়ামূর্তি তাকে হাত তুলে ডাকছে!

সে কি স্বপ্ন দেখছে? জীবক চোখ রগড়ায়। না, স্বপ্ন নয়, চোখের ভুলও নয়। ঐ তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, শুভ্র বসনে ঢাকা ছায়ামূর্তি তাকে ডাকছে!

অভিভূত জীবক চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর অলিন্দ পার হয়ে, শয়নকক্ষ অতিক্রম করে, সোপানশ্রেণী বেয়ে নীচে নেমে দরজা খুলে তীরবেগে ছোটে সেই আলোর শিখা লক্ষ্য করে।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছে জীবক অবাক। কেউ নেই কোথাও। এক বালিস্তূপের ওপর এক বাতি জ্বলছে। তার ক্ষীণ কম্পিত শিখার নীচে কি ওটা? সাদা রঙ-করা চতুষ্কোণ এক কাষ্ঠফলক।

জীবক তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় সে দিকে। দুধের মতো সাদা ফলকটার ওপর লাল রঙে কি যেন লেখা। কম্পিত হাতে সে তুলে নেয় ফলকখানা। মুক্তার মতো

অভিভূত জীবক চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে...

সাজানো অক্ষরমালা, জীবক পড়লো একবার—দুবার—তিনবারঃ

পুত্র!

অস্থির হয়ো না, পথভ্রষ্ট হয়ো না। মহৎ কর্মেই মানুষের পরিচয়। জীবসেবার ব্রত নিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে যাও। আশীর্বাদ করছি, পুত্র, জীবনে তুমি উজ্জ্বল কীর্তি স্থাপন করবে। ফলকখানা সাবধানে রক্ষা করো। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হতে পারে।

জীবক বিহ্বল হতভম্ব। কে? কে লিখলো কথাগুলো? কেন? কি উদ্দেশ্যে? তার ভাল-মন্দে কি প্রয়োজন লেখকের? কি সম্পর্ক তার জীবনের সঙ্গে?

জীবক আবার পড়ে লেখাগুলোঃ ......পুত্র!...... পুত্র!...কে আমায় ডাকে পুত্র বলে?...মা!...বাবা!...

নীচে কোন স্বাক্ষর নেই। না থাক, জীবকের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মনের ওপর হঠাৎ যেন কোথা থেকে স্নিগ্ধ বসন্তসমীরণ এসে নিবিড় শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে গেলঃ

...কে তুমি? নিয়তি?.. না, স্পষ্ট দেখেছি ছায়ামূর্তি ...মা কিংবা বাবা, দুজনের একজন কেউ নিশ্চয়ই...... কাছে কাছে আছ সর্বক্ষণ...পুত্রের প্রতি অতন্দ্র স্নেহদৃষ্টি মেলে জেগে আছ সারাক্ষণ......

কাঠের ফলকখানা দুহাতে বুকে চেপে ধরে জীবক কাঁপতে কাঁপতে সেখানে বসে পড়ে চোখ বুজলোঃ...... আজ আমি নিঃসন্দেহ, আমার জন্ম-রহস্যের যবনিকা একদিন উঠবেই......তাই তো ফলকখানা তুমি সাবধানে রাখতে বলেছ, তখন এটা দরকার হতে পারে।......আঃ কী শান্তি!

ধীরে ধীরে জীবক কাঠের ফলকখানা আবার ধরে চোখের সামনে। আবার পড়ে লেখাটাঃ......বেশ, তাই হোক, তোমার স্নেহাশিস্ মাথায় তুলে নিচ্ছি। জীবসেবার ব্রত নিয়েই আমি এগিয়ে যাব। জীবন-হননের শিক্ষা নিয়েছি এতকাল, এবার জীবন-রক্ষার সাধনায় ব্রতী হবো।

কাঠের ফলকখানা নিয়ে নিজের শয়নকক্ষে সে ফিরে এল।

পরদিন তার ঘুম ভাঙে দেরিতে, সূর্যদেব তখন পূর্ব দিগন্তে অনেকখানি উপরে উঠে গেছে। সে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলো। প্রধান পরিচারক তার ডাক শুনে এগিয়ে আসতে সে জিজ্ঞেস করলো,—বাবা কোথায়?

পরিচারক বললে,—তিনি তো খুব ভোরেই চলে গেছেন। সেনাবাহিনী নিয়ে এতক্ষণে বোধহয় রওনা হয়ে গেছেন। আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন, তাই আপনাকে তিনি জাগান নি। বারবার বলে গেছেন আপনাকে সাবধানে থাকতে। চোদ্দ-পনের দিনের মধ্যেই তিনি ফিরে আসার চেষ্টা করবেন। আপনার সঙ্গে তাঁর অনেক ব্যাপারে বিশেষ আলোচনা করার আছে, বলে গেছেন।

জীবক তখুনি ছুটলো, যদি দেখা হয় অভয়ের সঙ্গে।

কিন্তু হলো না। সে যখন গিয়ে পৌঁছলো, অভয়ের চতুরঙ্গ সেনাবাহিনী—রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতিক—তখন চতুর্দিক ধুলোয় আচ্ছন্ন করে নগরের পূর্ব সিংহদ্বার পার হয়ে চলেছে। সবার আগে সুশিক্ষিত গজবাহিনী—হেলেদুলে এগিয়ে চলেছে, ছোটখাট পাহাড় যেন এক-একটা। তাদের পিঠে সশস্ত্র সৈন্যদল। গজবাহিনীর পেছনে রথীর দল। তারপর পদাতিক। সবশেষে পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করে চলেছে ঘোড়সওয়ার বাহিনী।

সিন্ধুদেশীয় বলবান প্রকাণ্ড ঘোড়াগুলো যেন যৌবন-তেজে উচ্ছল চঞ্চল।

দূর থেকে দেখা যায় অভয়ের প্রকাণ্ড রথের উঁচু চূড়া—তার ধ্বজ বা পতাকা। সেদিকে তাকিয়ে পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে জীবক। দুঃখে মন ভার। নিজের মনে বলে,—পিতা, শেষ মুহূর্তে দেখা হলো না আপনার সঙ্গে। আপনার স্নেহ-মমতার তুলনা নেই। এত বড় হয়েছি, বেঁচে আছি—তা-ও আপনারই দয়ায়। অজ্ঞানে হয়তো অনেক অপরাধ করেছি আপনার কাছে। তার জন্যে মার্জনা চাইছি, পিতা। দূর থেকে আপনাকে প্রণতি জানাই, প্রার্থনা করি আশীর্বাদ। ভেবেছিলাম, আপনার অনুমতি ও স্নেহাশীর্বাদ নিয়েই যাব। কিন্তু তা হলো না। আবার কবে কতকাল পরে দেখা হবে জানি না।

গভীর চিন্তায় জীবক ডুবে যায়—হ্যাঁ, এক দিক দিয়ে এ বোধহয় ভালই হলো। যে পরিচয় সত্য নয়, তা নিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে পা বাড়ানো ঠিক হতো না। এটাই বোধহয় ভবিতব্যের নির্দেশ। যে জন্ম-দুর্ভাগা, যার কোন পরিচয়ই নেই, তাকে নিজের চেষ্টায় কর্মের মধ্য দিয়ে এ জগতে নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

জীবক অন্যমনস্ক—ভাবে আর ভাবে। হঠাৎ এক-সময় খেয়াল হয়, সৈন্যবাহিনী কখন নগরদ্বার অতিক্রম করে চলে গেছে, পথের পাশে সে দাঁড়িয়ে আছে—একলা।

কিশোর-অন্তর তোলপাড় করে গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

সে ফিরে চলে। কোন্ পথে—নির্বান্ধব এই অজানা বিশ্বে কোন্ পথে সে চলবে? হঠাৎ গতরাত্রের সেই কাষ্ঠফলকের রক্তাক্ষরমালা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠেঃ পুত্র! জীবসেবার ব্রত নিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে যাও!

জীবক দাঁড়িয়ে পড়ে। আঃ! ধরিত্রীর বুকে এমন মিষ্টি করে পুত্র বলে ডাকার তাহলে আরো একজন আছে! কে তুমি? বাবা? মা? মা-ই বোধহয়। মায়ের স্নেহ কি জানি নে। এই বোধহয় মাতৃস্নেহ। এই স্নেহের দুর্বার আকর্ষণে গতকাল গভীর নিশীথে তুমি ছুটে এসেছিলে, অলক্ষ্যে থেকেই মায়ের মন নিয়ে বুঝেছিলে, পুত্রের জীবনে সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তুমি না গেলে সেখানে কালো যবনিকা নামতে পারে।...মা! মাগো!......

তরুবীথির আড়ালে দাঁড়িয়ে জীবক নীরবে কাঁদে। গত রাতের অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিকে মায়ের আসনে বসিয়ে পূজো করে অশ্রুর অর্ঘ দিয়ে। শেষে মনে মনে বলে,—হ্যাঁ, জীবসেবা, মানুষের সেবাই হবে আমার জীবনের ব্রত। আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করবো, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-শাস্ত্রের সমস্ত জ্ঞান আয়ত্ত করবো। আমি হবো মর্তের ধন্বন্তরি।...কিন্তু...কিন্তু কোথায় কিভাবে পাব এই শিক্ষা......

॥ দুই ॥

এক বিস্তীর্ণ নির্জন প্রান্তর। এখানে-ওখানে দু-চারটে বড় বড় বট-অশ্বত্থের গাছ আর ছোটখাট ঝোপঝাড়। প্রান্তরের ভেতর দিয়ে গেছে রাষ্ট্রীয় সড়ক বা রাজপথ। রাজপথ ধরে এক কিশোর চলেছে পশ্চিম দিকে। দূর থেকে তাকে দেখে বলার উপায় নেই যে, সে জীবক। বেশ কিছু দিন হলো, সে ঘর ছেড়েছে, ছেড়ে এসেছে তার এত কালের নিশ্চিন্ত আশ্রয়। বহু-বহু পেছনে পড়ে আছে মগধের রাজধানী রাজগৃহ।

জীবকের বেশভূষা অতি সামান্য। মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার-আভরণ সবই সে ফেলে এসেছে। কোন অস্ত্রশস্ত্রও সঙ্গে নেয়নি। কোমরে জড়ানো সাধারণ কোমরবন্ধ—আত্মরক্ষার জন্য সেখান থেকে ঝুলছে শুধু একখানা কোষবদ্ধ তরবারি।

জীবকের লক্ষ্য তক্ষশিলা। বহু-বহু দূরে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কাছে অবস্থিত গন্ধার রাজ্যের রাজধানী তক্ষশিলা—হাজার হাজার ক্রোশ দূর রাজগৃহ থেকে।

সবরকম বিদ্যাচর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ পীঠস্থান তক্ষশিলা। চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থাও সেখানে সর্বোত্তম। চিকিৎসা-শাস্ত্রের সমস্ত বিভাগে শ্রেষ্ঠ নৈপুণ্য লাভ করতে হলে তক্ষশিলায় যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। পৃথিবীর দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার ছাত্র সেখানে যায় বিদ্যালাভের জন্য।

পূর্বাঞ্চল থেকে সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের তক্ষশিলা নগরী যাবার পথ শুধু সুদীর্ঘই নয়, অত্যন্ত দুর্গম ভয়ঙ্করও বটে। পথে পড়ে হিংস্র জন্তু-জানোয়ার অধ্যুষিত বিশাল সব বনভূমি, জলহীন নির্জন মরুকান্তার এবং বড় বড় খরস্রোতা নদ-নদী। পার হতে হয় ছোট-বড় অনেক স্বাধীন রাজ্য। নৃশংস ভয়াল নানা দস্যুদল সে পথে ওত পেতে থাকে। সামান্য অর্থের জন্য মানুষ খুন করতেও তাদের বাধে না। সে পথে পদে পদে এমনি আরও কত মৃত্যুফাঁদ।

এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে সাধারণতঃ ধনী

অভিজাতবংশীয় ছাত্রেরাই সেখানে যায় বিদ্যালাভের জন্য। তারা যায় লোকজন নিয়ে রথ, অশ্ব প্রভৃতি যানবাহনে করে।

পিতা অভয়ের ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে জীবকও তাই যেতে পারতো। শুধুই কি তাই! গন্ধার মগধের মিত্র-রাজ্য। গন্ধার-রাজ পুষ্করসারীর সংগে মহারাজ বিম্বিসারের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। অভয় অনুরোধ করলে মহারাজ বিম্বিসার পুষ্করসারীর কাছে সানন্দে ব্যক্তিগত পত্র লিখে দিতেন। আর তাহলে তক্ষশিলার সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের কাছে শিক্ষালাভের সুযোগ পেতে জীবকের পক্ষে কোন বাধাই থাকতো না।

কিন্তু জীবক তা চায় নি। তাই নিঃসহায় নিঃসম্বল অবস্থায় দৃঢ় কঠিন সংকল্প নিয়ে সে পথে নেমেছে। নিজের চেষ্টা ও কর্মের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে সে জীবনপাত করবে, তবু কারো সাহায্য আর গ্রহণ করবে না—এই তার সংকল্প।

দিনের পর দিন সে এগিয়ে চলেছে পদব্রজে—নিঃসংগ। চলার বিরাম নেই। অপরিচিত দেশ—অজানা পথঘাট। সহায়সম্বলহীন অনাথ ছাত্র হিসাবে সে নিজের পরিচয় দেয় মানুষের কাছে। এমনি করে যে দীর্ঘ কঠিন পথ সে ইতিমধ্যে পার হয়ে এসেছে. তা অতুল বিত্ত-বিভবের মধ্যে পরম স্নেহযত্নে লালিতপালিত এক কিশোরের পক্ষে যে কী কষ্টদায়ক, তা ওকে দেখলেই বোঝা যায়।

শুষ্ক রুক্ষ চোখেমুখে কালি পড়েছে। সর্বাংগ ধূলি-ধূসরিত। মাথায় কোথায় সেই কুঞ্চিত কেশরাশি, কেশরাগ বা গন্ধতেল দিয়ে যার পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকতো দাসদাসীরা! সেখানে একরাশ রুক্ষ চুলের বোঝা। সামান্য যে বেশভূষা, তা-ও অত্যন্ত ময়লা, স্থানে স্থানে ছিঁড়ে গেছে।

চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় খাদ্য ছাড়া যার মুখে কিছু রুচতো না, দুগ্ধফেননিভ শয্যা ছাড়া যার ঘুম হতো না, আজ তার যে আহার ও আশ্রয় জুটছে, তা তার বাড়ির দাসদাসীরাও কল্পনা করতে পারে না। এ খাদ্যও নিয়মিত নয়। পর্যাপ্তও নয়। আশ্রয়ও অনিশ্চিত—যত্রতত্র। গ্রামে জনপদে গৃহস্থ বাড়িতে কখনও বা অনাথ আশ্রমে বা পান্থশালায় খাদ্য ও আশ্রয় জোটে, কখনও জোটে না।

আজ দুপুরে হয়তো কিছুই জুটতো না। অনেক চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত এক গৃহস্থ বাড়ি থেকে কিছুটা যবের মণ্ড জোগাড় করতে পেরে সে বর্তে গেছে। তাই দিয়েই কোন রকমে ক্ষুধা শান্তি করেছে।

সূর্য পশ্চিম গগনে। শ্রান্তক্লান্ত জীবক—তবু যতখানি পারে জোরে হাঁটছে। লোকের কাছে শুনেছে, প্রান্তর পার হলেই এক বড় জনপদ পড়বে। সূর্যাস্তের আগেই সেখানে পৌঁছতে হবে। খাবার ও বিশ্রামের জন্য মন তার ব্যাকুল।

বেলা ক্রমেই শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু প্রান্তরের বুঝি শেষ নেই। জীবকের মনে দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। সে দৌড়তে শুরু করে।

কিন্তু এ কী! প্রান্তর শেষ হয়ে যে জংগল শুরু হলো! লোকটা কি তাহলে ইচ্ছে করেই তাকে ভুল নির্দেশ দিয়েছে? পথশ্রান্ত অসহায় এক অনাথ কিশোরের সংগে এ কী নিষ্ঠুর পরিহাস! তার মাথায় বুঝি আকাশ ভেঙে পড়ে।

জংগল ক্রমেই গভীর হচ্ছে। এখন উপায়? খিদে ও পিপাসা পেয়েছে অনেকক্ষণ। পিপাসাটা এখন যেন বেশী করে পেয়ে বসলো। যদি কোন জলাশয় পাওয়া যায়, সেই আশায় জীবক জংগলের আরো ভেতরে ঢোকে।

এখানে-ওখানে টিলা-ঢিবি, ফাঁকা জায়গা, তারপরেই আবার জংগল। হঠাৎ এক জায়গায় এসে সে থমকে দাঁড়াল। মানুষের চিহ্ন স্পষ্ট! ছাইয়ের গাদা ও খাবারের উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে আছে।

জীবকের আর এগুতে সাহস হয় না। সে শুনেছে, এইসব বনে জংগলে শুধু হিংস্র জন্তু-জানোয়ারই থাকে না, থাকে ভয়ংকর ডাকাতের দল। অদূরে ফাঁকা অঞ্চলটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে ডালপালা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে নাম-না-জানা বিরাট এক মহীরুহ। জীবক তাড়াতাড়ি তার মাথায় গিয়ে উঠে বসলো।

কিন্তু পিপাসার কি হবে? নিদারুণ পিপাসায় তার অন্তরাত্মা ছটফট করছে। একটু জল পেলে খিদে ও পিপাসা দুটোরই উপশম হতো—অন্ততঃ কিছুকালের জন্য। জীবক তাকায় চারদিকে।

সূর্য ডুবছে। বনের বুকে নামছে অন্ধকার। হঠাৎ তার চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। দূরে জংগলের মাঝে দেখা যাচ্ছে এক জলাশয়।

তাড়াতাড়ি সে গাছ থেকে নামতে যাবে, হঠাৎ এক হরিণ-শাবকের আর্ত চিৎকারে বনের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল। চমকে উঠে জীবক দেখে, অদূরে এক ঝোপের ধারে বিরাট এক অজগর এক হরিণ-ছানাকে কামড়ে ধরেছে। তার দেহ-কুণ্ডলীর বজ্রপেষণে মুহূর্তে

ছানাটির মৃত্যু হলো। তারপরই অজগরটি তাকে গিলতে শুরু করে।

ডালের ওপর বসে জীবক ভাবছে, কি করবে। ছানাটিকে গিলে অজগরটি ধীরে ধীরে ঝোপের নীচে অদৃশ্য হয়েছে। এমন সময় ফাঁকা জায়গার বিপরীত দিকের জঙ্গলটা নড়ে উঠলো। আর পরক্ষণে সেখান থেকে বেরিয়ে এল একদল লোক। কালো কালো ভয়ঙ্কর চেহারা, হাতে খড়্গ, কুঠার, লাঠি ইত্যাদি। জীবক শিউরে ওঠেঃ দস্যু!

দস্যুরা কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে কি সব পরামর্শ করলো, তারপর আবার গা ঢাকা দিল জঙ্গলের মধ্যে। জীবকের আর গাছ থেকে নামা হলো না। গাছের মাথায় মগডালে উঠে যায় সে।

জঙ্গলের বুকে রাতের আঁধার গাঢ়তর হয়। দেখতে দেখতে নিশাচর অরণ্য যেন জেগে ওঠে। বন্য জন্তুর চিৎকার, ছুটোছুটি কানে আসে। গাছের নীচে শুকনো পাতার মর্মরধ্বনি, ঝোপেঝাড়ে খসখস আওয়াজ! অনেক পরে চাঁদ উঠলো। ক্ষীণ মেটে জ্যোৎস্নায় অরণ্যকে মনে হয় আরো রহস্যময় ভয়ঙ্কর। তৃষ্ণার্ত ক্ষুধার্ত জীবকের নিদ্রাহীন রাত কাটে গাছের মাথায়।

পর দিন ভোরে আবার সে রওনা হলো। তিন দিনের দিন দুপুরে সে এসে পৌঁছলো শ্রাবস্তীতে। কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তী। সেখানে এসে সে শুনলো, ভোর বেলায় বড় এক দল বণিক বহু গোশকটে বা গরুর গাড়িতে করে পণ্যসম্ভার নিয়ে রওনা হয়ে গেছে পশ্চিম দিকে। বৈশালীর বণিক তারা।

জীবকের আর দাঁড়ানো হলো না। সামান্য খাদ্য যা জুটলো, তাই খেয়ে ছুটলো বণিকদের নাগাল পাওয়ার জন্য। কোন বণিকদলের আশ্রয় তাকে পেতেই হবে। যে পথ সে পার হয়ে এসেছে, তার তুলনায় সামনের পথ অনেক বেশী দুর্গম, ভয়ঙ্কর। তাই আসার পথে সে সর্বত্র বণিকদলের সন্ধান করেছে।

সে জানে, অন্যান্য নগরের মতো চম্পা, রাজগৃহ, বৈশালীরও অনেক বণিক গোশকটে পণ্যসম্ভার চাপিয়ে বাণিজ্যের জন্য বারাণসী, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী, তক্ষশিলা প্রভৃতি নগরে যাতায়াত করে। পথে পড়ে মহারণ্য, মরুকান্তার—বিশেষতঃ তক্ষশিলার পথে। সেখানে পদে পদে ভয়ঙ্কর বিপদ—বিষম দস্যুভয়। তাই বণিকেরা বহুজন দল বেঁধে সশস্ত্র রক্ষী ও পথ-প্রদর্শক নিয়ে যাতায়াত করে ওসব পথে।

এমন কোন দলের সাক্ষাৎ পেলে সে বেঁচে যায়। অবশ্য সাক্ষাৎ পেলেই যে তাদের কাছে আশ্রয় পাবে, এমন কোন কথা নেই। বিপদসঙ্কুল পথে অপরিচিত কাউকে সঙ্গে নিতে তারা সহজে রাজী হয় না। এজন্য তাদের, বিশেষতঃ তাদের দলপতি সার্থবাহের আস্থা তাকে যে করে হোক পেতেই হবে।

যথাসাধ্য দ্রুত পায়ে জীবক এগিয়ে চলে। নিদারুণ পথের কষ্ট—ক্লান্ত পা যেন আর চলতে চায় না।

সেদিন কেটে যায়। বণিকদলের দেখা মেলে না। এক গ্রামে সে আশ্রয় নেয় রাতের মতো। ডাকাতের ভয়ে তটস্থ গ্রামবাসী। তাই যৎসামান্য খাদ্য জুটলেও, আশ্রয় সে পায় না কোন বাড়িতে। এক খড়ের গাদায় রাত কাটিয়ে, পরদিন ভোরের আলো ফুটতেই সে রওনা হলো আবার।

সারা দিন কেটে গেল। বেলা যত শেষ হয়ে আসে, জীবকের গতি তত মন্থর হয়। দূরে দেখা যায় এক মহাবন। গভীর সে মহারণ্য গম্ভীর ভয়াল চোখ মেলে যেন তাকিয়ে আছে তার দিকে।

জীবক থমকে দাঁড়ায়। অনেক পেছনে ফেলে এসেছে শেষ গ্রাম। সেখানে দুপুরে যে বাড়িতে তার আহার জুটেছিল, তার গৃহকর্তা তাকে বারবার নিষেধ করেছিলেন এ পথে একলা যেতে। হিংস্র জন্তু-জানোয়ার অধ্যুষিত ও বন নাকি ভয়ঙ্কর। আছে দস্যুভয়।

এখন কি করণীয়? দিন শেষ হয়ে আসছে। অসহায় চোখে জীবক চারিদিকে তাকায়। হঠাৎ তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। বনের প্রান্তে কি ও! ধোঁয়ার রেখা কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশ পানে উঠছে। কারা ওখানে? মানুষ, না অন্য কিছু? শত্রু, না মিত্র?

কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেও তো চলবে না। গাছপালার আড়ালে আড়ালে সন্তর্পণে জীবক এগিয়ে গেল।

তারপরেই পথের বাঁক ঘুরতেই যে দৃশ্য তার চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হলো, তাতে বিস্ময়ে আনন্দে তার হাত-পা যেন অবশ হয়ে আসে।

বনের প্রান্তে পথের পাশে প্রশস্ত এক ফাঁকা জায়গা। সেখানে বড় একদল বণিক রাতের মতো তাঁবু ফেলেছে। বহু তাঁবু। পাচক ও ভৃত্যের দল রান্নার কাজে ব্যস্ত। তাঁবুগুলির মাঝে বড় একটা তাঁবু সহজেই জীবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মনে মনে

সে বলে,—ওটা দলনেতা সার্থবাহের তাঁবু না হয়ে যায় না।

তাঁবুগুলোকে বেষ্টন করে, শুয়ে বা দাঁড়িয়ে আছে সব বলীবর্দ। যেমন বিশাল তাদের দেহ, শিংও তেমনি প্রকাণ্ড ও ছুঁচলো। বলীবর্দদের ঘিরে বাইরের দিকে রাখা হয়েছে বড় বড় শকট বা গাড়ি-গুলোকে। জীবক বুঝতে পারে, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার ও দস্যুরা যাতে সহজে আক্রমণ করতে না পারে, তার জন্যেই ব্যূহ তৈরি করা হয়েছে এমনিভাবে।

জীবক এগিয়ে যায়। খবর নিয়ে শোনে, বণিক-দল যাবে তক্ষশিলায়। সার্থবাহের সঙ্গে দেখা করতে যেতেই সে বাধা পেল রক্ষীদের কাছ থেকে। বনপথে যাত্রা করার মুখে বণিকদল নিরাপত্তার জন্য দশজন সশস্ত্র রক্ষী নিয়োগ করেছে। এদের বলা হয় অরণ্যা-রক্ষিক—এরা শুধু প্রহরী নয়, পথ-প্রদর্শকও বটে। জীবক বাধা পেল তাদের নেতা আরক্ষিকজ্যেষ্ঠের কাছ থেকে।

যাই হোক, সার্থবাহের সে দেখা পায় শেষ পর্যন্ত এবং মিনতিভরা কণ্ঠে জানায় নিজের প্রার্থনা। নিজের পরিচয় সে দেয় অনাথ বিদ্যার্থী হিসাবে।

বণিকদলের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে, অনেকেরই অনিচ্ছা তাকে স্থান দিতে।

সার্থবাহ বয়সে প্রবীণ—নাম তিরীট-বৎস। শুধু ধনৈশ্বর্যেই তিরীট-বৎস শ্রেষ্ঠীকুলে প্রধান নন, জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায়ও প্রধান—ধীর স্থির বিবেচক। জীবককে দেখে তাঁর মনে মমতা জাগে। ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে তাঁর ধারণা হয়—এ কিশোরের দ্বারা আর যাই হোক অপকার হবার সম্ভাবনা নেই।

সার্থবাহের দয়ায় জীবক আশ্রয় পেল।

রাত্রির আহারাদির শেষে শুতে যাবার আগে সার্থ-বাহ আরক্ষিকজ্যেষ্ঠ ও তার অধীনস্থ রক্ষীদের বিশেষ-ভাবে নির্দেশ দিলেন সদা সতর্ক প্রহরায় থাকতে।

মৃদু হেসে আরক্ষিকজ্যেষ্ঠ বললে,—মহোদয়, আপনি শুনে হয়তো সুখী হবেন যে, আরক্ষিকের কাজ করলেও আমি ব্রাহ্মণ। আমরা বেঁচে থাকতে আপ-নাদের কোন ক্ষতি হবে না। আপনারা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন।

ব্রাহ্মণ! জীবক অবাক হয়ে তাকায় আরক্ষিক-জ্যেষ্ঠের দিকে।

আরক্ষিকজ্যেষ্ঠের কথা শুনে সার্থবাহ বললেন,—আপনি ব্রাহ্মণ! শুনে সুখী হলাম।

তারপর সহযাত্রী বণিকদের লক্ষ্য করে বললেন,—আপনারা বোধহয় জানেন যে, এই অঞ্চলটা খুবই বিপদসঙ্কুল। দস্যুভয়ই প্রধান। কিছুকাল আগে আমার পরিচিত বারাণসীর এক বণিকদল এখানে দস্যুর হাতে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন, জীবনহানিও ঘটেছিল। আপ-নারাও হয়তো শুনেছেন সে ঘটনা। সেইজন্য আমাদের সবাইকে একটু সজাগ থাকতে হবে। আমরা নিজেরা যদি সজাগ ও সতর্ক থাকি, তাহলে আরক্ষিকজ্যেষ্ঠ ও তার দলের কাজও অনেকখানি সহজ হবে।

গভীর নিস্তব্ধ রাত্রি। নিস্তব্ধ মহারণ্য। জমাট-বাঁধা স্তব্ধতা যেন চেপে বসেছে বিশ্বচরাচরের বুকে। বনমধ্যস্থ দু-একটা জানোয়ারের চিৎকার মাঝে মাঝে সে স্তব্ধতায় আঁচড় কাটছে ক্ষণিকের জন্য। গাছের একটা পাতা পর্যন্ত নড়ছে না।

রাত বোধহয় তৃতীয় প্রহর শেষ হতে চললো। আকাশে সরু একফালি চাঁদ উঠেছে। ধরিত্রীর বুকে অস্পষ্ট মরা জ্যোৎস্না আর পাতলা কুয়াশা।

তাঁবুগুলি নীরব। সবাই ঘুমে অচেতন। কিন্তু ঘুম নেই জীবকের চোখে। দীর্ঘ পথ-পর্যটনে ক্লান্ত সে। তার ওপর এতকাল পরে পেয়েছে নিশ্চিন্ত আশ্রয় ও পর্যাপ্ত আহার। তাই অনেক আগেই তার ঘুমিয়ে পড়া উচিত ছিল। কিন্তু কি যে হয়েছে, কিছুতেই ঘুম আসছে না। কি এক অস্বস্তি যেন তাকে পেয়ে বসেছে সন্ধ্যা থেকে—বিশেষতঃ দস্যুদের সম্পর্কে সার্থবাহের সাবধান-বাণী শোনার পর থেকে।

মাঝে সে একবার সন্তর্পণে বেরিয়েছিল তাঁবু থেকে। কিছু দূরে এক গাছের তলায় দেখেছিল আরক্ষিকদের। ওরা ওখানে কেন?—তার মনে প্রশ্ন উঠেছিল। ওদের তো কর্তব্য চারদিক পাহারা দেওয়া। সার্থবাহকে কি বলবে কথাটা?

সঙ্গে সঙ্গে অন্তর থেকে বাধা এসেছিল—না, এটা উচিত হবে না। একে সে বয়সে কিশোর, কী-ই বা তার অভিজ্ঞতা! সে তুলনায় প্রবীণ সার্থবাহের অভিজ্ঞতা অনেক বেশী। তার ওপর এদের সঙ্গে তার মাত্র কয়েক ঘন্টার পরিচয়। ওদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে।

জীবক হঠাৎ বিছানায় উঠে বসলো। বাইরে কোথায় যেন একটা শিস দেবার শব্দ! শোনার ভুল নয় তো? জীবক উৎকর্ণ : না, না, ঐ—ঐ আবার!

[শেষাংশ ২৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

পাহাড়ী পথে

শিল্পী নীলরতন চট্টোপাধ্যায়
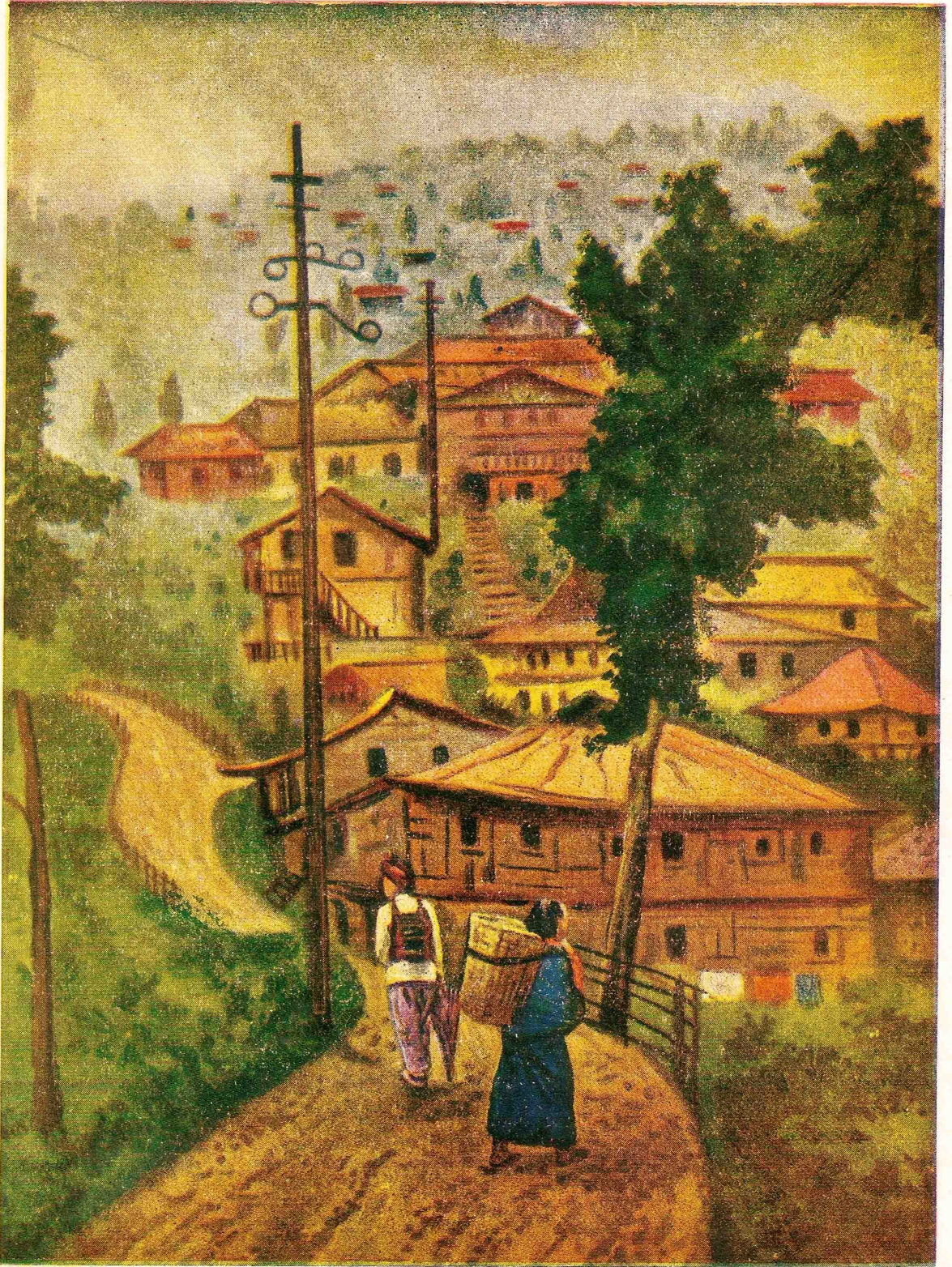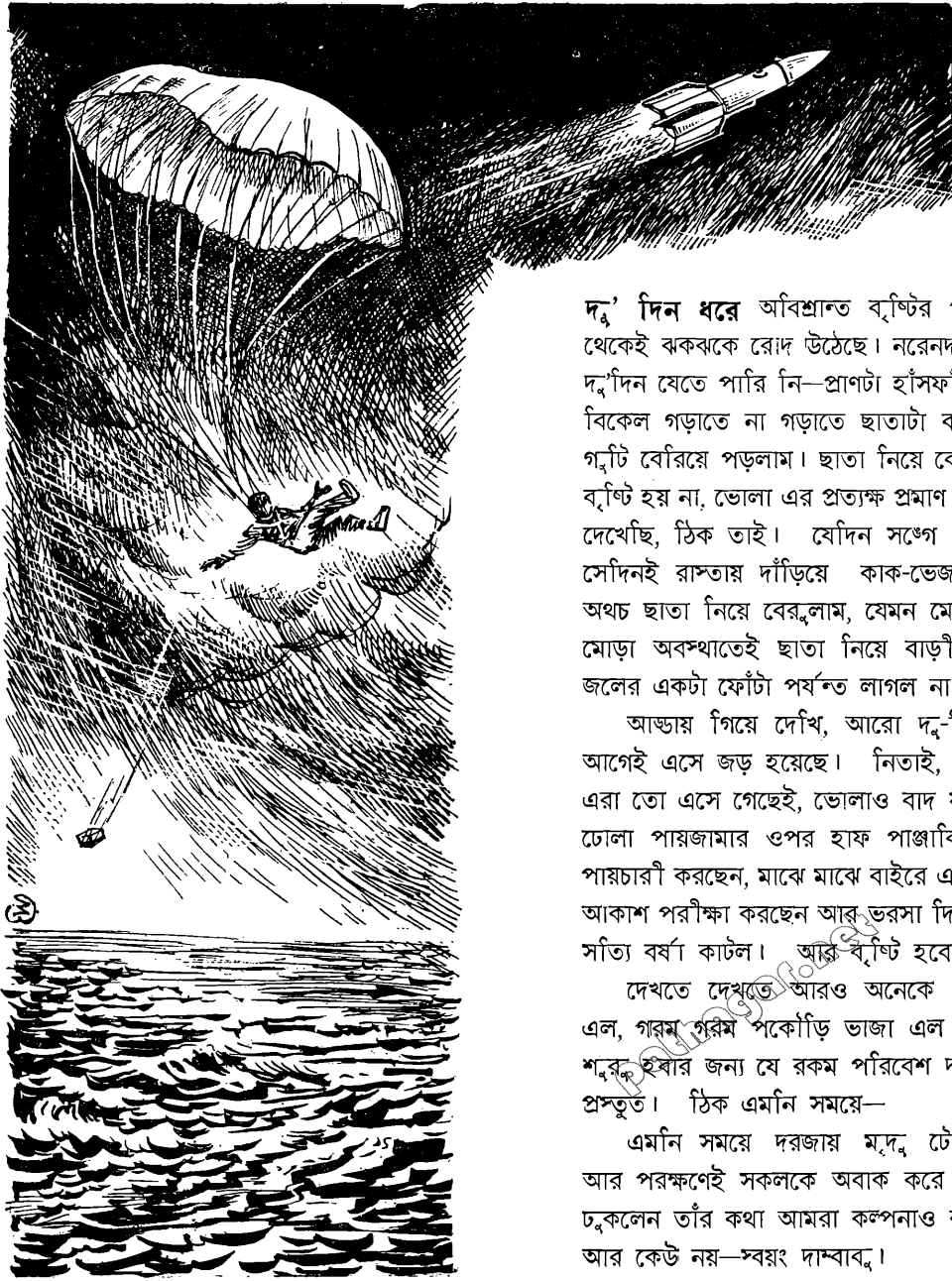
দু' দিন ধরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর আজ সকাল থেকেই ঝকঝকে রোদ উঠেছে। নরেনদার সান্ধ্য আড্ডায় দু'দিন যেতে পারি নি—প্রাণটা হাঁসফাঁস করছিল। তাই বিকেল গড়াতে না গড়াতে ছাতাটা বগলে নিয়ে গুটি গুটি বেরিয়ে পড়লাম। ছাতা নিয়ে বেরুলে নাকি আর বৃষ্টি হয় না, ভোলা এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছে। আমিও দেখেছি, ঠিক তাই। যেদিন সঙ্গে ছাতা থাকবে না, সেদিনই রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাক-ভেজা ভিজতে হবে। অথচ ছাতা নিয়ে বেরুলাম, যেমন মোড়া ছিল তেমনি মোড়া অবস্থাতেই ছাতা নিয়ে বাড়ী ফিরলাম, গায়ে জলের একটা ফোঁটা পর্যন্ত লাগল না।

আড্ডায় গিয়ে দেখি, আরো দু-তিন জন আমার আগেই এসে জড় হয়েছে। নিতাই, ভবতোষ, সুখময় এরা তো এসে গেছেই, ভোলাও বাদ যায় নি। নরেনদা ঢোলা পায়জামার ওপর হাফ পাঞ্জাবি চাপিয়ে ঘরময় পায়চারী করছেন, মাঝে মাঝে বাইরে এসে তীব্র দৃষ্টিতে আকাশ পরীক্ষা করছেন আর ভরসা দিচ্ছেন—নাঃ, এবার সত্যি বর্ষা কাটল। আর বৃষ্টি হবে না।

দেখতে দেখতে আরও অনেকে এসে জুটল। চা এল, গরম গরম পকৌড়ি ভাজা এল। অর্থাৎ মিটিং শুরু হবার জন্য যে রকম পরিবেশ দরকার তার সবই প্রস্তুত। ঠিক এমনি সময়ে—

এমনি সময়ে দরজায় মৃদু টোকা শোনা গেল, আর পরক্ষণেই সকলকে অবাক করে দিয়ে যিনি ঘরে ঢুকলেন তাঁর কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি নি। আর কেউ নয়—স্বয়ং দাম্বাবু।

প্রফেসর এক্স

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

না, নাম শুনে যা মনে হচ্ছে সে রকম কিছু নয়। দাম্বাবু আফ্রিকার কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক নন, নক্রুমা, লুমুম্বা, জিম্বাবা—এঁদের কারো সঙ্গেই তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের মতই খাঁটি বাঙ্গালী—পুরো নাম দাম্যদত্ত গুহখাসনবীশ। অত বড় নামটা নিয়ে হোঁচট খেতে হয়, তাই সংক্ষেপে ওটা দাম বাবু করে নেওয়া হয়েছে। তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করতে গিয়ে সেটাই শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে দাম্বাবু।

দাম্বাবুকে দেখে অবাক হবার কথাই বটে। কেন না তিনি কখন যে পৃথিবীর কোন্ অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান কেউ বলতে পারে না। তাঁর বাবা ছিলেন অগাধ টাকার মালিক আর তিনি হলেন বাপের একমাত্র সন্তান। কাজেই কাজকর্ম কিছু না করে ইচ্ছেমত জীবন কাটিয়ে দেবার সুযোগ ছিল তাঁর যথেষ্ট। তার ওপর তাঁর ছিল দেশভ্রমণের নেশা। শুধু নিজের দেশ নয়, গোটা পৃথিবীটাকে তিনি চষে বেড়াতেন। এই হয়তো দেখা গেল হনলুলুতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, পরের দিনই হয়তো চলে গেলেন রিও ডি জেনেরিও। আবার তার পরের দিনই আলাস্কা কিংবা কামস্কট্‌কা। আজকাল এরোপ্লেনের কল্যাণে পৃথিবীও যেন ভয়ানক ছোট হয়ে গেছে—সব এপাড়া-ওপাড়া।

এই সেদিনও দাম্বাবু ব্রেজিলের নিভাকো শহর থেকে বেশ কাব্যি করে চিঠি লিখেছিলেন। নরেনদা'র আড্ডায় সে চিঠি পড়াও হয়েছিল। আর এরই মধ্যে তিনি স্বয়ং সশরীরে হাজির!

—আরে আরে দাম্বাবু যে! কি খবর? হঠাৎ চলে এলেন যে!

দাম্বাবু গম্ভীর গলায় বললেন,—প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি। ওঃ, যে বিপদে পড়েছিলাম! নেহাৎ পুণ্যের জোর ছিল তাই রক্ষা।

—কি রকম?

—ভূমিকম্প। ভূমিকম্প না বলে সাগরকম্প বললে আরও ভালো হয়। আমার জীবনে এরকম কখনও দেখি নি। শুনেছি বটে এ-রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল সেই ক্রাকাটোয়ায়, ১৮৭৩ সালে। আর এবারে ঘটল মেক্সিকো উপসাগরে।

—আহা, ব্যাপারটা একটু খুলেই বলুন।

বলব বলেই তো এসেছি—দাম্বাবু ফরাসের ওপর গুছিয়ে বসে সুরু করলেন ঃ

ব্রেজিলে জুলে রিমে কাপের খেলা দেখব বলে টিকিট কেটেছি। খেলা হতে কয়েক দিন দেরি দেখে ভাবলাম একটু বেড়িয়ে আসি। মেক্সিকো উপসাগরের ধারে ল্যান্ডস্ এন্ড একটা ছোট্ট গ্রাম। সেখানে থাকে আমার বন্ধু নিকলসন। ভারী অমায়িক লোক। একবার কুইন এলিজাবেথ জাহাজে আলাপ হয়েছিল। সেই থেকে ক্রমাগত সে তার ওখানে যাবার জন্য নেমন্তন্ন করছে। ভাবলাম কটা দিন ওখানেই কাটিয়ে আসি যতদিন না খেলা শুরু হয়।

ল্যান্ড্স্‌এন্ডে তো পেঁছিলাম। সমুদ্রের ধারে ছোট্ট গ্রাম। শহরের কোলাহল নেই। প্রাকৃতিক দৃশ্যে অপরূপ। খাও-দাও আর বেড়াও। নিকলসন আর তার গিন্নী দুজনেই খুব অতিথিবৎসল, তাই দিনগুলো ভালোই কাটতে লাগল।

একদিন নিকলসন বলল, ক্যালিফোর্নিয়ার মত এখানেও একটা ছোটখাট রেডউডের বন আছে। বহু দিনের পুরোনো বিরাট বিরাট সব গাছ, দেখলে অবাক হয়ে যাবে। তবে পাহাড় ভেঙ্গে যেতে হয়। চল, একদিন ঘুরে আসি।

সমুদ্রের বুক থেকে খাড়া উঠে গেছে পাহাড়। পাহাড়ে উঠবার চমৎকার ঘোরানো মোটর রোড আছে। আমরা তিনজন—আমি, নিকলসন আর তার বৌ—প্রচুর স্যান্ডউইচ্ সঙ্গে নিয়ে একদিন গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, আর ঘণ্টাখানেক বাদেই পাহাড়ের প্রায় চূড়ায় পেঁছে গেলাম। নিকলসন বলল,—এবার উৎরাই। পাহাড়ের একেবারে নীচে রয়েছে সেই বন। গাড়ী নিয়ে নামা যাবে না। গাড়ীটা এইখানে লক করে রেখে এবার হেঁটে হেঁটে নামতে হবে।

বেশ চলেছি গল্প করতে করতে আর স্যান্ডউইচ্ চিবুতে চিবুতে, হঠাৎ কেমন একটা গুম্ গুম্ আওয়াজ শুনে চমকে উঠলাম। তার পরই সুরু হল প্রলয় কাণ্ড। প্রথমে সোঁ সোঁ করে ঝোড়ো হাওয়া বইতে সুরু করল। তার পরই মনে হল পায়ের নীচে মাটি যেন টলমল করছে। পেছন ফিরে দেখি ফোয়ারার মত সমুদ্রের জল উঁচু হয়ে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে আছড়ে পড়ছে। এখনই বুঝি পাহাড়সুদ্ধু ডুবিয়ে দেবে। জলস্তম্ভের কথা ছেলেবেলায় বইতে পড়েছি, কিন্তু সে যে কি বস্তু তার কোন ধারণা ছিল না। মনে হল, এই বুঝি সেই জলস্তম্ভ। তবে একটা নয়—দুটো নয়—হাজারটা জলস্তম্ভ যেন একসঙ্গে ছুটে চলেছে সমুদ্র তোলপাড় করে। দূরে মড়মড় করে বিশাল বিশাল গাছ ভেঙ্গে পড়ছে। তার আওয়াজে কানে তালা লাগার যোগাড়। আমরা যেখানটায় ছিলাম সেখানটায় বড় গাছ তেমন

ছিল না তাই রক্ষে। কোন রকমে মাটি আঁকড়ে তিন-জনে ভগবানের নাম করে পড়ে রইলাম। কিন্তু তাই কি থাকা যায়? মুহূর্তে-মুহূর্তে ছিটকে ফেলে দিচ্ছে দশ হাত দূরে। হাত-পা চুরমার হবার গতিক।

এরই মধ্যে সভয়ে দেখলাম, আকাশের ওপর দিয়ে জ্বলন্ত কতকগুলো পদার্থ ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড গর্জন আর রাশি রাশি ধোঁয়া। তখন বুঝতে পারিনি সেটা একটা জাহাজ। সমুদ্রের ওপর দিয়ে কোথায় যাচ্ছিল কে জানে! প্রচন্ড বিস্ফোরণে হাজার টুকরো হয়ে হাজার ফুট দূরে ছিটকে পড়ল।

কি করে যে রক্ষা পেলাম তা আমি এখনও বুঝতে পারি নি। শুধু আমি নই, আমরা তিনজনই। কিন্তু পরদিন যখন অবস্থা স্বাভাবিক হল, তখন সে প্রলয়ের চিহ্ন দেখে মাথা ঘুরে গেল। ল্যান্ড্‌স্‌এন্ডের সমস্ত বাড়ী ধ্বসে গেছে, পাহাড় ফেটে কাত হয়ে পড়েছে, অগুনতি সামুদ্রিক প্রাণীর মৃতদেহে সাগরের বেলাভূমি ছেয়ে রয়েছে।

খবরটা যখন কাগজে বেরোল, তখন আশপাশের অঞ্চলগুলিতে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠল। আচমকা এরকম একটা কান্ড কেন ঘটল তা কারো মাথায় এল না। সমুদ্রে ভূমিকম্প বা সাগরকম্প নতুন কথা নয়, কিন্তু তা এত ভয়ংকর রকমের হল কেন? সাগরের নীচে কোন নতুন আগ্নেয়গিরির জন্ম হল নাকি?

কয়েক দিনের মধ্যেই বিজ্ঞানীদের একটা দল ব্যাপারটা সরেজমিনে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য চলে এলেন ল্যান্ড্‌স্‌এন্ডে। নিকলসনের বাড়ীঘরদোর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আমরা একটা তাঁবু খাটিয়ে কোন রকমে দিন কাটাচ্ছি। এমন একটা বিপদের দিনে নিকলসনদের একলা ফেলে রেখে চলে যাওয়াটা খুবই অভদ্রতা হত, তাই আমিও ওখানে থেকে গিয়েছিলাম।

অবশ্য যে ল্যান্ড্‌স্‌এন্ডকে আমি আগে দেখে গেছি এর সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না। মৃত সামুদ্রিক প্রাণীর কংকালে সমুদ্রের ধারটা এখনও ছেয়ে আছে, আর তারই সঙ্গে মিশে-আছে নানান ধরনের উদ্ভট সব জিনিস। ওরই মধ্যে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম একটা ছোট্ট সাদা চৌকো বাক্স। বাক্সটি কি দিয়ে তৈরী জানি না, কেন না ওরকম অদ্ভুত ধবধবে সাদা জিনিস আমি কখনও দেখিনি। মার্বল পাথরের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও জিনিসটা তার চাইতে অনেক হাল্কা। আর, আশ্চর্য কান্ড, যেখানে সমস্ত জিনিস ভেঙ্গে থেঁতলে চুরমার হয়ে গেছে সেখানে এমন একটা বাক্স প্রায় আস্ত রয়ে গেল কি করে? শুধু ওর খানিকটা অংশ ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, খুব সূক্ষ্ম কতকগুলি ছিদ্র চোখে পড়ে, কিন্তু তার চেয়ে বেশী কিছু না।

অনুসন্ধানী দলে অনেক নামকরা বিজ্ঞানী এসে-ছিলেন। তাঁদের কারো কারো সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় ছিল। কয়েকজনের সঙ্গে নতুন করে আলাপ হল। ওঁরা অনেক খুঁটিনাটি পরীক্ষা করলেন কিন্তু মূল কারণ সম্বন্ধে তেমন কোন সূত্র আবিষ্কার করতে পারলেন না।

হঠাৎ আমার সেই সাদা বাক্সটার কথা মনে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি সেটা এনে এক তরুণ বিজ্ঞানীর হাতে দিলাম।

বাক্সটা দেখে তিনি প্রায় চমকে উঠলেন। একটু নেড়েচেড়ে বললেন, এ জিনিস আপনি কোথায় পেলেন? এ যে মনে হচ্ছে সুপার-রেডোনাইট! অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য জিনিস। এতদিন পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল, যে সব খনিজের মধ্যে বিন্দুমাত্র তেজস্ক্রিয়তা নেই কিংবা যে সব খনিজ রেডিও-অ্যাক্‌টিভ অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় পদার্থকে আটকে রাখে তাদের মধ্যে ডিউনাইট আর রেডোনাইটই সবচেয়ে শক্তিশালী। তারপর সুপার-রেডোনাইট আবিষ্কারের পর জানা গেল যে, এর শক্তি আরও বেশী। এ পর্যন্ত কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থই একে বিন্দুমাত্র ভেদ করতে পারেনি। অথচ, আশ্চর্য, এটাও দেখি ঝাঁঝরা হয়ে গেছে! কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য —এতটা সুপার-রেডোনাইট সংগ্রহ করে তা দিয়ে এমন একটা মজবুত বাক্স বানাল কে? এ তো যার তার কাজ নয়!

আমি বললাম, দরকার মনে করলে বাক্সটা আপনারা নিয়ে যেতে পারেন।

নিশ্চয়! নিশ্চয়!—আমার কথা লুফে নিয়ে ভদ্র-লোক অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে বাক্সটি হাতে তুলে নিলেন।

কথা প্রসঙ্গে আমি বললাম, আপনাদের দলের সঙ্গে আর একজন বিজ্ঞানী আসবেন আশা করেছিলাম। কিন্তু তাঁকে তো দেখতে পাচ্ছি না! প্রফেসর এক্স এলেন না?

—হ্যাঁ, তাঁরও তো আসবার কথা ছিল, কিন্তু আজ কয়েক দিন হল তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

—মস্তিষ্কবিকৃতি! অর্থাৎ পাগল হয়ে গিয়েছেন প্রফেসর এক্স?

—তাই তো মনে হচ্ছে।

এখানে একটু আগের ঘটনা বলা দরকার। প্রফেসর এক্স যে কোন মানুষের আসল নাম নয় এ তো সহজেই আন্দাজ করা যায়। এটি একটি ছদ্মনাম। অংক-শাস্ত্রে কোন না-জানা রাশিকে অনেক সময় এক্স অক্ষর দিয়ে বোঝানো হয়। এ লোকটিও নিজের নাম প্রকাশ করতে চান না বলেই লোকে ওঁর নাম দিয়েছে প্রফেসর এক্স। মহাকাশ-অভিযানে এ পর্যন্ত রাশিয়া আর আমেরিকা —এ দুটি দেশই সাফল্য লাভ করেছে বলে জানি, কিন্তু পৃথিবীর আরো কয়েকটা দেশও যে এ চেষ্টা চালাচ্ছিল সে খবর হয়তো অনেকেই রাখি না। এদের মধ্যে লাটিন আমেরিকার দু-একটি দেশও ছিল। এদেরই একটি দেশ, নামটা যখন গোপন রাখা হয়েছে তখন আমিও বলব না,—ধরা যাক্ তার নাম পাটাজোনা,—এ ব্যাপারে বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছিল। আর এই পাটাজোনারই সবচেয়ে পণ্ডিত লোক, যিনি এ ব্যাপারে আশ্চর্য বাহাদুরি দেখিয়েছিলেন,—তাঁরই নাম প্রফেসর এক্স।

মস্ত বড় বিজ্ঞানী এই প্রফেসর এক্স—অর্থাৎ যাঁর ছদ্মনাম এক্স। মহাকাশ-অভিযানে তিনি নিজে একাধিকবার অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে তাঁর অভিযানের উদ্দেশ্য ঠিক চন্দ্রবিজয় বা ঐ জাতের কিছু ছিল না। যতদূর জানি, তিনি ছিলেন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক আর কস্‌মিক্-রে—যার বাংলা করা হয়েছে নভোরশ্মি বা ব্যোমরশ্মি—তাই নিয়ে তাঁর গবেষণা বিজ্ঞানীমহলে বেশ সোরগোল তুলেছিল।

পাটাজোনার অভিযাত্রীরা ঠিক সোভিয়েট রাশিয়া বা আমেরিকার অভিযাত্রীদের মত মহাকাশ-অভিযানে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন বলে মনে হয় না, তবে মহাকাশে —পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল যতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে তারও ঊর্দ্ধলোকে তাঁরা উঠতে পেরেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর এই প্রফেসর এক্স ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন।

সেই প্রফেসর এক্স পাগল হয়ে গেলেন! কী এমন ব্যাপার ঘটল যে এমন একটা অবিশ্বাস্য সংবাদ বিশ্বাস করতে হবে?

দাম্বাবু এই পর্যন্ত বলে একটু চুপ করলেন। আমরা সবাই তখন দম বন্ধ করে গল্প শুনছিলাম। পকৌড়ি আর চায়ের কথা কারও মনেই নেই।

একটু দম নিয়ে দাম্বাবু আবার সুরু করলেনঃ

যাক্, এর কয়েকদিন পরেই আমি জুলে রিমে খেলা দেখতে চলে আসি, ফলে বেশ কিছুদিন আর নিকলসন বা ল্যান্ড্‌স্‌এন্ডের খোঁজ নেওয়া হয় নি। ইতিমধ্যে আমাকে একটা কাজে পাটাজোনার রাজধানীতে—ধরা যাক্ তার নাম উইলোস্টিক,—চলে আসতে হয়।

প্রফেসর এক্স-এর খবর নিয়ে শুনলাম ওঁর অবস্থার বিশেষ হেরফের হয়নি। রাতদিন ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকেন, আপন মনে ফিস্‌ফিস্ করেন আর মাঝে মাঝে আঁতকে উঠে দুহাত দিয়ে মাথা টিপে বসে থাকেন। যেন একটা ভীষণ বিপদের সঙ্কেত পেয়েছেন।

কেন এমনটা হল? এও যেন একটা রহস্যই রয়ে গেছে।

কিন্তু রহস্যের কিনারা যে শেষ পর্যন্ত হয়ে যাবে তা ভাবতে পারি নি, আর আমারও যে তার মধ্যে কিছুটা ভূমিকা থাকবে একথা কল্পনাও করি নি। কিন্তু তাই হয়ে গেল।

তোমরা তো ভাই জান, আমি লোকটা ভবঘুরে বাউণ্ডুলে গোছের হলেও একটু-আধটু পড়া-শোনার বাতিক আছে। বড় বড় বিজ্ঞ লোকদের বক্তৃতা শুনতেও ভালোবাসি। একদিন উইলোস্টিক ইউনিভার্সিটির পাশ দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ খেয়াল হল ভেতরটা একটু ঘুরে দেখে আসি। ভেতরে গিয়ে দেখি সামনের ল্যাবরেটরীতে কে একজন অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে কি পরীক্ষা করছেন। আমার দিকে চোখ পড়তেই বললেন, এ কি? আপনি! আশ্চর্য যোগাযোগ বলতে হবে। আপনার কথাই তো ক'দিন থেকে ভাবছি।

চিনতে পারলাম। সেই তরুণ বিজ্ঞানীটি যিনি আমার কাছ থেকে সুপার-রেডোনাইটের বাক্সটা চেয়ে নিয়েছিলেন।

বললেন,—আপনার সেই বাক্সটাই যে রহস্য সন্ধানে অমন সাহায্য করবে তা কে জানত! ল্যান্ড্‌স্‌এন্ডের সাগরকম্পের রহস্য প্রায় পনেরো আনাই উদ্ধার হয়ে গেছে। প্রফেসর এক্স সুস্থ থাকলে বাকিটাও এতদিনে হয়ে যেত।

—কি রকম? কি রকম?

তখন সেই বিজ্ঞানীটি, পরে জেনেছিলাম তাঁর নাম ডক্টর স্যান্টানা, বলতে সুরু করলেন ঃ

প্রফেসর এক্সই এই সাগরকম্পের জন্য প্রধানতঃ

দায়ী। অবশ্য স্বেচ্ছায় যে নয় তা নিশ্চয়ই বুঝেছেন। কিছুদিন থেকে প্রফেসর এক্স কস্‌মিক্‌-রে নিয়ে গবেষণা করছিলেন। এই কস্‌মিক্‌-রে'র ভিতরের ব্যাপার সবাই না জানলেও নাম প্রায় সকলেই জানে। দূর মহাকাশে এই তেজস্ক্রিয় রশ্মি যুগ যুগ ধরে সর্বক্ষণ ছুটে বেড়াচ্ছে—প্রচণ্ড বেগে আর প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে। সে শক্তি যে কত ভয়ঙ্কর তা আমরা কল্পনাই করতে পারি না। বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন এই কস্‌মিক্‌-রে দুরকম। এক, প্রাথমিক বা প্রাইমারী,—যা নাকি কেবল দূরে মহাকাশেই রয়েছে। আসলে সেগুলো মহাশূন্যে ছুটে বেড়ানো পরমাণুর একটা ভগ্নাংশ মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞানীরা পরমাণুর গঠনের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে বলে, পরমাণুর মাঝখানে আছে একটি ভারী অংশ—নিউক্লিয়াস, প্রোটন আর নিউট্রন দিয়ে যা তৈরী আর সেই নিউক্লিয়াসকে ঘিরে বিভিন্ন লাইন করে ঘুরছে ইলেক্‌ট্রনের দল। ঠিক যেমন সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে গ্রহের দল। এখন, এই পরমাণুর মধ্য থেকে যদি ইলেক্‌ট্রনগুলো ছিটকে বেরিয়ে যায় তা হলে পড়ে থাকবে শুধু নিউক্লিয়াস—গোটা পরমাণুর তুলনায় যা অসম্ভব ভারী আর বিদ্যুৎশক্তিতে ভরা। শুধু তাই নয়, তার মধ্যে যে প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে সে রকম শক্তি মানুষ আজও আয়ত্ত করতে পারে নি। প্রাথমিক বা প্রাইমারী কস্‌মিক্‌-রে হচ্ছে এই সব পরমাণু থেকে ইলেক্‌ট্রন ছাড়ানো তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস।

কিন্তু এই সব প্রাথমিক কস্‌মিক্‌-রে যখন বায়ুমণ্ডলের মধ্যে এসে পড়ে, তখন বাতাসের পরমাণুগুলোর সঙ্গে ধাক্কা লেগে তারা একেবারে বদলে যায়। তখন তাদেরকে বলা হয় মাধ্যমিক বা সেকেণ্ডারী কস্‌মিক্‌-রে। তখন আর এগুলি তত মারাত্মক থাকে না। বাতাসের পরমাণুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে তাদের শক্তি ও তেজস্ক্রিয় ভাবটা ক্রমেই প্রশমিত হতে থাকে; তারপর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে নামতে নামতে যখন সেগুলো পৃথিবীর মাটিতে এসে পড়ে তখন তদের তেজস্ক্রিয়তা একেবারেই কমে যায়।

মাধ্যমিক কস্‌মিক্‌-রে নিয়ে বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে অনেক গবেষণা করেছেন, কিন্তু মহাকাশের নভোরশ্মি বা কস্‌মিক্‌-রে নিয়ে তা করা তো আর সম্ভব নয়। তা করতে গেলে ওখানে গিয়ে তা করতে হবে, কেন না বায়ুমণ্ডলে নেমে এলেই তার ধাক্কায় ওদের চালচলন যাবে বদলে।

তাই প্রফেসর এক্স ভাবছিলেন কোন রকমে ওদের অক্ষত শরীরে পৃথিবীর মাটিতে ধরে আনা যায় কিনা।

তারপর যখন নিজে তিনি মহাকাশ-অভিযানে রওনা হলেন, তখন স্বভাবতঃই তাঁর মাথায় একটা মতলব এল। কস্‌মিক্‌-রে ভেদ করতে পারে না এমন একটা পদার্থের খোঁজ করতে করতে তাঁর সুপার-রেডোনাইটের কথা মনে পড়ল। বহু কষ্টে ঐ দুষ্প্রাপ্য জিনিসটার খানিকটা সংগ্রহ করে তিনি তা দিয়ে একটা বাক্স তৈরি করলেন যার মধ্যে কোন রকমে একমুখো ভাল্‌বের সাহায্যে খানিকটা প্রাইমারী কস্‌মিক্‌-রে ঢুকিয়ে নিতে পারলে তা আর বাক্সের দেয়াল ভেদ করে বেরুতে পারবে না। তারপর সেই বাক্স স্পেস্‌ স্যুটের পকেটে পুরে তিনি মহাকাশে পাড়ি দিলেন আর অদ্ভুত কৌশলে খানিকটা কস্‌মিক্‌-রে সেখান থেকে সংগ্রহ করে ঐ বাক্সে পুরে তাঁর স্পেস্‌ স্যুটের পকেটে ভরে ফেললেন। বলা বাহুল্য বাক্সে যে কস্‌মিক্‌-রে বন্দী হয়ে রইল তা প্রাথমিক রশ্মি—পৃথিবীর বুকে ও-জিনিস কখনও এর আগে অক্ষত দেহে প্রবেশ করেনি।

মহাকাশ থেকে ফিরবার সময় আর আর অভিযাত্রীদের মত প্রশান্ত মহাসাগরে না নেমে মেক্সিকো উপসাগরে নামা হবে এই রকম ব্যবস্থা ছিল। সম্ভবতঃ অভিযানের গোপনীয়তা রক্ষা করবার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ক্যাপসিউল যখন সত্যি মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে ফিরে মেক্সিকো উপসাগরের ওপর চলে এল তখন শেষ মুহূর্তে প্যারাসুট খুলে তাঁর নেমে পড়বার কথা। ঐ সময় বোধহয় তিনি কৌতূহল বা নিরাপত্তার জন্য সুপার-রেডোনাইটের বাক্সটি বার করে হাতে তুলে নিয়েছিলেন। তারপর যথাসময়ে প্যারাসুট খোলা হল, বাতাসে ভাসতে ভাসতে তা নামতে লাগল পৃথিবীর বুকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ঘটল একটা অঘটন। হঠাৎ সুরু হল প্রচণ্ড ঝড়, আর তারই দাপটে বাক্সটা তাঁর হাত থেকে ফস্‌কে পড়ে গেল। সমুদ্রের অতল তলে কোথায় যে সেটা তলিয়ে গেল তার আর খোঁজ পাওয়ার উপায় রইল না।

প্রফেসর এক্স অবশ্য প্রাণে বেঁচে গেলেন। নির্দিষ্ট জায়গা থেকে অনেক দূরে ভেসে গিয়েছিলেন তিনি। উদ্ধারকারীরা হেলিকপ্টার নিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করল তাঁকে। কিন্তু তখন থেকেই তিনি ভীষণ মন-মরা হয়ে রইলেন। এত কষ্ট করে ধরে আনা মহামূল্য কস্‌মিক্‌-রে কি সমুদ্রের তলাতেই হারিয়ে যাবে?

হারিয়ে গেলে কিছু ক্ষতি ছিল না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটল আরো অঘটন। সুপার-রেডোনাইট যতই ক্ষমতাশালী হোক শেষ পর্যন্ত কস্‌মিক্‌রে'র প্রচন্ড শক্তিকে সে ঠেকাতে পারল না। তাকে ঝাঁঝরার মত ফুটো করে দিয়ে সেই রশ্মি বেরিয়ে পড়ল মহাসমুদ্রের তলায়। অবশ্য বাক্সটার মধ্যে যে সামান্য বাতাস ছিল তার সংগে অনবরত ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ঐ রশ্মির তীব্রতা হয়তো অনেকখানিই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল; তবু যেটুকু ছিল তাই ঘটাল এক অঘটন। বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সে সৃষ্টি করল এক বিরাট সাগরকম্প। বাক্সটা হয়তো গড়াতে গড়াতে ল্যান্ড্‌স্‌-এন্ডের কাছেই কোথাও এসে পড়েছিল, তাই চোটটা পড়ল ঐ অঞ্চলেই। তার খানিকটা পরিচয় তো আপনি নিজেই পেয়েছেন। জাহাজ-ভর্তি মানুষ, অগুনতি সামুদ্রিক প্রাণী ধ্বংস করে, পাহাড় ধ্বসিয়ে, গোটা ল্যান্ড্‌স্‌এন্ড গ্রামটি ধূলিসাৎ করে তবে সে শান্ত হল।

প্রফেসর এক্স আগে থেকেই মন-মরা হয়ে ছিলেন। এ খবর যখন তাঁর কানে গেল, তখন আসল ব্যাপারটা আন্দাজ করতে তাঁর সময় লাগল না। মনে হয় সেই হল তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতির কারণ।

ডক্টর স্যান্টানা চুপ করলেন। কথাটা বিশ্বাস হচ্ছিল না, কিন্তু তিনি যখন যুক্তিতর্ক দিয়ে, কি করে ঐ তথ্য সংগ্রহ করেছেন, প্রফেসর এক্স-এর সহকারীদের জেরা করে কি জানতে পেরেছেন ইত্যাদি সব বুঝিয়ে দিলেন তখন আর অবিশ্বাসের কারণ রইল না। প্রফেসর এক্সকেও জেরা করে তিনি কিছু কিছু তথ্য পেয়েছিলেন, তবে তা ছিল অসংলগ্ন। তাতে জোড়া-তালি দিয়ে তাঁকে সিদ্ধান্তে আসতে হয়েছে। তবে প্রফেসর এক্স নাকি একটু একটু করে ভালো হয়ে আসছেন। তিনি সুস্থ হলে তাঁর মুখেই হয়তো বাকিটুকু পরিষ্কার হয়ে যাবে।

গল্প শেষ করে দাম্বাবু চুপ করলেন। পকৌড়ি ভাজা তখন জুড়িয়ে হিম হয়ে গেছে, চা জুড়িয়ে হয়ে গেছে সরবৎ।

• গল্পের যাদুঘরে •

যদি পাখি হতাম

বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিক কাউন্ট লিও তলস্তয়ের নাম কে না শুনেছে! রোজকার মত সেদিনও তলস্তয় লিখতে বসেছেন। লিখতে লিখতে হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল জানালার বাইরে। দেখলেন, একঝাঁক চঞ্চল পাখি সারিবদ্ধভাবে উড়ে চলেছে। তাদের কলকাকলীতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে।

উড়ন্ত পাখির ঝাঁক তলস্তয়কে আশ্চর্য আনন্দে মাতিয়ে তুলল। লেখা ফেলে তিনি ভাবতে লাগলেন, ঐ পাখিদের মত আকাশের অগাধ নীলিমায় ডানা মেলে তিনিও যদি উড়তে পারতেন! ভেবে ভেবে তাঁর মনে হল, তিনিও পারবেন উড়তে।

তাই একদিন চোখ বুজে তিনি দোতলার ঘরের জানালা থেকে হাত দুটোকে পাখির ডানার মত মেলে ধরে মারলেন এক লাফ!

ঝুপ্‌...............

ভাগ্যিস নিচে ফুলগাছটা ছিল। তার ডালপালায় কোট-প্যান্ট জড়িয়ে গেছল বলে রক্ষে। নইলে তলস্তয় আর তলস্তয় থাকতেন কিনা সন্দেহ। পাখি হয়ে উড়তে না পারলেও তাঁর প্রাণপাখী যেত উড়ে চিরদিনের মত!

তলস্তয় রুশ সাহিত্যের একজন দিকপাল লেখক। কেবলমাত্র রুশ সাহিত্য নয়, বিশ্ব-সাহিত্যের পাতায় তাঁর নাম সোনার অক্ষরে লেখা। তাঁর লেখা 'ওয়ার এন্ড পীস', 'আনা-কারেনিনা' প্রভৃতি বইগুলি বিশ্বসাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ।

১৮২৮ সালে ইয়াসনায়া পলিয়ানায় তলস্তয় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১০ সালের ২১শে নভেম্বর অষ্টাপাডোর রেলস্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী নিবাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

—বাউল দাশ

শক্তিপদ রাজগুরুর

মানুষের পরিচয়

বান এলে আমাদের ভালোই লাগতো! ময়ূরাক্ষীর বালুচর ডুবে গেরুয়া ঢল নামতো পাহাড় থেকে, দেশ-মুলুক ভাসিয়ে নদীর বাঁধ ভেঙে সারা অঞ্চল প্লাবিত করে দিতো। সবুজ ধান-ক্ষেত ডুবে যেতো—যতদূর চোখ যায় চকচক করতো শুধু জল আর জল। মাঠে কলকলিয়ে জল ছুটতো, মাঝে মাঝে এক-একটা গ্রাম যেন জলে ভাসছে। যাতায়াত বন্ধ।

মাঝে মাঝে আকাশ কালো করে মেঘ নামতো—শনশনিয়ে আসতো বৃষ্টি!

আশপাশের ডুবে যাওয়া গ্রামের মানুষ এসে ভিড় জমাতো আমাদের গ্রামে। কারণ আশপাশের গ্রামের মধ্যে আমাদের গ্রামটাই ছিল বড়। বাজার-হাট, ডাক্তার-খানা, হাইস্কুল, এটা সেটা ছিল। প্রায় আঠারো পাড়ার গ্রাম। ধ্বসে-যাওয়া জমিদারদের বাড়িগুলোর ভিতরে কি কতটুকু সারবস্তু টিকে ছিল জানি না। তবে ওই সব চকমিলানো বাড়ির আনাচে কানাচে তারা ঝড়ো কাকের মত এসে জুটতো আশ্রয়ের সন্ধানে।

স্কুলের ক্লাসও প্রায় বন্ধ হয়ে আসে এই সময়, ছেলেপুলেরা ক্লাসে আসবে কি করে এই বানের তোড় পার হয়ে ? আমাদের সেকেন্ড মাস্টার মশাই দল বেঁধে রিলিফের কাজে বের হতেন। ওরই মধ্যে একটু ভালো অবস্থায় টিকে থাকা গ্রাম-গ্রামান্তরে যেতাম, সঙ্গে খোল-করতাল আর লাল সালুতে লেখা বন্যাত্রাণ সমিতির পরিচয়। সেকেন্ড মাস্টার ভূপতিবাবুই শিখিয়ে দিয়েছিলেন গানটা, সেই গান গাইতাম বেসুরো বেতালা ছন্দে। গানের সুরে প্রীত হয়ে না হোক গোলমাল কলরব শুনে লোকজন বের হয়ে আসতো, আমাদের ঝুলিও ভরে উঠতো তাদের দানে।

চাল-ডাল-কাপড়চোপড়ও সংগৃহীত হতো এই ভাবে, ওই বানে-ভাসা লোকদের জন্য খিচুড়ির যোগাড় হয়ে যেতো।

সেবারও এমনি ঘটেছিল! অন্যান্যবারের তুলনায় বেশীই ছিল বানের তোড়। ময়ূরাক্ষীর বাঁধের মাটি-গুলোকে ওই হিংস্র নদী তার ধারালো জিভের সাপটে অতলে টেনে নিয়ে সবুজ ধানক্ষেতে ভরা গ্রামগুলোর বুকে হানা দিয়েছিল।

রাতের অন্ধকারে আর্তনাদ ওঠেঃ হুঁ-শি-য়া-র!... হুঁ-শি-য়া-র! ভয়ে রাতের পাখীগুলোও কলরব করে উঠেছিল। আকাশে বাতাসে ওঠে মত্ত জলধারার গর্জন।

দু'একদিনের মধ্যেই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বোঝা গেল। গ্রামের পথে ক্ষুধার্ত জনতার ভিড় বেড়ে গেল।

ভূপতিবাবু দলবল নিয়ে বন্যাত্রাণে বের হলেন। কোন দল গেল দূরের জলমগ্ন গ্রাম থেকে আটকে-পড়া মানুষের উদ্ধারে, কোন দল বের হল চাল-ডাল সংগ্রহের ঝুলি নিয়ে।

কম্পা আমাদের দলনেতা। তার একটা হাত-এর আঙুলগুলো নেই—লক্ষ্মীমন্ত ছেলে। কবে আখ-শালে আখ দিতে গিয়ে আখমাড়াই করা কলের মধ্যে তার বাঁ হাতটাই ঢুকে গেছল। ওই আঙুলগুলো চলে যায় তাতেই। অবশ্য বাঁ হাতের সেই দলামত মাংসপিণ্ডের শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় আমরা পেয়েছি। সবতাতেই চৌকস, কেবল পড়া ছাড়া। অবশ্য তার জন্যই এক এক ক্লাসে দু তিনবছর থেকে থেকে পোক্ত হয়ে উঠেছে।

সেকেন্ড মাস্টার মশাই বললেন, তোরা বরং শহরে যা। কান্দীতে। দেখ আদায়পত্র কি হয়।

আমরাও রাজী। হেডমাস্টার মশাই নিজেই স্কুলের প্যাডে পরিচয়-পত্র লিখে দিলেন। ভূপতিবাবু বললেন, পবিত্র সেবার কাজে যাচ্ছো, সেই কথাটা ভুলো না।

যাবো তো, কিন্তু যাওয়াই মুশকিল। এখান থেকে ছ'মাইল দূরে মহকুমা শহর। দুচারবার গেছি, তবু আমরা গ্রামের ছেলে, সেখানে গিয়ে চাঁদা-চাল-কাপড় ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে মনে করলেই কেমন যেন ঘাবড়ে যাই। কম্পা অভয় দেয়, ঘাবড়াচ্ছিস কেন'রে? চল্ তো, সব ঠিক হয়ে যাবে।

পথ বলতে মাটির কাঁচা সড়ক মত টিকে ছিল আগে থেকে। ধুলোয় হাঁটু ডুবে যায় অন্য সময়, সেই ধুলো

এখন কাদায় পরিণত হয়েছে। হাঁটুভোর কাদা। আর চারিদিকে বানের তোড়—মাঠে তখনও জল রয়েছে, চকচক করছে এদিক থেকে দূর দিগন্ত অবধি। তারই মাঝে কালো চিহ্নের মত ঢিবিগুলো জেগে আছে। আর পথের উপর দিয়ে জলস্রোত বয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে ভেঙ্গে গেছে সেই পথ—হাঁটুভোর কোমরভোর জলস্রোত চলেছে।

মাঝে একটা ছোট খাল। সেখানে এসে দেখি, সেই খাল এখন ছোটখাটো নদীতেই পরিণত হয়েছে।

কি হবে রে ?—আমাদের দলের সতে শুধোয়।

কম্পার বুকে অসীম সাহস, বলে, খোলটা মাথায় তুলে দে আমার ; সাঁতরে ওপারে রেখে আসি। তোরাও নেমে পড়্। দাঁড়া না, ববস্থা একটা হয়ে যাবে।

অর্থাৎ সাঁতরেই সেই জলস্রোত পার হতে হবে, ফেরার পথ নেই। তাছাড়া আমাদের যা হোক কিছু যোগাড় করে আনতেই হবে। অনেক বুভুক্ষু মুখ যেন চেয়ে আছে আমাদের দিকে। এটুকু দুঃখকষ্ট সইতেই হবে।

কম্পা ইতিমধ্যে দুটো কলাগাছ জুটিয়ে এনেছে পাশের জলেডোবা বাগান থেকে, তার উপরই খোল আর হারমোনিয়ামটা চাপাতে চাপাতে বলে, দেশের জন্য কতো ছেলে গুলিগোলা খাচ্ছে, ফাঁসিতে যাচ্ছে, আর তোরা এটুকু পারবি না ?

সতে আমাদের দলের মূল গায়েন। আন্ডারওয়ার পরে জামা-কাপড়টা মাথায় বাঁধতে বাঁধতে সে গেয়ে ওঠে দরাজ গলায়—

দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা, হুঁশিয়ার !

ওর দরাজ গলার সেই সুর আর ওই কথাগুলোই বোধহয় আমাদের মনেও সাহস আনে।

ঝপ্—ঝপাং !

এক একজন সেই স্রোতের মুখে লাফ দিয়ে পড়েছি, কম্পা সাঁতার কাটতে কাটতে বলে, ভেলাটাকে ঘিরে রাখ্ যেন ভেসে না যায়।

যন্ত্রপাতিগুলো ওর উপরই তুলে ঠেলে ঠেলে চলেছি

"ভিক্ষা দাও গো নগরবাসী......

আমরা। বেপরোয়া ছেলের দল পারের দিকে চলেছি এগিয়ে।

চড়চড়ে রোদ উঠেছে। পথের চিহ্নও মুছে গেছে জলের স্রোতে।

দড়াম্!

গুপী পিছল পথে ছিটকে পড়েছে। আমার অবস্থাও তেমনি—পা দুটো আসমানে, হাতও আকাশে তুলে ছিট্‌কে পড়লাম পথের ধারে ওই জলের মধ্যেই। কম্পা রেগে বলে উঠল, কাঁচের আলমারীতে তুলো দিয়ে মুড়ে রাখবো গিয়ে। কি র‍্যা তোরা? এ্যাই নবা—খোল সামলে!

হাঁটুভোর জল ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে নবা বলে, হ্যাঁ, তিন টাকার কেত্তন করতে গিয়ে পাঁচ টাকার খোল না ভাঙ্গে শেষমেষ!

কম্পা গর্জন করে, মাথা ভাঙ্গবো তোর!

চড়চড়ে রোদে ওই জলকাদা ভেঙ্গে আমরা ক্লান্ত পরিশ্রান্ত কটি ছেলে দুর্বার আশা নিয়ে শহরের দিকে এগিয়ে চলি। দূরে নারকেল গাছে ঘেরা বড় বড় দালান-গুলো চোখে পড়ে।

কাঁচা রাস্তার এই কাদাও ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে। আশাভরে আমরা এগিয়ে চলি। পিছনে পড়ে রইল বন্যাবিধ্বস্ত পল্লীঅঞ্চল আর তার মানুষগুলো। সামনে পূর্ণতার রাজ্য, ওখানে আছে প্রাচুর্য আর সম্পদ। মনে মনে ভাবি, আমাদের ভিক্ষার ঝুলি উপচে পড়বে ওদের দানে।

বৈকালের আলো হলুদ হয়ে আসছে। খোয়াঢাকা পথে ছায়া নামে। সামনেই বড় বড় বাড়িগুলো গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। লোকজনের ভিড় জমে সেখানে।

ইতিমধ্যে আমরা তৈরী হয়ে আসরে নেমে পড়েছি। কঞ্চির মাথায় দুদিকে বাঁধা লাল সালুর ফেস্টুন। আগে আগে দুজন কাপড়ের খুঁট ধরে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে চলেছে, পিছনেই সতের ভরাট গলায় গান:

"ভিক্ষা দাও গো নগরবাসী
ভিখারী এসেছে দুয়ারে।
যাহা দিবে তাই হাসিমুখে নিব
আর্ত স্বদেশবাসীরে সেবিব
বন্যাপ্লাবিত কাঁদে কত শত
ভাসিছে অকূল পাথারে!"

ভূপতিবাবুর নিজের লেখা এ গান, তাঁরই সুর। আমরাও সতের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তারস্বরে চীৎকার করে গাইছি। পায়ে কাদা, চুলগুলো উস্কোখুস্কো, খালি পা। আমরাই বুঝি বন্যাপীড়িতদের মূর্তিমান সংস্করণে পরিণত হয়েছি!

ফুলপ্যান্ট কালো কোট মোজা জুতোপরা উকিল-বাবুদের দল মোক্তারের পাল চেয়ে দেখলেন মাত্র, ওঁদের সামনে গিয়ে হাজির হতে ওদের একজন বলে ওঠেন, পারমিশান নিয়েছো তোমরা? কোর্ট এরিয়াতে এসেছো।

কম্পা ওঁদের দিকে চাইল। তারপর নিচু গলায় বলল, উকিল কিনা, তাই আইন দেখাচ্ছে! ঠিক আছে।

আমরা তখনও গান গেয়ে চলেছি। গ্রামাঞ্চল থেকে যারা এসেছিল তাদেরই দানে আমাদের ভিক্ষাপাত্র ভরে উঠছে। কাছারি ছাড়িয়ে শহরের ভিতরের পথ দিয়ে চলেছি। সন্ধ্যা নামছে। বড় বড় বাড়িগুলোর গায়ে আবছা ছায়ান্ধকার জমেছে। পথে পথে জনতার ভিড়।

গৃহস্থ ঘরের বৌ-মেয়েরা আমাদের ভিক্ষাপাত্রে ঢেলে দেয় চাল। কেউ এগিয়ে দেয় কাপড়-জামা-শাড়ি। আমাদের বুক ভরে ওঠে। মনে হয়, মানুষের দুঃখে বিপদে এগিয়ে আসে মানুষ, শুধু সেই আবেদনটুকু পৌঁছে দিতে হবে আন্তরিকতার সুরে।

জল খাবে বাবা?

একটি বয়স্কা যেন জানতে পেরেছে আমাদের তৃষ্ণার কথা। এতটা পথ ভেঙে এসেছি, এই চীৎকার করেছি পথে পথে। ততক্ষণে এক বালতি জল-গ্লাস আর এক বাটি গুড়ও এসে গেছে। আকণ্ঠ তৃষ্ণায় জল গিলে চলেছি। বুড়ি আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

কোন্ ক্লাসে পড়ো তুমি?

জবাব দিই, ক্লাস টেন-এ। ও পড়ে নাইন এ, এবার ফার্স্ট হয়েছে ও।

বুড়ি একে একে শুধোয় আমাদের খবর, তোমার বাবা তো ডাক্তার বললে না?

ঘাড় নাড়ি।

আর তোমার বাবা?

গুপী জবাব দেয়. কাপড়ের কারবার আছে বাজারে।

বেঁচে থাকো বাবারা! শুনছি তো ওদিকে খুব বান। আমার মেয়ের বাড়ি কাশীপুর। তার জন্যে ভাবছি—

ওখানে খুব ক্ষতি হয় নি। আমাদের ছেলেরা গেছল কাল।—আমি বলি।

বুড়ি শুনে আশ্বস্ত হয়। বাড়ি থেকে চাল, কাপড়-চোপড় এনে দেয় একরাশ। খুশী হয়ে বলে, ওদের

দিও বাবা। বেঁচে থাকো তোমরা। সোনার দোয়াত কলম হোক।

সন্ধ্যা নামছে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে এইবার আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরছি। সঙ্গে চালের পুঁটুলি হয়ে গেছে দুটো, কাপড়-চোপড়-এর গাদাও রয়েছে। এইবার সত্যিই মনে হচ্ছে, আমরা ক্লান্ত, বিশ্রামের দরকার আমাদের।

কম্পা বলে, এই রকেই থাক্ তোরা। আর কার পকেটে কি আছে বের কর্।

মিলিয়ে দেখা গেল কুল্লে তিন টাকা মত রয়েছে। কম্পা বলে, মুড়ি আর বাতাসা নিয়ে আয়। ওই দিয়েই রাত কাটাতে হবে।

কাল?—ওকে শুধোই।

—কালকের কথা কাল ভাববি।

আশ্রয় নেই, খাবারও নেই। সঙ্গে যা রয়েছে তা ভিক্ষালব্ধ এবং সেই ক্ষুধার্ত বন্যাপীড়িতদের জন্য। ওর থেকে এক দানাও গ্রহণ করার অধিকার আমাদের নেই। কম্পা বলে, কতো লোকের এমনি অবস্থা হয়েছে, কি খাবে তার ঠিক নেই। একরাত একদিন তেমনি থাকতে পারবি না তোরা? এক্কেবারে লবাব হয়ে গেছিস, না?

কম্পার মুখ অমনিই। গুপী জবাব দেয় ঠিক আছে বাবা। তাই হবে। তা তুই চললি কোথায়?

কম্পা বলে, একবার হাকিম সাহেবের বাংলোতে যাবো। ওর একটা চিঠি হলে উকিলদের থেকে হয়তো কিছু টাকা উঠবে। বুঝলি, ওই উকিল টুকিলগুলো আবার আইনের কথা বলে কিনা! দেখি ওদের মুরোদটা।

আমরা তিন জনে বের হয়েছি হাকিম নামক প্রভুর দরবারের দিকে। এস. ডি. ও. সাহেব নেই। এখন ফার্স্ট মুনসেফই সর্বেসর্বা। খুঁজে খুঁজে কাছারির ওদিকে মাঠের মধ্যে ওঁর বাংলোতেই গেলাম। একটা খালের ধারে পাঁচিল-ঘেরা দোতলা বাড়ি। সামনে বাগান মত, তাতে শাকসবজি গাছগাছালি লাগানো হয়েছে। বারান্দায় হাকিম সাহেব তাবড় তাবড় উকিল মোসাহেব পরিবৃত হয়ে খোশগল্প করছেন। মুনসেফ সাহেবের গলাই তখন শোনা যাচ্ছে। লাউ-এর গুণবর্ণনা করছেন তিনি। সামনের মাচায় লকলকে লাউ গাছে কয়েকটা লাউও ঝুলছে দেখলাম। গদগদ চিত্তে সকলে মুনসেফ সাহেবের কথা শুনছে। একজন সায় দিয়ে ওঠেন, যা বলেছেন স্যার। লাউ-এর মত পুষ্টিকর খাদ্য আর নেই। তাও যদি আবার বাংলোর লাউ হয়—

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মোটামত একজন উকিল বলে, সেদিন আপনার গাছের লাউ নিয়ে গেলাম, খেয়ে ইস্তক মনে হচ্ছে, দেহে মত্ত হাতির বল এসে গেছে স্যার! ডাক্তারবাবু তো অবাক।

মুনসেফবাবু গোঁফের ফাঁকে মৃদু মৃদু হাসছেন তাঁর গাছের লাউ-এর গুণ শুনে। এমন সময় আমাদের তিনজনকে ওই বিচিত্র পলিমাটিচিত্রিত পোশাকে ঝোড়ো কাকের মত ঢুকতে দেখে, তাঁর হাসি অন্তর্হিত হল। বিরক্তি ভরে চাইলেন তিনি। পারমিশান নেবার কথা বলেছিলেন যিনি, সেই উকিলও রয়েছেন দেখলাম, লাউ খেয়ে ওঁরই দেহে মত্ত হাতির বল এসেছে। আমাদের দেখে খ্যাঁক্ করে ওঠেন তিনি, কি চাই? এখানে কেন? কাছারিতে যাবে।

কম্পা পকেট থেকে আধভেজা দলাপাকানো হেড-মাস্টার মশাই-এর লেখা চিঠিখানা এগিয়ে দিয়ে বললে, আমরা পাঁচগাঁ স্কুলের ছাত্র, ফ্লাড রিলিফের জন্য বের হয়েছি কিছু সংগ্রহ করতে। আপনি যদি স্যার একটু বলে দেন কাছারিতে, কিছু টাকা পেতে পারি।

মুনসেফবাবুর ঝুঁরো গোঁফ শুয়োরের রোমের মত সিধে হয়ে উঠেছে, হাকিমী মেজাজ নিয়ে গম্ভীর স্বরে তিনি বলেন, তোমরাই যে সেই ছাত্র, তা কি করে জানবো? আজকাল তো এমন আকচার হচ্ছে।

উকিলরা মুখিয়ে ছিলেন, ওঁদের মাথাগুলো নড়ে ওঠে। একজন বলেন, ঠিক কথা বলেছেন স্যার। আইনের কথা।

অতঃপর সেই 'মত্তহস্তী' উকিলবাবুই পরামর্শ দেন, কাল কোর্টে একটা এফিডেবিট করিয়ে নাও, পাঁচ টাকা খরচা দিও, করে দেব।

তাতে কত টাকা চাঁদা পাবো?—আমি জিজ্ঞাসা করি।

—তা জানি না। তবে তখন আইনবলে চাঁদা আদায় করতে পারবে। নইলে এখন তোমরা বেআইনী কার্য করছো। সেকসন—

থামুন!—কম্পা চটে ওটে, আপুনি কিছু লিখে দেবেন না স্যার? আপনার এলাকায় এসব হলো, আপনারাও তো দেখবেন।

খুব যে লম্বা লম্বা কথা বলছো ছোকরা!—ধমকে ওঠেন আর একজন।

কম্পা ব্যাপার বুঝতে পেরে হুজুরের হাত থেকে চিঠিখানা টেনে নিয়ে বলে, চল্‌রে। যত্তো সব—

হয়তো আরও কিছু বলত, তবু যাহোক সামলে নিয়ে কম্পা বেরিয়ে আসে। গজগজ করতে থাকে, আইন! ভারি সব লাটসাহেব রে? বানের জল গায়ে লাগে নি কিনা তাই এতো ডাঁট!

পেছনে উকিল মোক্তারের দল আর সেই লাউসেবী উকিল তখন তড়পাচ্ছেন, বাঁদর ছেলেরা! হাজতে পুরতে হয় ওদের। আপনি স্যার একবার হুকুম দিন, টাইট করে দিচ্ছি ওদের।

যে কোন কারণেই হোক সেটা আর হয়ে উঠল না। তবু আমরাও বিস্মিত হয়েছি লেখাপড়া জানা শহুরে মাতব্বরদের এই ব্যবহারে। কম্পা বলে, ওরা কি দেবে? দিয়েছে সাধারণ মানুষ। তারাই দেবে, ঘাবড়াস না। ওসব হল ফোকটিয়া গিরিধারীর দল!

আদায় আমাদের মন্দ হয় নি। শহরের একটা মহল্লাতে ঘুরে যা পেয়েছি, তা অনেক। রাশীকৃত চাল-জামা-কাপড়-এর স্তূপগুলো পাহারা দিয়ে রাতে সেই ফাঁকা চত্বরে বসে আছি। ক্ষিদের কথাও ভুলে গেছি। চাট্টি মুড়ি-বাতাসা কোন কালে হজম হয়ে গেছে। অন্ধকারে আমরা কটি প্রাণী রাতের প্রহর জেগে বসে আছি। আকাশে মেঘ জমেছে—এলোমেলো হাওয়া বয়।

বৃষ্টি আসবে নাকি রে?—আমি শুধাই।

কম্পা অভয় দেয়—সমুদ্রে শয়ন যার, শিশিরে কি ভয় তার? কাত মেরে শুয়ে পড়্।

রাত কতো জানি না। হঠাৎ একটা ধস্তাধস্তির শব্দে চমকে উঠলাম। সকলেই জেগে গেছি। কম্পা কাকে যেন সাপটে ধরেছে।

চোর!

লোকটা রাতের অন্ধকারে আমাদের ওই চালের একটা পুঁটুলি নিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ও ভাবেনি—একটা ছেলে ওকে এমনি কায়দা করে কাল ফাঁস দিয়ে ধরে ফেলবে।

আলো নেই। তারাগুলোও ডুবে গেছে। আবছা অন্ধকারে লোকটা অনুনয় করছে, ছেড়ে দ্যান বাবু!

দহে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব।

হেই বাবু!—লোকটা অনুনয়-বিনয় করে, ডুবে যাবো! ছেড়ে দ্যান!

উঠবস্ কর্। কান ধরে উঠবস্ কর্ পঞ্চাশ-বার, তবে ছাড়া পাবি।

প্রাণের দায়ে লোকটা কান ধরে উঠবস্ সুরু করে। আমরা ঘিরে আছি আর সে কান ধরে উঠবস্ করছে —এক, দুই তিন—

হল না।—কম্পা সহসা গর্জে ওঠে, ভালো করে বস্। পনেরো হয় নি—ব্যাটা ভুল গুনছে। আবার এক থেকে সুরু কর্। সুরু কর্—মারবো এক রদ্দা!

কম্পার বাঁ হাতের থাবড়া খেয়ে লোকটা আবার এক থেকে সুরু করে। এমন শাস্তি সে কদাপিও ভোগ করে নি। ঘেমে নেয়ে উঠেছে, হাঁপাচ্ছে, তবু উঠবস্-এর বিরাম নেই, ততক্ষণে ঘন্টা কাবার হয়ে গেছে।

সকাল থেকেই পরিক্রমা সুরু হয় আবার। সহরের পথে পথে ঘুরে চলেছি। সংগ্রহের মাত্রা দেখে খুশীতে উপছে উঠি। সাধারণ মানুষ দিয়েছে আশাতীতভাবে।

দুপুর হয়ে আসছে। কাল থেকে খাওয়া নেই, খিদে-তেষ্টার জ্বালাটা এইবার টের পাই। পয়সাও নেই যে কিনে খাবো।

ঘন্টা বাজছে। সামনেই একটা আশ্রম। মন্দিরে পুজো হচ্ছে। কি ভেবে কম্পা এগিয়ে যায়।

বেশ বিরাট এলাকা জুড়ে মন্দির-বাগান। আশ্রমে বাবাজীরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁদেরই মধ্যে একজন মাতব্বরগোছের সন্ন্যাসী এগিয়ে আসেন। কম্পা বলে কথাটা। পকেট থেকে সেই চিঠিখানা বের করে দেয়।

যদি আমাদের কয়েকজন ছেলেকে দুপুরে খাবার ব্যবস্থা করে দেন, বড় ভালো হয়।

আমাদের দিকে চাইলেন তিনি। কি ভেবে বলেন, ঠিক আছে। দশজনকে প্রসাদ দেবার কথা বলে দিই?

এতটা আশা করি নি আমরা। প্রায় সকলেরই হয়ে গেল খাবার ব্যবস্থা। বাকী রইলাম আমরা দু-জন। কম্পা আর আমি।

আশ্রমের মন্দিরে দেখা যায় ঘৃতসিক্ত পীতাভ অন্নপ্রসাদ—গন্ধরাজ লেবুর সুগন্ধ উঠছে। সোনা রঙের মুগের ডাল, তরিতরকারি, পরমান্ন! দেখেশুনে ক্ষিদেটা চাগিয়ে উঠছে।

কম্পা বলে, চল্, তোর আমার ব্যবস্থা দেখিগে এইবার। তোরা খেয়ে দেয়ে কাছারির ওখানে যাবি। বৈকালে ফিরতে হবে মালপত্র নিয়ে।

দুজনে বের হলাম সহরের পথে—উদ্দেশ্য নিজে-দের আহার্য সংগ্রহ করা।

এই কাজটাই বিশ্রী লাগে। কম্পা বলে, চল্, ওই সিংহীবাবুদের বাড়িতেই যাই।

বিরাট চকমিলানো বাড়ি। ওপাশে নিত্যসেবার বিগ্রহ-মন্দির। এপাশে দেউড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। দারোয়ান বাধা দেয়—কাঁহা যায়ে গা?

কাছারিতে।—কম্পা জবাব দেয়।

কাছারিতে বোধহয় কোন কাজ আছে ভেবে দারোয়ানজী আর বাধা দেয় না, আমরা এগিয়ে গেলাম। সামনে বাগানে পাতাবাহার গাছগুলো মাথা নাড়ছে। ওপাশে কাছারি। কয়েকজন কর্মচারী লাল খেরো-বাঁধানো খাতায় হিসাব লিখছে। আমাদের দিকে চাইল। কম্পা 'বাবুর সঙ্গে দেখা করব' বলায় ঘরটা একজন দেখিয়ে দিল।

সুন্দর সাজানো ঘরটা। মাথার উপর টানা পাখার ঝালর নড়ছে মৃদু মৃদু টানে। বাবু তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আছেন, মুখে ফরসির নল, তা থেকে খাস বালাখানা তামাকের খোশবু উঠছে। গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবি, হাতের আঙুলগুলোয় ঝকঝক করছে চুনী পান্না হীরে—আরও কত কি পাথরের বড় বড় আংটি। আমাদের দিকে বিরক্তিভরে চাইলেন। সুগোল মুখ-খানায় যেন রাজ্যের ঘৃণা আর কাঠিন্য, মেঘমন্দ্রস্বরে জিজ্ঞেস করেন, কি চাই?

কম্পা পকেট থেকে একমাত্র সম্বল সেই চিঠিখানা এগিয়ে দিল। হুজুর সেই ময়লা কাদামাখা কাগজখানা ছুঁতেও ঘৃণা বোধ করছেন দেখে কম্পা বলে ওঠে, ফ্লাড রিলিফের জন্য চাঁদা তুলতে এসেছিলাম স্কুল থেকে, আমাদের দুজনকে যদি দুপুরে খাবার ব্যবস্থা করে দেন—

কথাটা অসমাপ্ত থেকে যায়, জমিদারবাবু বোমা ফাটার মত শব্দ করে প্রশ্ন করেন, কদ্দিন চলছে এই ধাপ্পাবাজী?

চমকে উঠি। কম্পাও অবাক হয়—কি বলছেন স্যার!

ঠিকই বলছি। যাও—যাও এখান থেকে। ভিক্ষে করতে লজ্জা করে না? ইয়ং ম্যান, খেটে খাও গে। ভিক্ষে!

জবাব দিই, ভিক্ষে করতেই এসেছি, কিন্তু নিজেদের জন্য নয়।

দারোয়ান! শ্যামসিং!—হুজুরের গোল মুখখানা হুলো বেড়ালের মত হয়ে উঠেছে রাগে। হুঙ্কার ছাড়েন তিনি, চাবুকে শায়েস্তা করতে পারি জানো ছোকরা? মুখের উপর কথা! ভিখিরীর আবার মেজাজ!

দারোয়ান ততক্ষণে এসে পড়েছে। কম্পা করে কি, ফস করে পিঠের জামাটা তুলে ফেলে রুখে দাঁড়ায়—চাবকান! রাস্তার মানুষের কাছে যাই নি, যার আছে তার কাছেই এসেছিলাম। ভুলই করেছি। চল্ রে সন্তু!

বের হয়ে এলাম জমিদারবাবুর মুখের উপর কথা-গুলো ছুঁড়ে দিয়ে। রাগে অপমানে চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে। বলি, না খেয়ে একটা বেলা থাকবো কম্পা, এভাবে আর নয়!

কম্পা রাগে গজগজ করছে—বড়লোক! ইতর কোথাকার!

দুপুরের রোদে এগিয়ে আসছি। হঠাৎ পিছন পিছন কাকে আসতে দেখে দাঁড়ালাম। দেখি, একটি ভদ্রলোক আমাদের ডাকছেন। পাতলা ছিপছিপে চেহারা, পরনে ঘরে কাচা একটা ধুতি আর আধা রঙ-ওঠা পাঞ্জাবি। মনে পড়ল, এঁকেই জমিদারবাবুর কাছারিতে বসে খেরো-বাঁধানো খাতায় যোগ দিতে দেখেছিলাম।

বলি, কম্পা, ওই জমিদারবাবু আবার ডাকতে পাঠিয়েছে রে?

কম্পা ফোঁস করে ওঠে, ওর কেনা গোলাম নাকি যে ডাকলেই যেতে হবে? জমিদার! ঢের দেখেছি অমন ট্যাঁকখালির জমিদার!

ভদ্রলোক বললেন, বাবু ডাকেন নি, আমিই তোমাদের ডাকছিলাম ভাই।

ওঁর কণ্ঠস্বরে কি একটু রয়েছে—যাতে চটে উঠতে পারি না। কম্পা বলে, কেন, বাকীটুকু এইবার আপনাকে দিয়ে সারাবেন তিনি?

ভদ্রলোক হাসলেন, না না। ওঁদের কথা ছেড়ে দাও ভাই, বলবার মুখ যখন আছে, তখন যা তা বললেও চলে, ভাবেন ওঁরা। আমি বলছিলাম তোমরা আমার বাড়িতেই চলো—

কম্পা জবাব দেয়, কোথাও আর যাবো না মশাই, একবেলা দিঘির জল খেয়ে কাটিয়ে বাড়ি ফিরে যাবো। ওতে কিসসু হবে না। চল্ রে সন্তু—

ভদ্রলোক আমার দিকে চাইলেন, ওঁর চোখে অসহায় কাতর ভাব ফুটে উঠেছে। বলেন, আমি খুবই গরীব, তবু অভুক্ত তোমাদের ফিরিয়ে দিলাম একথাটা মনে পড়বে আর আমাকেও আজ দুপুরে অভুক্ত থাকতে হবে।

একটু আগেকার একজনের সেই নিদারুণ অপমানে জ্বলে উঠেছিলাম, মনে হয়েছিল, এখানের মানুষ সবাই কেমন অন্যরকম। লেখাপড়াজানা উকিলের দল হৃদয়-হীন নিষ্ঠুর, ধনী জমিদাররাও তাই। কিন্তু তবু

মানুষ কোথাও রয়ে গেছে।

যাবে না ভাই?

উনি বলছেন, চল্ কম্পা। খাস না খাস—যেতে হবে।—আমি বলি।

তাই বল ভাই। এই রোদে পথে পথে কেন ঘুরবে? কাল বৈকাল থেকেই তো ঘুরছো।—ভদ্রলোক বললেন, তোমাদের দলকে পথে কাছারিতে আমি কালই দেখেছি। ভালো লেগেছিল মানুষের দুঃখে এই সাড়া দেওয়া-টুকু। সাবাস দিয়েছিলাম মনে মনে!

এগিয়ে চলেছি!

কলাগাছ আর মালতীলতায় ঘেরা ছোট্ট একটি বাড়ি। ছায়ার স্নিগ্ধতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা বকুলগাছ। মিষ্টি গন্ধভরা এ বাতাস। চালে উঠেছে সবুজ চালকুমড়োর লতা, হলুদ হলুদ ফুল ফুটেছে। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কোথায় উদাস সুরে দু একটা পাখী ডাকছে।

মা!

ভদ্রলোক ডাকতে দরজা খুলে বের হয়ে এলেন বর্ষীয়সী একটি মহিলা, তাঁর পরনে লালপাড় শাড়ি, পাকা চুলে সিঁদুরের আভা, স্নিগ্ধ সুন্দর পবিত্র একটি মূর্তি। আমাদের দেখে কতো পরিচিতের মত ডাকেন, এসো বাবা।

ভদ্রলোক পরিচয় করিয়ে দেন, আমার মা। আর এরা পাঁচ গাঁয়ের স্কুলের ছাত্র, বন্যার্তদের জন্য এসেছে এখানে। আজ আমাদের অতিথি এরা।

বৃদ্ধাকে প্রণাম করতে ইচ্ছা হয়। প্রণাম করতে তিনি বলেন, থাক-থাক বাবা। বসো। দেখেছিলাম বটে তোমাদের কালকে। স্নান টান করো বাবা। ওরে খোকা, এদের স্নানের ব্যবস্থা করে দে। গরীবের বাড়িতে এসেছো, কতো ভাগ্যি আমার!

সামান্য আয়োজন। অথচ কি বিরাট একটি অন্তরকে দেখেছিলাম সেদিন। আজও এতদিন পরেও সেটা স্মরণে আসে। আজ মনে হয়, সেদিন ওখানে না গেলে বুঝি ভুলই করতাম।

দুজনকে দেবার মত থালাও নেই, কলাপাতায় মোটা লাল চালের ভাত, লাউ শাক-এর ঘন্ট আর চাল-কুমড়োর তরকারি। ক্ষিদের মুখে তাই যেন অমৃত। আমরা খাচ্ছি আর অদূরে আমাদের সামনে বসে আছেন সেই মহিলা।

আর একটু তরকারি দিই খোকা?

না—না।

গরীবের বাড়ি। কতো ভাগ্যি আমার তোমরা এলে!

আন্তরিকতার স্পর্শে ওই সামান্য আয়োজন কি যে তৃপ্তিকর হয়ে উঠেছিল তা লিখে বোঝানো যায় না।

আসবার সময় প্রণাম করে বলি, আসি আমরা।

ভদ্রমহিলা বলেন, এসো বাবা। এদিকে এলে আসবে কিন্তু।

মাথা নাড়লাম।

সেদিন বিজয়গর্বে উৎফুল্ল হয়ে সহর থেকে ভারি ভারি চালের আর কাপড়ের বোঝা নিয়ে ফিরেছিলাম। কিন্তু সে সব ছাড়া পেয়েছিলাম আরও কিছু যার মূল্য হয় না।

বহুদিন কেটে গেছে। জীবনে অনেক লোক এসেছে, গেছে। তবু মনে পড়ে অন্ধকারের বুকে স্মৃতির আলোয় একটি স্নেহময়ী মুখ—একটি অতি সাধারণ মানুষ আর সেই দিনের কলাপাতায় মোটা লাল চালের ভাত আর অতি সামান্য একটু তরকারি।

বহু রাজভোগের তুলনায় তা অনেক বেশী সুস্বাদু, আন্তরিকতার চিরন্তন মধুর ছোঁয়ায় আজও তা আমার মনে অক্ষয় স্মৃতিতে পরিণত হয়ে আছে। মনে হয়, ভালোবাসা-প্রীতি আর আন্তরিকতা নিয়েই মানুষ, ওইটুকুই তার সত্যিকার পরিচয়। মানুষকে তাই ভোলা যায় না।

জিরাফ

অমিয়কুমার চক্রবর্তী

নেমন্তন্নয় যারা এসেছিল সবাই চলে গেল সন্ধ্যার একটু পরে। এবার খুকু তার রঙের বাক্স নিয়ে বসেছে। তন্ময় হয়ে সে রঙের পরে রঙ চড়িয়ে চলেছে,—খাতার রং যা হয়েছে তা রামধনুকেও হার মানায়। বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, গণ্ডার, সাপ, ময়ূর, সাদা বাঘ,—সব কিছুই তার খাতায় চরে বেড়াচ্ছে। আর, কারুর উপরেই কোন রঙের অভাব নেই।

এইটুকু মাত্র দুঃখ খুকুর যে, অতগুলো উপহারের জিনিস মা সব আলমারির উপরের তাকে তুলে রেখেছেন, বলেছেন কাল সকালে পেড়ে দেবেন। খুকু তখন রঙের বাক্স নিয়ে মেতে ছিল, আপত্তি করে নি তাই। এখন তার খুব ইচ্ছে হচ্ছে সেগুলো একটু দেখে ভাল করে। মাকে বলতে মা তাকে কোলে নিয়ে খুব আদর করলেন, তারপর চুমু খেয়ে বললেন, 'থাক না আজ, একদিনেই কেন সবগুলো পুরোনো করে ফেলবি! বেশ ছবি আঁকছিস, তাই আঁক না!'

খুকু আর আপত্তি করল না বটে, কিন্তু কথাটা তার ঠিক মনের মত হল না। অন্য মনে ছবি আঁকতে আঁকতে হঠাৎ একটা চমৎকার মতলব তার মাথায় খেলে গেল।

চিড়িয়াখানায় খুকু জিরাফ দেখতে পায় নি, কিন্তু দাদুর কাছে শুনেছে, ছবিতেও দেখেছে। তাদের গায়ের রং আর গড়ন অনেকটা জেব্রার মত, আর, কে না জানে, তারা ইচ্ছে করলে গলাটা যত খুশি লম্বা করে দিতে পারে। এবার সে একটা জিরাফ আঁকতে বসল। ব্যস, হয়ে গেল আঁকা। জিরাফটার পা থেকে পিঠ অবধি ইঞ্চিতিনেক, আর গলাটা সারা পাতা জুড়ে।

ওঃ, কী ভালই না হয়েছে জিরাফটা! তাড়াতাড়ি দিদিকে ডেকে দেখাল। দিদির সঙ্গে সঙ্গে দাদাও

খুকুর জন্মদিনে খুকু কত যে জিনিস পেয়েছে তা গুণে শেষ করা যায় না। জামা জুতো ছবির বই খেলনা তো অজস্র পেয়েছেই, তাছাড়া দিদার দেওয়া লাল টুকটুকে শাড়িটা, আর প্রদীপ দাদার দেওয়া রঙের বাক্সটা যে তার কী ভাল লেগেছে! কী যে চমৎকার রঙের বাক্সটা, চৌকো চৌকো খোলে কত যে রঙ সেখানে!

জন্মদিন সত্যি কী যে মজার! সকলের কাছে কত আদর আর ভালবাসা! লালটুকটুকে শাড়িটা পরে আর সবচেয়ে রঙচঙে ফিতেটা মাথায় বেঁধে খুকু যখন ময়ূর-আঁকা আসনে আয়েস করে পায়েস খেতে বসল, দিদি বলে উঠল, 'ও বাবা! খুকু তো নয়, যেন অচিন দেশের রাজকন্যা!'

এসে হাজির। দাদাটা যেন কী! দিদি তো অত বড়, সে পর্যন্ত বলল খুব ভাল হয়েছে, তবু দাদাটা ঠোঁট উল্টে বলল, 'দূর কিচ্ছু হয়নি!'

খুকু বলল, 'যা যাঃ, হয়নি তো হয়নি! তুমি আমার রঙের বাক্সে হাত দিতে এস না,—খাইয়ে দেব!'

এবার খুকু দাদুকে ডেকে তার জিরাফটা দেখাল। দাদু পর্যন্ত খুব প্রশংসা করলেন।

কাটল কিছুক্ষণ। এবার দাদু ঘরে একা। পা টিপে টিপে খুকু গেল দাদুর ঘরে। পড়বার ঘর থেকে দিদির আর দাদার পড়ার শব্দ আসছে, মা আর দিদিভাই কাজে ব্যস্ত। এই সুযোগ!

'দাদু, দাদু, তুমি তো অনেক কল তৈরি করেছ, আমায় একটা কল তৈরি করে দেবে দাদু?'

'কী কল রে?'

'আমি যে জিরাফটা এঁকেছি না, একটা কল করে দেবে যাতে সেটা হাঁটতে পারে?'

'কেন রে, কী হবে হাঁটতে পারলে?'

'সে আমি বলব না!'

'কেন বলবি না?'

'তুমি মাকে বলে দেবে!'

'না না, বলব না। বল্ তুই। তুই তো আমায় চুপি চুপি কত কথা বলিস, সব কি আমি তোর মাকে বলে দিই?'

'আচ্ছা। ও দাদু, মা তো আমার সমস্ত পেরাইজ ওপরের তাকে রেখে দিয়েছে, জিরাফটা বেশ গলা বাড়িয়ে সেগুলো পেড়ে দেবে! আমি একটুও ভাঙব না দাদু, তোমার ঘরে বসে খেলা করব!'

'এই কথা! তা বেশ। কিন্তু একটা কাজ করতে হবে। তুই এখন পড়বার ঘরে যা, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমি যতক্ষণ না ডাকছি ততক্ষণ কিন্তু এ ঘরে আসবি না। তাহলেই সব নষ্ট হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা।' জিরাফের ছবিটা দাদুর কাছে রেখে খুকু নাচতে নাচতে চলে গেল।

মিনিটকয়েক পরে দাদুর ডাক শুনে খুকু এসে দেখে,—যত উপহার সে পেয়েছে সে সমস্তই ঘরের মেঝেয় থরে-থরে সাজানো। সঙ্গে সঙ্গে সে হাততালি দিয়ে উঠল। বলল, 'দাদু, দাদু, জিরাফটা কোথায় গেল গো এগুলো পেড়ে দিয়ে?'

দাদু বললেন, 'তার কাজ হয়ে গেছে, তাই সে চলে গেছে। ওরা যে কাজের লোক, সময় নষ্ট করে কি?'

'যাঃ, কক্ষনো চলে যায় নি? ও তো আমার জিরাফ, কোথায় আবার চলে যাবে শুনি?' বলতে বলতেই দাদুর খাটের উপর তার খাতায় আঁকা জিরাফের ছবিটা খুকুর চোখে পড়ল। বলে উঠল, 'কী মিথ্যুক! এই তো আমার জিরাফ!' একটা সন্দেহ মনে হতেই ও তখন যে ঘরে খেলনাগুলো ছিল সেখানে গেল। দেখল, আলমারিটার ঠিক নিচেই একটা চেয়ার রয়েছে।

আর খুকুর কোন সন্দেহ রইল না। ছুটতে ছুটতে দাদুর ঘরে এল সে। দু-হাতে দাদুর গলা জড়িয়ে ধরে, চোখ নাচিয়ে দুষ্টুমি-মাখা গলায় বলল, 'দাদু, দাদু, আমি না, জিরাফ বানান করতে পারি!'

'কর্ দিকিনি!'

'করব? দ-য়ে আকার, আর দ-য়ে হস্‌সউ!'

• সংবাদ-বিচিত্রা •

মানুষ মারার খরচ

বিশ্বের ধনভাণ্ডারে মালিক হয়ে যাঁরা বসেছেন, তাঁরা মানুষের বাঁচবার মত খরচ দেবার কথা উঠলেই অর্থের অভাব প্রভৃতির নানারকম অজুহাত দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু মানুষ মারার জন্য যুগে যুগে কত খরচ করা হয়েছে, সে সব হিসাব দেখলে তাঁরা চমকে উঠবেন না তো?

জুলিয়াস সিজারের সময় যুদ্ধে প্রতিটি লোক মারার গড়পড়তা খরচের হার ছিল তিন শিলিং। নেপোলিয়নের সময় এই খরচ দাঁড়ায় মাথাপিছু ছয়শো পাউণ্ডের মত।

আর, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রতিটি লোক মারতে খরচ হয়েছে চার হাজার দুশো পাউণ্ড। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কত খরচ হয়েছে, জান? মাথাপিছু দশ হাজার পাউণ্ড!

এর সামান্য একটা অংশও যদি মানুষের বাঁচার জন্য খরচ করা হতো, তাহলে আজকের দুনিয়ার রূপ সম্পূর্ণ পালটে যেত—নয় কি?

● প্রদীপকুমার রায় ●

প্রথম দৃশ্য

[ব্যোম ভোলানাথ শিবের বাড়ী
কৈলাস পর্বত,
উঠোনে তাঁর পুকুরভরা
সিদ্ধির শরবত।
পেছন দিকের মাঠটি জুড়ে
সাতটি গাঁজার গাদা,
খড়ের মতন বিরাট বিরাট
পালুই করে বাঁধা।
ববম্ ববম্ গাল বাজিয়ে
আছেন বেজায় সুখে,
কলকে এবং গেলাসটা তাঁর
লেগেই আছে মুখে।
গাঁজার ঝোঁকে সেদিন সাজেন
বাঞ্ছাকল্পতরু,
বলবো, খুলে কাণ্ডখানা
করছি গল্প সুরু।]

নন্দী ও ভৃঙ্গী। এই আমাদের পাগলা ভোলা,
আসল মহাদেব গো;
শীতকালে গা উদোম খোলা,
নেই কাঁথা নেই লেপ গো!
গালটি বাজান ববম্ ববম্,
কলকেটি সেজে দেন তাতে দম,
ট্যাঁকেই গাঁজার প্যাকেট তোলা,
নেই জামা, নেই জেব গো;
এই আমাদের পাগলা ভোলা
আসল মহাদেব গো।
গাঁজার ধোঁয়ায় হচ্ছে ফেঁপে
দিব্যি ভুঁড়ির 'শেপ' গো,
ইঞ্চি ধরে দিচ্ছি মেপে
একটা আনুন 'টেপ' গো।
ভুঁড়ির মতই দিলটা দরাজ,
মনের মধ্যে নেই কোন ভাঁজ,
বলছি কথা চাঁচাছোলা,
নইতো মোসাহেব গো—
এই আমাদের পাগলা ভোলা
আসল মহাদেব গো!

মহাদেব। চড়ে বিশাল দামড়া গরু
আজ হয়েছি কল্পতরু,
দিয়েই দেবো আমার কাছে চাইবে যা,
মাংস, পোলাও, মাছ-পাতুড়ি,
ঘিয়ের লুচি, টাটকা পুরি,
বগি থালায় সাজিয়ে নিয়ে খাইবে যা।
বাইসাইকেল দুচারখানা,
ল্যাম্ব্রেটা বা স্কুটারখানা,
রাস্তা ধরে ফটফটিয়ে ধাইবে যা,
ঘর সাজাবার টেবিল চেয়ার,
রেডিওগ্রাম কি রেকর্ড-প্লেয়ার
পাড়াপড়শীর ঘুম তাড়িয়ে গাইবে যা।
[জবর খবর ছড়িয়ে গেল
আকাশ পাতাল জুড়ে,
ভনভনিয়ে হাজার মাছি
পড়ল যেন গুড়ে।]

হৈহয়। তোড়জোড় করেই এলেম
শ্রীচরণ দেখতে বাবার
ভক্তি নেইকো ব্যাটার
কুলোকে বলবে আবার।
এগিয়ে দাও পাগুলো
নিয়ে নি একটু ধুলো,

দেখতেই এলেম শুধু
বরটর নেই চাইবার।
তুমি তো ছাড়বে নাকো,
বলবে, ডেঁপো ছোঁড়া,
জ্ঞান নেই গুরু-লঘুর,
ধরাকে দেখছে সরা।
নেহাতই ছাড়বে নাকো?
তা হলে ওদের ডাকো,
এনে দিক ভাঁড়ার থেকে
গোটা দশ টাকার ঘড়া।

মহাদেব। আচ্ছা, আচ্ছা,
বর দেবো সাঁচ্চা,
দশ ঘড়া টাকা তুই
নিয়ে যারে বাচ্চা।

কুম্ভকর্ণ। জাতে রাক্ষস, উচ্চবর্ণ;
অধীনের নাম কুম্ভকর্ণ,
ধারি নে কো ধার টাকা পয়সার,
কেই বা গরীব, টাকা আছে কার,
কে খাতক কেবা উত্তমর্ণ।
চাই নে রৌপ্য, চাই নে স্বর্ণ;
মণি-মুক্তা কি হীরা-সুবর্ণ।
ঘুম দিতে চাই সব কাজ ফেলে,
পাকী দুই সের সর্ষের তেলে
মর্দন করে নাসিকা-কর্ণ।

মহাদেব। আচ্ছা, আচ্ছা,
বর দেবো সাঁচ্চা,
ফিরে গিয়ে ছয় মাস
নিদ যাও বাচ্চা।
[এলেন এবার ধূম্রলোচন
পাতালপুরে ধাম,
ডান্ডা-মারা ভক্ত তিনি,
দেশ জুড়ে তাঁর নাম।]

ধূম্রলোচন। বাবা গো, ও ভোলানাথ,
পেন্নাম নাও গো আমার,
শুনে সব এলেম ছুটে,
ঠিক নেই জুতো-জামার।
হোঁতকা ঝাঁকড়াচুলো,
যত সব পড়শীগুলো,
পিছে মোর আছেই লেগে,
ব্যাটারা বড়োই চামার,
উঁচু নাক দাও চেপটে,
গুঁতো দাও নাকে ঝামার।

মহাদেব। কি চাও, কি চাও, খুলে বলো ওহে বৎস,
মুখটা করেছ কেন এমন বীভৎস!
পড়শী জব্দ করা কি এমন শক্ত?
নরমের যম ওরা শক্তের ভক্ত।
ভুঁড়িদাস কালোকোলো, তোমার যা চেহারা,
চিনবে না যদি সাজো পালকির বেহারা!
ব্যাটাদের বেশ করে জাপিয়ে ও জাপিয়ে
ধরাধরি করে দেবে পালকিতে চাপিয়ে।
ঘাড়ে করে নিয়ে ফেলে গঙ্গার গর্ভে,
শেষকালে বেশ করে চেপেচুপে ধরবে।
হাঁক পাঁক করে ওরা কিছু খাবি খাইয়া
চক্ষু উলটে যাবে অক্কাটি পাইয়া।

ধূম্রলোচন। পালকি জুড়লে ঘাড়ে বড়োই যাতনা হবে,
দেহটা করবে শুধু আইটাই,
এমন এক বর দাও যাতে করে টিট হয়
একসাথে চুনো আর চাঁইটাই।
হাতের তালুতে দাও বিদ্যুৎ লাগিয়ে
কারো মুন্ডুতে ছুঁলে এই হাত,
চট্ করে শক্ লেগে বেগুন পোড়ার মত
পুড়ে যেন হয় ব্যাটা চিৎপাত।

মহাদেব। তাই হল রে, তাই হল।
মুন্ডুতে হাত পড়বে যারই
দেখবি পুড়ে ছাই হল।
পয়সা কড়ি, ঘর কি বাড়ী,
তোর কপালে নাই হল;
আকাশের ঐ বজ্রের আজ
তোর তালুতেই ঠাঁই হল।
[বরটা পেয়েই ধূম্রলোচন
হলেন দিশেহারা,
করতে পরখ তাঁর ক্ষমতা
সবায় করেন তাড়া।
নন্দী এবং ভৃঙ্গী, দু-জন
মহাদেবের চেলা,
ভাবছে মনে, থাকবো, না কি
পালাবো এই বেলা!]

নন্দী। আরে, আরে, ওকি, ওকি!
ও ব্যাটা ক্ষেপলো কি?
কি ভেবে মনে মনেই,
ও এগোয় শনৈঃ শনৈঃ?

ভৃঙ্গী। এ হল ভ্যালা বালাই,
চল ভাই, পালাই পালাই!

ধূম্রলোচন। ওরে, ওরে, নন্দী,
তোরে করে বন্দী,
মুন্ডুতে মেরে চড়,
যাচাই করবো বর;

পাছে ঠকে যাই, তাই
এ'টেছি এ ফন্দী!
দূরে সরে না গিয়ে,
মাথাটা দে আগিয়ে;
পুড়ে মরে স্বর্গে
চট করে চড়্ গে;
কাঁচিয়ে দিসনে মোর
এই অভিসন্ধি।

নন্দী। ওরে, মোর মগজটা,
এতই কি সস্তা?
তোর হাতে তুলে দেবো
শুনে তোর ধাপ্পা!
বাড়াসনি হাতটা,
দেবো এক গাঁট্টা;
আসিসনি কাছে তুই
দিতে গুলগাপ্পা।
দেখাইয়া রম্ভা
দেবো আজ লম্বা,
যে দিকে দু চোখ যায়
গেয়ে 'লারেলাপ্পা'।

ধূম্রলোচন। ঐ ব্যাটা নন্দীটা বড়ো বর্বর,
কাছে পেলে শেখাতাম মেরে এক চড়;
বসে বসে ভৃঙ্গীটা কাঁপে থরথর;
ছুঁই ওর মুণ্ডুটা হয়ে তৎপর।
পরখ করেই দেখি শিবের এ বর
সাঁচ্চা, না আছে তাতে কিছু গড়বড়।

ভৃঙ্গী। বুকটা কাঁপছে ত্রাসে
ব্যাটা যে এগিয়ে আসে
বাবার কাছে নালিশ করে
দেখিয়ে দেবো মজা;
থাম্ তুই, ঐ খানে থাক্,
নইলে তাক করে টাক
পাটকেল ছুঁড়েই মাথা
ফাটিয়ে দেবো সোজা!
ও বাবা, থামছে না যে,
লাফিয়ে আসছে কাছে,
আমার সাধের মুণ্ডুখানার
নয় কিছু কম দাম;
বেয়াড়া বরটা দিয়ে
মহাদেব মরুক গিয়ে,
বাঁচলে নিজে তারপরে তো
থাকবে বাপের নাম।
[নন্দী দিল চম্পট আর
ভৃঙ্গী দিল লম্বা,
ধূম্রলোচন হাতে হাতেই
পেলেন অষ্টরম্ভা।
খানিক ভেবে মহাদেবকেই
করল এবার তাক,
ভাবলে, ছোঁবে তাঁরই মাথা
যা-ই কপালে থাক।
হকচকিয়ে হেঁচকি তোলেন
এইবারে ব্যোম্‌ভোলা;
বুঝতে পেলেন বরটি দিয়েই
জল করেছেন ঘোলা।]

মহাদেব। এ দেখি বিষম বালাই,
ওরে বাপ, পালাই, পালাই,
ঠেকাবে আর কে ওকে,
চললাম বিষ্ণুলোকে;
হায়রে বুদ্ধিদোষে
গেল প্রাণ শেষ বয়সে;
কেন যে গাঁজার ঝোঁকে
এই বর দিলেম ওকে!
ব্যাটা ঠিক করবে ঘায়েল;
ঘণ্টায় আশী মাইল
যদি না ছুটতে পারি,
যাবো আজ যমের বাড়ী।

ধূম্রলোচন। শুনছো ও ভোলানাথ,
রাস্তায় একটু দাঁড়াও;
ফটাফট লম্ফ ঝেড়ে
ছাড়লে দেখছি পাড়াও।
লোকে কয় যাচাই করে
সওদা কিনবে সবে,
দিয়ে বর পরখ করার
'চান্‌স্' তো দিতেই হবে।
যদি আজ দৌড়ে বেড়াও
বাইরে মাঠে ঘাটে,
ছড়াবে নিন্দে দেশে,
ব্যবসাই উঠবে লাটে।

মহাদেব। ও বাবা, ধূম্রলোচন,
ভুঁড়িটার বেজায় ওজন
দেহটাও বেজায় ভারী
কতো আর ছুটতে পারি?
ভোগাবি মিছিমিছি,
লোকে যে করবে ছিছি।
ছড়াবে অনেক কথা,
নেই তোর কৃতজ্ঞতা।
ছেড়ে দে, ধরছি পায়ে,
পড়বি খুনের দায়ে।

শেষে যে টাঙিয়ে বাঁশে
ঝোলাবে তোকেই ফাঁসে।

ধূম্রলোচন। জানি নে ওসব কথা,
ছেড়ে ঘর পালাও কোথা?
জব্দ করবো তোমায়
থোঁতা মুখ করবো ভোঁতা।
যেখানেই লুকোও গিয়ে,
থানা কি হাসপাতালে,
পাহাড়ে আর সাগরে
স্বর্গে আর পাতালে।
তোমাকে পাকড়ে ধরে
করে চিত পাড়বো ভুঁয়ে,
বরটা করবো পরখ
তোমারি মুণ্ডু ছুঁয়ে।
[ঝুলছে কাছা খুলছে কোঁচা
ছোটেন ভোলানাথ,

পেছন পেছন ধূম্রলোচন
ছুটছে তুলে হাত।
ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপণে শিব
ছোটেন রাত্রিদিন,
ভয়ের ঠেলায় কাঁপছে পিলে
ব্যাপারটা সঙ্গীন
কৈলাস আর বিষ্ণুপুরী
লক্ষ যোজন দূর
ছোটেন তবু প্রাণের দায়ে,
পায়ে ঘোড়ার খুর।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ধূম্রলোচন শিবের পিছে
করল যখন তাড়া,
বিষ্ণুলোকে নারদ তখন
হচ্ছে ঘেমে সারা।
বাহন ঢেঁকি ভেঙে নারদ
বেজায় দিশেহারা;
বিষ্ণু করেন গালমন্দ,
কাঁপছে গোটা পাড়া।]

নারদ। ব্যাপার শুনুন শ্রীহরি,
বলুন এখন কি করি,
বিপদ আমার বলছি খুলে আপনাকে;
গিয়েছিলেম বাংলাতে
চাকরী আমার সামলাতে;
মাইনে-কড়ির করে না আর ভাবনা কে?
আমায় দেখে গুণ্ডাকুল
ছুড়লো বেজায় পাওয়ারফুল
একটা বোমা আমার দিকে তাক করে,
চমকে উঠে দেখি যে
আমার সাধের ঢেঁকি যে,
দিয়েছে তা একেবারে ফাঁক করে।
দেখুন গোলোকবিহারী,
বিপদ হল কি ভারী,
কেমন করে যাবো বিদেশ সফরে;
ব্যাপারটা খুব জরুরী
কদিন না হয় গরুড়ই
বয়ে বেড়াক আপনার এই নফরে।

গরুড়। বুঝেছ নারদ খুড়ো,
হয়েছি বেজায় বুড়ো;
তোমার বিরাট ঐ লাশটা

কাঁধে যদি চাপে মোর
ভেঙে যাবে হাড়গোড়
হাঁসফাঁস করবে যে প্রাণটা!
দয়া করে ক্ষ্যামা দাও,
ব্রহ্মার কাছে যাও
তাঁর কাছে চেয়ে নাও হাঁসটা;
নয় সূর্যের ঘোড়া
নিয়ে নিও একজোড়া,
তা দিয়ে চালাও এই মাসটা।

বিষ্ণু। হঠাৎ তুমি চড়লে পিঠে
গরুড় আমার ভড়কাবে;
হড়কে গিয়ে পাখনা ভেঙে
হাসপাতালের খড় খাবে।
ভাঙলে ঢেঁকি রাত্তিরে রোজ
ধান ভেনে চাল 'ব্ল্যাক' করে,
নরক থেকে পুলিশ ডেকে
দিই ধরিয়ে ক্যাঁক করে?
পুলিশ যখন পিটবে তোমায়
কেমন করে আটকাবে?
ধাপ্পা দেওয়া বেরিয়ে যাবে
যখন মাথায় চাঁট খাবে।

গরুড়। ধর্ তো চেপে নারদে
রাখ্‌তো পুরে গারদে,
ওর দাড়িতে শীঘ্র ছেড়ে
পিঁপড়ে গোটা বারো দে;

ঝুলছে বাসা বোলতারও
বাঁধনগুলো খোল্ তারও
নামিয়ে এনে ওর জটাতে
গণ্ডা কয়েক তারও দে।

নারদ। হায়রে তোমার কান ভাঙালো
এমন করে আজকে কে?
সত্যি বেজায় অবাক হলেম
মিথ্যুকটার কাজ দেখে।
কেমন করে ভাবলে আমি
নামতে পারি এই নীচে?
দিব্যি গেলে বলছি তোমায়
শুনছো যা, তার সব মিছে।
এই কি আমার বিচার হল
ডিউটী দিয়ে রাত জেগে?
মরবে মুখে রক্ত উঠে
ব্রহ্মতেজের তাত লেগে।

বিষ্ণু। দেখছি বসে নারদ তোমার
বেয়াদবি চাল-চলন;
বাচাল এবং বেচাল হয়ে
করছো বড়োই আস্ফালন!
চালচুলো তো নেই কো তোমার
চালাচ্ছো স্রেফ বোলচালে,—
দেখতে কি চাও বিষ্ণুদূতে
কেমন মাথায় ঘোল ঢালে?
বেচাল হয়ে চাল চেলো না,
বন্ধ করো দাবার চাল;
নইলে যাবে চাকরী তোমার
জুটবে না আর খাবার চাল।
বাসটি তোমার তুলবো জেনো
তোমার ভিটের চাল কেটে;
ঘরের মধ্যে কুমিরটাকে
ঢুকিয়ো না আর খাল কেটে!

[বিষ্ণুলোকে নারদ যখন
খুব পড়েছেন মুশকিলে,
ধূম্রলোচন তাড়িয়ে আনে
মহেশ্বরকে খুশ দিলে।
তিন দেবতার কপালে আজ
কি ছিল যে হায় লেখা,
পথের মাঝে শিবের সাথে
ব্রহ্মার তাই হয় দেখা।
ধূম্রলোচন করলো শেষে
শিবকে ছেড়ে তাঁয় তাড়া;
প্রাণের দায়ে তিনিও ছোটেন
ছাড়তে বুঝি হয় পাড়া।]

ব্রহ্মা। ঐ রে ব্যাটা আসছে তেড়ে,
দাঁড়াও, দাঁড়াও, হাঁকটা ছেড়ে,
ধরতে পেলেই ফেলবে পেড়ে,
ছোঁবেই মাথায় হাত দিয়ে।
যতোই বোঝাই, যতোই কাঁদি,
পাগড়ি যতো বড়োই বাঁধি
ছোঁবেই আমার মাথার চাঁদি
শিবের মাথা বাদ দিয়ে।
কাজ তো শিবের সৃষ্টিছাড়া,
বরটি দিলেন এমনিধারা,
তার ঠেলাতেই ছাড়েন পাড়া
ছোটেন হরির ঘর পানে;
যেই পড়েছি ব্যাটার চোখে
কার ক্ষমতা রুখবে ওকে
শিবকে ছেড়ে নতুন ঝোঁকে
তেড়ে এলো মোর টানে!

শিব। দিয়ে বর একি বিপদ
মলছি যে নাক-কানটা,
প্রাণপণ দৌড়ে এবার
করে ধড়ফড় প্রাণটা;
ছুটলাম যোজন যোজন,
তবুও ধূম্রলোচন
সমানে আসছে তেড়ে
ভয়ে জান হয় ঠাণ্ডা।
পায় ধরি বিষ্ণু তোমার
ছেড়ে দাও রাম বাণটা।
[আসছে তেড়ে ধূম্রলোচন
ঠিক পেছনে তাঁর,
জোঁকের মতন আছেই লেগে
নাইকো রেহাই আর।]

ধূম্রলোচন। দাঁড়াও, দাঁড়াও শিব,
ছুটে বার হল জিব,
তুমি তো লোকটা দেখি সোজা নও!
বুঝে গেছি ঘোঁতঘাঁত,
দৌড়ে আমার হাত
ছাড়াবে এমন তুমি ওঝা নও।
ব্রহ্মা ঠাকুর দাদা
আমায় ভেবেছে হাঁদা,
বোঝেনি তো কতো ধানে কতো চাল;
শিবুদাকে ফেলে রেখে
দেবো ওঁরই মাথা সেঁকে,
চালাকি চলবে আর কতো কাল!

ব্রহ্মা। শুনছো ওহে বিষ্ণুঠাকুর
ধূম্রলোচন বলছে কি?

চ্যাটাং চ্যাটাং বাক্যি তোমার
কানের ফুটোয় গলছে কি?
এক্ষুণি দাও জোরসে ছুঁড়ে
চক্র তোমার সুদর্শন
এক ঘায়ে দাও উড়িয়ে মাথা
দাঁড়িয়ে দেখুক মানুষজন।
পিঁপড়ের যবে পাখনা গজায়
ঘনিয়ে আসে তার সময়,
চুকিয়ে ফেলো ল্যাঠা, বাজে
চারটে, এখন চা'র সময়।

বিষ্ণু। থামরে ব্যাটা ধূম্রলোচন
দেখিস বুঝে নিজের ওজন;
শিব করেছেন বড়ই পেয়ার
তাইতো তাঁকে নেইকো কেয়ার!
সরল ব্রহ্মা ঠাকুরদাদায়
অকারণেই ফেললি ধাঁধায়?
তুই বেয়াদব বড়ই পাজি,
দেখাই দাঁড়া ভেল্কিবাজি;
বাড় বেড়েছে বেজায় রে তোর,
যাচ্ছি এবার বাড়ীর ভেতর।
মটকা থেকে চক্র পেড়ে
ঘুরিয়ে নিয়ে আসবো তেড়ে।
মুণ্ডু ঘাড়ে কয়টি আঁটা?
সবগুলো আজ পড়বে কাটা।

ধূম্রলোচন। ঘরের ভেতর যাবার আগেই
বোঝার আগেই অকস্মাৎ
চড়াৎ করে রাখবো দাদা
তোমার মাথায় আমার হাত।
শিবের বরও পরখ হবে
ছেড়েও যাবে তোমার ধাত।
কুমড়ো গড়ান গড়িয়ে তুমি
এবার হবে ভস্মসাৎ!

বিষ্ণু। এগিয়ে এসো ওগো লক্ষ্মী,
ডাকো আমার দেহরক্ষী,
বচন শুনেই পিঁজরা ছেড়ে
পালায় বুঝি প্রাণপক্ষী।
হোঁতকা হাঁদা ব্যাটা দত্যি,
নেই ভয় ডর এক রত্তি,
রোগা পট্‌কা দেহে আমার
সয় কি এখন এত ঝক্কি?
[রান্না ফেলে ভেতর থেকে
বেরিয়ে এলেন লক্ষ্মী,
ব্যাপার দেখে হতভম্ব;
রাক্ষসটার রোখ কি!!]

লক্ষ্মী। ও শ্রীহরি, এ এলো ফের কোথ্‌থেকে!
পাতাল থেকে পাঠালে এই
পোড়ারমুখো দৈত্যে কে?
রূপ দেখে ওর ভির্মি লাগে,
ভূত ছাড়ানোর ওঝাও ভাগে;
আঁতকে উঠে বিষম খাবে
বাচ্চা-বুড়ো প্রত্যেকে।
দাঁত খিঁচিয়ে হঠাৎ যদি
ঘরের দিকে যায় তেড়ে,
মটকা থেকে চক্রখানা
ফট্‌ করে ও নেয় পেড়ে,—
সবাই তখন অক্কা পাবে,
মুণ্ডু কেটে রক্ত খাবে;
ভালোয় ভালোয় বিদেয় করো
খোঁচায় ওকে মরতে কে?

ধূম্রলোচন। সন্তান আমি তোর, শোন্‌ মাগো লক্ষ্মী;
অকারণে আমি আর সই কতো ঝক্কি?
মিছে কথা কই যদি মুখে হবে কুষ্ঠ;
সাধনায় মহাদেব হয়ে খুব তুষ্ট
বর দেন যদি কারো মাথা করি স্পর্শ
অমনি সে মানুষটা পুড়ে হবে ভস্ম।
পরখ করতে চাই মুণ্ডুটা ছুঁয়ে তার,—
অমনি পালায় শিব জামাজুতো থুয়ে তার।
প্রস্তাব যেই দেওয়া, পিতামহ ব্রহ্মা,
জোর পায়ে এইদিকে দিয়েছেন লম্বা।
কথাগুলো না শুনেই প্রতিবাদী পক্ষের,
বিষ্ণু দেখান ভয় চকচকে চক্রের!
বলে দে আমায় তুই, এই মোর ভিক্ষা,
কার মাথা ছুঁয়ে করি বরটা পরীক্ষা।

লক্ষ্মী। সমাধান দিচ্ছি করে,
এর আর সমস্যা কি?
না করতে পারলে হতেম
সকলের নমস্যা কি?
বরটা শিবের পরের মাথায়
পরখের সর্ত জুড়ে।
মিছিমিছি দৌড়ে বেড়াস
পাতাল আর মর্ত ঢুঁড়ে।
কাঁধে তোর নিজের মাথাই
আছে তোর হাতের কাছে।

ভুলে তা ছুটিস মিছে
দুনিয়ার লোকের পাছে।
এখুনি হাতটা মাথায়
দিলে তোর কাটবে ধোঁকা;
বরটাও পরখ হবে,
মহাদেবও বনবে বোকা।

ধূম্রলোচন। অবাক হয়ে আমার নিজের
দেখছি মা আক্কেল শুধু!
থাকলে মাথা পরীক্ষাতে
হতেম কি আর ফেল শুধু?
হাতের কাছে, হায় বিধাতা,
থাকতে আমার নিজের মাথা,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের পায়ে
দিচ্ছি কিনা তেল শুধু!
ধরবো এবার সোজা সড়ক
নিজের মাথাই করবো পরখ,
দাঁড়িয়ে থেকে নিজের চোখেই
দেখুন আমার খেল শুধু।

বিষ্ণু। কাণ্ড দেখে চক্ষুচড়ক—
করছে নিজের মাথাই পরখ;
সব্বনেশে বরটা শিবের
এবার বুঝি লাগায় মড়ক।

ব্রহ্মা। গোলমেলে ঐ হোঁতকা ব্যাটার
আজগুবী চালচলন তো;
নিজের মাথায় হাত দিল আর
অমনি মাথা জ্বলন্ত!!

বিষ্ণু। ছাড়ছে জ্বর দিচ্ছে ঘাম,
প্রাণটা রামের নিচ্ছে নাম,
ভাগ্যে ছিল লক্ষ্মী ঘরে,
নইলে হত তুলকালাম!
[নিজের মাথায় হাত ঠেকাতেই
ধূম্রলোচন ছাই;
এক মিনিটের মধ্যে তাহার
টিকির দেখাও নাই।
রক্ষা পেয়ে হাঁফ ছাড়লেন
এবার ভোলানাথ,
বুক ফুলিয়ে ছাড়েন তিনি
লম্বা লম্বা বাত।]

শিব। অনেকটা পথ ছুটতে আমার
ত্রিশূলখানা হারিয়ে গেছে,
নইলে কি আর রক্ষা পেতো?
ভাগ্যে ছিল, গেল বেঁচে।
এগিয়ে এলে আর একটা পা,
মনে মনেই ছিলেম এঁচে,
একচড়ে ওর ঘুরিয়ে মাথা
মতলবটা দিতেম কেঁচে।

নারদ। ঢেঁকি আমার থাকলে গোটা,
মুণ্ডুটা ওর দিতেম ছেঁচে,
নস্যি দিতাম ঢুকিয়ে নাকে,
ফ্যাঁচফেঁচিয়ে মরতো হেঁচে।
পুড়িয়ে খাবার জন্যে ওকে
হাড়িপাড়ায় দিতেম বেচে,
নিজের হাতে নিজেই মোলো,
তাইতে গেল বেজায় বেঁচে!

লক্ষ্মী। দেখতে মজা লাগছে খুবই
নারদ, শিবের চালচলন;
বিপদ কেটে এখন তাদের
হচ্ছে কেমন আস্ফালন।
দেখাতে নিজ বাহাদুরী,
মহাদেবের নেইকো জুড়ি;
কাটলে বিপদ এমনি করেই
করেন নিজের দোষ স্খালন।
নিজের ভুলে নিজেই ঠকে,
কাজটা কি আর হাসিয়ে লোকে,
প্রাণটা নিয়ে ডেরায় ফিরে
এবার গিয়ে ঠাণ্ডা হন।

ঘরছাড়া

নটরাজন

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের এই সীমান্ত সহরের সঙ্গে বাকি দেশটার সংযোগ একমাত্র আকাশপথ—অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্‌স্‌ কর্পোরেশানের বিমান সার্ভিস। ধনীরা তো বটেই মধ্যবিত্তদেরও এই আকাশ পথ ছাড়া বাইরে যাওয়ার উপায় নেই।

একটু আগেই ডাকোটা বিমানখানা দমদম থেকে এখানে এসে পৌঁছেছে। নেমে গেছে যাত্রীরা। মাল-পত্র খালাস বোঝাইও হয়ে এল। একটু পরেই আর একদল যাত্রী নিয়ে বিমানটা আকাশে উড়বে।

বিমানঘাঁটির লাউঞ্জ অর্থাৎ ওয়েটিং রুমে বসে অস্থির হয়ে উঠেছে সাত বছরের ছোট্ট বাবলু। জীবনে এই প্রথম সে বিমানে চড়তে যাচ্ছে। তাই তার যেন আর সবুর সইছিল না। প্রশ্নের পর প্রশ্নে তার কাকাকে অস্থির করে তুলছিল—ও কাকু, আর কতক্ষণ বসে থাকবো? এবার চল, এরোপ্লেনে গিয়ে বসি। আমি কিন্তু কাকু জানালার ধারে বসবো। ঠাকুমা বসবে আমার পাশে। জানালা দিয়ে আমি পদ্মানদীটাকে দেখতে পাবো।

এতক্ষণে লাউঞ্জের মাইক ঘোষণা করেঃ ফ্লাইট্‌ নাম্বার টু ফাইভ্‌ ফাইভ্‌। যাত্রীদের বিমানে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি। ফ্লাইট্‌ নাম্বার...

বাবলুর কাকা বাবলু ও তার ঠাকুমাকে প্লেনের সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বৃদ্ধাকে বললেন, কোন চিন্তা নেই, মা। তোমাদের নিয়ে যেতে মেজদা নিজেই দমদমে থাকবে।

তারপর বাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, প্লেনের মধ্যে বসে কিন্তু দুষ্টুমি করো না, বাবলু। চুপটি করে ঠাকুমার পাশে বসে থেকো, কেমন?

বাবলু তার বড় বড় চোখ দুটো মেলে কাকার দিকে তাকিয়ে অবিন্যস্ত চুলভর্তি মাথাটাকে একপাশে হেলিয়ে সম্মতি দেয়।

জানালার পাশেই বসেছিল বাবলু। পাশে তার বৃদ্ধা ঠাকুমা। বিমান ছাড়ার আগে এয়ার হোস্টেস অর্থাৎ বিমানসেবিকা একটি সুশ্রী এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে একখানা বড় ট্রেতে কতকগুলো চকোলেট ও সেই সঙ্গে তুলো ও মিষ্টি সুপারির প্যাকেট তার সামনে এনে ধরতেই বাবলু অবাক বিস্ময়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

একটু স্নিগ্ধ হেসে পরিষ্কার বাংলায় মেয়েটি বাবলুকে বললে, এই তুলো কানের মধ্যে গুঁজে রাখো, খোকা। শব্দ কম আসবে। আর এই চকোলেট নাও।

বাবলু লুব্ধ দৃষ্টিতে চকোলেটের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কটা নেব?

তোমার যে কটা খুশি।

এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে বাবলু তিনটে চকোলেট তুলে নেয়। তারপর মেয়েটিকে আবার প্রশ্ন করে, আমরা পদ্মা নদীটা দেখতে পাবো তো?

ও, তোমার বুঝি পদ্মা নদীটা দেখবার খুব শখ? হ্যাঁ, দেখতে পাবে। আমি তোমাকে বলে দেব।

এরোপ্লেনে চড়ার প্রথম মুহূর্তের উত্তেজনা তখন অনেকটা কেটে গেছে বাবলুর। ইঞ্জিনের শব্দটাও অনেকটা সহ্য হয়ে গেছে ততক্ষণে। আকাশের বুক চিরে উড়ে চলেছে ডাকোটা বিমান। নীচের ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, বনজঙ্গল ঠিক খেলনার মত মনে হচ্ছিল বাবলুর। পরিষ্কার নীল আকাশে দু'-একখানা হাল্কা

মেঘের টুকরো প্লেনের গা ঘেঁষে বিদ্যুৎগতিতে উল্টোদিকে সরে যাচ্ছিল।

একসময় সেই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এয়ার হোস্টেস কাছে আসতেই বাবলু তাকে জিজ্ঞেস করে, পদ্মানদী আর কতদূর বলতে পারো?

মেয়েটি হেসে জবাব দেয়, এখনও দূর আছে, খোকা। ঠিক সময় তোমাকে বলবো। তা পদ্মানদীটা দেখবার এত ইচ্ছে কেন তোমার?

বাবলু বললে, বাঃ, ঐ পদ্মার পাড়েই যে আমাদের বাড়ি ছিল। আমি তো তখন খু-উ-ব ছোট। ঠাকুমা বলেছে, একদিন রাতে নাকি একদল লোক লাঠি, ছোরা নিয়ে আমাদের গাঁয়ে ঢুকে অনেক ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল, অনেককে মেরে ফেলেছিল।

তারপর?—প্রশ্ন করে মেয়েটি।

বাবলু একবার তার বৃদ্ধা ঠাকুমার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার বলতে থাকে, ওরা নাকি আমাদের বাড়িও পুড়িয়ে দিয়েছিল। আমার বাবাকে মেরে ফেলার ইচ্ছে ছিল ওদের। কিন্তু পারে নি। বাবা নাকি খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঐ পদ্মানদীতে নৌকো ভাসিয়ে চলে গিয়েছিল দূরের থানায় খবর দিতে। তারপর—

তারপরের কথাটা আর শোনা হল না মেয়েটির। ইতিমধ্যে ওপাশ থেকে একজন যাত্রী এক গ্লাস জল চাইতেই মেয়েটি চলে গেল সেই দিকে।

সেই ডাকোটা বিমানটি তখন বাবলু ও তার ঠাকুমা সহ একদল যাত্রীকে নিয়ে মাঠঘাট, পথ প্রান্তর ডিঙিয়ে উড়ে চলেছে।

এক সময় সেই মেয়েটি বাবলুকে ডেকে বললে, নীচের দিকে তাকিয়ে থাক, খোকা। এবার পদ্মানদী দেখতে পাবে।

বিরাট সেই ভয়ংকরী পদ্মা। কিন্তু এত উঁচু থেকে তার সেই ভয়ংকর রূপটি ঠিক চোখে পড়ে না। মনে হয়, যেন সবুজ ধানের ক্ষেতের শেষে আরম্ভ হয়েছে একটা বিরাট বালির প্রান্তর। থরথর করে কাঁপছে। মাঝে মাঝে সূর্যের আলোয় চকচক করে উঠছে ঢেউগুলো। বালির চর জেগে উঠেছে এখানে ওখানে। খেলনা স্টীমারের মত দু' একটা স্টীমার আর ছোট ছোট বিন্দুর মত সাদা পাল তোলা নৌকো-গুলো যেন স্থির হয়ে রয়েছে সেই প্রান্তরের মধ্যে।

প্লেনের জানালায় কপাল ঠেকিয়ে নীচের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে বাবলু। পদ্মার জলে যেন কিছু খুঁজতে চেষ্টা করে সে।

বাবলুর বৃদ্ধা ঠাকুমাও জানালার দিকে ঝুঁকে দেখতে থাকেন পদ্মাকে। তাঁর অতি পরিচিত ঐ পদ্মা। ঐ পদ্মার পাড়ে তাঁর কৈশোর ও যৌবনের দিনগুলো কেটেছে। ওর সংগে যে তাঁর নাড়ির সম্পর্ক। ভেবেছিলেন, ঐ পদ্মার পাড়েই শেষ নিঃশ্বাস ফেলবেন। কিন্তু তা আর হল কই? কেমন যেন সব ওলট পালট হয়ে গেল। হয়ত ঐ পদ্মার সংগে এই শেষ দেখা।

জানালা দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে টপ্ টপ্ করে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে থাকে বৃদ্ধার চোখের কোল বেয়ে।

পদ্মাকে পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে চলছে সেই ডাকোটা বিমান। ছোট্ট বাবলু কিন্তু তখনও ঠিক তেমনিভাবেই তাকিয়ে থাকে নীচের দিকে।

সেই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটি এবার বাবলুর সীটের কাছে এগিয়ে এসে একটু মিষ্টি হেসে বললে, কি খোকা, পদ্মা দেখা হল তো?

বাবলু এবার মুখ ফেরায়। তার ডাগর চোখে জেগে ওঠে এক বিষণ্ণ আশাহত ভঙ্গি। একটু সময় মেয়েটির মুখের পানে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে সে বললে, তুমি তো রোজ এই পথে যাও, তাই না?

হ্যাঁ, প্রায়ই যাই। কেন বল তো?—মেয়েটি হেসে বললে।

আমার বাবাকে কখনও দেখেছ ঐ পদ্মানদীর মধ্যে? সেই যে আমার বাবা বাদামী পাল তোলা নৌকোয় চেপে থানায় খবর দিতে গিয়েছিল, আর ফেরে নি। আমি এত করে এতক্ষণ লক্ষ্য করলাম, কিন্তু কই বাবাকে তো দেখতে পেলাম না।

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটির মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। ম্লান কণ্ঠে সে বললে, আমি তো তোমার বাবাকে চিনি না, খোকা।

বাবলু ধরা গলায় বলে ওঠে, ঠাকুমা বলে, আমি নাকি দেখতে ঠিক আমার বাবার মত। পারবে তুমি—বল না, পারবে তুমি আমার বাবাকে খুঁজে বের করতে? বাড়ি ফিরে এসে আমাদের দেখতে না পেয়ে বাবা বোধ হয় এখনও নৌকো নিয়ে পদ্মার জলে ভেসে বেড়াচ্ছে!

বলতে বলতে চোখ দুটো তার জলে ভরে ওঠে।

রঘু ডাকাত

ধীরেন্দ্রলাল ধর

উনিশ শতকের গোড়ার দিকের কথা। বাংলাদেশে তখন একটা অরাজকতার যুগ। বিদেশী বেনের দল বাংলাদেশের রাজকাজে জুড়ে বসেছে। তারা পয়সা রোজগার করতে এসেছে, চুরি জুয়াচুরি শঠতার মাধ্যমে তারা যতটা পারে লুঠে নিচ্ছে। সেজন্য জুলুম, দাঙ্গা, ঘর জ্বালানো কিছুই তারা বাকি রাখছে না। এই সব অনাচারের জন্য কোন সঙ্কোচ বা চক্ষুলজ্জার বালাই সাহেবদের নেই। আইন তাদের তৈরী, পুলিস তাদের অধীন—কাজেই সঙ্কোচের কথা ওঠে না। আর অর্ধসভ্য কালো ভারতীয়দের সুসভ্য করার মহান দায়িত্ব তারা গ্রহণ করেছে, কাজেই চক্ষুলজ্জা কিসের!

বাংলাদেশের মানুষকে সভ্য করে তোলার তখন সবচেয়ে ভাল মাধ্যম ছিল গ্রামে নীলের আবাদ করা, চাষীদের উপর জুলুম করে তাদের ধানজমিতে নীলের চাষ করতে বাধ্য করা। এবং তারপর সেই নীল বিদেশের বাজারে বিক্রি করে চাষী-দের পাওনা না দিয়ে সব টাকাটাই ঘরে তোলা। আইনতঃ এর কোন প্রতিকার না থাকায় বাংলার চাষীরা ক্রমে ক্রমে উচ্ছন্নে যাচ্ছিল।

কিন্তু সব চাষীই নিরীহ নয়! কেউ কেউ দুরন্ত প্রকৃতির ছিল। তারা নির্বিবাদে এই অনাচার সহ্য করেনি, তারা প্রতিকারের জন্য রুখে দাঁড়িয়েছিল। তাদের লাঠির সামনে অনেক অত্যাচারী নীলকর সাহেব ঢিট্ হয়েছিল। কিন্তু বাইরে রটিয়েছিল —এরা ডাকাত, মানুষকে শান্তিতে বাস করতে দিতে চায় না।

দেশের গরীব-দুঃখীরা কিন্তু এই ডাকাতদের কাছ থেকেই নানাভাবে সাহায্য পেতো, এবং মনে-প্রাণে তাদের আশীর্বাদ করতো।

সপ্তগ্রাম অঞ্চলে রঘুনাথ আচায্যি ছিল এমনি এক ডাকাত।

আচায্যি বাড়ীর ছেলে। বাপের টোলে সংস্কৃত কাব্য পাঠ শেষ করেছিল। তারপর শুরু করেছিল বেদান্ত পড়তে। কিন্তু ইতিমধ্যে লাঠিখেলা, বল্লম ছোড়া আর তাসের আড্ডাতেই তার বেশি আসক্তি দেখা দিল। ফলে পড়াশুনা আর তেমনভাবে এগোলো না। যখন তখন যাকে তাকে লাঠি খেলায় চ্যালেঞ্জ করে বসে। তাসের আড্ডায় জমলে রাত দুপুর হয়ে যায় বাড়ি ফিরতে। পিতা রাম আচার্য একদিন বললেন—এমনভাবে চললে তুই যজমানের ঘরগুলো বজায় রাখবি কেমন করে? ভাল পণ্ডিত না হলে লোকে ডাকবে কেন?

রঘু বললো—ঠাকুরের পুজো করে তোমার মত দক্ষিণে না নিলে, দেখবে, সবাই আমাকেই ডাকছে।

—দক্ষিণে না নিলে খাবি কি?

—কেন, আমাদের ধান-জমি তো রয়েছে। বাগান রয়েছে।

—তেল নুন কিনবি কোত্থেকে?

—ধান বেচে, কাপড় বেচে।

—কাপড় বেচবি?

—পুজোর সময় যজমানরা প্রণামীর কাপড় দেবে তো, অতো কাপড় আমাদের কোন্ কাজে লাগে?

—তাহলে পুজোর সময় গরীব-দুঃখীদের যে কাপড় দিই, তুই তা বন্ধ করে দিবি?

—কেন?

—নাহলে আর বেচার জন্যে কাপড় পাবি কোথায়?

—তাহলে ভিক্ষে করবো। বামুনের তাতে দোষ নেই। কিন্তু দেবতার পুজো করে মজুরী নিলে পাপ হয়।

আচায্যি মশাই আর কিছু বলেন না। ছেলে যে

আদর্শের কথা বলে সেটা তাঁর কাছে ভালই লাগে। তাছাড়া এই একমাত্র ছেলেটিকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন। অবশ্য রঘুও কোনদিন বাপের সামনে কোন বাচালতা প্রকাশ করেনি। পিতাপুত্রে একটা সখ্যভাব বর্তমান। কারণ রঘুনাথ ষোল বছরে পড়তেই আচার্য তাকে বন্ধু করে নিয়েছেন। প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ—এই শাস্ত্রবাক্যে তিনি বিশ্বাস করেন।

বাপ-মা ও একমাত্র পুত্র নিয়ে আচায্যি পরিবারে অশান্তির কোন প্রবেশপথ ছিল না। বাইরের রাজনৈতিক আবহাওয়া যত জটিলই হোক না কেন, বাংলার গ্রামবাসীরা তা টের পেতো না, যতক্ষণ না কোন সৈন্য-সামন্তের ছাউনি পড়তো গাঁয়ের আশেপাশে। শিবতলায় মানুষের স্মরণকালে সে অবস্থা ঘটেনি, কাজেই গাঁয়ের মানুষরাও শান্তিতেই ছিল।

কিন্তু কোম্পানীর আমলে এই শান্তি বিঘ্নিত হলো। সৈন্যদের ছাউনি পড়লো না, বসলো নীলকুঠি। সৈন্য এলে আবার চলে যেতো। কিন্তু নীলকুঠি দিনের পর দিন জাঁকিয়ে বসে, নীলকর সাহেবদের অনাচারে গাঁয়ের মানুষের আর বাঁচার পথ থাকে না।

শিবতলাতেও একদিন নীলকুঠি বসলো।

নীলকুঠির মালিক হলেন ম্যালকম সাহেব। সাহেব বিলেত থেকে এসেছিল কোম্পানীর সেরেস্তায় কাজ করতে। চাকরি করতে করতে সাহেব দেখলো, মাসকাবারী মাইনে আর ঘুষ-চুরির উপরি রোজগারে যে টাকা সঞ্চয় হয়, তাতে শেষজীবনে বিলাতে গিয়ে নবাবী করা চলে না। অথচ এদেশে রাতারাতি দু-পাঁচ লাখ টাকা কামিয়ে নেবার সুবিধা আছে। একটা নীলকুঠি খুলে বসতে পারলেই হলো, সিন্দুক ভর্তি হয়ে যাবে মোহরে। সপ্তগ্রামের এই দিকটায় কোন নীলের আবাদ ছিল না, ম্যালকম সপ্তগ্রামে আপিস খুলে বসলো। আশেপাশের পাঁচ-সাতখানা গাঁয়ে ঢোলসহযোগে ঢেঁড়া পিটিয়ে দেওয়া হলো, বিঘে পিছু পাঁচ কাঠা জমিতে নীলের চাষ করতে হবে। নীলকুঠির সাহেব সেই নীল কিনে দাম দেবেন।

'পাঁচকাঠিয়া' দিয়ে যার পত্তন হলো, পরের বছর তাই হলো দশকাঠা। তারপর যার যেটা ভাল জমি, তার সেটাই নীল আবাদের জন্য দাগ দেওয়া হতে লাগলো। নীলের দাম চাষীরা যা পেতে লাগলো তাতে খরচ পোষায় না। আপত্তি জানালে ঘর পোড়ে। রুখে দাঁড়ালে, পাইকরা কাছারীতে ধরে নিয়ে গিয়ে রীতিমত প্রহার দেয়। প্রতিকার কোথাও কিছু হয় না। হাকিম সাহেব, সাহেবের বিরুদ্ধে কোন কথাই তিনি আমল দেন না। আইন-কানুনও সাহেবদের পক্ষে। আর দারোগা ও পুলিস তো হাকিমের হুকুমের চাকর। গ্রামে গ্রামে চাষী মহলে হাহাকার পড়ে যায়।

শিবতলা গ্রামেও হাহাকার ওঠে। তা উঠুক, ম্যালকম জানে যে, এই হাহাকার না থাকলে তার টাকার অঙ্ক ফেঁপে উঠবে না। ম্যালকমের মুচ্ছুদ্দী গজেন ঘোষও সে কথা জানে।

রামপদ আচায্যির টোলে কিছুদিন গজেন পড়াশুনা করেছিল। তাই আচার্যদের উপর জুলুম করতে গজেনের গোড়ার দিকে একটু চক্ষুলজ্জা হয়েছিল। কিন্তু দু-তিন বছরে জুলুম করার অভ্যাসটা যখন বেশ রপ্ত হয়ে গেল, তখন আর চক্ষুলজ্জা রইল না। একদিন সোজাসুজি গজেন আচায্যিমশাইকে বললো—আপনার পুকুরপাড়ের জমিটায় এবার নীলের আবাদ করতে হবে।

আচায্যি বললেন—ওটা আমাদের ব্রহ্মোত্তর জমি। ওখান থেকে আমাদের সারা বছরের খোরাক হয়। ও জমিতে নীল চষতে পারবো না।

—সাহেব বলছিলেন।

—তুমি সাহেবকে বুঝিয়ে বল।

—বুঝিয়েছি, সাহেব তো শোনে না।

—না শুনলে উপায় নেই। ও জমি ছাড়বো না।

এই জমির আবাদ নিয়েই শেষ অবধি শুরু হলো রোখারুখি।

বর্ষা শুরু হতেই আচায্যি যথারীতি তার জমিতে বাসমতী ধান রুইতে শুরু করলো।

গজেন দেখেশুনে বললো—কাজটা ভাল করলেন না, সাহেব শুনলে রাগ করবে।

করে করবে।—আচায্যি বললেন—আমার অন্নের সংস্থান তো আগে। ঘরে অন্ন না থাকলে সাহেব তো আমাকে খাওয়াতে আসবেন না।

গজেন অবশ্য সে কথার কোন জবাব দেয় নি।

দিব্যি মাসখানেক কেটে গেল।

তারপর একদিন সাহেব বন্দুক কাঁধে নিয়ে, জনা চারেক সড়কিওলা পাইক ও গজেনকে সঙ্গে নিয়ে সারা গ্রাম তদারক করে গেল।

পরদিন সকালেই দুজন পাইক এসে রাম আচায্যিকে ডেকে নিয়ে গেল। সপ্তগ্রামে সাহেবের সদর কাছারীতে।

কাছারীতে রাম আচায্যিকে কতটা নির্যাতন করা

হলো তা নীলকুঠির তিন-চারজন পাইক ছাড়া আর কেউ জানলো না। মার খেয়ে আচায্যিমশাইয়ের সংজ্ঞা লোপ পেল। পাইকরা তখন তাঁকে পথের ধারে এক গাছ-তলায় ফেলে রেখে দিয়ে চলে গেল। বিকালের দিকে হরিয়া সদর থেকে গাড়ী নিয়ে ফিরছিল। আচায্যি-মশাইকে ওই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সে তার গাড়ীতে তুলে নিয়ে বাড়ী পেঁাছে দিয়ে গেল। অচেতন আচায্যিমশাইকে এতটা পথ গরুর গাড়ীর ঝাঁকানি খাইয়ে নিয়ে আসায় হয়তো অপকারই হলো বেশী। কিন্তু তিনি বাড়ীতে পেঁাছে গেলেন।

রঘু ঘুম থেকে উঠেই চলে গিয়েছিল এক অন্ন-প্রাশনের নিমন্ত্রণে পাশের গাঁয়ে। ফিরলো সন্ধ্যাবেলা। বাড়ী এসে পিতার অবস্থা দেখে সে তো বিমূঢ় হয়ে পড়লো। পিতার কোন জ্ঞান নেই, কবিরাজ মশাই দেখে গেছেন। মকরধ্বজ ও দুটো ওষুধের ব্যবস্থা করে গেছেন। কিন্তু অচেতন মানুষকে তো ওষুধ খাওয়ানো যায় না। হাঁ করিয়ে পিসিমা একটু একটু জিভে লাগিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু তাতে অবস্থার কোন সুরাহা হচ্ছে বলে মনে হয় না।

রঘু তখনই ছুটলো কবিরাজ মশাইয়ের বাড়ী।

—কবিরাজকাকা, বাবাকে কেমন দেখলেন?

—ভাল নয়।

—কি হয়েছে?

—মাথায় অথবা ঘাড়ে কোন জোর আঘাত লেগেছে।

—নীলকুঠির কাছারীতে ডেকে নিয়ে গিয়ে সেখানে মেরেছে। মেরে পথের উপর ফেলে দিয়ে গিয়েছিল।

—খুবই সম্ভব। তবে আঘাতের কোন চিহ্ন তো দেখতে পেলাম না। মাথায় কোন কাটা বা ফোলা নেই। সন্দেহ হচ্ছে ঘাড়েই লেগেছে।

—সুস্থ হতে কদিন সময় লাগবে?

—জ্ঞান না ফিরে এলে কিছুই বলা যাচ্ছে না।

কবিরাজ মশাইয়ের মুখের পানে তাকিয়ে রঘুর কেমন সন্দেহ হয়। জিজ্ঞাসা করে—জ্ঞান ফিরবে তো?

—সবই ভগবানের কৃপা বাবা। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটি অবধি নড়ে না।

রঘু কবিরাজ মশাইয়ের মুখের পানে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আপন মনেই বলে উঠলো—তাহলে বাবা বাঁচবে না!

—হয়তো বাঁচবেন, তবে চিরদিনের মতো পঙ্গু হয়ে যাবেন। চলাফেরার শক্তি আর থাকবে না। ভগবানকে ডাক, তাঁরই কৃপা প্রার্থনা কর।

—সারা জীবন পুজো আহ্নিক করে তো এই হলো, আবার ভগবান!

রঘু ছিটকে বেরিয়ে এলো কবিরাজ মশাইয়ের বাড়ী থেকে।

রঘুনাথ কিন্তু বরাবর সোজা বাড়ী গেল না। গঙ্গার ধার দিয়ে ঘুরে গেল কালীতলায়। কালী মন্দিরের কাছেই ঘোষেদের বাড়ী। বাড়ীর সামনের বারান্দায় বসে গজেন ঘোষ তামাক খাচ্ছিল; রঘু তার সামনে গিয়ে বললো—একটা কথা বলতে এলাম মুচ্ছুদ্দিবাবু!

গজেন ভারিক্কি চালে বললো—কে, রঘু!

—আমার বাবাকে কুঠিবাড়ীতে ডেকে নিয়ে গিয়ে মেরে অজ্ঞান করে রাস্তায় ফেলে দিয়ে যাওয়া হয়েছিল, হরিয়া গাড়োয়ান তাকে বাড়ীতে পেঁাছে দিয়েছে। বাবার এখনও জ্ঞান হয়নি। বাবার যদি ভালমন্দ কিছু হয়, তাহলে আমি কিন্তু তোমাকে সহজে ছাড়বো না।

—তুই কি বলছিস রঘু! কুঠিবাড়ীর কোন্ লোক আচায্যি মশাইয়ের গায়ে হাত তুলতে সাহস করবে?

—মনে রাখবে, আমার লাঠির সামনে দাঁড়াতে পারে এমন লেঠেল এই তল্লাটে একজনও নেই। তোমার অনেক অন্যায় আমরা সয়েছি। এবার তোমার এই ঘর জ্বলবে, গঙ্গায় লাস ভাসবে। আর রেহাই নেই!

রঘু আর সেখানে দাঁড়ালো না। যেমন ভাবে এসেছিল, তেমনি ভাবে বেরিয়ে গেল।

গজেন ডাকলো—মতি—

এক কালো ষণ্ডামার্কা জোয়ান এগিয়ে এলো।

—শুনলি তো কি বলে গেল।

—ওসব কথায় আমরা ভয় করিনে হুজুর।

—রাতে একটু সজাগ থাকিস্।

—আমাদের কিছু বলতে হবে না হুজুর, আমরা ঠিক আছি।

দুদিন অচেতন থেকে তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় আচার্য মশাই মারা গেলেন।

রঘুনাথের আপনার জন বলতে ওই বাবা আর বিধবা পিসিমা। পিসিমা কান্নাকাটি করলেন, কিন্তু রঘুনাথের চোখে জল নেই। সে গুম্ হয়ে বসে রইল। পরে পাড়ার ছেলেরা তাকে ডেকে নিয়ে গেল শ্মশানে।

পল্লী অঞ্চলে শবদাহ করতে সময় লাগে।—গাছ কেটে কাঠের জোগাড় করতে হয়। পিতার

অন্ত্যেষ্টি শেষ করে রঘুর ফিরতে সকাল হয়ে গেল।

গজেন ফতুয়ার উপর চাদর কাঁধে ফেলে ঘাটে যাচ্ছিল, নৌকা করে সদরে যাবে। পথে রঘুর সঙ্গে দেখা। রঘু রক্তচক্ষু তুলে তাকালো গজেনের মুখের পানে। বললো, মুচ্ছুদ্দি, বাবাকে শেষ করে ঘাট থেকে ফিরছি। এবার তোমার পালাও শেষ করবো। এ গাঁয়ের বাস তোমার তুলতে হবে। আর তার সঙ্গে নীলের চাষও ওঠাবো। খেয়াল রেখো—

গজেন কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু রঘুর মুখের পানে তাকিয়ে কিছু বলতে আর সাহস পেল না। চিন্তিত মুখে গজেন ঘাটে এসে নৌকায় উঠলো।

কাল রাতে ম্যালকম সাহেব মদ খায়নি। সাহেবের সখ হয়েছিল সিদ্ধির সরবৎ খাবার। খানসামা সরবৎ তৈরী করে দিয়েছিল। রাতে মদ খেলে সকালে মাথাটা ধরে থাকে। সিদ্ধির সরবতে তা হয়নি। আজ সকালে সাহেবের মেজাজ ছিল ভাল। ঘুম থেকে উঠে প্রাতর্ভোজন সারছিল। এমন সময় গজেন এসে রঘুর কথা বললো। ম্যালকম বললো—ডোন্ট মাইন্ড। আমি এখনি দারোগাকে বলে ওকে ফাটকে আটক করছি। হাজতে দু-চার ঘা খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

গজেন ভয় পেয়ে গেল। বললো—তাতে আরো খারাপ হতে পারে হুজুর। গাঁয়ের ছেলেছোকরার দল ওকে খুব মানে।

—ডাম্ ইট্! অতো ভয় করলে তুমি ম্যানেজারি করতে পারবে না। হারামজাদাগুলোকে প্রশ্রয় দিলে ওরা তোমাকে পেয়ে বসবে। নিগারগুলোকে মাথায় উঠতে দেবে না।

সাহেব যাদেরকে নিগার বলছে গজেন যে তাদেরই একজন, সাহেবের সে খেয়াল থাকে না। গজেনের অবশ্য এসব কথা শোনার অভ্যাস আছে। নরম গলায় সে বললো—প্রথমেই আমি বাড়াবাড়ি করতে চাই না হুজুর; দারোগা এখন একটা 'ওয়ার্নিং' দিয়ে আসুক। তাতেই কাজ হবে।

—বেশ, কালই দারোগাকে যেতে বলবো।

—কাল নয় হুজুর। কদিন পরে ওর বাবার শ্রাদ্ধ হবে। সেদিন অনেক লোকজন থাকবে, তাদের সামনে দারোগাবাবু হুকুম জারি করে আসবেন। সবাই জানবে।

—অলরাইট! তাই বলে দেব। ওসব তুমি গ্রাহ্য করো না। তুমি বেপরোয়া কাজ করে যাও। তোমার কোন ভাবনা নেই। তুমি আমার লোক, আমরা দেশের রাজা, মানে তুমি রাজার লোক। তোমার ভয় কি? এদেশে আমাদের ক্ষতি করতে পারে এতো সাহস কার! শুধু খেয়াল রেখো, গতবারের ডবল আবাদ এবার আমার চাই।

—সে ব্যবস্থা আমি এবার করেছি হুজুর। ভাল জমি কোথাও বাকি রাখিনি।

—ওয়েল, গো অন্!

গজেন সাহেবকে সেলাম দিয়ে কারখানা ঘরের দিকে চলে গেল। এমন ভালভাবে অনেকদিন সাহেব তার সঙ্গে কথা বলেনি। গজেনের মনটা খুশী হলো।

দেখতে দেখতে ক'টা দিন কেটে গেল।

বামুন বাড়ী, দশদিনে শ্রাদ্ধ। রঘু পিতার শ্রাদ্ধ করতে বসেছে, এমন সময় দারোগাবাবু এলেন, সঙ্গে জনাচারেক লাল পাগড়ি পুলিস।

দারোগা হাঁক দিল—রঘুনাথ আচায্যি ঘরে আছে?

প্রতিবেশী যারা ছিল, তারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। বললো—রঘু শ্রাদ্ধে বসেছে।

—একবার বাইরে আসতে বল।

পিসি বেরিয়ে এসে বললো—এখন তো উঠতে পারবে না।

—হাকিমের হুকুম আছে, তাকে জানিয়ে যেতে হবে।

হাকিমের হুকুম, কাজেই রঘুকে উঠে আসতে হলো।

দারোগা বললো—রঘুনাথ আচার্য, কদিন আগে নীলকুঠির ম্যানেজার গজেন ঘোষকে মারপিট করবে বলে ভয় দেখিয়েছ, সেই কারণে হাকিম সাহেব তোমাকে 'ওয়ার্নিং' দিচ্ছেন। এই গাঁয়ে কোন মারপিট হলে রঘুনাথ আচায্যিকে সেজন্য দায়ী করা হবে। তুমি ভবিষ্যতে ভদ্রভাবে চলবে।

একখানি ফিকে হলুদ রঙের কাগজ দারোগা রঘুনাথের চোখের সামনে মেলে ধরলো।

রঘুনাথ হাঁ না কোন কথা বললো না।

দারোগা কাগজখানি ভাঁজ করে পকেটে রাখলো, তারপর সঙ্গী পাহারাওলাদের বললো—চল্—

পঞ্চায়েতের মোড়ল তারিণী খুড়ো ছিল। বললো—এলেন আর গেলেন। একটু বসুন—

—না, সময় নেই।

তারিণী বললো—রঘু, তুই একবার বল্, ডেকে বসা—

রঘু বললো—কেন? কাজে এসেছে। কাজ হলে চলে যাবে। অতো খাতির-যত্ন করার কি আছে?

—হাজার হোক্, মানী লোক—

তুমি ডেকে নিয়ে গিয়ে তোমার বাড়ীতে বসাও গে। আমার অত সখ নেই!—কঠিন কণ্ঠে কথাগুলো

বলে রঘু বাড়ীর মধ্যে চলে গেল শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ করতে।

তারিণী হতাশ কণ্ঠে বললো—কাজটা ভাল হলো না।

দারোগা সদলে গটগট করে পথ পার হয়ে গেল।

সন্ধ্যাবেলা গঙ্গায় পিন্ড ভাসিয়ে রঘুনাথ যখন ঘাটে উঠছে, তখন গজেনের নৌকো এসে লাগলো ঘাটে। গজেন নৌকো থেকে নামতেই রঘু মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালো। বললো—আজ বাবার শ্রাদ্ধ করলাম। এবার নীলকরের শ্রাদ্ধ করবো। তোমরা অনেকের ঘর পুড়িয়েছ, অনেককে মারধোর করেছ; সেই সব ঋণ জমেছে। আমি সব কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দোব। আর তোমাদের ভাবতে হবে না।

গজেন তো থ', মুখে কোন কথা জোগালো না।

রঘু চলে গেল। গজেন এবার পিছন পানে তাকালো। পিছনে সড়কিধারী মতিয়াকে দেখে বললো—মতিয়া, শুনলি তো?

—শুনেছি। ওসব ফাঁকা কথায় আমি ডরাই না।

—ছোঁড়াটা বড্ড একরোখা!

—হোক না। কি করতে পারে করুক না।

—লাঠি ধরতে ওস্তাদ।

—ওরকম কত ওস্তাদ দেখলাম। আমাদের কাছে ওস্তাদি দেখাতে এলে পিটিয়ে হাত-পা ভেঙে দেব। আপনি মোটেই ঘাবড়াবেন না।

গজেন কিন্তু অতো সহজে নিশ্চিন্ত হতে পারলো না। তিনবছর নীলকুঠির মুচ্ছুদ্দিগিরি করে সে জানে একজন লোকও যদি তাকে তাকে থাকে, তাহলে সে অনেক অনিষ্ট করতে পারে। এই তিন বছরে একা মতিয়াকে দিয়েই তো সে কতজনের ঘরে আগুন লাগিয়েছে। রঘু যদি সত্যি কিছু করার মতলব করে তাহলে ক্ষতি সে করবেই। পরে হাঁকডাক করে সে ক্ষতিপূরণ হবে না। চিন্তিত মুখে গজেন বললো—আচায্যিকে অমনভাবে মারধোর করাটা তোদের ঠিক হয়নি। মানুষটা একেবারে মরে গেল।

—আমরা তো কিছু করিনি। কুঠিবাড়ীর বুনো-গুলোই তো করেছে। বুধুয়া আচায্যির গায়ে হাত তুলেছিল। আচার্য ভগবান ডেকে শাপশাপান্ত করে। বুধুয়া তখন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়, একটা বাঁশের খুঁটি লেগে বুড়ো অজ্ঞান হয়ে যায়! দু ঘন্টাতেও জ্ঞান হলো না দেখে বুধুয়া তখন পথের ধারে শুইয়ে দিয়ে আসে। বিশেষ মারধোর কিছু হয়নি।

—একটা ব্রহ্মহত্যা হয়ে গেল।

—সে যা হোল বুধুয়ার হোল। তাতে আপনার কি?

—ছেলেটা তো আমার উপর চোট্ করবে।

—ছাই করবে। আমরা তাহলে আছি কেন? ওর ভিটেতে তাহলে ঘুঘু চরবে।

—সে তো পরের কথা। গোড়ার চোট্ তো আমাকেই সামলাতে হবে।

—কিচ্ছু হবে না। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না।

কিন্তু 'ভাববেন না' বললেই ভাবনা ফুরায় না। গজেন ভাবতে থাকে।

চারজন পাইক রাতে শুয়ে থাকে গজেনের বারান্দায়। রাতে শুতে যাবার আগে গজেন তাদেরকে বলে—একটু সজাগ থাকিস রে মতিয়া। ছোঁড়াটাকে বিশ্বাস নেই। কোন্ ফাঁকে হয়তো ঘরে আগুন দিয়ে যাবে।

ও ভাবনা মন থেকে একদম তাড়িয়ে দিন কর্তা। —বলে মতিয়া খৈনি টিপতে শুরু করে।

গজেন বাড়ীর ভিতর শুতে চলে যায়। মতিয়া সঙ্গীদের সঙ্গে খানিক বকবক করে। রাত গভীর হয়। কোন এক সময় কথা ফুরিয়ে যায়। তাদের নাক ডাকতে শুরু করে।

এক ঘুমেই রাত কেটে যাবার কথা। কিন্তু তা হয় না।

শেষ রাতে গোয়ালঘরে গরুর দাপাদাপিতে ঘুম ভেঙে যায়। মতিয়া চোখ মেলেই লাফিয়ে ওঠে। চারিদিক আলো করে গোয়াল-ঘরের চালা জ্বলছে। চীৎকার করে ওঠে—ওরে, ওঠ্, ওঠ্, আগুন লেগেছে।

সবাই ছুটে যায় গোয়ালের দিকে। গরু দুটোকে বের করে আনে।

ইতিমধ্যে বাড়ীর পিছন দিকে দরজা জানলাতেও আগুন দেখা দিল। মতিয়া ছুটলো সেইদিকে। দেখে, একটা লোক মশাল হাতে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। 'তবে রে ব্যাটা' বলে মতিয়া ছুটে তাকে ধরতে গেল। পরক্ষণেই পায়ে এক বল্লমের খোঁচা খেয়ে সে ঘুরে পড়ে গেল। লোকটি ইতিমধ্যে আরেকটা জানালার উপর মশালটা ধরে দিয়ে অন্ধকারে সরে পড়ে।

দেখতে দেখতে সারা বাড়ীটায় আগুন লেগে গেল।

সোরগোলে পাড়াপড়শী ছুটে এলো।

ছেলের দল বালতি ও কলসী নিয়ে এলো। পুকুর থেকে জল তুলে আগুন নেভাতে হবে।

এমন সময় পিছন থেকে রঘুর গলা শোনা গেল—

কেউ জল ঢালিস্‌নে। অনেকের ভিটেতে আগুন দিয়েছে। নিজের ভিটে এবার পুড়ুক, গাঁয়ের আপদ দূর হোক। গজা ব্যাটাকেও ওই আগুনে ফেলে দে। মূল সুদ্ধু যাক্‌—

রঘুনাথ কোন কথারই জবাব দিল না। বাড়ী চলে গেল।

সন্ধ্যেবেলা হাকিম এসেছিল নীলকুঠিতে মদ খেতে। গজেন সেই সময় এসে পড়লো, কাঁদো কাঁদো

দেখে, একটা লোক মশাল হাতে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

ছেলে-ছোকরারা জল তুলতে গিয়ে থেমে যায়।

চোখের উপর ঘোষেদের বাস্তু পুড়তে লাগলো।

মতিয়া ও তার সঙ্গীরা যতটা পারলো বাক্স প্যাঁটরা বাইরে বের করে আনলো। কিন্তু অনেক কিছুই রক্ষা করতে পারলো না। গজেনের স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে গাছতলায় এসে হায় হায় করে উঠলো—আমাদের সব গেল!

পিছন থেকে রঘু বললো—গজা বেটা অনেকের ঘর জ্বালিয়েছে, এবার তার নিজের ঘর পুড়লো!

দুপুরের দিকে বাক্স পেঁটরা নিয়ে ছেলেমেয়েদের হাত ধরে গজেন নৌকায় উঠলো। হুগলীতে তার শ্বশুরবাড়ী, ঐখানেই যাবে। যাবার সময় মতিয়াকে বলে গেল—আবার এখানে ঘর তুলতে হবে। তোরা ঘরামিদের একবার খবর দিস।

রঘু সেখানে ছিল, বলে উঠলো—আবার ঘর তুললে সে ঘরও পুড়বে। শিবতলাতে গজা ঘোষের আর স্থান হবে না।

নৌকো চলে গেল। ছেলেছোকরা যারা ছিল, তারা বললে—একটা আপদ বিদায় হোল। রঘুদা এদ্দিনে একটা কাজের মত কাজ করেছ!

প্রবীণেরা বললো—কাজটা কিন্তু ভাল হলো না।

গলায় বললো—হুজুর, আজ আমি ছেলেমেয়ের হাত ধরে গাছতলায় বসেছি,—

হাকিম সব শুনে তখনই দারোগাকে তলব করলেন। বললেন—শিবতলার রঘু আচায্যিকে আজ রাতেই গ্রেপ্তার করবে। কাল সকালে তাকে হাজির করবে আমার সামনে।

ফৌজ নিয়ে দারোগাবাবুকে সেই রাতেই বেরুতে হলো। শেষ রাতে শিবতলায় এসে রঘুনাথের বাড়ীতে তারা হানা দিল।

এমন একটা কিছু ঘটতে পারে রঘুনাথ তা আন্দাজ করেছিল। সেইজন্য রাতে সে শিবমন্দিরের নাটবারান্দায় শুয়ে ছিল। পুলিস ফৌজের পদশব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। আড়াল থেকে তাদের গতিবিধি দেখেই সে সরে পড়লো।

ভোরবেলা দারোগা আচায্যিবাড়ীতে হাঁক-ডাক করলো। বুড়ী পিসিমার উপর অনেক হম্বি-তম্বি করলো। বাড়ীর ঘর ক'খানা ঘুরে দেখলো, কিন্তু রঘুর কোন পাত্তা পেল না।

পরদিন শিবতলা গাঁয়ে ঢোলসহযোগে পুলিসের লোক ঢেঁড়া পিটিয়ে গেলঃ রঘু আচায্যির নামে হুলিয়া আছে। যে তাকে ধরিয়ে দেবে সে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার পাবে।

টাকাটা সরকারী টাকা নয়। নীলকুঠির ম্যালকম

সাহেবই এই পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। গরীবের কাছে টাকার লোভ মস্ত লোভ। সেই টাকার লোভেই রঘুনাথকে লোকে ধরিয়ে দেবে বলে সাহেব আশা করেছিল। তাছাড়া রঘুনাথের মতো মানুষকে অংকুরেই বিনাশ না করলে এ অঞ্চলে তিনি জুলুম করে নীলের আবাদ চালাবেন কি করে?

কিন্তু টাকার লোভ দেখিয়েও কোন কাজ হয় না। রঘুর কোন খবর থানায় এসে কেউ জানায় না। সাহেব বলে—ব্যাটা এই অঞ্চল ছেড়ে পালিয়েছে।

সাহেবের কথাটা গজেনের মনে লাগে। আবার সে যথারীতি শিবতলায় জোরজুলুম চালাতে শুরু করেছে। বাস্তু জমির পোড়া ইঁট কাঠগুলো সাফ করেছে, এবার দুখানা ঘর করে চলে আসবে। তবে আর ক'টা দিন যাক্।

গজেন এ অঞ্চলে প্রতিদিনই আসে। অনেক টাকা নীলের ব্যাপারে দাদন দেওয়া আছে। সেই সব জমির আবাদের উপর নজর রাখতে হয়। এজন্য ঘোরাফেরা করতে হয়। তা সে যত কাজই থাক, গজেন বিকালের দিকে চলে যায়।

সেদিন ফেরার মুখে সহসা কালবৈশাখী শুরু হলো। সারা আকাশ অন্ধকার করে প্রচন্ড বর্ষণ। বজ্রপাতও হচ্ছে। এই বাজ-পড়াকে গজেন বড় ভয় করে। গজেন পথের পাশে বিধু মোড়লের দাওয়ায় আশ্রয় নিল। মোড়ল তাড়াতাড়ি একখানা চাটাই পেতে দিয়ে বললো—বসুন।

গজেন বসলো।

সেই বৃষ্টি থামতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

মোড়লের বাড়ী থেকে গজেন যখন পথে নামলো তখন পথঘাট অন্ধকার। বিধু বললো—একটা আলো নিয়ে সঙ্গে যাবো?

গজেন বললো—দরকার নেই। মতিয়া আছে, ঠিক চলে যাবো।

অন্ধকারেই যতটা সম্ভব পথের খানাখন্দ সামলে গজেন অগ্রসর হলো। মতিয়া চললো আগে আগে।

পথের মোড় ফিরে তেঁতুলতলা পার হয়েছে, সহসা চারপাঁচ জন লোক লাফিয়ে পড়লো তাদের সামনে। খপ্ করে দুজনের বুকের উপর দুটো সড়কি তুলে ধরলো, হাঁক দিল—সামালো!

গজেন ও মতিয়া থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

দুটো লোক মতিয়ার হাত থেকে সড়কি কেড়ে নিলে। তার মাথার পাগড়িটা খুলে নিয়ে তাকে বেঁধে ফেললো তেঁতুল গাছটার সঙ্গে। তারপর গজেনের হাত ধরে একজন বললো—এসো মুচ্ছুদি!

গজেন সভয়ে বললো—কোথায়?

—তোমার ভিটেয়।

—সেখানে কি?

—সেখানে তোমাকে কবর দেব।

আঁ!—গজেন কাঁপতে শুরু করলো।

—তোমার জন্যে এখানকার মানুষ অনেক দুঃখ পেয়েছে। আজ তাই তোমাকেই শেষ করবো।

—না-না—

এসো।—টেনে নিয়ে চললো গজেনকে।

কাছেই গজেনের ভিটে। সামনে এসে গজেন তখন কাঁপছে, বলছে—না—না—

লোকটি বললো—বাঁচতে চাও?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। আমায় ছেড়ে দাও—

—এই ভিটেতে তোমার অনেক টাকাকড়ি পোঁতা আছে। জায়গাটা দেখিয়ে দাও!

—টাকা পোঁতা আছে!

—হ্যাঁ। জুলুমবাজি করে যে টাকা রোজগার করেছ, সে সব গেল কোথায়? যাবার সময় তো সঙ্গে নিতে পারনি।

—টাকা তো নেই। কি বলছ!

—কথা বাড়িও না। হয় সেই টাকার সন্ধান বল, না হয় তো এইখানে জ্যান্ত কবর দিয়ে যাবো। আমি রঘুনাথ, আমি তোমাকে সহজে ছাড়বো না। মরবার ভয় থাকে তো শিগগীর বলে ফেল—

গজেন চুপ করে রইল।

কী!—রঘু এক ঝাঁকানি দিল গজেনের হাতে।

—উঃ লাগে—

—বল—

গজেন নিরুপায়। তবু বললো—এই অন্ধকারে এই জমিতে আমি কি দেখাবো?

রঘু এক রদ্দা বসিয়ে দিল গজেনের ঘাড়ে।

দেখাচ্ছি দেখাচ্ছি, মারিস নে!—বলে গজেন খানিকটা গিয়ে একটা জায়গা দেখিয়ে দিল।

ঠিক জায়গা?—রঘু জিজ্ঞাসা করলো।

—ঠাহর করতে পারছি না। রান্নাঘরের উনুনটা তো এইখানেই ছিল, সেই উনুনের নীচে—

—ঠিক আছে। যদি না পাই তো এই গর্তে তোকেই কবর দেব।

পিছনে আর দুজন দাঁড়িয়ে ছিল। রঘু বললো—খোঁড় এইখানে—

দুজনের হাতে বল্লম ছিল। সেই বল্লমের ফলা দিয়ে তারা মাটি খুঁড়তে শুরু করলো।

খানিকক্ষণ মাটি তোলার পর বল্লমের মুখে ঠন করে কি লাগলো। দুজনে হাতাহাতি করে তুলে ফেললো একটা কলসী।

রঘু বললো—দেখ্ আর কটা আছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আরো তিনটে কলসী পাওয়া গেল।

রঘু বললো—আর কোথাও কিছু আছে?

গজেন বললো—না।

রঘু বললো—এবার তাহলে চল্, এবারকার মত বেঁচে গেলি—

তেঁতুলতলায় ফিরে এসে রঘু সঙ্গীদের বললো—এবার ছেড়ে দে, মাল পাওয়া গেছে।

সঙ্গীরা মতিয়ার বাঁধন খুলে দিলে। রঘু বললো—দুজনে মুখ বুঁজে চলে যা, যদি কোন হৈচৈ শুনি তো জান খতম্!

গজেন ও মতিয়া সন্ত্রস্ত মনে প্রায় ছুটতে ছুটতে ঘাটে এলো। নৌকো বাঁধা ছিল। গজেন দাঁড়ী-মাঝিদের ডেকে বললো—শিগগীর সড়কি নিয়ে চল্, আমার সর্বস্ব লুঠে নিলে।

নৌকার চারজন দাঁড়ীই ছিল পাকা লেঠেল। তখনই তারা সড়কি হাতে নিয়ে ঘাটে নেমে পড়লো। মতিয়াও একগাছা সড়কি নিল। তারপর সবাই ছুটলো গজেনের ভিটের দিকে।

তেঁতুলতলার পাশে আসতেই, শাঁ করে দুটো সড়কি এসে দুজনকে ধরাশায়ী করলো। সঙ্গে সঙ্গে রঘুর গলা শোনা গেল—জানের মায়া থাকে তো সরে পড়—

সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

পা থেকে সড়কি খুলে নিয়ে দাঁড়ীরা বললো—চল ফিরে যাই—

গজেন বললো—আমার টাকা—

—তোমার টাকার জন্য আমরা জান দেব? যা হয় কাল দিনে দিনে হবে।

—তখন কি আর কিছু থাকবে রে!

দাঁড়ীরা সে কথায় কান দিল না। আহত পায়ে গামছা বেঁধে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘাটে ফিরে এলো।

নৌকায় উঠে গজেনের মনে হলো টাকার শোকে সে এবার পাগল হয়ে যাবে।

নীলকুঠিতে এসে ম্যালকম সাহেবকে গজেন সব কথাই বললো। তবে তিন কলসী টাকা পয়সার কথাটা বলতে পারলো না। তাহলেই তো সাহেব বুঝবে গজেন চুরি করে। সাহেব কত টাকা ছিল জিজ্ঞাসা করলে গজেন বললো—'পাঁচ-ছশো।' সাহেব বললো ডোন্ট মাইন্ড, আমি তোমাকে বছরে একশো টাকা বখসিস দোব। পাঁচ বছরে তোমার ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। ভাল করে কাজ কর, আর ওই রঘু ডাকাতটাকে ধরার চেষ্টা কর—

কিন্তু ওই টাকার শোকে গজেনের চেহারা খারাপ হয়ে গেল। যারা দেখলো, তারাই বললো—কি মুচ্ছুদ্দি মশাই, শরীরটা বড় খারাপ দেখছি,—

মুখে এই কথা বললেও মনে মনে সবাই খুশী। রঘুনাথ গজেন মুচ্ছুদ্দির অবস্থা সত্যিই কাহিল করেছে। মুচ্ছুদ্দির সেই আগের মত দাপট আর নেই।

এদিকে দারোগা চুপ করে বসে নেই। নানাভাবে রঘুর খবর নেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কোন দিক থেকে হদিস পাচ্ছে না। লোকটা কি এই অঞ্চল থেকে উবে গেল নাকি!

একদিন সন্ধ্যায় ম্যালকম সাহেব বাংলোর বারান্দায় বসে মদের গেলাসে চুমুক দিচ্ছিল, এমন সময় একজন লোক এসে সেলাম দিল। এক নজরেই ম্যালকম বুঝে নিলে, লোকটি দিল্লীওলা, হিন্দীতে বললো—কেয়া মাংতা?

আগন্তুক বললো—শুনলাম সাহেব জহরৎ কেনেন তাই এলাম।

ম্যালকম সাহেবের জহরৎ কেনার সখ ছিল। এই সখের একটা উদ্দেশ্যও ছিল। বিলাত যাবার সময় থলি বোঝাই করে হাজার হাজার টাকার মোহর নিয়ে যাবার নানা অসুবিধা। কিন্তু হীরা কিনে নিয়ে গেলে একটা ছোট থলির মধ্যে লাখ লাখ টাকার হীরা সহজেই নিয়ে যাওয়া যায়। আর এদেশে তখন নবাবী আমলের শেষ অবস্থা। অনেক আমীর-ওমরাহ ও জমিদারদের বংশধরেরা গোপনে হীরাজহরৎ বিক্রি করে পূর্ব-পুরুষের ঠাট বজায় রাখতে চেষ্টা করছে। তাদের কাছে পাঁচশো টাকা দামের হীরা অনায়াসেই দুশো টাকায় পাওয়া যায়। এখান থেকে লাখ টাকার জহরৎ নিয়ে গেলে বিলাতের বাজারে তা দু লাখে বেচা চলবে। সে-ও একটা মস্ত লাভ। ম্যালকম সাহেব তাই হীরা জহরৎ কিনতো।

ম্যালকম বললো—তুমি জহরৎ বিক্রী কর?

আগন্তুক বললো—না সাহেব, আমার ঠাকুরদা ছিলেন অযোধ্যার বেগমের উজির। হেস্‌টিংস সাহেব যখন বেগমের বাড়ী লুঠ করেন তখন বেগমের কিছু হীরে-জহরৎ আমার ঠাকুরদার কাছে ছিল। সেগুলি উত্তরাধিকার হিসাবে এখন আমিই পেয়েছি। তার কিছু আমি এখন বিক্রী করবো, টাকার বড় দরকার।

—কি রকম জিনিস আছে দেখাতে পার?

আগন্তুক এবার সামনের কুর্শীখানার উপর বসে পড়লো, বললো—নবাব বাড়ীর সাঁচ্চা জিনিস হুজুর, হাজার টাকার নীচে কোনটারই দাম হবে না।

—সঙ্গে আছে? দেখাতে পার?

—দুখানা পান্না আছে সাহেব, দেখাচ্ছি। তবে এখানে তো সে জিনিস দেখানো যাবে না সাহেব। ঘরে চলুন—দামী জিনিস, আমার বিপদ হবে।

সাহেব উঠে পড়লো, বললো—এসো।

দিল্লীওলাকে নিয়ে সাহেব ঘরে ঢুকলো।

দিল্লীওলা চারিপাশে তাকিয়ে নিয়ে বললো—এখনি কেউ এসে পড়বে না ত?

—চাকর দারোয়ান সব ওদিকে খানা পাকাচ্ছে, না ডাকলে কেউ আসবে না।

ঠিক আছে।—বলে দিল্লীওলা আচকানের পকেটে হাত ভরে দিলে। পরক্ষণেই বের করে আনলো একটা

সাহেবের বুকের উপর পিস্তলটি ধরে......

দেশী পিস্তল, সাহেবের বুকের উপর পিস্তলটি ধরে বললো—একটু আওয়াজ তুললেই মৃত্যু! যদি মরতে না চাও তো সিন্দুকে যত হীরে জহরৎ আছে, বের করে দাও।

সাহেব কি করবে ভেবে না পেয়ে বললো—এখানে তো কিছু নেই।

—কোথায় আছে?

—নীলকুঠির কাছারীতে।

—না। সব এখানে আছে, হয় বের করে দাও, না হয় গুলিতে মর।

—তুমি আমার সঙ্গে কাছারীতে চল।

—তোমার সঙ্গে যাবো না, তোমাকে খুন করে যাবো। আমার বাবাকে ঠেঙিয়ে গাছতলায় শুইয়ে দিয়ে এসেছিলে, তোমাকে মেরে আমি এখানে শুইয়ে রেখে যাবো।

সাহেব অবাক হলো,—তুমি রঘু আচায্যি? তোমাকে চেনা যায় না।

—বাজে কথা থাক্, জহরৎ দেবে না গুলি খাবে? আমার সময় নেই।

—এখানে তো কিছু নেই। এখানে বাক্স, সিন্দুক কিছু দেখছ?

ঘরে সত্যই কিছু ছিল না, শুধু একপাশে একখানি খাট পাতা ছিল। তার উপর কয়েকটা বালিশ, ও মোটা গদী।

রঘু বললো—আমি জানি, ওই বালিশে জহরৎ সেলাই করা আছে, খুলে দাও।

—বালিশের মধ্যে?

প্রচণ্ড এক থাপ্পড় পড়লো সাহেবের গালে। সাহেব 'আঁক' করে উঠলো। রঘুনাথ বললো—জলদি, না হলে এখনি গুলি করবো।

এদেশের কালো আদ্‌মি যে সাহেবের গায়ে হাত তুলবে, সাহেব তা কোনদিনই ভাবেনি। বাহিরের পানে তাকিয়ে দেখলো, সাহায্য পাবার মত কেউ নেই। তবু—

—ঠিক আছে, তৈরী হও, গুলি করবো—

রঘুর মুখের পানে তাকিয়ে সাহেব আর ভরসা পেলে না, উঠে দাঁড়ালো।

বিছানার উপর একটা তাকিয়া, ছিল, সেটা ছিঁড়তেই তার ভিতর থেকে গোটা পঁচিশ হীরা বেরুলো। রঘুনাথ সেগুলি পকেটে ভরলো।

থাক, আজকের মতো এই অনেক, পরে আবার আসবো।—বলে রঘু চট্ করে মাথার পাগড়ীটা খুলে

নিয়ে সাহেবের হাত দুখানা বেঁধে ফেললো। পাগড়ীর একটা খুঁট ঠেসে দিল সাহেবের মুখে। তারপর পিস্তলটা পকেটে ভরে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরদিন সকালে সেই তল্লাটে নতুন করে ঢেঁড়া পিটানো হলো ঃ রঘু আচার্য্যিকে যে ধরিয়ে দেবে সে হাজার টাকা পুরস্কার পাবে!

এবার রঘুনাথ ধরা পড়লো।

ধরিয়ে দিল এক বাউল। বাউল এদিকের পাঁচ-সাতখানা গ্রামে গান গেয়ে ভিক্ষা করতো। সে খবর শুনলো রঘুর পিসিমা অক্ষয় তৃতীয়ায় ব্রত করবেন, ব্রত-পার্বণ উপলক্ষ্যে গাঁয়ের মানুষকে দান দেওয়া হবে। যাদের ঘর পুড়েছে, তারা টাকা পাবে, যারা গরীব মজুর খাটে, তারা পাবে কাপড়, আর ছোট ছেলেমেয়েরা পাবে মিঠাই। সন্ধ্যার সময় যেন সব রঘুর বাড়ীতে জমায়েত হয়। বাউল সেই খবর পৌঁছে দিলে থানায়, দারোগা বললো—খবর যদি সত্যি হয়, রঘুকে যদি ধরতে পারি হাজার টাকা তুমি অবশ্য পাবে।

বাউল বললো—অনেক দিনের আশা, টাকাটা পেলে আমি কাশী চলে যাবো।

অক্ষয় তৃতীয়ার দিন সন্ধ্যার পর পুলিস এসে নামলো ঘাটে। তখন অনেক মানুষ জমে গেছে আচার্য্যি-দের বাড়ীতে। রঘুনাথের দানখয়রাতি শুরু হয়েছে, এমন সময় পুলিস এসে ঘিরে ধরলো।

রঘুনাথ কিন্তু মোটেই চঞ্চল হলো না। বললো—থানায় যাবো, আগে দানখয়রাতি শেষ হোক্!

দারোগা জোরজুলুম করতে চাইছিল। রঘু বললো—জোরজুলুম চালালে দাঙ্গা হবে, এখানকার সব ছেলে-ছোকরা আমার দলে। আমি খুন-জখম চাই না, আপনি অপেক্ষা করুন, কাজ শেষ করে আমি আপনার সঙ্গে যাবো।

দারোগা রঘুকে এতোটা ভদ্র বলে আশা করতে পারেনি। চারপাশে ভিড়ের পানে তাকিয়ে হাঙ্গামা করতেও তার সাহস হলো না। কুড়িজন মাত্র পুলিস আর এখানে দু-তিনশো লোক। হাঙ্গামা বাধলে ব্যাপার সুবিধা হবে না। যারা গাঁয়ের পথে একটা লাল পাগড়ি দেখলে ভয় পেতো, তারা এতগুলো বন্দুকধারী দেখেও নড়ে না, দারোগার বিস্ময় লাগে। কিছুটা অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে সে মনে করলো।

দানখয়রাতি শেষ হতে রাত একপ্রহর কেটে গেল, তারপর রঘু বললো—এবার চলুন।

অত্যন্ত সহজভাবে রঘু এসে পুলিসের নৌকায় উঠলো। অবশ্য গাঁয়ের অনেক ছেলেছোকরা ঘাট অবধি এসেছিল পিছু পিছু।

রঘু ধরা পড়েছে শুনে ম্যালকম সকালেই ছুটে এলো থানায়। রঘুকে আনা হলো সাহেবের সামনে। সাহেব বললো—বিচারে তোমার কি শাস্তি হবে, কিছু জানো?

রঘু বললো—বেশী কিছুই হবে না। দু-চার বছর জেলে ঘানি টানতে হবে।

—দ্বীপান্তর কি ফাঁসীও হতে পারে।

—না। আমি ডাকাতিও করিনি, খুনও করিনি।

—তোমার নামে ডাকাতির অভিযোগ আছে, তুমি লোকের ঘরে আগুন দিয়েছ, বাড়ী লুঠ করেছ, আমার বরকন্দাজকে আহত করেছ, তোমাকে কালাপানি যেতে হবে।

—যেতে হয় যাবো।

সাহেব ভেবেছিল রঘুকে খানিকটা ভয় দেখিয়ে দেবে, কিন্তু দেখলো রঘু ভয় পাবার মত মানুষ নয়। তবু বললো—আমি হাকিমকে বলে তোমার সাজা কমিয়ে দিতে পারি।

—আপনার অতো দয়া করার কারণ কি?

—তুমি আমার হীরে জহরৎগুলি ফিরিয়ে দাও।

রঘু এবার সাহেবের মনের কথাটা বুঝলো, বললো সেগুলো জঙ্গলের এক গাছতলায় পুঁতে রেখেছি। আমি ছাড়া কেউ সেখানকার হদিস জানে না।

—তোমাকে সেখানে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।

—আমি যাবো না। সে যেমন আছে থাক্।

—তুমি জেলে চলে গেলে, সেগুলো কি হবে?

—যেমন আছে থাকবে।

—তুমি যদি আর না ফেরো?

—যেমন আছে থাকবে! সে সব আর তুমি ফেরত পাবে না সাহেব. অনেক মানুষের সর্বনাশ করে তুমি সেই টাকা জমিয়েছ সাহেব, সে টাকা তোমাকে ভোগ করতে দেব না।

—ওগুলো ফেরত দিলে তোমার সাজা আমি অর্ধেক করে দেব; তুমি ভেবে দেখ—

—তোমার কথা আমি বিশ্বাস করিনে সাহেব। তোমার জন্যে অনেক লোকের চোখের জল পড়েছে, কিন্তু তোমার মন গলেনি। তোমাকে আমি ভাল করে চিনি সাহেব, তুমি আমার বাবাকে খুন করেছ। তুমি সাপের চেয়ে সাংঘাতিক। আমি যখন জেল থেকে ফিরে আসবো, তখন তোমার এই নীলকুঠি আমি তুলে দেব।

তুমি যদি ভাল চাও, তাহলে তার আগেই সরে পড়ো এখান থেকে, আর তোমার ওই মুচ্ছুন্দি গজেন বেটাকেও সংগে নিয়ে যেও।

সাহেব কোন মতেই রঘুকে বাগে আনতে পারলো না। যাবার সময় ক্রুদ্ধ কণ্ঠে দারোগাকে বললো—আমি হাকিমকে বলবো, এই হারামজাদাকে যেন চৌদ্দ বছর দ্বীপান্তর দেয়। তুমি বেশ কড়া করে কেস লেখো, কোন ফাঁক না থাকে।

দারোগা বললো—সে কথা আমায় বলতে হবে না হুজুর।

দারোগা খোশ মেজাজে সকাল থেকে সাজিয়ে গুছিয়ে কেস লিখতে বসলো। জমাদারকে ডেকে পরামর্শ করতে বসলো সাক্ষী-সাবুদ কাকে কোথায় পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে হাকিমকে বলে পাঁচ সাত দিন সময় চেয়ে নিতে হবে। তার মধ্যে সব ঠিকঠাক করে রঘুটাকে একবার কালাপানি পার করে দিতে পারলে একটা প্রমোশন নির্ঘাত মিলে যাবে। ইতিমধ্যে বাউলের হাজার টাকা পুরস্কারের কিছুটা ভাগ নিতে হবে, অন্ততঃ শ'দুয়েক টাকা।

দারোগা লেখে আর গোঁফে তা দেয়, নিজের কৃতিত্বেই সে আত্মহারা।

রঘু এই কদিন হাজতে পড়ে আছে।

প্রথম দুদিন রঘু চুপচাপ ছিল। তৃতীয় দিনে সে সান্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলো—আমার কি হবে বল তো? জেল না দ্বীপান্তর?

চুপ করে ঘরের বাইরে টুলটার উপর ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে সিপাহীর ভাল লাগে না, তাই সে জবাব দেয়—দ্বীপান্তর হবে, নয়তো ফাঁসী।

—আমি তো কোন খুন করিনি, ফাঁসী হবে কেন?

—তাহলে দ্বীপান্তর।

—কতদিন থাকতে হবে সেখানে?

—চৌদ্দ বছর।

—তাহলে তো সেখান থেকে আর ফিরতে পারবো না। চৌদ্দ বছর ঘানি টানতে টানতেই মরে যাবো।

—শুধু ঘানি টানা নয়, পাথর ভাঙতে দেয়, গম পিষতে দেয়,—

—চৌদ্দ বছর একভাবে ওসব করা তো সহজ নয়। মরেই যাবো। হাজার হাজার টাকার সব হীরে জহরৎ গাছতলাতেই থেকে গেল। সে টাকায় কত মানুষের বরাত ফিরে যেতো, সে সব কোন কাজেই আর লাগলো না। তবে নীলকর সাহেব অনেক অত্যাচার করেছে, গজেন ঘোষটাও মহা পাজী। ওই দুটোকে সর্বস্বান্ত করেছি, এইটেই লাভ।

রক্ষী কিছু বলে না।

খানিক চুপ করে থেকে রঘু আবার বলে—তোরা কত করে মাইনে পাস?

—দশ টাকা।

—দশ টাকা, আর আমার গাছতলায় হাজার হাজার টাকা......

আবার চুপচাপ।

খানিক পরে আবার রঘু প্রশ্ন করে—তোমার দেশ কোথায়?

—ছাপরা জেলা, রঘুনাথপুর গ্রাম।

—আমার নামে গ্রাম? বাঃ! তা গাঁয়ে তোমার কে আছে? জমি-জায়গা কত? গরু মোষ আছে?

কথায় কথায় রঘু রক্ষীর সংগে আলাপ জমিয়ে তোলে। তারপর কথায় কথায় বলে—তোমরা গরীব মানুষ, আমি তোমাকে রাজা করে দিতে পারি। আমার যা আছে, তোমার সাতপুরুষে খেয়ে ফুরাবে না। কিন্তু সে সব মাটি চাপাই রয়ে গেল। ভেবেছিলাম গরীব মানুষকে কিছু দিয়ে যাবো, তা আর হোল না। আমি কালাপানি চলে যাবো, সব মাটিচাপা রয়ে যাবে। কাউকে বলে গেলেও সে খুঁজে পাবে না। যাক্, যা হবার তাই হবে, ভাল কাজ করা আমার বরাতে নেই—আমার অদেষ্ট!

রঘু চুপ করলো।

রক্ষীর মাথায় কিন্তু ভাবনা ঢুকে গেল। দশ টাকা মাইনের পাহারাওলা লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর রক্ষী আবার এলো। দরজার লোহার গরাদের সামনে খাটিয়া পেতে বসলো। এইখানেই রাতে শোওয়া তার ডিউটি। খৈনি টিপে মুখে ফেলে দিয়ে বললো—সর্দারজী ঘুমুলে নাকি?

রঘু শুয়ে পড়েছিল, বললো—না। কেন?

—আপনার সেই টাকা-পয়সার হদিসটা আমাকে বলে দিন না, একবার চেষ্টা করে দেখি।

রঘু বললো—বললে কি আর পাবে? শিবতলার পরে গংগার তীর বরাবর আট দশ ক্রোশ জংগল আছে জান? মঠবাড়ীর জংগল। সেখানে বাজার ঘাট থেকে খানিকটা এগিয়েই একটা পুরানো বটগাছ আছে, সেই গাছের পাশ দিয়েই জংগলে ঢোকার একটা পথ আছে। সেই পথে ক'পা গেলেই একজোড়া তালগাছ আছে, তার নীচে গজেন ঘোষের তিন কলসী টাকা, আর নীলকর

সাহেবের এক কলসী জহরৎ পোঁতা আছে। যদি পারো তো তুলে নিও, তবে সবটা নিও না। আট আনা নিও, আট আনা গরীবদের দিও।

কথাটা শুনে রক্ষী উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণেই আরেক কথা তার মনে হলো। মঠবাড়ীর জঙ্গলের পাশ দিয়ে সে তো অনেকবার যাওয়া আসা করেছে, সেখানে তো অনেক বটগাছ, তালগাছও তো কম নেই খুঁজে বের করবে কেমন করে? বললো—সর্দারজী, ওখানে তো অনেক বটগাছ আছে।

—তাতো থাকবেই।

—তালগাছও তো বিস্তর।

—তা আছে।

—তাহলে কি করে হদিস করবো?

—একটার পর একটা দেখবে, যদ্দিন না পাও।

—সে তো অনেকদিন লাগবে।

—তা তো লাগবেই।

—দুমাস ছ'মাস তো হবে?

—দু'চার বছরও হতে পারে।

রক্ষী আবার ভাবতে শুরু করে।

আবার কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে ডাকে—সর্দারজী।

কি?—রঘু জবাব দেয়।

—আপনি সংগে থাকলে তো আপনি বিলকুল সেই জায়গা দেখিয়ে দিতে পারেন।

—তা পারি। কিন্তু আমি সংগে থাকবো কেমন করে? আমি তো ফাটকে আটক আছি।

—সে আমি বন্দোবস্ত করবো। আজ রাতে আপনি যেতে পারবেন?

—কেন পারবো না।

—আমি আপনাকে নিয়ে যাবো। কিন্তু সর্দারজী, কথা দিতে হবে, টাকা আপনি আমাকে দেবেন। ফাঁকী দেবেন না।

—মরদকা বাত, হাতীকা দাঁত, সিপাইজি।

—ঠিক আছে, আমি রাতে ঠিক সময় আপনাকে ডাকবো।

পরদিন সকালে থানায় সোরগোল পড়ে গেল, হাজতঘরের তালা খোলা, ঘর খালি। যে রক্ষী পাহারায় ছিল সেও নিখোঁজ।

কথাটা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো।

হাকিম দারোগাকে কতকগুলো গালিগালাজ করলেন, বললেন—যেভাবেই হোক রঘুকে ধরতে হবে, না হলে তোমার চাকরি আমি খতম্ করবো। অপদার্থ! গবেট্ কোথাকার!

কিন্তু হাজতঘর থেকে যে মানুষ কর্পূরের মতো উবে যায়, সাধারণের চোখে সে বড় সহজ মানুষ নয়। সবাইকার কাছে রঘু অলৌকিক শক্তিমান বলে মনে হয়। রঘু যেখানে যায় সেখানেই রঘুকে দেখবার জন্য গাঁয়ের মানুষ ভেঙে পড়ে। রঘু গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায় ঝড়ের মত, ছেলে-ছোকরাদের ডেকে বলে—লাঠি ধর্! নীলকরের অত্যাচার সইবি না। ওরা মারলে তোরাও মারবি। ওদের পুলিস আর লেঠেল কজন? আমরাই তো সব!

এবার রঘু দল গড়তে থাকে।

দুমাস পরে বর্ষা নামলো। গজেন বাড়ী বাড়ী ঘুরতে শুরু করলো নীলের আবাদের দাদন দিতে। কিন্তু সবার মুখে এক কথা—নীল আমরা রুইব না।

গজেন বলে—হাকিমের হুকুম।

ছেলে-ছোকরার দল বলে—মানি না!

তখন নীলকরের লেঠেল আসে, গাঁয়ের দু-দশজনকে ভয় দেখায়, মারধোর করে, ছেলে-ছোকরাদের সংগে তখন ছোট-খাটো দাংগা হয়। দু-দশজন জখম হয়। তারপর পুলিস এসে কিছু লোককে ধরে নিয়ে যায়।

রঘুনাথ এবার এক রাত্রে থানায় আগুন দেয়, নীলকুঠি পুড়িয়ে দেয়।

শিবতলা ও আশেপাশের গ্রামের খবর কাগজে বেরুতে শুরু করে। কলকাতার নামকরা সম্পাদক হরিশ মুখুজ্যে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় জোরালো ভাষায় লিখতে শুরু করলেন—এ কি হচ্ছে?

ছোট লাটের টনক নড়লো। সাহেব হাকিম বদলী হয়ে বাঙালী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এলেন। তিনি নিজে তদন্ত শুরু করলেন। নীলকরের অত্যাচার বন্ধ হলো।

লাভের আর তেমন সুবিধা নেই দেখে ম্যালকম্ সাহেব কারবার গুটিয়ে ফেললো।

ওদিকে জার্মানী থেকে নকল নীল বেরিয়ে গেল, এখানকার নীলের চাহিদা কমে গেল। দেশের মানুষ স্বস্তি পেল।

কিন্তু রঘুনাথ আচায্যির নাম লোকের মনে রয়ে গেল। ইংরেজের 'ডিসট্রিকট্ গেজেটিয়ার'-এ রইল রঘু ডাকাতের সত্যি-মিথ্যে জড়ানো ইতিহাস।
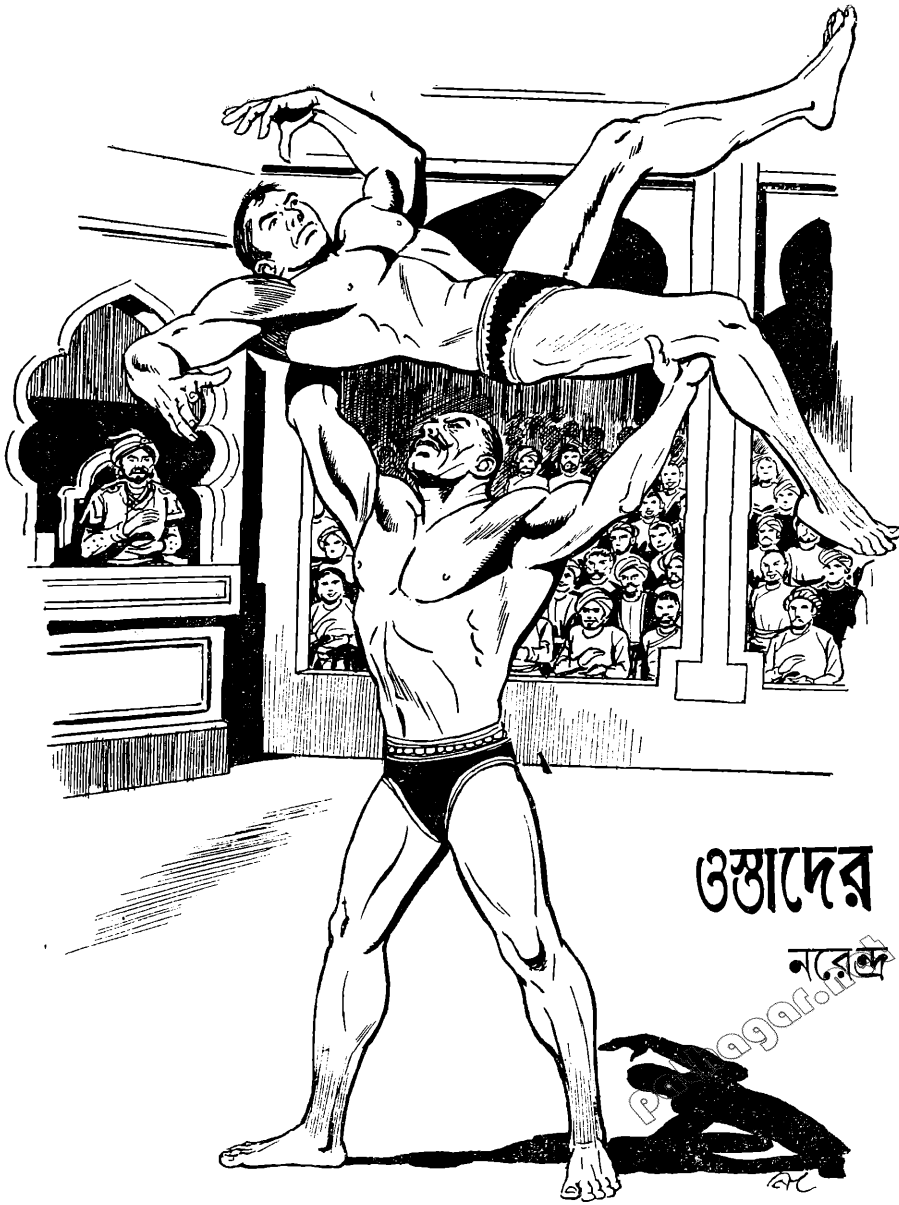
ওস্তাদের ওস্তাদী

নরেন্দ্র দেব

একজন কুস্তিগর পালোয়ান মল্লযুদ্ধে অসাধারণ ওস্তাদ ছিলেন। তাঁকে অন্যান্য দেশের ওস্তাদেরাও 'ওস্তাদজী' বলে সম্মান করতেন। সে সময় তাঁর সমতুল্য কুস্তির পালোয়ান আর অন্য কেউ ছিল না। কুস্তির প্যাঁচ তিনি যতরকম জানতেন, আর কোনও ওস্তাদই সে সময় তত রকম জানতেন না। এই কুস্তির প্যাঁচের কৌশল শেখবার জন্য তাঁর কাছে অনেক শিষ্য আসতো। তারাও নানা প্যাঁচ শিখে এক একজন ওস্তাদ হয়ে উঠতো।

এই সব শিষ্যদের মধ্যে এমন একটি ছেলে এসেছিল, যার শরীরে অসীম শক্তি এবং বুদ্ধি এত প্রখর ছিল যে, ওস্তাদজীর কাছে অতি কঠিন প্যাঁচও সে দু' একদিনের চেষ্টাতেই আয়ত্ত করে ফেলতো। ওস্তাদজী তার শরীরের এই অসাধারণ বলিষ্ঠ ক্ষমতা, তীক্ষ্ন বুদ্ধি এবং সবরকম কুস্তির কৌশল শেখবার অত্যন্ত আগ্রহ দেখে খুব খুশী হয়ে এই শিষ্যটিকে তাঁর জানা সব রকম কৌশল ও প্যাঁচ শিখিয়ে দিলেন। কেবল একটি মাত্র অতি কঠিন কৌশল তাঁর নিজের আয়ত্তে রাখলেন।

শিক্ষা শেষ হবার পর তিনি শিষ্যটিকে বিদায় দেবার সময় বললেন, একজন মহামান্য নৃপতি একটি

কুস্তির পালোয়ান খুঁজছেন তাঁর রাজ্যের জন্য। তিনি আমাকে বহুমূল্য বেতন দিয়ে তাঁর রাজ্যে শ্রেষ্ঠ পালোয়ানরূপে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি কারুর অধীনে বেতনভোগী কর্মী হতে সম্মত নই বলে সে কাজ নিইনি। কিন্তু রাজাকে ভরসা দিয়েছি যে আমারই সমতুল্য একজন ওস্তাদ পালোয়ান তাঁকে সংগ্রহ করে দেবো। অবশ্য তোমার কথা ভেবেই আমি তাঁকে এই ভরসা দিয়েছিলাম। এখন তুমি যদি মহারাজের কাজ নিতে রাজী থাকো, তবে আমি তোমাকে তাঁর কাছে পাঠাতে পারি।

শিষ্যটি দরিদ্র, তাই এই প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সানন্দে সম্মত হল। ওস্তাদজী তৎক্ষণাৎ সানন্দে একখানি পরিচয়-পত্র লিখে তাঁর এই সবচেয়ে প্রিয় শিষ্যটিকে মহারাজের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মহারাজ এই শিষ্যটিকে কাজে নিযুক্ত করবার আগে তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। মহারাজের অনুরোধ উপেক্ষা করে উক্ত ওস্তাদজী তাঁর রাজ্যে প্রধান পালোয়ানের পদ গ্রহণে অস্বীকার করায় তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন তাই, প্রথম প্রশ্নই তিনি করলেন, তুমি কি মল্লযুদ্ধের প্রতিযোগিতায় তোমার ওস্তাদজীকেও হারিয়ে দিতে পারবে ?

সে নিজেও যে একজন অসাধারণ কুস্তিগির, শিষ্যটির মনে এই অহংকার ও গর্ব খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল; কারণ, এ পর্যন্ত দেশে যত মল্লযুদ্ধের আসরে কুস্তির লড়াইয়ের প্রতিযোগিতা হয়েছিল, সর্বত্র সে জয়ী হয়ে প্রথম পুরস্কার অর্জন করেছিল। কাজেই সে বেশ জোর গলায় বললে এদেশে এমন কেউ নেই মহারাজ, যে মল্লযুদ্ধে আমাকে হারাতে পারে।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তোমার ওস্তাদজীকেও মল্লযুদ্ধের প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিতে পারবে ?

শিষ্যটি ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বললে, মহারাজ! ওস্তাদজীকে 'ওস্তাদ' বলে চিরকালই মান্য করবো নিশ্চয়, কারণ, তিনি আমার শিক্ষাদাতা গুরু। কিন্তু মল্লযুদ্ধে আর শারীরিক শক্তিতে আমি বোধ হয় তাঁর চেয়ে কোনও অংশে কম নেই।

মহারাজ তার কথা শুনে মনে মনে খুশী হলেন না, তবু তাকে পরীক্ষা করবার জন্য কুস্তির প্রতিযোগিতা আহবান করবার আদেশ দিলেন। বললেন, তুমি যদি এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে পারো, তবে দ্বিগুণ বেতন দিয়ে তোমাকে কাজে নিযুক্ত করবো এবং সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দেবো। আর যদি পরাজিত হও, তোমাকে শাস্তি দেব।

শিষ্যটি মহারাজকে প্রণাম করে এ প্রস্তাবে সম্মত হল।

দেশে দেশে এই মল্লযুদ্ধের ঘোষণা প্রচারিত হল এবং সমস্ত খ্যাতনামা, যশস্বী, কুস্তিগির পালোয়ানদের নিমন্ত্রণ জানানো হল এই কুস্তি প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য। ওস্তাদজীর কাছে সর্বাগ্রেই নিমন্ত্রণ এলো। তিনি এখবর পেয়ে মনে মনে একটু হাসলেন। ভাবলেন, শিখতে না শিখতেই এত দম্ভ! এটা ভাল নয়। ওর শিক্ষা দেখছি সম্পূর্ণ হয়নি। তিনি এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেবেন বলে সম্মতি জানিয়ে চিঠি দিলেন।

কুস্তির এই প্রতিযোগিতার খবর পেয়ে দেশ-বিদেশের যত বড় বড় সব নামকরা পালোয়ান আসতে লাগলেন। কিন্তু একে একে সবাই হেরে যেতে লাগলো আর লড়াইয়ের প্রাঙ্গণ বারবার হাস্য-কোলাহল ও জয়ধ্বনিতে ভরে উঠতে লাগল।

সব শেষের দিন এসে উপস্থিত হলেন ওস্তাদজী। গুরু-প্রণাম করে ও পরস্পরকে অভিবাদন জানিয়ে গুরু-শিষ্যের মল্লযুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হল। সমস্ত সভা-প্রাঙ্গণ "হর হর শংকর" ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো। আজ আর রাজপুরীর প্রাঙ্গণে লোক ধরে না। এই প্রতিযোগিতা দেখবার জন্য বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাই এসে জড় হয়েছে। স্বরাজ্যের আর আশেপাশের অন্যান্য রাজ্যের লোকেরাও এসে ভিড় করেছে। কারণ, ওই শিষ্যটির নাম এবং তার ব্যায়াম কৌশলের খ্যাতি সর্বত্রই এর মধ্যে রটে গিয়েছিল।

"শিব শিব মহাদেব" শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গুরু-শিষ্যের মল্লযুদ্ধ শুরু হল। আজ মহারাজ স্বয়ং এসেছেন এই কুস্তির লড়াই দেখতে। কারণ, তিনিই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, এই নতুন কুস্তিগির পালোয়ানটি যেন প্রাচীন ওস্তাদটিকে হারিয়ে দিয়ে তার স্পর্ধা চূর্ণ করে।

কিন্তু রাজার ইচ্ছা পূর্ণ হল না। কিছুক্ষণ শিষ্যটিকে লড়বার সুযোগ দিয়ে শেষে ওস্তাদজী তাঁর সেই গোপন প্যাঁচটি চালিয়ে মুহূর্তের মধ্যে দাম্ভিক যুবক শিষ্যটিকে একেবারে সটান লম্বা চিৎপাত করে ফেললেন।

দর্শকদের সভা থেকে সহস্রকণ্ঠে জয়ধ্বনি ও করতালি শুরু হল। আবালবৃদ্ধবনিতা, হাজার হাজার নরনারী আনন্দউল্লাসে চিৎকার করতে লাগলো।

মহারাজ তাঁর পালোয়ানের পরাজয়ে দুঃখিত হলেন না। বরং তার স্পর্ধা আর দম্ভ চূর্ণ হল দেখে তিনি মনে মনে সুখীই হলেন। কিন্তু রাজ্যের পাত্র, মিত্র, মন্ত্রীবর্গ, সভাসদগণ প্রভৃতি সকলেই তাঁদের পালোয়ানের পরাজয়ে বড়ই দুঃখিত ও লজ্জিত হয়ে পড়লেন। কারণ, তাঁরা সকলেই আশা করেছিলেন যে, তাঁদের এই পশুরাজ সিংহের মতো অসাধারণ শক্তিশালী ভীমের ন্যায় বলবান যুবক পালোয়ানটি প্রতিবারে যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী সকল পালোয়ানকে সহজেই লড়াইয়ে হারিয়ে জয়ী হচ্ছিলেন এই বয়োবৃদ্ধ কুস্তিগির পালোয়ানকেও তেমনি সহজেই পরাজিত করতে পারবেন।

কিন্তু, হয়ে গেল তাঁর বিপরীত কান্ড। কিছুক্ষণ উভয়ে ধস্তাধস্তি চলতে লাগলো। শিষ্য যত প্যাঁচ কষে সবই তো তার গুরুর কাছে শেখা। সে প্যাঁচের কাটান দিতে হয় কেমন করে গুরু তাও শিষ্যকে শিখিয়েছিলেন। সুতরাং অতি সহজেই শিষ্যের সব প্যাঁচ তিনি কাটিয়ে বেরিয়ে আসছিলেন, আর দর্শকদের জয়ধ্বনিতে কুস্তির ময়দান মুখরিত হয়ে উঠছিল।

তবে ওস্তাদজীর বয়স বেশী। অনেকক্ষণ লড়বার মতো দম তো ছিল না তাঁর। সেই জন্য তিনি যে প্যাঁচটি শিষ্যকে শেখাননি এবার সেই প্যাঁচটি প্রয়োগ করলেন। শিষ্য তার প্রয়োগ ও প্রতিরোধ কিছুই জানতো না। কাজেই, নিজেকে সে বড় অসহায় বোধ করছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই দর্শকেরা দেখলে সেই বয়স্ক পালোয়ান রাজার জোয়ান লড়িয়েকে মুহূর্তের মধ্যে শূন্যে তুলে ফেললেন এবং চোখের পলক পড়তে না পড়তে সেই দুর্দান্ত শক্তিশালী যুবক পালোয়ান মাটিতে চিৎপাত হয়ে পড়লো এবং পাশ ফেরবার আগেই সেই বয়স্ক পালোয়ান তার বুকে পা তুলে দাঁড়ালেন। লোকারণ্য রাজপ্রাঙ্গণ তৎক্ষণাৎ করতালি ও জয়ধ্বনিতে পূর্ণ হয়ে উঠলো।

আগেই বলেছি, শিষ্যের পরাজয়ে রাজা খুশী হয়েছিলেন। অহংকারীর পরাজয়ে তিনি প্রীত হলেন। গর্বিত লোকের গর্ব চূর্ণ করার জন্য তিনি সেই বর্ষীয়ান গুরুকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করলেন। জনতার জয়ধ্বনিতে লড়াইয়ের মাঠ আবার পূর্ণ হয়ে উঠলো।

মহারাজ তখন সেই উদ্ধত যুবককে তিরস্কার করে বললেন তুমি অতি নির্বোধ ও মূর্খ। তোমার অহংকারের উপযুক্ত ফল পেয়েছো। যাঁর দয়ায় কুস্তি লড়তে শিখেছো তাঁরই সঙ্গে তুমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নামলে, তোমার একটু লজ্জা বোধ হল না? ভগবান তোমাকে তাই উপযুক্ত প্রতিফল দিলেন।

যুবক শিষ্য এবার অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে সবিনয়ে বললে, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন মহারাজ। আমাকে গুরুজী যে সব কিছু শেখান নি আজ বুঝতে পারলুম।

ওস্তাদ মৃদু হেসে বললেন; বৎস! আমি এই দিনের সম্ভাবনা হতে পারে আশংকা করেই কিছু বিদ্যা নিজের হাতে রেখেছিলুম। দেখছি, সেটা বুদ্ধিমানের মতই কাজ করা হয়েছিল। জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলে গেছেন মনে রেখো যে, কোনও শিষ্যকে এমন শক্তিশালী কোর না যাতে সে তোমার সঙ্গে শত্রুতা হলে তোমাকে পরাস্ত করতে পারে। সাধু সজ্জনেরা বলে গেছেন মনে রেখো :—

হয়তো জগতে কৃতজ্ঞতা বলে কিছু নেই।
যদিও ছিল তা' কোনোদিন আগে,
আজ তার শুধু কাহিনীই জাগে,
অস্ত্র চালাতে শিখেছে যে বা যে গুরুর কাছে,
হয়তো একদা সেই লোকই মারে অসি পাছে।

টুকরো হাসি—একটু হাসো!

—দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়

শিক্ষক—আজ ক্লাসে এত কম ছেলে কেন?
এক ছাত্র—স্যার, ক্লাসে আজ কিছু ছাত্র অনুপস্থিত।
শিক্ষক—(রেগে গিয়ে) অনুপস্থিত ছাত্রদের পিছনের বেঞ্চিতে দাঁড়াতে বলো।

ভাল্লুকেও ভেজাল

স্বপনবুড়ো

এক রকম অচেনা শহরে হঠাৎ পেছন থেকে 'পিকলু' বলে ডাকতে শুনে সে হোঁচট খেতে খেতে কোনো রকমে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর উল্টো দিকে ফিরে চার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলে—হাঁকটা আসছে কার কাছ থেকে।

আরে, থপ্‌থপ্‌ করে মূর্তিমান ঘটোৎকচ এগিয়ে আসছে যে!

ঘটোৎকচের আসল নামটা পিকলুরা সবাই যে ঠিক কবে থেকে ভুলে গিয়েছিল—সে কথা আর মাটি খুঁড়ে জানা যাবে না।

এমনিতেই ছেলেটার উঁচু লম্বা বলিষ্ঠ দেহ, আর ওই রকম থপ্‌থপ্‌ করে হাঁটা দেখে সবাই তাকে অন্য রকম মনে করত। তার ওপর যে বছর ইস্কুলে সে ঘটোৎকচের পার্ট নিয়ে বাঁশের তৈরী স্টেজটাকে আচমকা ভেঙে ফেললে, সেই থেকেই তার বাবা-মায়ের দেওয়া নামটা ছেলের দল একেবারে বেমালুম ভুলে গেল, আর সরাসরি 'ঘটোৎকচ' বলেই তাকে ডাকতে সুরু করে দিল।

ঘটোৎকচ আদৌ তাতে চটত না। ওইটেই যেন তার আসল নাম এইভাবেই ছেলেদের কৌতূককে সে সহজ ভাবে গ্রহণ করেছিল।

মান্ধাতার আমলের সেই ঘটোৎকচ ওকে দেখতে পেয়ে যেন হাতের মুঠোর মধ্যে চাঁদ খুঁজে পেলে! একেবারে লুফে নিলে ওকে—যেমন নাকি পাঠশালার ছেলেরা পাকা পেয়ারা লুফে নেয়। বললে, আরে পিকলু, তুই! এই শহরে এলি কোথা থেকে?

পিকলু উত্তর দিলে, খুব হালে এসেছি। কিন্তু ঘটোৎকচ, এই অজানা শহরে তুই কি করছিস?

ঘটোৎকচ হো-হো করে হাসতে লাগলো। বলল,

আমাদের আবার জানা-অজানা। আমরা সারা দেশের শহরে শহরে ঢুঁ মেরে বেড়াই—

পিকলু জিজ্ঞেস করে, কিন্তু কাজটা কি শুনি?

ঘটোৎকচ তার ছোট চোখ দুটি নাচিয়ে মিটিমিটি হাসল, সে ভারী মজার কাজ। সার্কাসে চাকরী নিয়েছি যে! তাই সব শহরে শহরে আমাদের আনাগোনা। নানান জায়গার জল পড়ছে পেটে। আর সেই সঙ্গে নানান জায়গার বিচিত্র সব খাবার। যেমন খাবার খাই, আর তেমন জল খাই—! দারুণ খিদে পায় ত! কাজেই সব হজম হয়ে যায়।

কিন্তু সার্কাসে তোর কাজ কি?—পিকলুর অবাক প্রশ্ন।

ঘটোৎকচ উত্তর দেয়, আমার কাজটা ভারী রগড়ের। একটি মোটা ভাল্লুককে নিয়ে খেলা দেখাতে হয়। ভাল্লুকটা কখনো তালে-তালে নাচছে, কখনো মধু খাবার জন্যে আবদার করছে, কখনো কেঁপে জ্বর আসছে তার। আবার পর মুহূর্তেই সোজা বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যেন বক্তৃতা দিচ্ছে।

পিকলু উৎসাহিত হয়ে বললে, খুব মজার ব্যাপার ত! আমায় দেখাবি তোদের ভালুকের খেলা?

—দেখাবো বৈ কি! সার্কাসের দলে আমার কি রকম খাতির দেখবি! তোকে একেবারে বক্সে বসে দেখাবো। তখন বুঝবি আমার কেরামতিটা! চল, আমাদের ডেরাটা আগে দেখে আসবি।

সত্যি, পেল্লায় কাণ্ড বলতে হবে।

শহরের এক প্রান্তে নদীর ধারে বিরাট তাঁবু পড়েছে। ছোট, বড়, মাঝারি আরো অনেক তাঁবুও আছে। বড় তাঁবুর ভেতর জানোয়ারগুলো থাকে। আর যারা খেলা দেখায় তারা থাকে ছোট ছোট তাঁবুগুলির ভেতর।

সার্কাস অঞ্চলে ঢুকে ঘটোৎকচের যার সঙ্গেই দেখা হয়, একেবারে দারুণ হুল্লোড় করে পরিচয় করিয়ে দেয় পিকলুর সঙ্গে।—মেরা দোস্ত আ গিয়া। You see—he is my friend—! দেখো ভাই, আমার ছেলেবেলার বন্ধু—

আনন্দের আতিশয্যে কখনো বলছে হিন্দীতে, কখনো ইংরেজীতে, আবার কখনো বাঙলায়।

তারপর পিকলুর কানে কানে কইলে, বুঝলি পিকলু, আজ যা একখানা ভাল্লুকের খেলা দেখাবো—

পিকলু বললে, সে ত বুঝলাম, ঘটোৎকচ। কিন্তু তোর সেই মজাদার ভাল্লুকটা কোথায়? সেটা আমাকে আগে দেখা! ভালো কথা, আঁচড়ে-কামড়ে দেবে না ত?

শুনে ঘটোৎকচ হো-হো করে হাসতে লাগলো, আমি সঙ্গে রয়েছি, তোর ভয়টা কি শুনি?

দুজনে গিয়ে হাজির হল মস্তবড় এক ভালুকের খাঁচার সামনে।

ঘটোৎকচকে দেখে ভাল্লুকটা আনন্দে নৃত্য সুরু করে দিল।

পিকলু বললে, ভাল্লুকটা তোকে ভারী চেনে দেখি। দেখেই একেবারে নাচতে সুরু করে দিল।

ঘটোৎকচ বললে, নইলে আর আমার পোষা ভালুক কিসে? জানিস, কথা বললে বোঝে। তুই যদি কিছু খেতে দিস—তাহলে তোর সঙ্গেও দিব্যি ভাব হয়ে যাবে।

পিকলু শুনে খুব মজা পেল। বললে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই খেতে দেবো। তোর ভাল্লুক কি খেতে ভালোবাসে বল? শুনেছি ভাল্লুক মৌচাকের মধু খেতে খুব ভালোবাসে। হ্যাঁ, ভালোকথা, একটা বইয়েতে পড়েছি—, মহুয়া খেতে ভাল্লুক খুব ভালোবাসে।

আরে রেখে দে তোর বইয়ের লেখা।—ঘটোৎকচ হুঙ্কার দিয়ে উঠল, আমার কাছে সব শুনে নে। আমার ভাল্লুক সব কিছু খেতে ভালোবাসে। মানে, তুই যা-যা খেতে ভালোবাসিস—সব খাবার।

—বলিস কি? ভাল্লুক সব খাবার খেতে ভালো-বাসে? কচুরী—সিঙাড়া—গরম জিলিপি—সব?

একেবারে বিলকুল!—ঘটোৎকচ চোখ দুটি নাচিয়ে একেবারে অভিজ্ঞের হাসি হাসতে থাকে। তারপর নিজেই ঠোঁট চেটে বলে, একেবারে মানুষের মতো যা দিবি সব গপাগপ্ খেয়ে নেবে। এতটুকু মুখ বাঁকাবে না!

আমি তাহলে দোকান থেকে কিছু টাটকা খাবার নিয়ে আসি।—পিকলু খুবই উৎসাহিত।

—হ্যাঁ, একেবারে তিনজনের মতোই আনিস। খাওয়ায় ওর খুব হাতযশ আছে। ঠিক একটা মানুষের মতোই গপাগপ্ খেয়ে নেবে।

পিকলু এক ঝুড়ি গরমাগরম খাবার যখন নিয়ে এলো, ভাল্লুকটা ঠিক মানুষের মতোই আনন্দে নৃত্য করতে লাগলো।

পিকলুও মহা উৎসাহে খাবারের ঠোঙাটা ওর দিকে এগিয়ে দিল। আর তক্ষুণি পিকলুকে অবাক করে দিয়ে ভাল্লুকটা দুই হাতে কপ্ কপ্ করে খাবার খেতে লাগলো।

পিকলু আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল, বাঃ! দিব্যি মানুষের মতো খাচ্ছে কিন্তু তোর ভাল্লুকটা।

ঘটোৎকচও কম উৎসাহিত হয়ে উঠল না। বললে, হ্যাঁ, মানুষের মতোই ত! কিরকম ট্রেনিং দিয়েছি আমি! একেবারে মানুষও বলতে পারিস।

হঠাৎ পরিতৃপ্ত ভাল্লুকটা ঢেকুর তুলল। পিকলু চোখ দুটো বড় বড় করে শুধায়, অ্যাঁঃ, তোর ভাল্লুক দেখছি পেট ভরলে মানুষের মতো ঢেকুর তোলে!

একটু বাদে ভাল্লুকটা গলা উঁচিয়ে মানুষের ভাষায় বলে উঠল, জল!

পিকলুর চোখে মুখে পরম বিস্ময়। ঘটোৎকচের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলে, অ্যাঁ। তোর ভাল্লুকটা দেখছি ঠিক মানুষের মতো কথা বলতে পারে!

ঘটোৎকচ বিজ্ঞের হাসি হেসে উত্তর দিলে, হুঁ-হুঁ সব শিখিয়েছি যে !

—বাংলাও শিখিয়েছিস ভাল্লুককে!

ঘটোৎকচ বললে, নয়ত কি! কাজের সুবিধের জন্য কত কিছু করতে হয়।

এইবার ভাল্লুকটা করল কি, সহসা তার মুখ থেকে মুখোশটা খুলে ফেললে। কি আশ্চর্য! ভেতরে একটা মানুষের মুখ!

পিকলুর চোখ তখন কপালের ওপর উঠেছে! বললে, অ্যাঁ! ঘটোৎকচ, করেছিস কি? একটা মানুষকে দিব্যি ভাল্লুক সাজিয়ে রেখেছিস?

ঘটোৎকচের মুখে তখনো বিজ্ঞের হাসি! সে বললে, সার্কাস চালাতে গেলে অনেক কিছু করতে হয়। আমাদের পুরোনো ভাল্লুকটা মারা গেছে। কিন্তু তাই বলে সার্কাসের খেলা ত বন্ধ থাকতে পারে না। প্ল্যানটা কিন্তু আমারই। দিব্যি মানুষটাকে ভাল্লুকের পোশাক পরিয়ে নিয়ে খেলা জমিয়ে তুলেছি। সার্কাসের ম্যানেজারও আমার কাজ দেখে ভারী খুশী। পঁচিশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছে। তাছাড়া ভাল্লুকের পরিচর্যা করার ঝামেলাটা কমে গেছে। বিশ্বম্ভর আমাদের সঙ্গে বসে দিব্যি ডাল-ভাত খায়!

বিশ্বম্ভর মাথা দুলিয়ে বললে, হ্যাঁ বাবু, বড্ড খিদে পেয়েছিল। তিনজনের খাবার তাই একাই সেরে দিয়েছি। আপনার জয় জয়কার হোক।

কাণ্ড দেখে পিকলু একেবারে তাজ্জব বনে গেছে।

খাদ্যে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল, মাছের গায়ে আলতা মাখানো এসব ওরা জানে! কিন্তু ভাল্লুকে ভেজাল? কোথায়ও শোনেনি, আর কোনো বইয়েতেও পড়েনি!

পিকলু জিজ্ঞেস করলে, এই রকম করে তুমি দিনের পর দিন ভাল্লুক সেজে খেলা দেখাচ্ছ?

বিশ্বম্ভর শুনে হি-হি করে হেসে উঠল। জবাব দিলে, বাবু, ঝামেলা ত কিছু নেই! দিব্যি পোশাকটা পরি, আর সন্ধ্যেবেলা ভাল্লুকের নাচ দেখাই। রোজ পাঁচ টাকা করে নগদ পাই। তাছাড়া সার্কাসের হেঁসেল থেকে কোন-না দেড়শ টাকার ভাত খাই? আমার দিব্যি পুষিয়ে যায়। আর ভেবে দেখুন বাবু, সার্কাস কোম্পানীরও কত সুবিধে। একটা ভাল্লুক পোষা কি সোজা কথা? হাতি পোষার চাইতেও শক্ত। কথায় কথায় ভাল্লুকের জ্বর সামাল দেবে কে? ভাল্লুকের আচড়-কামড় আছে,—তাছাড়া কোথায় মৌচাকের মধু, কোথায় মহুয়ার রস,—এসব জোগান দেবে কে শুনি? বাঘ-সিংহ মাংস পেলেই খুশী। কিন্তু ভাল্লুক ত তা নয়—

পিকলু বললে, তাই বলে ভাল্লুকে ভেজাল?

বিশ্বম্ভর হাসতে হাসতে জবাব দিলে, মানুষ-ভাল্লুকের নাচ দেখে দর্শকরা বেশী খুশী হয়,—বুঝলেন বাবু?
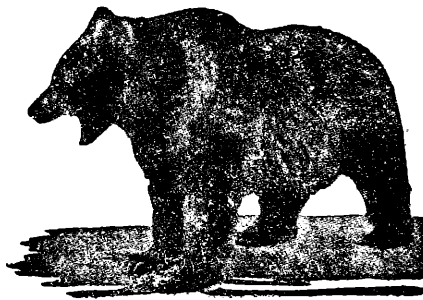
বাঘের পিছু নিয়ে

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

ঘাটশীলা থেকে পায়ে হেঁটে টাটায় যেতে মাঝখানে পড়ে। জায়গাটার নাম উখরা। ঘন জঙ্গলের ভেতর ছোট্ট পাহাড়ী গ্রাম। শাল, পেয়াশাল, ক্যাঁদ, জারুল ও পলাশের গাছ ডালপালা ছড়িয়ে জড়াজড়ি করে চলে গেছে দূর দূরান্ত পর্যন্ত। বন কোথাও গভীর, কোথাও হালকা। কিন্তু বলতে গেলে প্রায় কোনখানেই ছেদ নেই তার।

উখরা জংলা গ্রাম। তবে মাঝে মাঝে আছে কিছু পরিষ্কার ফাঁকাও। মাটি সেখানে হয় তামাটে, নয়ত গেরুয়া। পূবে পশ্চিমে দুই যমজ ভাইয়ের মত দুটো পাহাড়। যেটা বড়, তার গা দিয়ে সরু ধারায় নেমে আসছে খোলা লালচে জল। যেখানে যেখানে জমেছে এসে সেই জল, সেগুলো দেখায় অনেকটা ছোট ছোট হ্রদের মত। তাতে হয়ে রয়েছে প্রচুর পানিফল, ফুটেছে রাশি রাশি লাল সাদা শালুক।

শীতের শেষে হঠাৎ উখরাতে দেখা দিয়েছে বাঘের উৎপাত। নিরুপায় গ্রামবাসীরা তাতে ভয়ে অস্থির। এখানকার অধিবাসীরা বেশীর ভাগই কুর্মি আর ছত্রিশগড়িয়া। তারা জুম চাষ করে, লোকের খেত খামারে ঠিকে খাটে। জুম চাষ কি জান ত? মাটিতে কোদাল দিয়ে বড় বড় অগভীর গর্ত খোঁড়ে তারা। জঙ্গলে আগুন দিয়ে সেই পোড়া বনের ছাই এই সব গর্তে ফেলে সার হিসাবে। তারপর তাতে লাগায়

ধান, গম, ভুট্টা, মরুয়া, কাওয়ান। আরো অনেক কিছু। ফসল এতে ভালই হয়। তাছাড়া গোরু ভেড়া ছাগল আর মুরগী পোষে। দুধ মাংস ডিম হয়। নিজেরাও খায়, বিক্রিও করে।

হঠাৎ বাঘের দাপট আরম্ভ হতে মুশকিলে পড়ল সবাই। আজ একজনের বাছুর নিয়ে গেল। কাল আর একজনের ভেড়া খোয়া গেল। তার পরদিন অন্য এক-জনের উঠানের ওপর থেকে ঘুমন্ত কুকুরটা টেনে নিয়ে গেল। বাঘের থাবায় পড়ে প্রাণীটা শেষ বারের মত করুণ কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে। তা শুনে মশাল জ্বালিয়ে টাঙি নিয়ে সবাই বেরতে বেরতেই শিকার মুখে নিয়ে দৌড়ে বনে চলে যায় বাঘ।

অবশেষে ঘাটশীলায় খবর এল গোবিন্দবাবুর কাছে। গোবিন্দ মহাপাত্র ডাক্তার। আবার শিকারীও বটে। অনেক বাঘ ও ভালুক মেরেছেন। মেটে খরগোস, ময়াল সাপ এবং বুনো শুয়োরকে ত তিনি গ্রাহ্যই করেন না। কত যে প্রাণ হারিয়েছে তাঁর হাতে, তার সীমা সংখ্যা নেই। শিকারের খবর পেলেই নেচে ওঠেন গোবিন্দবাবু। সেই সঙ্গে তাঁর হাতের বন্দুকও।

বেড়াতে এসে অতিথি হয়েছিলাম তাঁর বাড়ীতে। কয়েকদিন কাটিয়ে ফিরব ফিরব করছি, এমন সময় এল উখরায় বাঘের খবর এবং গ্রামের লোক ধরে বসল গোবিন্দবাবুকে বাঘটা মেরে দিতে হবে বলে। আমাকে বললেন ভদ্রলোক, চল আমার সঙ্গে। বনে বেড়াবে। নূতন অভিজ্ঞতা হবে।

কলকাতার মানুষ। বাঘ দেখিনি তা নয়। তবে তা হয় চিড়িয়াখানায়, আর নয়ত সার্কাসে। জঙ্গল দেখেছি বেশীর ভাগই সিনেমায়। একবার সুন্দরবনে গিয়েছিলাম, সেও লঞ্চে চেপেই খালে খালে ঘুরেছি। ডাঙায় আর পা দিয়েছি কতটুকু! আগ্রহ হল। বললাম, চলুন যাব। একেবারে আনাড়ী ত আর নই। বন্দুকের ঘোড়া চিনি।

গোবিন্দবাবু রসিক লোক। তিনি বললেন, এক-বার সামনে বাঘ দেখলেই চোখে সর্ষে ফুল ফুটবে। তখন চেনা ঘোড়াই হাতী হয়ে নাচতে থাকবে। তোমাকে আমি কুমায় (শিকারের মঞ্চে) নোব না। কোন লোকের বাড়ীতে রেখে একাই বসব চার ফেলে। আর নিই ত বড়জোর নোব একটা টাঙিওয়ালা।

উখরা থেকে মাইল তিনেক দূরে ডুমরী নদী। নদী না বলে তাকে খাল বললেই ভাল হয়। বর্ষার সময় ডুবন জল থাকে, অন্য সময় হেঁটে পার হওয়া যায়। এককালে নাকি সুবর্ণরেখার সঙ্গে যোগ ছিল তার। জলের সঙ্গে সোনা ভেসে আসত। সেই বিশ্বাস থেকেই লোকে এখনো এর বালি কুলোয় নিয়ে চালে, যদি এক আধটু সোনার কুচি মিলে যায়।

হেঁদোর মা সেদিন বিকালে জলে কোমর ডুবিয়ে বসে বালি চালছে, হঠাৎ ওপার থেকে এক লাফ দিয়ে পড়েই বাঘ তাকে ছোঁ মেরে উঠিয়ে নিয়ে বনে ঢুকে গেল। হেঁদোর মা আর টুঁ শব্দটি করার সময় পেল না। লখাই মাহাত অনেকটা তফাতে কাঠ ভাঙছিল, সে এই দৃশ্য চোখের ওপর দেখল। তারপরই ঘাট-শীলায় ছুটল গাঁয়ের লোক গোবিন্দবাবুর কাছে।

ডুমরীর পাড়ে মাচা বাঁধার আদেশ নিয়ে চলে গেল লোকগুলি। তারপর পরের দিন সকালে রওনা হলাম আমরা। একটা হ্রদের কাছে এসে দেখলাম, রাশি রাশি খঞ্জন, শালিক আর জলপিপি খুঁটে খুঁটে কি খাচ্ছে স্যাঁতসেঁতে মাটি থেকে। হঠাৎ ডান দিকের মেটে পাহাড় থেকে খড়খড় করে কি যেন নামছে মনে হল। সেদিকে বন্দুক উঁচিয়ে গোবিন্দবাবু বললেন, দেখছ, কি আসছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি ওগুলো? তিনি বললেন, কচ্ছপের ছানা। উঁচু দেখে শুকনো ডাঙায় মা ডিম পেড়েছিল। বাচ্চারা এখন জলের টানে নীচে নেমে আসছে। এই ভাবেই সাপেরা গাছের ডালে ডিম পাড়ে। সেখান থেকে ঝড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে বাচ্চারা নীচেয় ছড়িয়ে পড়ে। লোকে বলে সর্প-বৃষ্টি। দেখতে পাচ্ছ, জল-জঙ্গলে শেখার জিনিস কত। যত যাবে ততই পাবে নূতন নূতন জিনিস।

তখন ফাল্গুন মাস। অজস্র লাল পলাশ আর সাদা কুরচি ও শাল ফুলে ঝলমল করছে বন। কত রঙবেরঙের পাখী ডাকছে, উড়ছে সামনে পিছনে। সত্যিই অবাক হবার মত! কিন্তু আরো অবাক হবার ব্যাপার সামনে ছিল। কুঁই কুঁই করে বাচ্চা ছেলের কান্না শুনে তাকাতেই দেখি একটা ভালুক দুটো মহুয়া গাছের ফাঁকে মাটিতে পড়ে এপাশ ওপাশ গড়াগড়ি খাচ্ছে। দেখলাম, তার চার পা দড়ি দিয়ে বাঁধা।

গোবিন্দবাবু বললেন, মহুয়া খেয়ে মাতাল হয়ে ঘুমচ্ছিল। চাষীরা মাঠে যাবার সময় বেঁধে ফেলেছে। ফেরার বেলা টেনে নিয়ে যাবে গ্রামে। তারপর বেশ ভাল দামে বিক্রী হবে ভেলকিওয়ালার কাছে।

যাকে 'শ্লথ বেয়ার' বা আলসে ভালুক বলে, ওটা তাই। ছুঁচলো মুখ, শরীরটা রোগা রোগা। একটানা

কুঁই কুঁই করছে, আর উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

উখরায় পোঁছে আমাকে সজন বলে এক ব্যক্তির জিম্মায় রেখে চলে গেলেন গোবিন্দবাবু ডুমরীর সেই কিনারায়, যেখানে হেঁদোর মাকে বাঘ উঠিয়ে নিয়ে গেছে। বলে গেলেন যে, বন্দুকের শব্দ শুনলেই যেন সজনকে সঙ্গে নিয়ে আমি চলে যাই, কারণ বুঝতে হবে, ততক্ষণে বাঘের দফা রফা হয়েছে।

দুপুরের খাওয়া সেরে আমি শুয়ে শুয়ে মাসিক-পত্র পড়ছি সজন ভুঁইয়ার মাটির ঘরে। একটা, দুটো, তিনটে বাজল। কৈ বন্দুকের আওয়াজ ত শোনা যাচ্ছে না! খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, গোবিন্দবাবু সজনের ভাইপো রুটাইকে নিয়ে বনে ওত পেতে বসে আছেন। কে জানে কি হল তাঁর! মনে হল, তখন জোর করে সঙ্গো গেলেই হত!

কেমন যেন স্বার্থপর মনে হতে লাগল নিজেকে। হঠাৎ পর পর তিনবার বন্দুকের শব্দ। সজন বলল, চল বাবু ছানা, ল্যাকড়া মরেছে লিচ্চয়। ল্যাকড়া ওরা বলে বাঘকে। বোধহয় ওরা যে কোন বাঘের সংজ্ঞা হিসাবে নেকড়ে কথাটাই ব্যবহার করে। চটপট প্যান্ট শার্ট পরে কাঁধে টাঙি নিয়ে রওনা হলাম দুজনে। পথে জুটে গেল আরো পাঁচ-সাত জন।

ডুমরী খালের এপারে রয়েছে গোবিন্দবাবুর সেই মাচা। কিন্তু তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন ওপারে একটা টিলার কাছে। সবাই খাল পেরিয়ে ওপারে গেলাম। অতটুকু জল, কিন্তু কি বিষম তোড়! উলটে ফেলে দেয় যেন মিনিটে মিনিটে। পাহাড়ে নদীর এই ধরন হয়, বলল সজন ভুঁইয়া। অসাবধান হলে পড়ে কোমরও ভেঙে যেতে পারে গো বাবু ছানা।

ওপারে পোঁছুতেই গোবিন্দবাবু বিষম বিমর্ষ মুখে বললেন, বাঘ মরেছে। কিন্তু রুটাইকে বাঁচাতে পারলাম না। কথা না শুনে সে জলে নেমে চান করছিল। এই ফাঁকে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ঘাড়ে, আর এক ঝটকায় নিয়ে গিয়ে ফেলল ঐ টিলার নীচে। কোথায় ওত পেতে ছিল কে জানে! পর পর তিনবার গুলি চালালাম। মরলও বাঘ। কিন্তু ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে রুটাইয়ের।

রুটাইয়ের মৃতদেহ নিয়ে এক দল গ্রামে ফিরল। আর এক দল বাঘটাকে বাঁশে বেঁধে নিয়ে গেল। আমি আর গোবিন্দবাবু অনেকক্ষণ বসে রইলাম সেখানে চুপ করে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। একটা দুটো হরিণ নয়ত বরা বা বুনো শুয়োর আসছে পা টিপে টিপে জল খেতে। গোবিন্দবাবু বললেন, চল, চলে যাই। ওরা বনের জন্তু, ওদের শান্তি ভঙ্গ করে কি হবে?

• বিজ্ঞান-সংবাদ •

বিষগাছ

আজব দুনিয়ার আর এক আজব—বিষগাছ। আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে একজন ডাচ্ উদ্ভিদবিজ্ঞানী মধ্য যবদ্বীপ, মালয় এবং সেলিবাসের আগ্নেয়গিরির নিকটবর্তী গভীর বনে এই গাছ আবিষ্কার করেন। ওখানকার লোকেরা এই গাছকে বলে ইউপাশ, যার মানে হল বিষগাছ। আদিবাসীরা এ থেকে বিষ সংগ্রহ করে। তারা ঐ তীব্র বিষ তীর ও বর্শার ফলায় লাগিয়ে জীব-জন্তু শিকার করে। এই গাছে কাঁটা হয়। কাঁটাতে বিষ থাকে। মানুষ বা যে কোন জীব-জন্তুর শরীরে তা সামান্য একটু বিঁধলেই বিষের দ্রুত ক্রিয়া সুরু হয় এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু ঘটে।

এই কাঁটার বিষে অনেক আদিবাসী প্রাণ হারিয়েছে। তাই এই গাছের তলায় মানুষের কঙ্কাল দেখতে পাওয়া যায়।

লণ্ডন মিউজিয়ামে ইউপাশ গাছের একটি তৈলচিত্র আছে। ১৮২০ সালে এই চিত্রটি অঙ্কন করেন নামকরা চিত্রকর ফ্রানসিস ডানবে। চিত্রে দেখা যায়, ইউপাশ গাছ ডালপালা ছড়িয়ে আছে আর তার তলায় মানুষের অনেকগুলি কঙ্কাল।

বিজ্ঞানীদের মতে আগ্নেয়গিরির নিকটে এই গাছ থাকায় তাতে গন্ধক মিশে গাছগুলো বিষাক্ত হয়ে গিয়েছে।

—মোহিত রায়
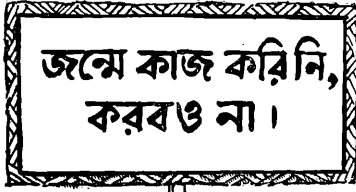
[হাতে একটা ডান্ডালাগানো বোর্ড নিয়ে ঢুকলো বুড়ো। বোর্ডে লেখা আছে 'জন্মে কাজ করিনি করবও না।' বুড়োর পিঠে টুকিটাকি নানান জিনিসের বোঝা। বুড়ো এসে প্রথমে রাখল সেই বোর্ডটা। তারপর রাখল একটা বসবার জলচৌকি। তার পাশে রাখল হালকা ধরনের র‍্যাক। তাতে হরেক রকমের পুতুল। বুড়ো কাজের জিনিসপত্তর বের করে ছড়িয়ে নিয়ে বসল—হাঁস বানানোয় মন দিল।]

বুড়ো। কি রে অত ছটফট করছিস কেন? ডানা দিতেই একেবারে মন উড়ুউড়ু? মানস সরোবরে যাবি নাকি? চুপ করে এইখানে বোস তো। কত দামে বিকোবি তুই?

[কানের কাছে হাঁসের মুখ এনে] কি বল্লি? এক সিকি? তা বেশ, তা বেশ।

[হাসটাকে র‍্যাকের ওপর-তাকে রাখল]

[একটা পুতুল হাতে নিয়ে]

কি রে? তোর তো একটা চোখ এখনও বাকি। এক চোখেই তো দিব্যি পুটুস পাটুস চাইছিস। তোর দাম কত? [কানের কাছে পুতুলের মুখ নিয়ে] কি বল্লি? এক আধুলি? তা বেশ তা বেশ। তুই বোস দেখি এখানে। [হাঁসের পাশে রাখল] এক্ষুণি সব ক্ষুদে খরিদ্দাররা এসে পড়বে। একটু তাড়াতাড়ি হাত চালাতে হবে।

[বুড়ো একমনে দ্রুত পুতুল বানানোয় মন দিল]

তপু আর নন্তুর প্রবেশ

তপু। [একটা হাঁস নিয়ে] এটা কত নেবে গো বুড়ো ঠাকুর্দা?

বুড়ো। একসিকি দাও গো, বাবুমশাই, আর সেই সঙ্গে একটু মুচকি হাসি।

[থুৎনি ধরে আদর করল বুড়ো]

নন্তু। এই পাখিটার দাম কত গো?

জ্যোতিভূষণ চাকী

বুড়ো। এই পাখিটা। দু-আনা, আর সেই সংগে একটু মুচকি হাসি।

[থুৎনি ধরে আদর করল বুড়ো]

[তপু আর নন্তু পুতুল কিনে, একটু আড়ালে গিয়ে]

তপু। আশ্চর্য ভাই, বুড়ো ঠাকুর্দা দেখি সারা-দিন কাজ করে চলেছে। তবু ওখানে লিখে রেখেছে 'জন্মে কাজ করিনি, করবও না।'—এ কেমন কথা?

নন্তু। আমিও তো ভেবে পাই না ভাই। আর দেখ, কাজের সঙ্গে মুখে হাসিটি লেগেই আছে। কি ভালোই যে লাগে!

তপু। সত্যি! [প্রস্থান]

[বুড়ো এক মনে পুতুল বানাচ্ছে। টুলু আর বুলুর প্রবেশ]

টুলু। বলে বলুক পি-পু-ফি-শু, আমি বাবা কাজের মধ্যে নেই। কাজের নামে গায়ে জ্বর আসে আমার। এই তো দাদা বলল, যা তো পোস্ট ক'রে

আয় চিঠিটা। আমি বল্লাম, দাদা পা-টা কেমন মচকে গেছে বল খেলতে গিয়ে, ব্যথা করছে খুব। দাদা ওমনি বল্ল, থাক থাক তোকে আর যেতে হবে না, আমিই যাচ্ছি।

বুলু। আলসেমিতে আমারও ভাই জুড়ি নেই। আমি হলাম যাকে বলে গিয়ে, কুঁড়ের বাদশা। সকালে মা কতবার করে ডেকে যান। আমি বাবু ওঠবার নামটি করি নে। উঠলেই তো দুধ আনতে যেতে হবে।

টুলু। [বুড়োর বোর্ডটা দেখে] ঐরে ঐ দেখ কি লেখা আছে—"জন্মে কাজ করিনি, করবও না।" একেবারে আমাদের মনের মত মানুষ পেয়ে গেছি।

বুলু। কি মজা! চল্ চল্ কাছে গিয়ে দেখি।

[টুলু আর বুলু বুড়োর কাছে এল]

বুড়ো। [মুখ না তুলেই] কি দেখছ?

টুলু ও বুলু। তোমাকে দেখছি।

বুড়ো। আমাকে দেখে কি হবে। তার চেয়ে বরং কেঁচিটা কোথায় দেখো তো, খুঁজে পাচ্ছি না।

[কেঁচিটা টুলুর চোখে পড়ল। সে হাতে দিল বুড়োর]

বেশ ভাই, বেঁচে থাকো। এতো নোংরা হয়ে আছে সব জিনিসপত্তর, ঠিক মত সব খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। একটু পরিষ্কার করে ফেল তো জায়গাটা।

[টুলু আর বুলু হাতে হাতে পরিষ্কার করে দিল]

একা মানুষ ভাই, বড়ো মুশকিল। তা তোমরা একটু হাত লাগাও না ভাই। [টুলুর দিকে চেয়ে] এই তো, এই দাগ বরাবর কাঁচি চালাও। আর তুমি— [বুলুর দিকে চেয়ে] এইটেতে রং লাগাও। [রঙের তুলি হাতে দিল। পুতুলটা হাতে তুলে দিল।]

[টুলু ও বুলু তন্ময় হয়ে গেল কাজের মধ্যে। এইভাবে অনেকক্ষণ কাটল। বুড়ো ইতিমধ্যে মোমবাতি ধরিয়েছে]

বুড়ো। সন্ধ্যে হয়ে গেল ভাই। এবারে বাড়ি যাবে না?

টুলু। এই তো যাচ্ছি। আর একটা নক্সায় কাঁচি চালিয়েই উঠব।

বুলু। এই টিয়ে পাখির ঠোঁটে একটু রং লাগিয়ে আমার ছুটি।

[টুলু ও বুলু হাতের কাজ শেষ করল]

টুলু। আচ্ছা, বুড়ো ঠাকুর্দা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

বুড়ো। হাঁ হাঁ, নিশ্চয়ই।

টুলু। আচ্ছা, তুমি যে এইখানে লিখে রেখেছ 'জন্মে কাজ করিনি, করবও না'—এর মানে কি? তুমি তো সারাদিনই কাজ করলে?

বুড়ো। আর তোমরাও যে নিজেদের কুঁড়ের বাদশা বলছিলে—আমি সব শুনে ফেলেছি।—তোমরাও তো হাত মেলালে আমার সঙ্গে? তার মানেই বা কি?

টুলু। তাই তো, তাই তো!

বুলু। ব্যাপারটা তো বেশ মজার।

টুলু। আমার একটা কথা মনে হচ্ছে, বলব?

বুড়ো। বলো। বলো।

টুলু। এই যে লিখেছে, জন্মে কাজ করি নি, তার মানে হল কাজ যে তুমি করছ তা মনেই করছ না।

বুলু। মানে কাজটা তোমার কাছে খেলার মতই।

বুড়ো। ঠিক ধরেছ ভাই, কাজে আনন্দ পেলে কাজটা তখন আর কাজ বলে মনে হয় না, মনে হয় খেলা। তা সে যে কোন কাজেই হোক। না, আর দেরি নয়। বেলা গড়িয়ে গেছে, এবারে চলি।

[জিনিসপত্তর গুছিয়ে দিল টুলু আর বুলু]

[একটা হাঁস হাতে নিয়ে] এইটে ভাই তোমায় উপহার দিচ্ছি। [টুলুকে দিল]

আর এইটে—[একটা টিয়ে পাখি হাতে নিয়ে] তোমায় দিচ্ছি।

[বুলুকে দিল]

কি খুশি তো?

টুলু ও বুলু। হাঁ, খুব খুশি।

বুড়ো। তাহলে কালকেও আসছ তো?

টুলু ও বুলু। হ্যাঁ, নিশ্চয় আসব। আজ তবে আসি।

বুড়ো। আর দাদা যদি চিঠি পোস্ট করতে বলে?

টুলু। [পিছু ফিরে দাঁড়িয়ে] ছুটে গিয়ে পোস্ট করে আসব।

বুড়ো। আর মা যদি ভোরবেলা উঠতে বলেন?

বুলু। [চলে যেতে যেতে] উঠে পড়ব।

[বুড়োর পিঠে বোঝা আর হাতে বোর্ড আঁটা দণ্ড নিয়ে হাসিমুখে প্রস্থান]

[নাট্য-নক্সাটির প্রেরণা এম. ডব্লউ. ব্রাউন-এর একটি গল্প]

ভৌতিক

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

জ্বলজ্বলে দুটি চোখ বেলগাছ থেকে সর সর করে নেমে বাড়ীর দেয়ালে মিলিয়ে গেল।

বিশেষ কাজ ছাড়া পাড়ার লোকেরা সন্ধ্যার পর ওদিকে হাঁটে না।

আমি শহরের ছেলে। পরীক্ষার ছুটিতে মামার বাড়ী এসেছি। শহরে ভূত-প্রেতের অস্তিত্ব কম বলেই বোধ হয়, ভূত আমাকে খুব নাড়া দেয় না।

সঙ্গী জুটে গেল ঘোষদের বাড়ীর রতনদা। সেও কাকার বাড়ী বেড়াতে এসেছে শহর থেকে। কলেজের ছাত্র।

একদিন দুজনে জলঙ্গীর ধারে বসে গল্প করছি, গ্রামের ছুতোর মিস্ত্রি নেপার সঙ্গে দেখা।

বয়স হয়েছে নেপার, কিন্তু এখনও শরীরে অসুরের শক্তি। হাতের কাজও খুব চমৎকার। আমাদের দেখে বলল,—কিগো দাদাবাবুরা হাওয়া খাচ্ছ ? কিন্তু আর ওদিকে যেও না। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, এবার বৃন্দাবনবাবু বের হবেন।

কে বৃন্দাবনবাবু ?—আমি কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না।

নেপা দুটো হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলল, নাম করলাম, কি জানি বরাতে কি আছে! ওই যে উকিলবাবু গো, ওই মল্লিকবাড়ীর মালিক।

সেই পোড়োবাড়ীটার নাম যে মল্লিকবাড়ী, সেটা জানা ছিল। তাই বললাম, ও বাড়ীর মালিক তো বেঁচে নেই।

নেপা চাপাগলায় বলল, বেঁচে আছেন আমি কখন বললাম ?

রতনদা বলল, তবে এই যে বললে বেড়াতে বের হবেন।

না, তোমরা একেবারে কাঁচা ছেলে। বেঁচে না থাকলে

বাড়ীটা একেবারে শ্মশানের ধারে। আগে শ্মশান এখানে ছিল না। জলঙ্গী নদী যেখানে ভুবনপুরের কাছে বাঁক নিয়েছে সেইখানে ছিল। জলঙ্গী নদী বড় অস্থির। প্রতি বছর ঠাঁই বদল করে। সরতে সরতে এখানে চলে এসেছে। তাই শ্মশানও সরে এসেছে।

বাড়ীটা একেবারে খালি। চেহারা দেখে মনে হয়, বহু বছর ধরে কেউ এখানে বাস করছে না। সামনেটা আগাছায় ভরে গেছে। দরজা-জানলা অনেকগুলোই ভেঙে পড়েছে। দেয়াল নোনাধরা, বিবর্ণ।

পাড়ার সবাই বলে বাড়ীটাতে ভূতের উপদ্রব আছে। কোথাও হাওয়া নেই, হঠাৎ জানলা-দরজাগুলো খট্ খট্ করে খুলে যায়। ভিতর থেকে হো হো শব্দে অট্টহাসি ভেসে আসে।

যারা রাত বিরেতে মড়া নিয়ে শ্মশানে আসে, তারা অনেক কিছু দেখেছে।

বুঝি বেড়ানো যায় না ? ওদের তো সূক্ষ্ম শরীর, দেখা যায় না। কোথাও কিছু নেই, দেখবে বাতাসে শুকনো পাতার স্তূপ ঘুরপাক খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে। বুঝবে, তাঁরা চলেছেন। অবশ্য মাঝে মাঝে শরীর নিয়েও দেখা দেন। অমাবস্যার রাত্রে অনেকে দেখেছে, গাউন পরে বাগানে পায়চারি করছেন।

আমরা আর তর্ক করলাম না। তাহলে নেপার মুখ থেকে আসল কাহিনীই শোনা যাবে না। তাই বললাম, বৃন্দাবনবাবু মারা গেলেন কিসে ?

নেপা এদিক ওদিক চেয়ে ফিস ফিস করে বলল, অপঘাতে। তা না হলে এ অবস্থা হবে কেন ?

আমরা আর কিছু বললাম না। নেপা যেভাবে চেপে বসল তাতে বুঝতে পারলাম সে নিজের থেকেই সব কিছু বলবে।

ঠিক তাই। নেপা বলে চলল, বৃন্দাবনবাবুকে মেরে ফেলা হয়েছিল। ভোরবেলা তাঁকে বাগানের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। পিঠে বর্শা বেঁধা।

—বর্শা ?

—হ্যাঁ। কে এ কাজ করেছে অনেকেই জানত, কিন্তু পুলিশ অনেক খুঁজেও তার পাত্তা পায়নি।

—সে কি ?

—হ্যাঁ তাই। আমরা সবাই জানতাম, এ হারু সর্দারের কাজ। বিখ্যাত ডাকাত হারু সর্দার।

—ডাকাত বৃন্দাবনবাবুকে মারতে যাবে কেন ?

পুরনো দিনের বিস্মৃতপ্রায় ঘটনা মনের মধ্যে সাজিয়ে নিয়ে নেপা বলল, তাহলে শোন। ডাকাতি করার সন্দেহক্রমে হারু সর্দার ধরা পড়ল। বৃন্দাবনবাবু সরকারী উকিল। হারুর যাতে জেল হয় তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। পাঁচ দিন ধরে চোখা চোখা সওয়াল। কাঠগড়ার মধ্যে হারু বন্দী সিংহের মতন ফুলে ফুলে উঠছে। সবাই বুঝতে পেরেছে, হারুর আর নিস্তার নেই। অনেক বছরের জেল হবে নির্ঘাত। কিন্তু কোথা দিয়ে কি যেন হয়ে গেল, জজসায়েব হারু সর্দারকে বেকসুর খালাস করে দিলেন। রায় বের হবার ঠিক পরের দিন বৃন্দাবনবাবু খতম। সেই থেকে বৃন্দাবনবাবু বাড়ী ছেড়ে কোথাও যান নি। এখানেই ঘোরাফেরা করেন।

কাহিনী শেষ করে নেপা উঠে পড়ল।

আমরা দুজনে চুপচাপ বসে। চারদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে। দূরে বার কয়েক শিয়ালের ডাক শোনা গেল।

মল্লিকবাড়ীর বিরাট কাঠামোটা দৈত্যের মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে রতনদাই প্রথম কথা বলল, নেপামিস্ত্রি নির্ঘাত গাঁজা-টাজা খায়। কেমন একটা আষাঢ়ে গল্প দিব্যি বানিয়ে বলে গেল। একটুও মুখে আটকাল না।

আমিও হাসলাম। বললাম, ঠিক বলেছ রতনদা। মরা উকিল এখনও তার বাগানে পায়চারি করে হাওয়া খায়!

রতনদা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমরা নিজের চোখে বৃন্দাবন উকিলকে দেখতে চাই। কি বলিস ?

—আমি রাজী।

ছেলেবেলা থেকেই ডানপিটে বলে আমার সুনাম ছিল। শহরে বিশেষ সুবিধা পেতাম না, কিন্তু ছুটিতে দিদির শ্বশুরবাড়ী বারাসাত গিয়ে পুকুরের জল তোলপাড় করে, গাছের ফলপাকুড় ছিঁড়ে প্রতিবেশীদের ত্রাস হয়ে উঠতাম।

ঠিক হয়ে গেল, আমি আর রতনদা দুজনে ওই মল্লিকবাড়ীতে একটা রাত কাটিয়ে আসব। অমাবস্যার রাতে।

বাড়ীতে দুজনেই কিছু বললাম না। বললে

আপত্তি করত। যেতে দিত না।

ভাগ্যক্রমে জুতসই সুযোগও জুটে গেল। খবর পেলাম, জলঙ্গীর ওপারে দেউলপুরে যাত্রা হবে। কলকাতার বিখ্যাত যাত্রা।

সারারাত যাত্রা শুনে পরের দিন ফিরব, এই বলে বাড়ী থেকে বের হলাম।

কথামত গ্রামের শিব মন্দিরের সামনে দুজনে যখন দেখা করলাম, তখনও সন্ধ্যা নামেনি।

রতনদা বলল, আলো থাকতে থাকতে চল মল্লিক-বাড়ীর মধ্যে ঢুকি। ভূতপ্রেত নেই জানি, কিন্তু সাপ-খোপ তো থাকতে পারে।

মল্লিকবাড়ীর গেট বরাবর যখন গিয়ে পেঁছিলাম, তখন অল্প আলো রয়েছে। অবশ্য চারদিকে ঝাঁকড়া গাছপালা থাকায় জায়গাটা একটু অন্ধকার।

গেট পার হবার সঙ্গে সঙ্গে তক্ষক ডেকে উঠল। মনে হল, পায়ের কাছ থেকে সরসর করে কি যেন একটা সরে গেল।

রতনদা হাতের টর্চটা জ্বালাল। খুব কমজোর বাতি। কিছুই দেখতে পেলাম না। ঘন ঘাসে সামনের পথ আবৃত।

সাপখোপ হবে। চল এগোই।—বলে রতনদা এগিয়ে চলল। পিছন পিছন আমি।

সদর-দরজায় একটা তালা ছিল বটে, কিন্তু বহু-দিনের অব্যবহারে মরচে পড়ে তার কোন জোর ছিল না। হাত দিয়ে মোচড় দিতেই তালা খুলে গেল।

আমরা ঘরের মধ্যে ঢুকলাম।

—দাঁড়া।

রতনদার নির্দেশে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা দেশলাই আর মোমবাতি বের করে রতনদা জ্বালাল।

স্বল্প আলোয় দেখা গেল ঘরের কোণে একটা তক্ত-পোশ। আর এক কোণে স্তূপাকার বই। পিছনে আর কি আছে. বাতির ক্ষীণ দীপ্তিতে দেখা গেল না। এটা বোধহয় বৃন্দাবন উকিলের বসার ঘর।

—তুই এঘরে থাক। আমি একবার পাশের ঘরটা দেখে আসি।

আমি তক্তপোশের ওপর বসলাম। রতনদা গেল পাশের ঘরে।

পাশের ঘরে যাবার কৌতূহল আমারও ছিল, কিন্তু ঘরের মেঝেতে ধুলোর পরিমাণ দেখে ঘোরাফেরা করার ইচ্ছা সংবরণ করলাম।

একটু পরেই রতনদা ফিরে এল। বলল, নারে, পাশে একটা ছোট ঘর আছে, সেখানে শোওয়া চলবে না। আজ দুজনে এই তক্তপোশে শোব, কেমন?

—ব্যাগ থেকে একটা চাদর বের করে রতনদা তক্ত-পোশের ওপর সেটা বিছিয়ে দিল।

বাতাসে বাতিটা কাঁপছে। টর্চটা জ্বালাও না।—আমি বললাম।

—বেশী ব্যাটারি নেই। টর্চটা পরে দরকার হতে পারে।

দুজনেই খেয়ে বেরিয়েছিলাম, কাজেই খাওয়ার প্রশ্ন নেই। এখন শুধু বৃন্দাবন মল্লিকের অপেক্ষা।

রতনদা আমার পাশে এসে বসল।

—রতনদা, তোমার ব্যাগে কি কি আছে?

—টর্চ আছে, দড়ি আছে, একটা ছোরা আছে। জানি না এসব দরকার লাগবে কিনা।

আমি তার উত্তরে কি একটা বলতে গিয়েই থেমে গেলাম।

বাইরে ঝড় উঠেছে। গাছের ডালপালাগুলো আছড়ে পড়ছে খোলা জানলার ওপর।

কিরে ভয় পাচ্ছিস নাকি?—রতনদা প্রশ্ন করল।

ভয় আবার কিসের? কালবোশেখীর ঝড় উঠেছে। ঘুমটা ভালই হবে, অবশ্য যদি বৃষ্টি আসে।

টর্চটা জ্বালিয়ে রতনদা হাতঘড়িটা দেখে বলল, সাড়ে সাতটা। আয় শুয়ে পড়া যাক। বলা যায় না, মাঝরাতে যদি জাগতে হয়।

দুজনে শুয়ে পড়লাম।

শোবার একটু পরেই রতনদার নাকডাকা শুরু হল। আমার ঘুম এল না। চুপচাপ শুয়ে রইলাম।

হঠাৎ রতনদার নাসিকাধ্বনি ছাপিয়ে আর একটা করুণ আর্তনাদ শোনা গেল। কে যেন উচ্চস্বরে কাঁদছে।

আমি উঠে বসলাম।

এমন হতে পারে, কেউ মারা গেছে, শ্মশানে তার কোন আত্মীয় কাঁদছে। কিন্তু এ যেন শিশুর কান্না। আর খুব কাছ থেকে ভেসে আসছে সেই ক্রন্দনধ্বনি।

—রতনদা, রতনদা!

জোরে ঠেলা দিতে রতনদা উঠে বসল।

ঘুমজড়ানো গলায় বলল,—কিরে, কি হয়েছে?

—কে কাঁদছে শোন। খুব কাছে বলে মনে হচ্ছে।

রতনদা কিছুক্ষণ মন দিয়ে শুনে হেসে উঠল। বলল, দূর! তুই বুঝি এই প্রথম গাঁয়ে এলি? ওতো শকুনের বাচ্চার কান্না। ঠিক মানুষের কচি ছেলের মতন কাঁদে।

শ্মশানের কাছে গাছে শকুনের বাসা হয়।

কথা শেষ করেই রতনদার পতন ও নিদ্রা। ভীষ্মের যেমন ইচ্ছামৃত্যু ছিল, রতনদার তেমনই ইচ্ছানিদ্রা।

কি করব, আমিও শুয়ে পড়লাম। ঘুম এল না। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম। মোমবাতিটা কখন্ এক-সময় নিভে গেছে। রতনদার টর্চটা নিজের বালিশের তলায় রেখেছি। যদি দরকার হয়।

এখন রাত নিশ্চয় অনেক। বৃন্দাবন মল্লিকের দেখা নেই। মুখে মুখে কত যে অলীক ভৌতিক কাহিনী রটে, এটাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আমরা একেবারে বৃন্দাবন মল্লিকের আস্তানার মধ্যে ডেরা বেঁধেছি, তবু কিছু হচ্ছে না। দিব্যি অক্ষত দেহে তো রয়েছি দুজনে।

খুট, খাট, খুট।

চমকে মুখ ফেরালাম। শব্দটা পাশের ঘর থেকে আসছে।

একদৃষ্টে দেখতে দেখতে মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শীতল প্রবাহ অনুভব করলাম। গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে। কপাল বেয়ে ঘামের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

হাত দিয়ে যে রতনদাকে ডাকব সে জোরও যেন পাচ্ছি না। সমস্ত দেহ নিস্তেজ, অসাড়।

নেপা মিস্ত্রী যা বলেছিল, ঠিক তাই।

খুব অস্পষ্ট, কিন্তু দেখতে বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে না।

বড় বড় গোলাকার দুটি চোখ। রাত্রে যেন জ্বলছে। সেই জ্বলন্ত কটাক্ষ আমার ওপর ন্যস্ত। গায়ে কালো গাউন। জানলার একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত বৃন্দাবন মল্লিক চলে বেড়াচ্ছে। খুট, খাট, খুট।

মাঝে মাঝে থামছে। বোধহয় তার শান্তিপূর্ণ আস্তানার উৎপাতকারীদের দেখছে রক্ত-চক্ষু মেলে। আবার হাঁটছে শব্দ করে করে।

অমাবস্যা। আকাশে চাঁদ নেই। শুধু এক মুঠো তারা। নিষ্প্রভ আলো এসে ঘরের মধ্যে পড়েছে।

দুটি চোখ যেন ক্রমেই এগিয়ে আসছে। আমার দিকে।

বৃন্দাবন মল্লিক এইবার শাস্তি দেবে। হারু সর্দার তাকে খতম করেছে। হারু সর্দারকে মেরে সে প্রতিশোধ নিতে পারত।

কিন্তু ভূতদের প্রতিহিংসা নেবার পদ্ধতি বিচিত্র। তাদের যত রাগ, যারা তাদের আস্তানায় হানা দেয়, তাদের ওপর।

আরো এগিয়ে আসছে দুটো চোখ।

এবার নিস্তার নেই।

চীৎকার করে উঠেছিলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান হল, তখন ভোর হয়েছে। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে।

উঠে দেখি রতনদা চিত হয়ে শুয়ে। অস্বাভাবিক মুখের অবস্থা। জিভটা একটু বেরিয়ে পড়েছে।

সর্বনাশ! রতনদা মল্লিকবাড়ীতে আসবার মতলব দিয়েছিল বলে, বৃন্দাবন মল্লিক বুঝি তাকেই শেষ করে দিল!

রতনদার দেহ ধরে নাড়া দিতে দিতে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলাম,—রতনদা, কোথায় চলে গেলে গো!

রতনদা ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসল, কি ষাঁড়ের মতন চেঁচাছিস? কোথায় আবার চলে যাব! ঘুমোচ্ছিলাম তো।

—ঘুমোচ্ছিলে? ওই ভাবে লোকে ঘুমোয়?

—আমি একটু দাঁত মুখ সিটকে ঘুমাই। কেন. কি হয়েছে?

—যা হবার তাই হয়েছে। কাল রাত্রে বৃন্দাবন মল্লিক এসেছিল।

—বৃন্দাবন মল্লিক?

হ্যাঁ, বড় বড় আগুনের ভাটার মতন চোখ। পরনে গাউন। এদিক ওদিক করছিল আর কটমট করে চেয়ে-ছিল আমাদের দিকে। বয়স কম বলে বোধহয় ছেড়ে দিয়েছে।

রতনদা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমার দিকে দেখল, তারপর বলল.—কিরে, তুইও আজকাল নেশা ভাং করছিস নাকি?

—তোমাকে ছুঁয়ে বলছি রতনদা, এর একটি বর্ণও মিথ্যা নয়।

রতনদা ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ কি ভাবল। তারপর বলল, আমার এই এক সর্বনেশে ঘুম হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়লে আর জ্ঞান থাকে না। পরীক্ষার হলে ইংরাজী পরীক্ষার দিন খাতার ওপর মাথা রেখেই ঘুমিয়ে পড়লাম। গার্ড ধাক্কা দিয়ে যখন ঘুম ভাঙাল, তখন সময় পার হয়ে গেছে।

আমার এসব ভাল লাগছিল না। কেবল রাত্রের সেই বিভীষিকার দৃশ্যটা ঘুরেফিরে চোখের সামনে ভাসছিল। বললাম, এ ভূতুড়ে বাড়ীতে আর নয়।

এখনও আমার গা ছমছম করছে। চল, বাড়ী যাই।

রতনদা উঠে দাঁড়াল। খানিক এগিয়ে থেমে পড়ে বলল, দাঁড়া, দিনের আলোয় একবার ঘরগুলো ভাল করে দেখে নিই।

ঘরের এ কোণ ও কোণ দেখল রতনদা।

বইগুলোর ওপর মাকড়সার জাল। বে-মেরামতে ছাদ বোধহয় ফুটো হয়ে গিয়েছে। দেয়ালে দেয়ালে জলের ধারার চিহ্ন।

রতনদা নীচু হয়ে তক্তপোশের তলাটাও দেখল। নীচে কিছু নেই। তারপর পাশের ঘরে চলে গেল।

একটু পরেই রতনদার উচ্চহাসির শব্দ কানে এলঃ হো-হো-হো!

কি হল? এত হাসির কি পেলে?—আমি জিজ্ঞেস করি।

রতনদা হাসতে হাসতেই বলল, আরে এই যে তোর বৃন্দাবন মল্লিক এখানে বসে! হা, হা, হা!

সে আবার কি!—বলতে বলতে পাশের ঘরের চৌকাঠে গিয়ে দাঁড়ালাম। কোণের দিকে চোখ ফিরিয়েই আমি অবাক।

একটা ছেঁড়া গাউন গায়ে জড়ানো। আগুনের মতন দুটি চোখ মেলে আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে। বিরাট আকারের একটি প্যাঁচা।

কিভাবে যেন ছেঁড়া গাউনটা তার গায়ে জড়িয়ে গেছে, হাজার চেষ্টা করেও বেচারী সেটাকে খুলতে পারে নি। সেটা নিয়েই দিন কাটাতে হচ্ছে।

রাত্রের বৃন্দাবন মল্লিকের স্বরূপ জানতে পেরে আমিও রতনদার সঙ্গে গলা মিলিয়ে হো হো করে হেসে উঠলাম।

• বিজ্ঞান-বিচিত্রা •

তৈল তাল
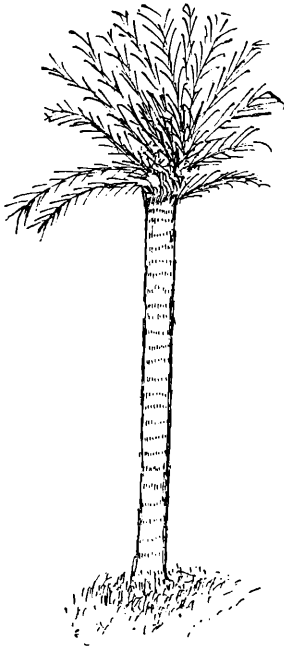
তাল থেকে তেলের কথা তোমরা বোধহয় নিশ্চয়ই শোননি। ভারি চমৎকার গাছ হল এই—তৈল তাল। আফ্রিকার যে সব জায়গায় প্রচুর বৃষ্টি হয় সাধারণতঃ এই গাছগুলি সেইখানে জন্মে। তবে আফ্রিকার মধ্য পশ্চিম অঞ্চলে এই গাছ বেশী দেখা যায়।

তৈল তাল অনেকটা আমাদের দেশের তাল গাছের মত দেখতে হয়। শুধু তাই নয়—সাধারণ গাছের মত এরও শিরে পাতার গোছা এবং কাঁদি বার হয়। এমনকি প্রত্যেক কাঁদিতে ৫/৬ শত ফলও ধরে। তোমরা শুনে অবাক হবে যে—একই গাছ থেকে দু-রকম তেল পাওয়া যায়। প্রথমতঃ এই ফল জলে সেদ্ধ করে তারপর চটকিয়ে ফলের গায়ের শাঁস থেকে একরকম তেল বার হয়। দ্বিতীয়তঃ এর বীচি কলে ভাঙিয়ে তার ভেতরের শাঁস থেকেও তেল পাওয়া যায়। তবে বীচির শাঁসের তেল ফলের শাঁসের তেলের চাইতেও ভাল। সেই জন্য বীচির তেল থেকে এক জাতের কৃত্রিম মাখন-এর মত খাদ্য প্রস্তুত হয়। আর ফলের তেল সাবান এবং বাতি তৈয়ারীর কাজে লাগান হয়।

তৈল তাল গাছগুলি কোথায় চাষ হয় জান—ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে এর আবাদ হয়ে থাকে।

মলয়কুমার সরকার

কুলিফুলি করেননি, নিজেই দুহাতে দুটো ঢাউস সুটকেস নিয়ে প্লাটফর্মের ভিড় ঠেলে ট্রেনে ওঠবার জন্যে ছুটছিলেন সত্যসিন্ধু সাধুখাঁ, ফস্ করে কে কী করলো, একখানা হাত ফাঁকা হয়ে গেল !

গেল গেল, ঝুলে পড়া হাতটাই গেল।

তার মানে বড় ঢাউসটাই গেল। স্রেফ হাপিস হয়ে গেল।

কিন্তু শুধু কি হাতটাই ফাঁকা হয়ে গেল সত্যসিন্ধুর ? বুকটা গেল না ? বেয়াল্লিশ ইঞ্চি ছাতির অন্তরালে লুকিয়ে থাকা কিছুক্ষণ আগের তাজা বুকটা ? এবং তার সঙ্গে ফাঁকা হয়ে গেল না সমস্ত পৃথিবীটাও ? গেল! সূর্যচন্দ্রতারা ভরা আকাশ সমেত সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটাই ফাঁকা হয়ে গেল।

অথচ সত্যসিন্ধুর ওই ফাঁকা হয়ে যাবার খবরটা কারুর কানেও গেল না, চোখেও পড়লো না।

পিছন থেকে একটা মাল বোঝাই ট্রলি এসে গেল হুড়বড়িয়ে ! তার পিছনে আপাদমস্তক বেলুনে ঢাকা, একটা বেলুনওয়ালা।

খোয়া যাওয়া সুটকেসটার শূন্য স্থান পূর্ণ হয়ে গেল এক সেকেন্ডে !

তার মানে সত্যসিন্ধুর ওই শোচনীয় লোকসানে কারুর কিছুই এসে গেল না। একটু 'হাঁ হাঁ'ও উঠলো না। কেউ কাউকে বলে উঠলো না 'ও কী মশাই, ও ভদ্রলোকের হাতের সুটকেসটা আপনার হাতে চলে এলো যে ?'...কিম্বা একথাও বললো না 'বেশ মশাই বেশ, দিব্যি হাত সাফাই শিখেছেন তো ? কিন্তু ধরা পড়ে গেছেন ! দিয়ে দিন, দিয়ে দিন। যার জিনিস তাকে দিয়ে দিন।'

নাঃ, কেউ কিছু বললো না। মানে জানতেই পারল না, অথচ রেল স্টেশনের এই বিরাট জনতা যদি এক-কাট্টা হয়ে সত্যসিন্ধুর পক্ষ নিতো, এবং 'সুটকেসমার'-টাকে 'এক হাত' নিতো, তা'হলেই হয়ে যেতো সব ঠিক।

সত্যসিন্ধুর শূন্য পৃথিবী আবার ভরে উঠতো, সত্যসিন্ধুর বুকটা আবার তাজা হয়ে যেতো, সত্য-সিন্ধুর চোখের সামনের ফুটে ওঠা সর্ষেফুলগুলো ঝরে পড়ে যেতো।

কিন্তু এসবের কিছুই হল না।

জনস্রোত যেমন এগোচ্ছিল এগোতে লাগলো; শুধু সত্যসিন্ধুই একটা বিরাট 'আঁক্' করে উঠলেন। সে রকম 'আঁক্' ধ্বনি অন্যত্র কোনোখানে উচ্চারিত হলে মুহূর্তে একটা 'দৃশ্য' জন্মে যেত সেখানটায়, কিন্তু জায়গাটা শেয়ালদা স্টেশন—যে জনসমুদ্রে একটা অমানুষিক গোলমালের প্রবাহের উপর যেন একটা খ্যানখেনে হাতুড়ির ঘা পড়েই চলেছে—'বেলা এগারোটা সতেরো মিনিটে দার্জিলিং মেল ছাড়বে।...'গারোটা

সাত্তেরো মিনিটবাদ দার্জিলিং মেল ছোড়েগি।...দার্জিলিং মেল উইল লীভ্ অ্যাট্ ইলেভেন সেভেন্টিন্...ফ্রম প্লাটফর্ম নাম্বার ফাইভ......।

সত্যসিন্ধু কিছুক্ষণের জন্যে যেন বুদ্ধুর মতো নিজের হাতের মুঠোটাকে অনুভব করলেন। অনুভবে কিছু পেলেন না।...তারপর সত্যসিন্ধু তাঁর সেই খাকি কাপড়ের বোরকা পরানো হারিয়ে যাওয়া ঢাউস সুটকেসটিকে অসংখ্য অগুন্তি ট্রাঙ্ক সুটকেস বালতি বাক্স ব্যাগ ঝুড়ি সাজি কুঁজোর অরণ্য থেকে চিনে বার করবার জন্যে মরিয়া হয়ে ছুটতে লাগলেন।

ছুটতে ছুটতে হঠাৎ একটি চাঁচাছোলা গলার চীৎকার কানে এলো সত্যসিন্ধুর—'শুনছেন? ও সুটকেস হারানো দাদু, এই সামনের কামরায় উঠে পড়ুন, আপনার সুটকেস আমার কাছে।'

সুটকেস হারানো দাদু!

আপনার সুটকেস আমার কাছে!

এটা আবার কী শুনলেন সত্যসিন্ধু?

ছিন্‌তাই চুরির ইতিহাসে এবকম ঘটনা ঘটেছে নাকি কখনো? ছিনিয়ে নিয়ে আবার অনুতাপানলে দগ্ধ হয়ে ডেকে ফেরত দিয়েছে?

পাগল!

তবে কি চোরটা রসিক প্রকৃতির?

ভিড়ের সুযোগে একটু রসিকতা করে গেল যাবার সময়?

সত্যসিন্ধু দিশেহারা হয়ে চারিদিকে তাকালেন, আবার শুনতে পেলেন, 'ও দাদু, এই যে এখানে! সামনের কামরায়! উঠে আসুন। জায়গা আছে।'

সত্যসিন্ধুর মাথার মধ্যে ভূমিকম্প হয়ে গেল। সত্যসিন্ধু বুঝলেন, এ হচ্ছে ছলনার ডাক। ভুলিয়ে কাছে টেনে বাকি হাতটাও ফাঁকা করে দেবে সত্যসিন্ধুর।

হয়তো বড় একটা গ্যাং আছে ওই 'সামনের কামরায়'।

নাঃ সামনের কামরায় কিছুতেই উঠবেন না সত্যসিন্ধু! ইচ্ছে করে কুমীরের হাঁয়ে ঢুকতে যাবেন না।

সত্যসিন্ধু তাই সেই বিরাট ধাক্কাধাক্কির মধ্যেও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে তিন চারটে কামরা পার হয়ে দূরের একটায় গিয়ে উঠে পড়লেন।

এখানেও উঠতেন না, আরো ছুটতেন, একেবারে অজগর সাপটার ল্যাজের ডগায় গিয়ে আশ্রয় নিতেন, যদি না অজগরটা নড়ে উঠতো।

সেই নড়ে ওঠার মুহূর্তেও শুনতে পেলেন সত্যসিন্ধু, 'ও দাদু, চলেই যাচ্ছেন যে! আচ্ছা বুদ্ধু তো! বলছি এখানে আপনার সুটকেস—।

সত্যসিন্ধু চোখকান বুজে দৌড়টা দিলেন।

সত্যসিন্ধুর মনে পড়লো ছেলেবেলায় পিসিমার কাছে শোনা সেই ভূত ও মেছুনীর গল্প। মাছ জিনিসটা নাকি ভূতদের খুব প্রিয়, তাই জেলেনী-মেছুনীদের হাতে মাছ দেখলেই ভূতেরা হাঁক পাড়ে, 'ওঁ মেঁছুঁনি, মাছেঁর দঁর কঁতো? ওঁ মেঁছুঁনি, যাঁচ্ছিস কেঁন? এবাঁর ফিঁরেই চাঁ না।'

ওই ফিরে চাওয়াটিই হচ্ছে সর্বনেশে। ফিরে চেয়েছো কি মাছ সমেত মেছুনী একেবারে মরে কাঠ হয়ে ভূতের ভোজে লেগে যাবে। ফিরে না চেয়ে চোঁ চাঁ দৌড় দিলে তবু সে যাত্রা বেঁচে গেল।

আর দৌড় দিয়ে যদি কোনো ঠাকুর-মন্দিরের দরজায় গিয়ে পড়তে পারে? ব্যস পুরো নিশ্চিন্তি। ওই সব ঠাকুর-টাকুর নাকি ভূতেরা আদৌ লাইক্ করে না। তাই তার ধারে কাছে যায় না।

তা সে যাক্—

ক'খানা কামরা পরে একটা কামরায় উঠে পড়ে সত্যসিন্ধুর মনে হলো, তিনি যেন একটি ভূতে তাড়া খাওয়া মেছুনী, এখন ঠাকুর-মন্দিরে আশ্রয় পেলেন। গাড়ি চলতে সুরু করেছে, আর ভয় নেই।

কিন্তু যে কামরায় উঠলেন সত্যসিন্ধু, সেখানে বসবার জায়গা তো দূরের কথা, দাঁড়াবারই জায়গা নেই। তার উপর হাতে সেই দ্বিতীয় ঢাউস সুটকেসটি।

ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ির এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি প্রতিবাদ ধ্বনি উঠলো, 'জায়গা নেই মশাই, জায়গা নেই, অন্য গাড়িতে যান।'

একজন বলে উঠলেন, 'নমস্কার মশাই, আপনারও এই কামরাতেই উঠতে ইচ্ছে হল? দেখে শুনে মনে হচ্ছে, দার্জিলিং মেলে এই একখানাই কামরা দিয়েছে রেল কোম্পানী। আর সেটা ইলাস্টিক্! উঃ! দু'ঘণ্টা আগে এসে, সাইডিঙে গিয়ে খালি গাড়িটিতে এসে বসেছিলাম, দেখতে দেখতে একেবারে সর্ষে ধরবার জায়গা রইল না! এই যে এখান থেকে যদি একটা আলপিন ছুঁড়ে ফেলি, মাটিতে পড়বে না, কোথাও আটকে থাকবে।...পড়বে কি করে? গলে পড়বার মতো ফাঁক পেলে তো?...এর ওপর আবার আপনি ওই গন্ধমাদন পর্বত নিয়ে—'

ভদ্রলোকের অভিযোগের ভঙ্গীতে মনে হয়, দু'ঘণ্টা আগে আসার দাবিতে পুরো কামরাখানাতেই একা

যাওয়ার অধিকার তাঁর ছিল। তাঁর পরে যারাই এসে ঢুকেছে, স্রেফ্ অনধিকার প্রবেশ করছে।

সত্যসিন্ধু একেই ছুটে এসে হাঁপিয়ে পড়েছেন, তার উপর আবার খাঁ খাঁ করা বুক, এই দুঃসময়ে গন্ধমাদনের উল্লেখে হাড়পিত্তি জ্বলে গেল তাঁর। রেগে বলে উঠলেন, 'আপনি তো মশাই দিব্যি একখানি জানলা চেপে বসে আছেন, আপনার এতো ইয়ে কেন ?'

গাড়ির সকলে একটি বচসা বাধবার অপেক্ষায় পুলকিত চিত্তে নড়ে চড়ে বসলো। নীরস ট্রেন জার্নিতে ওই বচসা-টচসাগুলোইতো কিঞ্চিৎ সরসতা।

তা' সে সরসতার ধারা ঝরলো।

ভদ্রলোক ক্রুদ্ধ গলায় বলে উঠলেন, 'দিব্যি ? দিব্যি বসে থাকতে দেখলেন আমায় ? স্রেফ্ ছুঁচ হয়ে বসে আছি দেখতে পাচ্ছেন না। পাশের ইনি যে আমায় এখনো ঠেলতে ঠেলতে জানলার বাইরে পার করে দেন নি, সেটা নেহাৎ জানলা দিয়ে গলবার মতো বপুটি নয় বলে।...তার ওপর আবার মুখে ডাহা রোদটা লাগছে।... গাড়িতে যখন উঠে বসলাম, সব জানলাগুলো ফাঁকা, ভাবলাম যেদিকটায় যখন রোদ থাকবে না—'

'চমৎকার মশাই চমৎকার।' একটি মহিলা বলে ওঠেন, 'আপনার তাহলে বাসনা ছিল ফাঁকা গাড়িতে শুধু আপনি একা এ জানলা ও জানলা, এ বেঞ্চ ও বেঞ্চ বিচরণ করে বেড়াবেন ? আমরা সবাই বানের জলে ভেসে এসেছি ? কেউ পয়সা দিয়ে টিকিট কাটিনি ?'

আর একজন বলে উঠলেন, বোধহয় মহিলারই সঙ্গী। আহা হা তুমি কেন আবার এ সব কথা ? মহিলা হয়ে—।

'তা'তে কি ? মহিলাদের ন্যায্য কথা কইবার অধিকার নেই এটা কোন্ শাস্ত্রে আছে ?

সেই শাস্ত্রটার নাম কেউ করতে পারলো না, মহিলাটা বিজয়-গর্বমাখা মুখে পানের কৌটো খুললেন।

কিন্তু সত্যসিন্ধুর এসবে মন নেই।

কারণ সত্যসিন্ধুর প্রাণে সুখ নেই।

না, সত্যসিন্ধুকে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে বলে, আর সুটকেসটাকে মাথায় চাপিয়ে রাখতে হয়েছে বলেই সুখহারা নন তিনি, ঘণ্টা চারেক রাস্তা না হয় বাক্স মাথায় এক পায়েই কাটালেন। দার্জিলিং মেলে চেপেছেন বলে তো আর দার্জিলিং পর্যন্ত যাচ্ছেন না ? বোলপুরে নেমে পড়বেন।

সুখের অভাব সেই সুটকেস!

সেই সুটকেসের কথা ভাবছেন আর সত্যসিন্ধুর বুকে হাতুড়ির ঘা পড়ছে। **আর তো এই কটা ঘণ্টা!** তারপর কী বলবেন তিনি শ্বশুর বাড়ির লোকদের ? কী বলবে তাঁকে শ্বশুড়বাড়ির লোকেরা ?

কী আর বলবে ?

বলবে চোর জোচ্চোর ছিঁচকে, পকেটমার। ডাকাতও বলতে পারে। দুপুরে ডাকাতির মতোই তো হলো ব্যাপারটা।

বত্রিশ বছর বিয়ে হয়েছে সত্যসিন্ধুর, শ্বশুর বাড়িতে এতোটুকু সুনামহানি ঘটেনি। যখন তখন শালা শালীরা বলতো—'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন হলেও—সাধুখাঁ আমাদের স্রেফ সাধু।'......

আর এখন ?

এখন এই বুড়োবয়সে শালার মেয়ের বিয়ের বাজার করবার ভার নিয়ে কিনা 'অসাধু' আখ্যা নিতে হবে ?

তাছাড়া আবার কি ?

কে বিশ্বাস করবে সত্যসিন্ধুর ওই 'ফস্' করে সুটকেস হাতছাড়া হওয়ার কথা ? নির্ঘাত ভাববে কালের হাওয়ায় সত্যসিন্ধুর এই উন্নতি ঘটেছে। দু'হাজারখানি টাকা হাতে পেয়ে—লোভ সামলাতে পারেননি, স্রেফ পকেটে পুরে ফেলে একটা গল্প বানিয়ে নিয়ে এসেছেন।

আর যদি তা নাও ভাবে যদি বোকা-সোকাই ভাবে, কী বিপদটায় পড়বে তারা, সেটাও তো ভাবতে হচ্ছে। আজই বিয়ে! কথা আছে সত্যসিন্ধু বিকেল নাগাদ পেঁাছে যাবেন, তারপর ওরা কনে সাজাবে, তত্ত্ব সাজাবে। সেই সব সাজসজ্জার মাল সত্যসিন্ধুরই নিয়ে যাবার কথা।

মানে, শুধু যাবার কথাই নয়, নিয়েই যাচ্ছিলেন, নতুন বিয়ের কনে আর নতুন জামাইয়ের জন্যে নতুন সুটকেস কিনে, তাতে নতুন নতুন সব জিনিসপত্তর কিনে ভরে।

হায় হায়, সেই বেনারসী শাড়ী ব্লাউজ। সেই ঢাকাই শান্তিপুরী, কেরালা কোয়েম্বাটুর, সেই সব কৌটোকাঁটা, ব্যাগ চটি, ঘড়ি, নাগরা ধুতি-চাদর, আয়না শেভিংসেট্ তোয়ালে, রুমাল, কোথায় গেল সে সব! বেছে বেছে যা সব কিনেছেন সত্যসিন্ধু, শালার পাঠানো টাকায়। পাছে কুলির মাথায় চাপালে ভীড়ে কুলি চোখছাড়া হয়ে যায়, তাই মরে মরে নিজে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তবু এই অঘটন ঘটলো!

সত্যসিন্ধুর মনে পড়লো, টিকিট ঘরের সামনে থেকেই যেন একটা লোক সত্যসিন্ধুর দিকে কেমন 'মতলব মতলব' চোখে তাকাচ্ছিল।

যেন 'কী বলি, কী বলি' ভাব।

সেই লোক। নির্ঘাত সেই লোক।

নাঃ কোনো সন্দেহ নেই, সেই মতলবি চেহারার লোকটাই এ কাজ করেছে।

হায়! হায়! সত্যসিন্ধু যদি তখনই 'পুলিশ পুলিশ' করে চেঁচাতেন, তাহলে এই দুর্ঘটনাটি হতো না। রেল পুলিশ এসে সেই বদ লোকটাকে হাতে হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যেতো। লোকের হাতের মালে হাত সাফাই করা বেরিয়ে যেত বাছার।

কিন্তু সত্যসিন্ধু তা করেননি।

তাই এখন সত্যসিন্ধু পস্তাচ্ছেন।

বিয়ে বাড়ির অবস্থার কথা ভাবছেন আর মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে সত্যসিন্ধুর, ওদিকে যে গাড়ির মধ্যে তুলকালাম চলছে, তা খেয়ালই নেই।

হঠাৎ ঘটাং করে থেমে গেল গাড়িটা।

অবশ্য চেন টেনে থামায়নি কেউ। গাড়ি একটা স্টেশনেই থেমেছে।

সত্যসিন্ধু ভাবলেন, নেমে পড়ে এর থেকে ঈষৎ ভালো কোনো গাড়ি পাই কিনা দেখবো?

তা ভাবতে যেটুকু সময়, হঠাৎ সত্যসিন্ধুকে দিশেহারা করে সেই 'মতলব মতলব' লোকটা উঠে এলো গাড়িতে। তার হাতে সত্যসিন্ধুর সেই খাকি বোরকা পরা ঢাউস সুটকেস! মানে নতুন জামাইকে তত্ত্বে দেওয়া

'অমন বুক চেপে ধরেছেন কেন?'

হবে বলে, ওই বোরকাটাও কিনে নিয়েছিলেন সত্যসিন্ধু, পাছে সুটকেসের রং খসে যায়।

কিন্তু এখন কি?

এখন যে সত্যসিন্ধুর চোখের সামনে সারা পৃথিবীটারই রং খসে যাচ্ছে। ও কেন? ওই সুটকেসটা নিয়ে কেন? কী মতলবে?

নির্ঘাত ভয়ংকর কোনো মতলব নিয়েই ওই ঘুঘুটা—

তা লোকটা ভয়ংকরই। নচেৎ ছিনতাই করে ভয় ডর নেই? উঠে এসেই সত্যসিন্ধুকে এক কোণে ওই ভাবে সুটকেস মাথায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হো হো করে হেসে উঠে বলে, 'কী দাদু, আচ্ছা লোক তো আপনি? অতো বার বললাম সামনের গাড়িতে জায়গা আছে, আপনার সুটকেস আমার কাছে, চলেই এলেন যে গটগটিয়ে?

-সত্যসিন্ধু কি বলতেন কে জানে?

চট করে কিছু বলার ক্ষমতাও ছিল না সত্যসিন্ধুর। ততক্ষণে সেই জানলাধারী রেগে বলে উঠেন, 'আপনিও তো আচ্ছা লোক মশাই? দেখছেন ভিড়ে লোকের দম আটকে যাচ্ছে, আর আপনি আবার ওই একটা মৈনাক পর্বত ঘাড়ে করে এসে ঠেলে উঠলেন?'

'মতলব মতলব' লোকটা সেদিকে কটাক্ষপাত করে বলে, উঠবো না কেন বলতে পারেন?'

'উঠবেন? দাঁড়াবার জায়গা নেই আর আপনি! বলি কোথায় দাঁড়াবেন শুনি?'

'দাঁড়াতেই হবে।'—মতলবি লোকটা গম্ভীর গলায় বলে, 'টিকিট যখন কেটেছি, তখন বসতে না পাই, দাঁড়াতে তো হবেই। লোকের পা মাড়িয়ে কিম্বা হাঁটু রগড়ে দিয়ে, অথবা কারুর জলের কুঁজো ভেঙে দিয়ে কিম্বা পাকা পেয়ারার ঝুড়ির মধ্যে পা পুঁতে—'

বলতে বলতে কী কৌশলে কে জানে লোকটা দিব্যি একখানি জায়গা করে নেয়। তারপর সত্যসিন্ধুকে বলে, 'আপনিও আচ্ছা লোক দাদু! বলতে নেই মা ষষ্ঠীর বাছা মোটামানুষ যাচ্ছিলেন দু দুটো সুটকেস বয়ে, একটু ভার লাঘব করে দিতে গেলাম, ছিটকে চলেই এলেন। আর এখন এখানে—একপায়ে—হি হি সুটকেস মাথায়—ছি ছি। আর আমরা ভারতবাসীরাও তেমনি! রেলগাড়ি চাপলেই ধরে নিই সব কামরাটায় আমার একার অধিকার! দেখছেন এই ভদ্রলোক এক পায়ে—'

লোকটা হঠাৎ অন্য আরোহীদের বাঙ্কে তুলে রাখা, পায়ের তলায় রাখা, কোলে কাঁখে আশে-পাশে রাখা মাল মোটের পর্বত নিয়ে টানা হেঁচড়া সুরু করে দেয়।

'আহা হা একী হচ্ছে মশাই......হাত দেবেন না, হাত দেবেন না কাঁচের বাসন,......উঃ আচ্ছা ঝামেলা তো' ইত্যাদি কোনো কথায় কান না দিয়ে সব কিছু হিঁচড়ে তুলে, সোজা করে গুছিয়ে দিয়ে মিনিটকয়েকের মধ্যেই সত্যসিন্ধুর সুটকেস দুটো কোনখানে যেন পাচার করে ফেলে সত্যসিন্ধুকে বসবার জায়গা করে দিয়ে, নিজেও তাঁর পাশে ঠেসে বসে পড়ে।

আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে যেন কতই হিতৈষী, কিন্তু সত্যসিন্ধু তো আর সেটা বিশ্বাস করতে পারেন না। সত্যসিন্ধুর মাথার মধ্যে ইঞ্জিন চলতে থাকে, ও কোন মতলবে কাজটা করেছে ভেবে।

আর সত্যসিন্ধুর সর্বাঙ্গে কাঁটা দিতে থাকে ওর গায়ে গা ঠেকছে বলে।

সত্যসিন্ধু বুক পকেটের হন্‌সাইডে রাখা পার্সটা দু-হাতে চেপে ধরেন।

আর সত্যসিন্ধু শিবনেত্র হয়ে তাকিয়ে থাকেন বাংকের উপর যেখানে তাঁর সুটকেস দুটি বিরাজিত।

সত্যসিন্ধুর সন্দেহ থাকে না—লোকটা তাঁর বড় ঢাউসটির ভিতর থেকে সব মাল বার করে নিয়ে স্রেফ্ ইঁট পাটকেল ভরে ফেরৎ দিতে এসে সাধু সাজছে। নামবার সময় ঠিক তাঁর দ্বিতীয় ঢাউসটি পেড়ে নিয়ে কেটে পড়বে—যার ভিতর সত্যসিন্ধুর যথাসর্বস্ব। নিজের তো বটেই, তাছাড়া বৌ, ছেলে, মেয়ে সব্বাইয়ের। তারা তো দশদিন আগে থেকে বিয়ে বাড়িতে গিয়ে বসে আছে, আর প্রতিদিন একখানা করে পোষ্টকার্ড ছাড়ছে, আসবার সময় অমুকটা এনো।'

সেটাও হাতছাড়া হয়ে যাবে, যদি সত্যসিন্ধু সতর্ক-দৃষ্টি ফেলে না রাখেন!

লোকটা অবশ্য বুঝতে পারে না সত্যসিন্ধু তাকে চিনে ফেলেছেন। তাই যেন কতো সরল কতো অমায়িক এইভাবে নিজের দুই হাঁটুতে হাত থাবড়ে হেসে গা পাতলা করে বলে, 'দেখলেন তো দাদু, জায়গা হলো কি না? কাউকে কি আমি গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছি? না। কারুর কোনো জিনিস কি জানলা গলিয়ে ফেলে দিয়েছি? না। অথচ দেখুন সবাই কেমন বসতে পেয়ে গেল। এই গোবিন্দ গড়াই যেখানে দাঁড়াবে, সেখানে সব ফর্সা।'

জ্ঞানপাপী!

মনে মনে উচ্চারণ করেন সত্যসিন্ধু, নিজের গুণ নিজেই বলা হচ্ছে—'সব ফর্সা!'

গোবিন্দ গড়াই আর একবার আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলে, 'আপনাদের মতো ভালমানুষ হলে কি আর পৃথিবীতে চরে খাওয়া যায় দাদু? পুরো টাকার টিকিট কেটে গাড়িতে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হা হা হা!... আরে ওকি দাদু, অমন বুক চেপে ধরেছেন কেন? অমন শিবনেত্র হয়ে যাচ্ছেন কেন? ইস, কী কাণ্ড!...আপনারা সব সরুন সরুন, হাওয়া ছাড়ুন—' এইভাবে এই সেদিন আমার নিজের বড়মামা—'

তারপর সে কী তুমল কাণ্ড লাগিয়ে দেয় গোবিন্দ গড়াই। আশপাশ থেকে সবাইকে সরিয়ে দিয়ে 'শুয়ে পড়ুন দাদু শুয়ে পড়ুন,' বলে জোর জবরদস্তি করে শুইয়ে দেয় সত্যসিন্ধুকে। এবং তারস্বরে বলতে থাকে, 'চোখটা বুজে একটু শান্ত হয়ে শুয়ে থাকুন দাদু, ওরকম শিবনেত্র হবেন না। চোখটা বুজুন, চোখটা বুজুন'।

সত্যসিন্ধুর ইচ্ছে হয় লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বলেন, 'তা তো সত্যি। চোখটা বুজলে তোমার খুব সুবিধে হয়। জন্মের শোধ বুজলে আরো।'......কিন্তু ইচ্ছেটা কাজে পরিণত করতে পারেন না, ভয় হয়। সত্যসিন্ধু ওকে ধরে ফেলেছেন, এটি বুঝে ফেললে, কে জানে আবার কোন মতলবের ফাঁদে ফেলবে, কোন মতলবের ফাঁস গলায় পরাবে।

অতএব চোখ বোজেন।

কিন্তু তিনিই কি কম যান? তিনি চোখ বোজেন, কিন্তু গোবিন্দ গড়াইয়ের একখানি হাত চেপে ধরে থাকেন। বেশী অসুখ টসুখ করলে বা নিদানকাল এলে সত্যি দাদুরা যেমন তাদের সত্যি নাতিদের হাত জড়িয়ে ধরে থাকে।

গোবিন্দই কি এ প্যাঁচ বুঝতে পারে না? খুব পারে, গোবিন্দ তাই কেবলই হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে থাকে—'হাতটা ছাড়ুন দাদু, একটু বাতাস করতে দিন।'

একখানা পাটকরা খবরের কাগজ হচ্ছে তার পাখা। তাও নিজের নয়, অন্য যাত্রীর হাত থেকে ফস্ করে টেনে নেওয়া।

সে আর কী বলবে?

একটা লোক বাতাসের অভাবে চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাবে আর সে বসে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরের কাগজ পড়বে? কেবলমাত্র সেটা কুড়িটা নয়া পয়সা দিয়ে কিনেছে বলে?

হুঁ। কে না জানে বিপদের কালে প্রত্যেকের সম্পত্তি প্রত্যেকের হয়ে যায়?

কেউ না জানুক গোবিন্দ গড়াই জানে। তাই সে অম্লান বদনে এর কুঁজো থেকে জল ঢালে, ওর পকেট

থেকে রুমাল টানে, ওর হাত থেকে কাগজটা টেনে নেয়।

কে আপত্তি করবে একটা মানুষ যখন মরতে বসেছে। মানুষ তো—বর্বর নয়। মানুষ তো বুনো নয়। আর মানুষ বুনো বর্বর নয় বলেই সত্যসিন্ধুও চুপ করে সহ্য করে যান এই যত্নের অত্যাচার। নইলে তেড়ে উঠে কামড়ে দিতেন।

সহসা গোবিন্দ গড়াই বলে, 'দুটো হাত দুদিকে ছড়িয়ে শুন দাদু, আরাম পাবেন। ও কি বাঁহাত দিয়ে বুকটা অমন চেপে ধরেছেন কেন? চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে ডাক্তারের চেষ্টা দেখবো?'

সত্যসিন্ধু অজ্ঞানের ভান করে না-শোনার ভঙ্গীতে শুয়ে থাকেন। হাতটাকে ইনসাইড্ পকেটের ওপর থেকে নামান না।

এবং পাছে মরমর ভেবে সে চেন টেনে গাড়ি থামায় তাই ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে বেঁচে থাকার—প্রমাণ দেখান।

কিন্তু মতলববাজদের সঙ্গে কে পারবে?
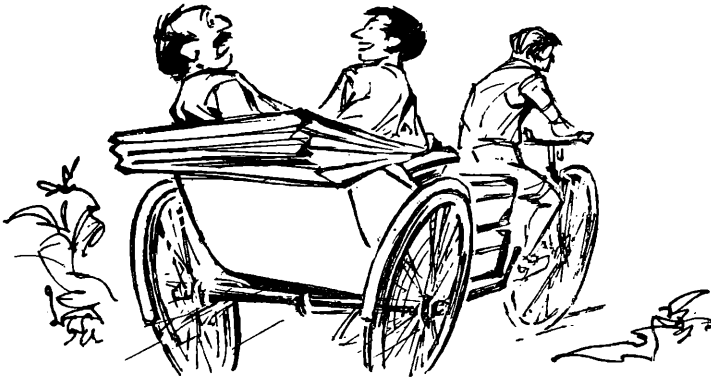
ট্রেন বোলপুর পৌঁছলে নামতে তো হবে?

কাজেই চৈতন্যেও আসতে হবে। আর গোবিন্দ গড়াইকেও সঙ্গে নিতে হবে।

কারণ গোবিন্দ গড়াই তো ট্রেনের অন্য সবাইয়ের মতো দায়িত্বহীন নয় যে, ওই হাসফাঁস করা মোটা মানুষটাকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় একটা স্টেশনে একা নেমে যেতে দেবে?

তা হয় না।

গোবিন্দ গড়াইও নেমে পড়ে। এবং গোবিন্দ গড়াই-ই সাইকেল রিক্সা ডাকে, সেই ঢাউস দুটোকে হিঁচড়ে হিঁচড়ে নামিয়ে (যার একটার মধ্যে ইঁট-পাটকেল ভরা) রিক্সায় তোলে, এবং সত্যসিন্ধুকে সাবধানে ধরে তাতে বসিয়ে দিয়ে তড়াক করে নিজেও চড়ে বসে।

তার মানে, গোড়া থেকে যে ফিকিরে ছিল, সেইটিই সাধন করে। সত্যসিন্ধুকে নিজের কবলগত করে ফেলে।......

তারপর আর কি?

কোনো একটা নির্জন রাস্তায় নিয়ে গিয়ে পকেট থেকে ছুরি বার করবে।

রিক্সাওয়ালাটাও যে ওর দলের লোক তাতে আর সন্দেহ থাকে না। কারণ গোবিন্দ ওর সঙ্গে সমানে দরাজ গলায় গল্প চালিয়ে যাচ্ছে 'বুঝলে রিক্সাওলা, এই বাবু-টির শরীর ভাল নয়। সাবধানে নিয়ে চল। বেশী ঝাঁকুনী দিও না।...আর এই যে ইনি বললেন—ডাক্তার মণ্ডলের বাড়ি যাবেন, চেনো তো সে বাড়ি?......আহা তা তো চিনবেই. রিক্সা চালিয়ে খাচ্ছো যখন।'...ননস্টপ্ চালিয়ে যাচ্ছে কথা।

কে জানে ওই অতি সাধারণ কথাগুলোর মধ্যে কোনো সাঙ্কেতিক কথাটথা লুকনো আছে কিনা! তাই তো থাকে এই সব চোর জোচ্চোর পকেটমারদের।

সত্যসিন্ধু এবার নিজের সম্পর্কে হাল ছেড়ে দেন। সত্যসিন্ধু ভাবতে থাকেন, বেশ তাই ভালো। গোবিন্দ গড়াই যদি তাঁকে নিহত করে রাস্তায় ফেলে রেখে মালপত্র নিয়ে সরেই পড়ে, পড়ুক! সত্যসিন্ধুকে তাহলে আর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে সর্বহারা মুখ দেখাতে হবে না।

আর গিন্নীর মুখ-ঝামটাও খেতে হবে না। শুধুই কি গিন্নীর? ছেলের নয়? মেয়েদের নয়? তারা বলবে না, রাতদিন আমাদের সাবধান করতে আসো, আর তোমার এই অবস্থা? একটা সুটকেসমার —গালে চড়টা মেরে এই রকম বুদ্ধু বানিয়ে চলে গেল।'

তার থেকে রাস্তায় মরে পড়ে থাকাই ভালো।

কিন্তু ক্রমশঃই যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে সত্যসিন্ধুর। কই ভুলিয়ে অন্য রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছে না তো? ঠিকই তো তাঁর শ্বশুরবাড়ির দরজায় এনে ফেললো।

কে জানে আরো কী মতলব।

বিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ে আরো বেশী বেশী মাল সাফাইয়ের মতলব নয় তো?

তাই।

ঠিক তাই।

রিক্সা থেকে নেমে, এবং সত্যসিন্ধু আর তাঁর গন্ধ-

মাদনদের নামিয়ে বলে ওঠে, 'দাদু গলার মধ্যে গোবি মরুভূমি! এক গ্লাস জল খাওয়ান দিকি।'

জল! তার মানে বাড়িতে ঢোকার ছুতো।

সত্যসিন্ধু এখন নিজের কোর্টে এসে পড়েছেন, আর ভয় করেন?

নাঃ। আর না।

তাই সত্যসিন্ধু 'বুকের কষ্ট' ভুলে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলেন, 'খাওয়াবো নাতি, শুধু জল কেন? উত্তম মধ্যম খাওয়াবো। এখন এই সুটকেসটি খুলে দেখাও দিকি, কী কী ভেজাল ভরেছো।'

গোবিন্দ গড়াই আকাশ থেকে পড়ে। গোবিন্দ গড়াই অবোধ শিশুর দৃষ্টিতে তাকায়। গোবিন্দ গড়াই কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, 'কী বলছেন?'

'যা বলছি ঠিকই বলছি! সত্যসিন্ধু সাধুখাঁর কাছে এসেছো মামদোবাজি করতে? জল চেয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকবে, তারপর—নেমন্তন্ন খেতে চাইবে, তারপর বিয়ে বাড়ি থেকে বেশ কিছু হাতিয়ে—

'দাদু আপনার হেড্ অফিসে কিছু গন্ডগোল হয়নি তো? কি বলছেন আবোল তাবোল।'

গোবিন্দ গড়াই আকুল হয়।

কিন্তু সত্যসিন্ধুর পায়ের তলায় এখন শ্বশুর-বাড়ির মাটি। সত্যসিন্ধু তাই সাহসী। অতএব সত্যসিন্ধু বলে ওঠেন, 'আবোল তাবোল বকছি? কেমন? তোমার মতলব আমি ধরে ফেলেছি বাছাধন। এখন নয়। সেই গোড়া থেকেই। বলি টিকিট ঘর থেকে তুমি আমায় ফলো করনি?'

গোবিন্দ গড়াই বলে ওঠে, 'তা করেছিলাম। আপনাকে ঠিক আমার বড় মামার মত দেখতে লাগছিল তাই। মানে এই সেদিন তিনি—'

'মারা গেছেন, তাই তো? ভালই করেছেন। তোমার মত ভাগনের হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেছেন। কিন্তু এই মামার মতনটি বড় শক্ত ছেলে বুঝলে?, তার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছো না। খোলো সুটকেস!'

'কী আশ্চর্য!' গোবিন্দ গড়াই বিস্ময়ের সাগরে কুল পায় না, 'আপনার বাক্স আমি খুলবো কি করে? আমার কাছে কি চাবি আছে?'

'আহাহা, ওরে আমার মানিক রে। তোমার কাছে চাবি নেই! সব-খোল চাবি থাকে না তোমাদের?'

'দেখুন আপনি তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন, আপনার ব্রেনে কিছু—'

'বটে বটে। আমার ব্রেন অ্যাটাক করেছে? ওরে আমার হিতৈষী। এবার আমায় মাথা খারাপের রুগী সাজিয়ে—'

ইত্যবসরে বাড়ির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসেন সত্য-সিন্ধুর শালা। বলেন, 'ওঃ জামাইবাবু এসে গেছেন? বাঁচলাম। বাড়ির মধ্যে তো জিনিস জিনিস করে মহা ঝামেলা লাগিয়েছে। ইনি? আপনার বন্ধু বুঝি?'

'হ্যাঁ বন্ধু! পরম বন্ধু!' সত্যসিন্ধু বলেন, 'আমি ওনার মামার মতন দেখতে বলে আমার ভার লাঘব করতে উনি ওই বিয়ের সুটকেসটি হাতিয়েছিলেন, আবার বড় দাঁও মারার লোভে সাধু সেজে—......বলি দাঁড়িয়ে রইলে যে? খোলো সুটকেস! দেখি কি কি সরিয়েছো!'

শালা হতভম্ব।

রিক্সাওলা থ।

শুধু গোবিন্দ গড়াইয়ের মুখে ফুটে ওঠে একটু মৃদু হাসি।

'বাড়ি ঢুকে ধীরে সুস্থে মিলিয়ে দেখুনগে দাদু কি কি হাতিয়েছি। তারপর একেবারে হাতকড়া নিয়ে যাবেন। এই ঠিকানা রইল।'

পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে এগিয়ে দেয় গোবিন্দ গড়াই। বলে, 'বড় বাজারে গরীবের একটা মেওয়ার দোকান আছে, ওদিকে গেলে দয়া করে পদধূলি দেবেন। আচ্ছা।...এই চল।'

নাকের সামনে দিয়ে চলে যায় রিক্সাটা ফিরিয়ে নিয়ে। সত্যসিন্ধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন।

না থেকেই বা করবেন কি?

ইত্যবসরেই তো তাঁর পকেট থেকে চাবি হাতিয়ে সুটকেস খোলা হয়ে গেছে। এবং বাড়ি সুদ্ধু সকলে সত্যসিন্ধুর পছন্দের তারিফ করতে লেগে গেছে।......

লোকটা তেষ্টার জল চেয়েছিল!

কিন্তু সত্যসিন্ধু কী করবেন?

রিক্সাভাড়াটা পর্যন্ত লাগলো না সত্যসিন্ধুর। কিন্তু তাতেই বা কী করতে পারেন সত্যসিন্ধু?...বিনা মতলবে কেউ যে শুধু শুধু কারুর উপকার করবার জন্যে মোট বইতে পারে, যত্ন করতে পারে অসুস্থ ভেবে, বাড়ি পেঁৗছে দিতে পারে, বুঝবেন কী করে?

সত্যসিন্ধু তো আর সত্যযুগের লোক নয়!

গোবিন্দ গড়াই যদি হঠাৎ সেই সত্য যুগটার কোনো একটা খাঁজ থেকে গড়িয়ে পড়ে এযুগের মাটিতে এসে বাস করতে বসে থাকে, সত্যসিন্ধুর সেটা জানার কথা নয়।

ঢাল আর তলোয়ার

শৈবাল চক্রবর্তী

পাশাপাশি দুজন থাকেন দুটি বাড়ীতে, কিন্তু বাক্যালাপ দূরে থাক কেউ কারো দিকে মুখ তুলে তাকান না পর্যন্ত! কোন একদিন এ বাড়ির এক ছেলে ও বাড়ির মেয়েটাকে চড় দেখিয়েছিল জবাবে মেয়েটা নাকি ভেঙিয়েছিল মুখ, সেই থেকে এক তুমুল বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাতের পর থেকে চলেছে এই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পালা!

ইনি শশধর আর উনি হলধর! একজনের মাছের ভেড়ী, অন্যজন গামছা'র আড়তদার! ব্যবসার দিক থেকে দুজনের আত্মীয়তা লক্ষ্য করবার মতন! দুজনেই আছেন খাওয়া-পরার ব্যাপার নিয়ে তবু কি কাজ-কারবার, কি পারিবারিক কোন প্রসঙ্গ নিয়ে ভুলেও কেউ কারো সঙ্গে কথা বলেন না!

শশধর রোগা, লম্বা, গলা সরু বাঁশীর মতন, হলধর মোটা গোলগাল, হাঁ করলে মনে হয় বাজ পড়ল বুঝি! পাড়ার লোক নাম দিয়েছে ঢাল-তলোয়ার! আকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখেই যে এই নামকরণ তা নিশ্চয় বুঝতে পারছ!

কিন্তু সেদিন হঠাৎ ওঁদের কথা বলতে হয়েছিল! বলা বাহুল্য, কোন প্রীতিবিনিময়ের ভাষা ওঁদের মুখ দিয়ে বেরোয় নি সে সময়! বাড়ী থেকে বেরুনোর মুখে দুজনের দেখা! দেখা বললে অবশ্য সত্যের অপলাপ করা হবে! একজন দাঁড়িয়েছিলেন পূবমুখো হয়ে আর একজনের চোখ ছিল পশ্চিমে!

নাকে এক টিপ নস্যি গুঁজে হলধর বললেন, এই যে—

শশধর বিড়িতে টান দিয়ে উল্টো দিকে তাকিয়ে নির্লিপ্ত মুখে বললেন কাকে বলা হচ্ছে?

ন্যাকামি দেখলে গা জ্বলে, হলধর কণ্ঠে বিরক্তি মেশালেন, বলি, আমি কি মিটিং-এ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছি? যত সব! এখানে প্রাণী বলতে তো একটি—

কথাটা কি? হাতঘড়ি উল্টে সময় দেখে শশধর বললেন গম্ভীর মুখে! একটু তাড়াতাড়ি শেষ করা

হোক—

কথাটা হচ্ছে, আপনাদের বাড়ীর বেড়ালটা বেজায় অভদ্র, বেয়াদপের একশেষ! আদব-কায়দা বলতে একটুও জানে না ওটা! চাপা রাগের সঙ্গে বললেন হলধর!

কেন কি করল সে? শশধর নাকে আর এক টিপ নস্যি গোঁজেন! কার পাকা ধানে মই দিল শুনি?

কি করল? কি করে নি, তাই বরং জিগ্যেস করলে ভাল হয়! বিড়ির বাকি অংশটা দূরে নিক্ষেপ করতে করতে হলধর রাগতভাবে জবাব দেন! এমনিতে তো মিঁউ মিঁউ করে অনবরত কানের কাছে ডেকে আমাদের দিবানিদ্রার বারোটা বাজায়। তার উপর কাল যা করেছে তার আর সীমা-পরিসীমা নেই! মাঝ-রাতে ভাঁড়ারে ঢুকে একরাশ ইলিশ মাছ ভাজা ছিল, সব নিঃশেষে সাবাড় করেছে! এখন কুটুমরা এলে আমি কি দিয়ে তাদের খেতে দিই? এগুলোকে কি বলে এ্যাঁ? বেড়াল পোষা না প্রতিবেশীর যন্তন্না বাড়ানো! আমি এই চললাম পুলিসে—

ইস্ পুলিসে অমনি গেলেই হল! শশধরের বাঁশীর মত গলায় বিদ্রূপ বেজে ওঠে!

কেন পুলিসে যাওয়ার মধ্যে এত হাতি-ঘোড়া কি আছে! হলধর কিছুটা অবাক হল! কত লোকই তো পুলিসে যাচ্ছে! নালিশ থাকলেই লোকে পুলিসে যায়—

নালিশের নামে এই ছেলেমানুষী নাকিকান্না শুনলে পুলিস কি করবে তাই ভাবছি! নিশ্চয় এক জোড়া মোটা বালিশ জুটবে কপালে! হিঁ হিঁ করে হেসে ওঠেন শশধর!

আমার বালিশ জুটবে কিনা জানি না তবে এক-জনের কপালে যে জেলের ঘানি জুটবে তা জানি! মুঠি পাকানো হাত নাচিয়ে হলধর বলে ওঠেন, বেড়াল তো আর জেল খাটতে পারে না, তাই তাকে যে পুষেছে, তার দৌরাত্মির দায়িত্ব তাকেই বর্তাবে! প্রতিবেশীর স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রায় বিঘ্ন ঘটালে শাস্তির বিধান আছে আইনে—বুঝলে? আমি উকিল-মোক্তারের সঙ্গে কথা বলে রেখেছি! উত্তেজনায় হলধর যেন হাঁপান!

তা বেশ করেছ। উকিল-মোক্তার যখন জুটিয়েছ তখন যে মোটা রকম গাঁটগচ্চা যাবে তা বুঝতেই পারছি! শশধর আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠেন! উঃ আমার কি আনন্দই হচ্ছে!

কেন আনন্দ কিসের? হলধর ভুরু কোঁচকান।

ভেবেছিলুম, বলব না, কিন্তু না বলে পারছি না! মানে কিছুতেই কথাটা আর চেপে রাখতে পারছি না—

কথাটা কি? হলধর আর থাকতে না পেরে প্রশ্ন করেন!

একান্তই শুনবে? তবে শোনো! আমার বেড়াল মিঁউ মিঁউ করে ডাকে না, আর সে কখনও ভাজা মাছ মুখে দেয় না। বিশেষ যদি তা পরের বাড়ীর মাছ হয়। আর...আরও শুনবে? আমার কোন বেড়ালই নেই বুঝলে গোবর গণেশ? যাও এখন, নালিশ করো গিয়ে—পুলিস, আদালত, হাটকোর্ট যেখানে খুশি—

বেড়াল নেই! কথাটা নিজে আউড়ে নিয়ে হলধর তিড়িং তিড়িং নেচে ওঠেন! ওই শরীর নিয়ে অমন-ভাবে নাচতে শশধরেরও চোখ কপালে ওঠে! 'ওই হলদে রঙের কাবলি বেড়ালটা তবে তোমার নয়! উঃ বাঁচালে! কাল থেকে ওটাকে ধরে রাখা থেকে যা ভয়ে ভয়ে ছিলুম! আমার নাতনিটা কি বায়নাই না ধরেছে বেড়ালটার জন্যে! শুধু নাতনি কেন বাড়ীসুদ্ধ লোক ওটার জন্যে পাগল! ওটা তবে তোমার নয়? ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল ভাই!'

———

শৈলেশ ভড়

রাত্রি তখন গভীর। পথঘাট নির্জন। খোলা জানলা দিয়ে হাওয়া আসছে মৃদু মৃদু। শরতের শেষ, তাই বাতাসে হিমেল আমেজ।

ডিটেকটিভ করঞ্জাক্ষ খাসনবিশ গায়ে একটা পাতলা চাদর জড়িয়ে লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা ইংরেজি উপন্যাস পড়ছিল। বিছানার পাশে সবুজ ঘেরাটোপ দেওয়া একটা আলো জ্বলছে।

অনেকদূর দিয়ে একটা এঞ্জিন চলে যাচ্ছে। তার হুইসিলের শব্দ ভেসে আসছে। ওপাশের গলিতে একটা ঘেয়ো কুকুর কাঁদছে একটানা।

শহরের এ অঞ্চলটা এখনও জমজমাট হয়ে ওঠে নি। কয়েকটি নতুন বাড়ী তৈরী হয়েছে। লোকজন সবে আসতে সুরু করেছে। কয়েকটি বাড়ী এখনও অসমাপ্ত। তাই অঞ্চলটা শহরের অন্য জায়গার তুলনায় যেমন নির্জন, তেমনি নিঝঝুম।

ঘরের দেয়ালঘড়িতে এইমাত্র মিষ্টিসুরে বারোটা বাজলো।

আলোটা নিবিয়ে দিয়ে করঞ্জাক্ষ ঘুমোবার চেষ্টা করলো আর ঠিক সেই মুহূর্তে বুম্...বুম্! প্রচণ্ড আওয়াজ করে বোমা ফাটল কোথায়।

রাস্তার দুপাশের গাছে পাখিগুলো আর্তনাদ করে উঠলো। কেউ কেউ পাখা ঝটপটিয়ে উড়েও গেল এদিক-ওদিক।

একটা চলমান গাড়ীর শব্দ পাওয়া যাছে। হ্যাঁ, এই দিকেই আসছে যেন। কৌতূহলী হয়ে বিছানায় উঠে বসলো করঞ্জাক্ষ। তারপর খোলা জানলাটার পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করলো।

হ্যাঁ, একটা সিডানবডি মন্থরগতিতে এগিয়ে আসছে তারই বাড়ীর দিকে। গাড়ীটার সামনের হেডলাইট দুটো জ্বলছে দৈত্যের জ্বলন্ত চোখের মত।

বুম! আবার একটা বোমা ফাটলো ঠিক বাড়ীর সামনে।

আর তার ধোঁয়া মিলিয়ে যেতেই দেখা গেলো চলন্ত গাড়ীর দরজা খুলে একটা লোক যেন হুমড়ি খেয়ে পড়লো রাস্তার ওপর। কেউ যেন তাকে ঠেলে ফেলে দিল। আর তারপরেই গাড়ীটা প্রচণ্ড গতিতে যেন উড়ে চলে গেল।

করঞ্জাক্ষ অনেক চেষ্টা করেও গাড়ীর নম্বরটা পড়তে পারল না। যে লোকটা এইমাত্র গাড়ী থেকে পড়ে গেল, সে এখনও পথের ওপরেই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। রাস্তার ফ্লোরেসেন্ট আলোয় করঞ্জাক্ষ স্পষ্ট দেখতে পেল, রক্তের একটা ক্ষীণ রেখা গড়িয়ে যাচ্ছে তার মুখের পাশ দিয়ে।

তাড়াতাড়ি নিকটস্থ থানায় একটা ফোন করে দিল করঞ্জাক্ষ। মুহূর্তের মধ্যে ইন্সপেক্টর মধুময় দত্ত সদল-বলে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন।

পরীক্ষা করে দেখা গেল লোকটি মৃত। এবং এ মৃত্যু যে হত্যার দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে তা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। মৃতের মুখটিকে হত্যাকারী হাতুড়ি বা হামানদিস্তা দিয়ে এমনভাবে থেঁতলে দিয়েছে

যে চেনবার কোন উপায় নেই।

মৃতদেহের জামা অনুসন্ধান করে কয়েক বাণ্ডিল একশো টাকার নোট আর একটি সুদৃশ্য ডায়েরি পাওয়া গেল।

ময়না তদন্তের জন্য মৃতদেহটিকে পাঠিয়ে দিয়ে ইন্সপেক্টর মধুময়কে নিয়ে করঞ্জাক্ষ বাড়ীর মধ্যে ফিরে এলো। নোটগুলি পরীক্ষা করে দেখা গেল জাল।

ডায়েরিটা পরীক্ষা করা দরকার। মলাটটা খুলতেই যে নামটা ঘরের আলোয় জ্বলজ্বল করে উঠল, সেটা দেখেই চমকে ওঠে ডিটেকটিভ করঞ্জাক্ষ।

ডায়েরিতে যে নামটি লেখা ছিল সেটা সহরের বিখ্যাত ডাকাত হরবন সিং-এর। হরবন সিংকে শুধু ডাকাত বললে ভুল হয়, সে একাধারে জালিয়াত ও স্মাগলার।

করঞ্জাক্ষকে উদ্দেশ করে লেখা একটা চিঠিও পাওয়া গেল ডায়েরির মধ্যে।

'মহাশয়, যে আসামীকে আপনারা ধরবার জন্যে এত চেষ্টা করছেন, আমরা আজ তাকে হত্যা করে আপনার বাড়ীর সামনে ফেলে দিয়ে গেলাম। তার দলের লোক আমরা। নোট জাল আর চোরা-চালানে আমরাই তাকে এতদিন সাহায্য করে এসেছি। কিন্তু লোকটা এতবড় শয়তান যে, আমাদের বখরার অনেক টাকা সে মেরে দিয়েছে। আজ সুযোগ পেয়ে তার প্রতিশোধ নিলাম। আশা করি, তার মৃতদেহের একটা সদ্গতি করবেন।'

এতক্ষণে বোঝা গেল বোমা ফাটানোর কারণটা। করঞ্জাক্ষকে সজাগ করে তোলাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

হরবন সিং-এর হত্যার খবরটা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। দৈনিকে ফলাও হয়ে প্রকাশ পেল। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো পুলিশ বিভাগ আর জনসাধারণ।

ময়না তদন্তের রিপোর্টে জানা গেল যে, হত্যার পর হত্যাকারী নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। তার প্রতিশোধ স্পৃহা এত প্রবল ছিল যে, হত্যার পর হাতুড়ি বা অন্য কোন ভারি জিনিস দিয়ে বারবার আঘাত করে হত্যাকারী তার মুখের চেহারাটা একেবারে বিকৃত করে ফেলেছে।

ইন্সপেক্টর মধুময় দত্ত বললেন, 'যাক্, এতদিনে নিশ্চিন্তে ঘুমনো যাবে। তুমি কি বল করঞ্জাক্ষ?'

'হুঁ।'—মৃদু নাসিকাধ্বনির সঙ্গে করঞ্জাক্ষের সারা মুখে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠলো।

আরো কিছুদিন পরে বোঝা গেল যে, সহরে জাল নোটের প্রচার বন্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু কোকেনের চোরা-চালান বেশ জমে উঠেছে।

'এটা বন্ধ করতেই হবে।' উপর থেকে আদেশ এসেছে করঞ্জাক্ষের কাছে।

সহরের সমস্ত থানার অফিসারদের নিয়ে মিটিং করলো করঞ্জাক্ষ। গরচা থানার অফিসার দীপেন্দু ছাড়া আর সবাই এসেছে সেই সভায়। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়াতে সে আসতে পারেনি।

করঞ্জাক্ষ সকলকে তাদের নিজ নিজ এলাকায় কড়া নজর রাখতে হুঁশিয়ার করে দিল। আর কি কি উপায় তারা অবলম্বন করবে তা-ও জানিয়ে দিল। গরচা থানার অফিসার দীপেন্দুকে টেলিফোন করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে দিল সে।

দীপেন্দু কর্মিৎকর্মা যুবক। সার্জেন্ট হয়ে চাকরী নিয়েছিল। এখন সে একটা গোটা থানার অফিসার। সম্প্রতি কয়েকটি বড় বড় খুনী আসামী ধরে সে অফিসে রীতিমত সুনাম অর্জন করেছে। ফলে পদোন্নতি হয়েছে। এভাবে চললে সে একদিন কমিশনারও হয়ে যেতে পারে। এতদিন সে গোপনে হরবন সিং-এর পিছনেই লেগে ছিল।

সে এখনও অবিবাহিত। তার থানার উপরের একটা ঘরে সে একলা থাকে। নিজের রান্না নিজেই করে নেয়। কারোর তোয়াক্কা করে না। সত্যি বলতে কি, পুলিশ বিভাগে এমন ভদ্র এবং নির্লোভ মানুষ কমই আছে।

কিছুদিন থেকে এই গরচা থানার সামনে একটা পাগলকে দেখা যাচ্ছে। তার মাথার চুলগুলো উস্কো-খুস্কো। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর গোঁপ। গায়ে ছেঁড়া ময়লা একটা ফতুয়া। আর পরণের ছোট নোংরা কাপড়টা কৌপনীর মত কোমরে জড়ানো। পাগলটা রোজ রাত্রে এসে এখানে জঞ্জাল ফেলা টিনটার পাশে বসে থাকে আর ভোর হবার আগেই চলে যায়।

দৃষ্টিটা তার সামনের থানার ওপর নয়। থানার পাশে যে দোতলা বাড়ীটা সেখানে আছে ওষুধ তৈরীর কারখানা। রাত্রে আলো জ্বেলে কাজ হয়। প্রায় শেষ-রাতে একটা কালো ভ্যান ঐ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায় ওষুধের বোতল আর কৌটোতে মাল বোঝাই করে। পাগলের দৃষ্টিটা সেই দিকেই। পাগলটা একদিন একটা কৌটো সকলের অলক্ষ্যে তুলে নিয়েছিল গাড়ী থেকে। তারপর বাড়ী এসে ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করে দেখে যা ভেবেছে তাই। কোকেন।

না, গাড়ীটাকে ধরে কোন লাভ নেই। আসল মালিককে ধরতে হবে।

একদিন গভীর রাতে পাগলাটিকে দেখা গেল—অন্ধকারে চুপিচুপি পিছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে সে উঠে যাচ্ছে উপরে। দোতলাটা অন্ধকার। কোথাও এতটুকু আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে না। দোতলার দীপেন্দুর ঘরের সামনে এসে সে দাঁড়ালো। দরজার ওপর টোকা দিল কয়েকটা। কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

ব্যাপার কী। ভ্রূ কোঁচকালো পাগলটা। তারপর হাত দিয়ে দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল। চারদিকটা ভালো করে দেখে নিয়ে পাগলটা আলতো পায়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। টর্চ জেলে দেখলো চারদিকটা। না কেউ কোথাও নেই। নিভাঁজ বিছানাটা দেখে বোঝা যায় এখনো সেটা ব্যবহৃত হয়নি। টর্চের আলোটা ঘুরতে ঘুরতে বিছানার পাশে আলনাটার ওপর এসে পড়লো। এলোমেলো করে জড়ো করা কয়েকটা প্যান্ট শার্ট। এক-পাশে কয়েকটা ময়লা রুমাল। আর তার পাশে ওটা কী ঝুলছে? চমকে ওঠে পাগলটা।

নিশ্বাস বন্ধ করে সে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করে দিল আগের মত। ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। হাতের কাছের মানুষ দেখা যায় না। একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে খস্ খস্ খস্ খস্। কেউ যেন এ-দিকেই আসছে। বারান্দার অন্য প্রান্তে একটা দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে পাগলটা।

পদশব্দ দীপেন্দুর ঘরের সামনে এসে থামলো। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। একটু পরে দরজায় খিল দেবার শব্দ শোনা গেল। পাগলটা অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এলো এবার। চুপিচুপি পায়ে সোজা চলে এলো বারান্দার অপর প্রান্তে। এই অবধি থানাবাড়ীর সীমানা। তারপর একটা সরুগলি আর তার পাশেই একটা দোতলা ছাদ। ছাদটা যে পাশের ওষুধের কারখানার, সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু ঐ ছাদ থেকে এখানে আসা সম্ভব নয়। অথচ পদশব্দটা এইদিক থেকেই এসেছে।

কিন্তু এখন আর অনুসন্ধান করে দেখার সময় নেই। রাত ভোর হয়ে আসছে। এখুনি তাকে পালাতে হবে। তা না হলে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

তখন বেলা এগারোটা। মধুময় দত্ত সবে লালবাজারে এসে তার অফিসঘরে বসেছেন। এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

'হ্যালো।'

'আমি করঞ্জাক্ষ কথা বলছি। আজ রাত্রি একটার সময় গরচা থানার পাশে ওষুধের কারখানায় খানা-তল্লাসী করবে। তারজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এখনই তৈরি করে নাও। আর একটা কথা—সব কাজ শেষ করে দোতলায় দীপেন্দুর ঘরে চলে আসবে। আমি ঐখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করবো। কেমন?'

যথাসময়ে খানাতল্লাসী সুরু হল। করঞ্জাক্ষ তখন গরচা থানার ওপরের বারান্দার ধারে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। পাশে কারখানার মধ্যে একটা চাপা গোলমাল শোনা যাচ্ছে। সেইসঙ্গে শিশি-বোতল ভাঙার শব্দ আসছে মাঝে মাঝে। দু-একজন কর্মচারী এদিক-ওদিক পালাতে গিয়ে ধরা পড়লো পুলিসের হাতে।

হঠাৎ দেখা গেল একটা লোক ছাদের ওপর দিয়ে ছুটে আসছে থানার বারান্দার দিকে। করঞ্জাক্ষ দেখলো একটা দড়ির সিঁড়ি থানার বারান্দা থেকে সোজা নেমে গেছে পাশের ছাদে। লোকটা সেই সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে উঠে আসছে। পলকের মধ্যে সে থানার বারান্দায় এসে নামলো।

বারান্দায় নেমেই লোকটা দড়ির মইটা খুলে নিল, হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে গেল দীপেন্দুর ঘরের দিকে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে করঞ্জাক্ষ তার হাতের সিল্কের সুতোর ফাঁসটা ছুঁড়ে দিল লোকটার দিকে। অব্যর্থ লক্ষ্য। মাথা গলিয়ে গা ডিঙিয়ে ফাঁসটা পায়ের কাছে এসে আটকে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়লো লোকটা। তারপর তাড়াতাড়ি উঠে বসবার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না।

ঠিক সেই সময় সিঁড়ি দিয়ে মধুময় দত্ত উঠে এলেন দোতলায়। বারান্দার আলোটা জেলে দিল করঞ্জাক্ষ।

মধুময় অবাক হয়ে বললেন, 'কে এই লোকটা?'

'ভালো করে দেখো', বলে করঞ্জাক্ষ, 'তাহলে চিনবে।'

লোকটাকে ধরে চিৎ করে দিল মধুময়। আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে পিছিয়ে এল কয়েক পা। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'এ ত হরবন সিং! কিন্তু দীপেন্দু?'

'সে আর নেই!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে করঞ্জাক্ষ বললে, 'তার মৃতদেহটা বিকৃত করে আমার বাড়ীর সামনে এরা ফেলে দিয়ে এসেছিল হরবন সিং-এর মৃত-দেহ বলে।'

দাঁত কিড়মিড় করে মধুময় বললেন, 'শয়তান! একে ফাঁসি না দিয়ে আগুনে পুড়িয়ে মারা উচিত।'

করঞ্জাক্ষ বললে, 'সে বিচার আদালতের। আমাদের নয়। এখন চলো এর একটা গতি করে আমরা চলে যাই।'

গোয়েন্দা সম্রাট রঙ্গলাল

চিত্র ও কাহিনী ~ শৈল চক্রবর্তী

বিদেশী গোয়েন্দাদের মাথায় থাকে টুপী। কিন্তু রঙ্গলাল বলে, ছিঃ ওর কোনো বাহার আছে নাকি? বেঁচে থাক আমাদের পাগড়ি! বাহন হিসাবে মোটর বা স্কুটারের পক্ষপাতী নয় রঙ্গলাল। রঙ্গলাল বলে, 'দুর্গম জায়গায় গাড়ি অচল। কিন্তু বাহাদুরের কাছে দুর্গম বলে কিছু নেই। একদিন দানা নিয়ে কাছে যেতেই বাহাদুর ডেকে উঠল চিঁ-হিঁ-চিঁ-হিঁ- এ ডাকের অর্থ বোঝে রঙ্গলাল। নিশ্চয়ই কেউ এসেছে বাড়িতে। সত্যিই তাই — এসেছে ঝগড়ু —

প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে অবশেষে প্রোফেসারের বাড়িতে—

প্রো:
জবর ম্যাজ

কে? বিক্রি খাওর হচ্ছেন না ত!
মেডেল দেখেও চিনতে পারছেন না? আমি রঙ্গলাল আমাকে খবর দিয়েছিলেন।
ওহ্, হো!

হ্যাঁ, এইবার বলুন কি চুরি গেছে আপনার?
কি বলব বাবা, আমার সর্বস্ব গেছে—

বুঝেছি। আচ্ছা, আপনার সেই সর্বস্ব ছিল কিসে?
ছিল একটা ওয়ালেটে, শার্কস্কিন লেদারের ওয়ালেট— তাতেই ছিল আমার সারাজীবনের সঞ্চয়—
কোথায় ছিল সেটা?

এই টেবিলেই ত ছিল হে!
হুম! এখন অন্য ঘরগুলো দেখা দরকার!

এটা আমার ল্যাবরেটরী। এখানে গাছ গাছড়া থেকে ওষুধ তৈরী হয়।

এই আমার সব্জি আর ভেষজের বাগান।

এখানে কি দেখছ?

আমি এখুনি বেরুচ্ছি এর কিনারা করতে। কিছু ভাববেন না আপনি।

সামনে কারা যাচ্ছে, একজনের হাতে একটা ব্যাগ··· বেশ সন্দেহজনক মনে হচ্ছে···

হুঁ, ঐ বাড়িতে ঢুকছে···
পেছনে কার্তিকের মত কে বাব্বা! ময়ূর ছেড়ে ঘোড়ায় কেন চাঁদ!

দরজা বন্ধ করে গেল। দোতালায় ওদের কথা শোনা যাচ্ছে···

ভাগ্যিস দড়িটা ঝুলছিল! এই দিয়েই ওপরে উঠব। রঙ্গলাল সব পারে-
!

কান খাড়া করে শুনতে হবে··

··· আমি তান করে যাব পাগলের ··· তোরা ব্যাগটা নিয়ে সরে পড়বি·· ল্যাম্প-পোস্টের কাছে কালো গাড়ি···
হুঁম্-আর বুঝতে বাকী নেই —এই হচ্ছে, যাকে বলে, আসল গ্যাং-

এমন সময় হঠাৎ বারান্দার দরজা খুলে একজন—
-এই হচ্ছে সুযোগ! একেই ধরতে হবে·
-এ ত সেই ঘোড়ায় চড়া মক্কেল না?

বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল রঙ্গলাল। ধরল তাকে বাগিয়ে কিন্তু সেও ছাড়বার পাত্র নয়।

ঝটাপট,
চড় চড়
দুম দাম

দাও ওকে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে! টের পাক বাছাধন!

হেঁ হেঁ রঙ্গলাল এ সব অবস্থার জন্যে প্রস্তুত থাকে..

ধপাস

ও হরি! এটা রিহার্স্যালের আখড়া! বোর্ডটা আগে দেখা উচিত ছিল!
"গুপ্তধন উদ্ধাও" নাটকের ড্রেস রিহার্স্যাল এখানে হইতেছে

আচ্ছা, বলুন ত বাহাদুর কোথায় গেল?
সে ত ঘুড়ি ওড়াচ্ছে-
না, না, বাহাদুর আমার ঘোড়া।
তাই বলুন, হ্যাঁ, একটা ঘোড়াকে দেখেছি প্রোফেসারের বাগানে-

প্রোফেসারের বাগান? আশ্চর্য!

ওদিকে প্রোফেসারের বাগানে —
মনে হচ্ছে কোনো চতুষ্পদ আমার বাগানে ঢুকেছে-

ঠিক তাই — রামভরোসা, জলদি আও, এহি ঘোড়েকো হটাও!

এমন সময় ছুটতে ছুটতে রঙ্গলাল সেইখানে হাজির হ'ল।
সর্বনাশ! এযে আমার বাহাদুর!
কে রঙ্গলাল? তুমি এখানে?

আমার ঘোড়ার খোঁজেই আপনার বাগানে আসতে হ'ল, সার!
কিন্তু, দেখ, কী সর্বনাশটা করেছে এ অসভ্য বীস্টটা-

সত্যিই তো প্রচুর কপি ভক্ষণ করেছে এ পেটুকটা — কিন্তু — ওটা? ওটা কি? একটা ওয়ালেটের মত-?

এইত সেই ওয়ালেট! শার্ক-স্কিন লেদার- প্রোফেসারের বর্ননার সঙ্গে ঠিক মিলে যাচ্ছে, কিন্তু- এত হাল্কা কেন?

এই দেখুন, স্যর, এটাই কি আপনার হারানো ওয়ালেট?
হ্যাঁ, হ্যাঁ! এইত আমার সেই অমূল্য— কোথায় পেলে বাবা?

কোনো দুর্বৃত্ত এটি নিয়ে পালাবার সময় নিশ্চয়ই ফেলে গেছে। বাহাদুর রুপি খেয়ে-ছিল বলেই না এটা আবিষ্কার হ'ল!
জিতা রহো বেটা বাহাদুর! আয় বেটা কাছে আয়! রামভরোসা, ওকে দানা খাওয়া!

কিন্তু আগে দেখুন আপনার টাকাকড়ি সব ঠিক আছে কি না!
দেখছি, বাবা, দেখছি!

কই টাকাকড়ি হীরে জহরৎ কিছুই ত বেরুচ্ছে না। মাল খুব সম্ভব সরিয়ে ফেলেছে-
না বাবা, হীরে জহরৎ ছিল না-

তবে কি হাজার টাকার নোটের তাড়া– ?
না তাও নয়! তার চেয়েও দামী– তুমি কল্পনা করতে পারবে না!

ব্যাঙ্কের মোটা অঙ্কের চেক নিশ্চয়?
না বন্ধু না, এইযে এইটুকু কাগজ! এটা কি জান? আমি সারাজীবন ধরে রিসার্চ করেছি চুল নিয়ে...

চুল নিয়ে?
হ্যাঁ, মাথার চুলের ফরমূলা, টাকের ওপর চুল গজাবার অসাধারন ওষুধ হবে এইটা দিয়ে...

পৃথিবীর এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারকে তুমি দ্বিতীয়বার আবিষ্কার করলে তাই তোমাকে পুরস্কৃত করব রঙ্গলাল...

এই ফরমুলা থেকে তৈরী ওষুধ প্রথম এক শিশি তোমাকে আমি উপহার দেব! হে-হে-হে...
কিন্তু তা নিয়ে আমি কি করব-3-3-3--
খতম

কান ধরবেন কেন?

প্রভাকর মাঝি

আপনার ঐ পেনটা নিয়ে
লিখছিলাম এক ছড়া
খাপ্পা হয়ে গেলেন তাতে?
মেজাজ এতো কড়া!

পরকে আপন ভাবতে হবে—
বইয়েই পড়ি, নয়?
ভেবেই কলম নিয়েছিলাম,
—দোষ কি এতে হয়?

করলেন মুখ খিস্তি না-হক,
'পাজি, শুয়োর, গাধা'
ইচ্ছে করে করি এ কাজ?
বিচার করুন, দাদা।

মগজে ভাব উসকে এলো,
তাই তো নিলাম একে,

কে জানতো ও হঠাৎ করে
পড়বে হাতের থেকে।

হঠাৎ করে কত কি হয়—
বন্ধ হয় না নাড়ি?
প্লেনে আগুন ধরে না কি?
ওলটায় রেলগাড়ি।

নেহাৎ যদি পেনের শোকে
মনটা হু হু করে,
আপনি সাজা দিতে পারেন,
লাগান কেন ঘরে?

দোষ করেছি, বকুনি দিন—
আর না করি যেন,
মারুন না চড়—তাই বলে ফের
কান ধরবেন কেন?

মিনি

রণজিৎ কুমার সেন

আমি যদি চোখ রাঙিয়ে হঠাৎ বলি—'এ্যাও',
ছোট্ট মিনি সরু গলায় বলে কেবল—'ম্যাও।'

আমি যদি আদর করে ডাকি—চুক্-চুক্-চুক্—,
অমনি মিনি এগিয়ে আসে ফুলিয়ে লোমশ বুক।

মিনি আমার ভারী মিষ্টি ছোট্ট বিড়ালছানা,
একই খাটে আমার ও তার একই যে বিছানা!

আদর করে হাত বুলিয়ে খেয়ে স্নেহের চুমো
রাতের বেলা ঘুম পাড়িয়ে যেই বলি 'তুই ঘুমো',

অমনি আমার জড়িয়ে গলা ঘুমিয়ে পড়ে মিনি,
এই বাড়িতে কেবল তারে আমিই শুধু চিনি।

দাদা বলে, 'দূর করে দে', দিদি বলে, 'আপদ',
সবার কাছে মিনি যেন বনের কোনো শ্বাপদ!

কেউ পারে না দেখতে ওকে, সবার চক্ষুশূল,
ভাবে সবাই—বোলতা যেন, ফুটিয়ে দেবে হুল!

মিনির জন্যে সবার সঙ্গে ঝগড়া আমার রোজ,
সারাদিনে এই বাড়িতে কেউ করে না খোঁজ—

কি দিয়ে কি খেলো মিনি, করলো কি না চান,
আমি ছাড়া কেউ বোঝে না মিনির অভিমান।

আমি যখন পড়তে বসি, মিনিরও চাই বই,
নখের আঁচড় কেটে কেটে ফুটিয়ে তোলে খই।

আমি যখন খেলতে বেরোই, মিনিরও চাই খেলা,
পাড়ার যত বিড়ালছানার বসে তখন মেলা।

পিঁড়ি পেতে বসলে খেতে, মিনিরও চাই পিঁড়ি,
হাসতে হাসতে মরি যে ওর দেখে বসার ছিরি।

জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে কেবল, আস্তে ডাকে—'ম্যাও,'
দুধের বাটি এগিয়ে দিয়ে আমি বলি—'এ্যাও।'

মিনি তখন চুপটি করে খাবারে দেয় মন;
ওর সাথে রোজ এমনি আমার কাটে সারাক্ষণ॥

ভুলিয়ে

নির্মলেন্দু গৌতম

সামনে যাকে পায় সে তাকেই
নানান কথায় ভুলিয়ে,
রঙ-বেরঙে এ'কেই তাকে
রাখছে ঘরে ঝুলিয়ে।

যাচ্ছে ভ'রে দেয়াল, তবু
চলছে আঁকা, ঝোলানো।
চলছে তবু অমনি ক'রে
আঁকার জন্য ভোলানো।

ব্যাপারটা কি যেই শুধানো,
বললে আঁকা থামিয়ে ঃ
'ওসব কথা ভাবছি নাকো
মিথ্যে মাথা ঘামিয়ে!'

বলেই আবার আঁকতে থাকে,
সময় যাবে ফাঁকা কি?
ভেবেই দ্যাখো, সহজ কথা
তেমন ছবি আঁকা কি?

কিন্তু পুপু টের পেলো না,
ছোট্‌কা তাকেই ভুলিয়ে—
কখন যে তার আঁকলো ছবি,
রাখলো ঘরে ঝুলিয়ে॥

অনন্যার আবাহনী

রঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আসবি যদি আয় মা আবার, ঘোচা মনের এ যন্ত্রণাঃ
দ্যাখ্‌ না মাগো করছে অসুর খাদ্যাভাবের কুমন্ত্রণা!
নকল করা খাদ্যাভাবের যুক্তি চালায় সর্বনেশে,
এ সব অসুর মারতে মাগো, আয় না আবার তেমনি বেশে।
রাতারাতিই দিচ্ছে সবই ভেঙেচুরে চারিদিকে......
রক্তে রাঙায় দেশের মাটি চালিয়ে মৃত্যু-রোলারটিকে।
শান্তি দিতে আয় মা আবার, আমরা তোকে ডাকছি খালি,
ভয়ঙ্করী মূর্তিতে মা, নে না আবার অর্ঘ্য ডালি!
বিদ্যে দে মা, বুদ্ধি দে মা, শক্তি দে মা, সাহস বল:
অত্যাচারের অন্ধকারে আর কত কাল থাকবো বল্‌?

বাঙলাটাকে বাঁচিয়ে রাখার, দে না মাগো সুমন্ত্রণা?
আসলি যদি বছর পরে ঘোচা মনের এ যন্ত্রণা।

সিংহের মামা ভোম্বলদাস

দুর্গাদাস সরকার

বাঘের ঘরে যে ঘোগের বাসা রে,—
এলো ভোম্বলদাস
বারো শত বাঘ এক গ্রাসে খায়,
ভয়ে বাঘ খায় ঘাস।

সিংহের মামা ভোম্বলদাস
ইয়া তার গোঁফ দাড়ি,
পাঁচ শত হাতি টেনে নিয়ে যায়
একশ' চাকার গাড়ি।

গাড়ি থেকে মুখ বাড়ায় যখন
ভোম্বলদাস হেসে
যতো বুনো প্রাণী প্রাণের ভয়েতে
বন ছাড়া হয় শেষে।

রাগী এক বাঘ মতলব আঁটে,
গেল সে ওঝার বাড়ি,
বাণ মেরে যদি শেষ করা যায়
শত্রুকে তাড়াতাড়ি।

বুড়ো ওঝা বসে খাচ্ছিল ভাত,
বাঘ দেখে ভয়ে কাঁপে,
এক নিমেষেই নিয়ে গেল বাঘে
ওঝাকেই এক লাফে।

বাঁচাবে তখন ওঝাকে আর কে?
বাঘ তাকে দাঁতে ধরে
আনল যখন বনের মাথায়
বুড়ো ওঝা গেছে মরে!

আর কি বা হবে? বাঘ করে তাকে
চর্বিত-চর্বণ,
এতোদিন শুধু ঘাস খেয়ে আছে
তাই ভারি খুশি মন।

হঠাৎ সে দ্যাখে—সামনে দাঁড়িয়ে
ভোম্বলদাস হাসে,
যমরাজ তাকে উদরে ভরল
বিরাট একটি গ্রাসে॥

আলোর জন্যে

সরল দে

এখানে কালো কালো ভাবনা ঝুল বোনে।
এখানে ফুলকুঁড়ি ফোটে না ফুলবনে।
এখানে ছায়া নামে খুকুর খেলাঘরে।
এখানে অকারণ অকালে বেলা পড়ে।
এখানে আলো নেই, এখানে হাওয়া নেই,
শিউলি-ভোরে ফুল কুড়োতে যাওয়া নেই।
এখানে একটাও শিউলিতলা নেই,
নরম ঘাসে ঘাসে পা ফেলে চলা নেই।
এখানে ছিল সব, কে নিল কেড়ে সব?
ফিরিয়ে দে রে সব ফিরিয়ে দে রে সব।
আলোর তীরে আজ আমরা দাঁড়িয়েছি,
নতুন করে চাই—যা কিছু হারিয়েছি।
আমরা আলো চাই ঘরের কোণে কোণে,
খুকুর খেলাঘরে, ফুলের বনে বনে।
আলোর মত ফুল শিউলি-ভোরে চাই,
আকাশ ঝল্‌মল্‌ নতুন করে চাই।
স্বপ্ন এঁকে রাখি চোখের কোলে তাই,
ভাবনা কালো কালো দু' পায়ে দলে যাই।
আলোর গান গেয়ে আলোর দূত সব
আমরা নিয়ে আসি আলোর উৎসব॥

তাই এবারে

বিশ্বপ্রিয়

আগমনীর আগমনের বোধন হতে সুরু—
সেই তো ঢাকি ঢাক বাজালো ঃ ড্যাম্‌ কুড়া কুড়্‌ কুড়ু!
সেই তো দীঘল দীঘির পাড়ে, দুধেল কাশের রাশে
শরৎ দিনের সোনালী রোদ, ঝিকমিকিয়ে হাসে।
সেই তো বাতাস, শিউলিফুলের গন্ধ বয়ে আনে—
বকের পাতি ডানা মেলে—নীলচে আকাশ পানে।
কই তবু সেই আগের মত সবার হৃদয় ঘিরে,
হাসি-খুশির আবেগ সাড়া জাগে আবার ফিরে?
হায়রে এবার শাসন হারা গ্রাম বাংলার কোলে,
ক্ষোভের আগুন জ্বলছে ধু-ধু ঃ শোকের ছায়া দোলে!
ছন্নছাড়ার মতন কি এক, দারুণ হতাশাতে—
সবার জীবন কাটছে শুধুই বিষাদ বেদনাতে।
তাই এবারে—এ-পাড় ও-পাড় দুই বাংলা জুড়ে,
এই বোধনের বাদ্যি বাজে ঃ রোদনভরা সুরে॥

দামাল ছেলে তিনটি

বেণু গঙ্গোপাধ্যায়

গাঙগুলীদের বঙ্কা
তারে দেখে পাড়ার লোকে সবাই করে শঙ্কা।
কচমচিয়ে খেয়ে ফেলে দশটা কাঁচা লঙ্কা।
বঙ্কা।

সঙ্গী তাহার মন্টি
একরত্তি কচি মেয়ে, ওরই ছোট বোনটি।
ঠিক করা দায় ওই দুজনের দুষ্টু বেশী কোন্‌টি।
মন্টি।

মাসতুতো ভাই অমলা
বঙ্কুরামের যোগ্য চেলা কেবলই খায় কমলা
লুকিয়ে এঁটে বসে থাকে উকীল বাপের শ্যামলা
অমলা।

দামাল ছেলে তিনটি
রাম রাবণের যুদ্ধ চালায় ধরি সারা দিনটি।
বিছানাতে ডিগবাজী খায়, নাচে তা ধিন ধিনটি
তিনটি।

রাত্রে ওরা লক্ষ্মী
মা ঠাকুমায় হয় না ওদের পোহাতে দায় ঝক্কি।
চুপটি করে ঘুমোয় যেন ডানাভাঙা পক্ষী।
রাত্রে ওরা লক্ষ্মী।

লিমেরিক

শান্তশীল দাস

বল্লভপুরে থাকে বনমালী ভটচায,
খায় দায় গান গায়, করে নাক কোন কাজ;
একদিন মামা এসে
নিয়ে গেল তার দেশে,
তিন কিলো ধান দিয়ে বলে, 'বুনো খই ভাজ'।
কাঞ্চন নগরের কৃষ্ণ কিশোর
দেড় মন শরীরেতে কী ভীষণ জোর!
ঘুষোঘুষি মারামারি
তাতে উৎসাহ ভারি;
ব্যাকরণ দেখলেই ঘাম পায় ওর।
চারিদিকে রব শুনি মিনি মিনি মিনি,
মনে হল, যাই গিয়ে দু' চারটে কিনি;
বলি, মিনি সন্দেশ
পাঁচখানা দাও বেশ;
বাড়ী এসে খুলে দেখি, পাঁচ দানা চিনি!
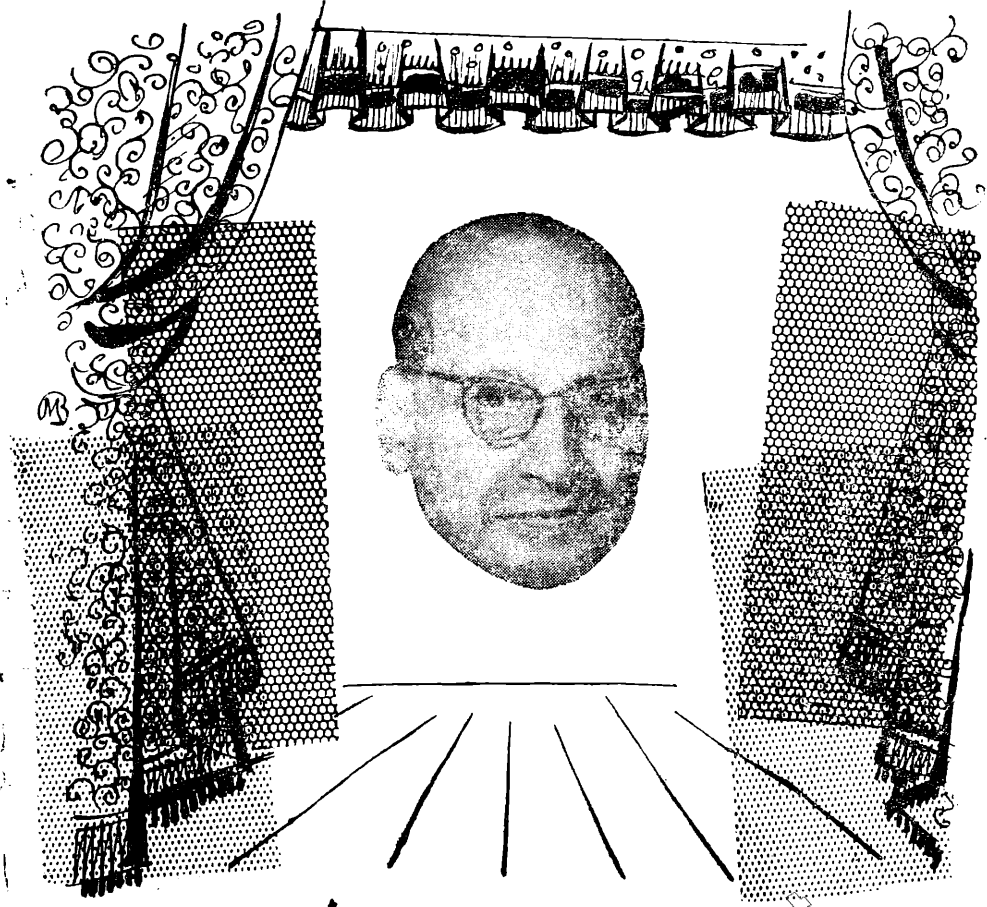
আমার কথা

অহীন্দ্র চৌধুরী

মনে আছে, ছোটবেলায় একবার বাবাকে বলেছিলাম, বাবা—আমাকে একটা বাঁশী কিনে দেবে?

বাবা বলেছিলেন, বাঁশী বাজাতে নেই, ফুসফুস খারাপ হয়।

ছোট্ট আমার সেই আশাটুকু পূর্ণ হয়নি বলে মনের মধ্যে কোন দুঃখ ছিল না।

ভেবেছিলাম, বাবা ঠিকই বলেছেন, বাঁশী বাজালে ফুসফুস খারাপ হয়।

আমার বাবা চন্দ্রভূষণ চৌধুরী মানুষ হিসাবে যদিও রাশভারী তবু তাঁর মতো স্নেহপরায়ণ মানুষ আমি দেখিনি।

আমার জীবনে যদি কারো প্রভাব পড়ে থাকে, তবে তা বাবার। বাবার কাছ থেকে পেয়েছি অনেক—যা আমার সারা জীবনের সঞ্চয়।

যাক সে কথা।

বাঁশী বাজানো শখটা এক সময় চলে গেল। ছাত্র-জীবন থেকে আর এক নেশা আমাকে পেয়ে বসলো।

সে নেশা খেলাধুলোর। রীতিমতো খেলোয়াড় হয়ে গেলাম আমি। কলকাতার মাঠ-ময়দানে আমি ফুটবল খেলতে আরম্ভ করলাম। কিছুটা সুনামও অর্জন করেছিলাম।

আমি যে একসময় ফুটবল খেলতাম, এ খবরটা সে সময়কার অনেকেরই জানা আছে। সে কি আজকের কথা! প্রায় ষাট বছর আগের কথা।

কিন্তু কোথা থেকে কী হয়ে গেল। খেলোয়াড় ছেলেটা যোগ দিলে নাটকের দলে।

তখন আমরা থাকতাম দক্ষিণ কলকাতায় ভবানীপুরে। থিয়েটারের দল ছিল পাড়ায়। কী খেয়ালে আমি নাম লেখালাম সেই দলে। রীতিমতো তালিম নিতে লাগলাম। তারপর একদিন আসরে অবতীর্ণ হলাম সাজ-পোশাক পরে। প্রথম যে নাটকে অংশ নিই, সে নাটকটি ছিল ঐতিহাসিক। একে ঐতিহাসিক নাটক, তারপর কখনো অভিনয় করিনি। পোশাক পরতে গিয়ে তো রীতিমতো ঝামেলা। ড্রেসার বললে, পোশাক পরতে। পরলাম, কিন্তু উল্টো। সখের দলের ছেলেরাও ঠাট্টা করলে। তারপর স্টেজে নামতে হবে। প্রম্পটারকে বলে রেখেছি ঠিক সময়ে বলতে, কখন স্টেজে নামতে হবে। সেই মতো নামলাম। কিন্তু স্টেজে নেমে সামনে অগণিত মানুষের কালো মাথা দেখে 'পার্ট' ভুলে গেলাম। ধরিয়ে দিতে তবে বলতে আরম্ভ করলাম।

নাটক শেষে দেখলাম, কেউ না কেউ সকলের তারিফ করছে। কিন্তু আমাকে কেউ বললে না কিছু। জানতে চাইলে, পরিচালক বললেন বেশ হয়েছে।

বুঝলাম, ভালো হয়নি। তবু সেদিন খুশী মনেই শেষ রাতে বাড়ি ফিরলাম মুখে রঙের প্রলেপ নিয়ে।

প্রথমটা বাবা জানতেন না যে, আমি নাটুকে দলে ঢুকেছি। যখন জানলেন তখন তাঁর কাছ থেকে সমর্থন তো পাইনি, বরং তিরস্কৃত হলাম। আমাকে অনেক করে বোঝালেন, যেন আমি যাত্রা থিয়েটার না করি।

আমি কিন্তু বেশ বুঝতে পারতাম, বাবা কেন আমাকে 'নাটুকে' হতে নিষেধ করেন। তাই তো কখনো তাঁর ইচ্ছার প্রতিবাদ করিনি। কেননা, আমি তো জানি বাবার কতোখানি স্নেহ আমাদের জন্যে।

কতোদিন এমন হয়েছে, অভিনয় করে বাড়ি ফিরেছি গভীর রাতে। ফিরে দেখেছি ঘুমন্ত বাড়ি। শেষটা কোন মতে পাঁচিল টপকে বাড়ি ঢুকেছি। চাকর-দরোয়ানদের ইশারায় চুপ করতে বলে বাইরের বৈঠকখানায় শুয়েছি ভোরবেলা ধরা পড়েছি বাবার কাছে।

আমাদের যখন তরুণ বয়েস, তখন কলকাতায় পেশাদারী মঞ্চে জমজমাট অবস্থা। সেটা গিরিশ যুগ চলছে। ভবানীপুরের ছেলে আমরা, দল বেঁধে উত্তর কলকাতায় নাটক দেখতে যেতাম। পয়সা থাকতো না সব সময়ে। হেঁটেই আসা-যাওয়া করতাম। নাটক দেখার এমনই উৎসাহ ছিল আমাদের।

আর সে সময় কলকাতার থিয়েটার তো এখনকার মতো আড়াই ঘন্টা তিন ঘন্টার নাটক নিয়ে নয়, দস্তুর মতো পাঁচ ঘণ্টা কি ছ ঘণ্টা সময় লাগতো অভিনয়ে। রাত ন'টায় নাটক আরম্ভ হলে শেষ হতো দুটো কি তিনটেয়। তারপর পায়ে হেঁটে উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতায় ভবানীপুরে ফিরে আসতে হত।

আমার অভিনয় জীবন ঠিকমতো শুরু যাত্রা-নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে। আর অভিনয় জীবনের গুরু অভিনেতা দিকপাল শ্রদ্ধেয় তিনকড়ি চক্রবর্তী।

তিনকড়ি চক্রবর্তী ছিলেন এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ। এমন মানুষকেই তো আচার্য হিসাবে মানায়। তাঁকে ডাকতাম তিনকড়িদা বলে।

আমাদের যখন অভিনয় জীবন শুরু, তখন মঞ্চের সম্রাট অভিনেতা ছিলেন সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ। দানীবাবু নামেই তাঁর পরিচয়। দানীবাবু ছিলেন নটগুরু মহাকবি গিরিশচন্দ্রের পুত্র। শুধু একা দানীবাবু নন, মঞ্চে তখন দিকপাল অভিনেতারা নাটকে অংশ নিতেন। একদিকে দানীবাবু, অন্যদিকে অমর দত্ত—এঁদের অভিনয় প্রতিভার কথা ভুলবার নয়।

অভিনয় আমরা দেখতাম। শুধু দেখা নয়, শিক্ষার্থীর মন নিয়ে তা আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেছি। যেমন একটা উদাহরণ দিই। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং তাঁর প্রফুল্ল নাটকে যোগেশের চরিত্রে অংশ নিতেন। এই নাটকের একটি সংলাপ 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' কথাটি নিজস্ব রীতিতে উচ্চারণ করতেন গিরিশবাবু। কিন্তু দানীবাবু যখন এই যোগেশ চরিত্রে রূপ দিতেন, তখন এই সংলাপটি আর এক ভাবে বলতেন। পরবর্তী কালে আরো কতো অভিনেতা এই চরিত্রে রূপ দিয়েছেন, প্রত্যেকেই চেয়েছেন স্বাতন্ত্র্য আনতে। শিশির ভাদুড়ী মশাইও যোগেশের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন—তিনি আবার আর এক নতুন রীতিতে এই সংলাপ উচ্চারণ করতেন। কিন্তু এই যে বৈচিত্র্য, তার মধ্যে

যতো অমিল থাক না, মিলেরও অন্ত ছিল না। এই যে অমিল থেকে মিল—এটাকেই বলা হয় অভিনয় ধারা। আমরা কেউ-ই এই ধারার বাইরে নই। আমরা যতো ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হই না কেন, তবু মূল ধারার উৎস-মুখ একটাই।

আগেই বলেছি, আমি অভিনয় জগতে প্রবেশ করি শৌখীন থিয়েটার এবং যাত্রাভিনেতা রূপে। তারপর রীতিমতো তালিম্ নিতে থাকি। শ্রদ্ধেয় তিনকড়ি চক্রবর্তীই আমার আচার্য। তিনিই আমাকে মঞ্চে আনেন।

স্টার থিয়েটারের তখন নাম ছিল আর্ট থিয়েটার। প্রথম নাটক স্বর্গত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাটক কর্ণার্জুন। আমি প্রথম রজনীতে অর্জুনের ভূমিকায় অভিনয় করি। সেদিনের অভিনয়ে কর্ণের ভূমিকায় ছিলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী। আরো ছিলেন নরেশ মিত্র, দুর্গাদাস, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণভামিনী, প্রভৃতি।

এতোদিন যাঁদের অভিনয় দর্শক হিসাবে দেখেছি, মুগ্ধ হয়েছি, আজ তাঁদের সঙ্গে অভিনয় করা। তা ছাড়া অর্জুনের মতো চরিত্রে।

প্রথম রজনীর অভিনয়ের অভিজ্ঞতার কথা বলি। সত্যি বলতে কি, আমি কেমন যেন ভীত হয়ে পড়েছিলাম অভিনয়ের আগে। পান্ডব-শ্রেষ্ঠ অর্জুনের মেক-আপ নিয়ে যখন আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালাম, তখন মনের যে অবস্থা তা বলবার নয়।

অবশেষে নাটক আরম্ভ হলো। আমাকেও নামতে হলো মঞ্চে। প্রথম রজনীর অভিনয়ে যে এমন করে দর্শকদের অভিনন্দন পাবো, এটা আমি ভাবিনি।

আমরা যখন অভিনয় করতে আরম্ভ করেছি, তখনকার দিন ছিল অন্য রকম। অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাছে রঙ্গালয় ছিল শিক্ষালয়। 'যতো দিন বাঁচি ততো দিন শিখি'র মতো। যতোদিন অভিনয় করি, ততো দিন শিক্ষা করি। পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতিরও কমতি ছিল না। একটা মঞ্চ যেন, বৃহৎ পরিবার। পরিবারে যেমন কর্তা আছে, এখানেও তেমনি কর্তা।

এবারে আমাদের সময়কার অভিনয় আর অভিনেতা-অভিনেত্রীর সম্পর্কে কিছু বলি।

গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেনি, তবে একবারই তাঁর অভিনয় দেখেছিলাম। ক্লাসিক থিয়েটারে প্রফুল্ল নাটকে তাঁকে যোগেশের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখেছি। তবে লোকমুখে শুনেছি, এক বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন গিরিশবাবু। নাটক ছিল তাঁর প্রাণ। মঞ্চ ছিল তাঁর কাছে জীবন। গিরিশচন্দ্র নাটক আর মঞ্চের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

গিরিশ যুগে আরো যাঁরা শীর্ষস্থানে ছিলেন তাঁদের মধ্যে অর্ধেন্দু মুস্তাফী, রসরাজ অমৃতলাল, অমৃতলাল মিত্র, মহেন্দ্র বসু, বেলবাবু প্রমুখের অভিনয়ের কথা ভুলবার নয়। অভিনেত্রীদের মধ্যে ছিলেন বিনোদিনী, গঙ্গামণি ছাড়া আরো অনেকে।

এঁদের অনেককে আমি চোখে দেখেছি—এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন মজলিশী। সবারই ছিল নাটক অন্ত প্রাণ।

এরপর এলো দানীবাবুর যুগ। গিরিশবাবুর ছেলে দানীবাবু। পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী। পিতা-পুত্র এঁরা একই সংগে নাটকে মঞ্চাবতরণ করেছেন। যেমন পিতা, তেমনি পুত্র—কেউ কম যেতেন না।

যাই হোক, দানীবাবুর সঙ্গে আমি অভিনয় করেছি। অভিনেতা হিসাবে যেমন তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, মানুষ হিসাবেও তাঁর তুলনা ছিল না। যেমন অমায়িক তেমনিই গম্ভীর। অথচ ছিলেন মজলিশী।

কিন্তু রসরাজ অমৃতলাল? আশ্চর্য এক মানুষ! একদিকে যেমন তাঁর মধ্যে একজন রসিক মানুষ লুকিয়ে ছিল, তেমনই ছিল উদার একটি প্রাণ।

তখনকার দিনে সবার চরিত্রের মধ্যেই বিভিন্ন গুণের এক আশ্চর্য সমন্বয় দেখা যেতো। যেটা পরবর্তী কালে আর তেমন দেখা যেতো না।

আমি যে যুগে অভিনয় জগতে এসেছি, সে যুগটা ছিল বাংলা রঙ্গমঞ্চের দ্বিতীয় অধ্যায়।

গিরিশ যুগের যাঁরা ছিলেন, এক-এক করে তাঁরা চলে গেলেন। চোখের সামনে দেখলাম, রসরাজ অমৃতলাল, মহেন্দ্রবাবু, বিনোদিনী—সবাই চলে গেলেন।

নতুনদের আবির্ভাব হতে লাগলো। আমারই মতো আরো কতো অভিনেতা, অভিনেত্রী মঞ্চের পাদ-প্রদীপের আলোয় এসে দাঁড়াতে আরম্ভ করলেন।

সেদিনের নবাগত আমরা। শিশির ভাদুড়ী, আমি, দুর্গাদাস, নরেশ মিত্র, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য—কিছু আগে পরে হলেও মোটামুটি আমাদের কাল আর যুগ একই। পুরোনো যাঁরা ছিলেন, তাঁরা এক-এক করে চলে গেলেন।

আমাদের মধ্যে নরেশবাবু ছিলেন বয়সে বড়ো। তিনি আমাদের আগেই থিয়েটারে যোগ দিয়েছেন। আইন পাশ করা সুদর্শন যুবক—তাঁর মধ্যে ছিল বিরাট প্রতিশ্রুতি।

আর শিশির ভাদুড়ী ছিলেন অধ্যাপক। অধ্যাপনা ছেড়ে অভিনয় জগতে এলেন। নতুন চিন্তা, নতুন ভাবধারা সংযোজন করতে চাইলেন।

এই রকম এক-এক করে কতো জনের আর্বিভাব ঘটলো—যাদের মধ্যে আমিও একজন।

আমাদের অভিনয় জীবনে প্রভাব পড়েছিল পূর্ব-সাধকদের। এ প্রভাব এড়াবার নয়। সুতরাং সব সময় মনে হতো, যে মঞ্চে দিকপাল অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অভিনয় করেছেন, সেই মঞ্চে আমরা করছি। আমাদের হাতে মঞ্চের গৌরব ক্ষুণ্ণ না হয়, এ চিন্তাটা সকলের মধ্যেই থাকতো। যেমন ছিল পরিশ্রম, তেমনি ছিল সাধনা। আমাদের কাছে অভিনয়টা তো বিলাস ছিল না, ছিল সাধনা। মঞ্চ আমাদের কাছে শিক্ষাপীঠ।

তাছাড়া তখনকার দিনে অভিনয়ে যেমন হতো মানসিক শ্রম, তেমনি দৈহিক। এক-একটা নাটক চলতো পাঁচ ঘণ্টা, কিংবা তারও বেশি সময় ধরে। আর অধিকাংশ নাটক ছিল ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক। সামাজিক নাটক যা ছিল, তারও গুরুত্ব কোনদিক থেকে কম ছিল না।

যেমন ধরা যাক, প্রফুল্ল। গিরিশবাবুর এ নাটকটি ক্লাসিক পর্যায়ের। কতো চরিত্র—কতো তাদের বৈচিত্র্য। কোন চরিত্রটি হেলা-ফেলার নয়। এই নাটকটি যখন মঞ্চে অভিনীত হতো—তখন দর্শকদের সামনে পুরোনো দিনের অভিনয়ের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে থাকতো। এই নাটকে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র অভিনয় করেছেন, অভিনয় করেছেন দানীবাবু প্রমুখ সব্যসাচী অভিনেতারা। সুতরাং অভিনয় কালে আমাদের সব সময়ে মনে হতো, এই বুঝি খারাপ হয়ে যায়।

আমাদের কাছে নাটক হোক, আর অভিনয় হোক, সব কিছু সার্থকতা নির্ভর করতো দর্শকদের বিচারের ওপর। দর্শকের বিচারে উত্তীর্ণ হওয়াটাই ছিল বড়ো।

কতো সময় দেখেছি, নতুন কোন নাটক রিহার্সাল আরম্ভ হলো। মনে হলো দারুণ নাটক। বাজীমাৎ করবে। শিল্পীরাও দরদ দিয়ে অভিনয় করলেন। কিন্তু যথাসময়ে পাদ-প্রদীপের আলোয় এলে দেখা গেল দর্শক-সাধারণ মুখ ফিরিয়ে নিলে।

ত্রুটি কোথায়? এমন নাটক, এমন অভিনয়—অথচ দর্শকদের মন জয় করতে পারলো না কেন?

এ প্রশ্ন থেকেই যেতো। বলা বাহুল্য এ ধরনের অসফল নাটকের বেশি দিন অভিনয় হতো না।

আবার এর বিপরীত দৃষ্টান্তও আছে। আমাদের বিচারে যেখানে নাটক দুর্বল মনে হয়েছে, দেখেছি দর্শকদের বিচারে সে নাটক উত্রে গেছে।

সুতরাং নাটকের ক্ষেত্রে দর্শকদের বিচারটাই হলো আসল কথা।

দর্শকদের ধর্ম কি? দর্শকরা কী চান?

এ প্রশ্নগুলো মনে আসে। কিন্তু আমরা দর্শকদের বিচার করবো কেমন করে।

একই সঙ্গে হাজার দর্শক নাটক দেখেন। তাঁদের কতো পরিচয়। কিন্তু মঞ্চে অভিনয় দেখতে বসে দর্শকের একাত্ম হয়ে যাওয়া,এটা তো মুখের কথা নয়। যেমন কেউ মেলোড্রামা পছন্দ করেন, কেউ পছন্দ করেন আবৃত্তির ঢং-এর অভিনয়, কেউ সূক্ষ্ম অভিনয়-রীতি ভালোবাসেন, আবার কেউ মিলনান্তক নাটক, কেউ বিয়োগান্তক—হাজার দর্শকের হাজার চাহিদা। এটা পূরণ করা কোন নাটকের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ এই অসম্ভবও সম্ভব হয় মঞ্চে। এমন নজীর অনেক আছে, মঞ্চে পর্দা উঠতেই দেখা গেল পরিপূর্ণ হল ঘর। চাপা গুঞ্জন থেমে গেল পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। হাজার দর্শক সেই মুহূর্তে মঞ্চের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়লেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রুদ্ধ নিঃশ্বাসে নাটক দেখলেন। এই যে দর্শক মনের ওপর যাদুকরী প্রভাব বিস্তার করা—এখানেই নাটক এবং অভিনয়ের সার্থকতা।

আমাদের কালে আমরা সব সময়ে মনে রাখতাম দর্শকদের কথা। কখনো দর্শকদের বিচার-বুদ্ধিকে ছোট করে দেখিনি।

আমাদের অর্থাৎ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে কোন রকম ভুল বোঝাবুঝি ছিল না এমন কথা বলি না। সবই ছিল। কিন্তু সংকীর্ণতা ছিল না। একটি রজনীর অভিনয় সার্থক করতে যে মিলিত উদ্যম প্রয়োজন—একথাটা আমরা বিস্মৃত হতাম না। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, প্রতিযোগিতা ছিল—কিন্তু সংকীর্ণ চিন্তা ছিল না।

আর একটা কথা, আমাদের মধ্যে শিক্ষার্থীর মন ছিল। একজন 'একস্ট্রা' অভিনেতা যদি ভালো অভিনয় করতেন, তাহলে সে ভালোটুকু গ্রহণ করতে দ্বিধা

করতাম না। আমরা সবাই শিক্ষক, সবাই শিক্ষার্থী। এই শিক্ষা আমরা পেয়েছিলাম পূর্বসূরীদের কাছ থেকে।

আর আমার জীবনে যদি সফলতা এসে থাকে, তবে তা সেই জন্যেই। এখনো আমার মধ্যে সেই শিক্ষার্থীর মনটা রয়েছে।

জীবনের প্রথম থেকেই 'অভিনেতা হবো'—এই চিন্তাটা ছিল আমার মনের মধ্যে। হলামও তাই। জীবনে চল্লিশ বছরের মতো সময় অভিনয় নিয়ে কাটিয়েছি। এই দীর্ঘকালের পথ পরিক্রমায় তো কম অভিজ্ঞতা অর্জন করি নি, আর সেই অভিজ্ঞতা দিয়ে বলতে পারি, এতো জানার পর কিছুই জানি নি, এতো শেখার পর কিছুই শিখিনি।

শ্রদ্ধেয় তিনকড়ি চক্রবর্তী আমাকে মঞ্চে নিয়ে এসেছিলেন। প্রথমেই অভিনয় করি কর্ণার্জুনের মতো নাটকে অর্জুনের চরিত্রে। তারপর থেকে কতো অভিনয় করলাম। কতো চরিত্রে রূপ দিলাম।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলি, আরো একজন অভিনেতা এই কর্ণার্জুন নাটকে একটি ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় করে রীতিমতো 'তাক' লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি হলেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গাদাস প্রথমে কর্ণার্জুনে 'বিকর্ণ'-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

দুর্গাদাসের কথা যখন উঠলো, তখন তাঁর সম্পর্কে দু'এক কথা বলি। দুর্গাদাস ছিলেন দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী। নাটকের চরিত্রের সঙ্গে অমন একাত্ম হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা খুব কম অভিনেতারই ছিল। তাছাড়া অভিনয়ে ছিল তাঁর সহজাত প্রতিভা।

আমাদের কাল, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় থেকে পঞ্চম দশক—এটা ছিল মঞ্চের একটা চিহ্নিত যুগ। প্রথম যুগের কথা তখনো আমাদের সামনে। যে যুগটাকে বলা হয় গিরিশ যুগ। তারপর গিরিশোত্তর কাল। যে কালে আমরা অভিনয় জগতে এলাম। তখনো মঞ্চের ওপরে গিরিশ যুগের পূর্ণ প্রভাব।

এক দিক থেকে আমরা ভাগ্যবান বৈকি। যাঁদের কাছ থেকে অভিনয়ে দীক্ষা নিয়েছি, শিক্ষা পেয়েছি, যাঁদের সঙ্গে অভিনয় করেছি, তাঁরা শুধু উচ্চ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তাই নয়—তাঁরা ছিলেন বিরল ব্যক্তিমানসের অধিকারী।

এক যুগ থেকে আর এক যুগে পদার্পণ করলাম। এক যুগের মানুষ অন্য যুগে এসে পেঁছিলাম। পরিবর্তন এলো সমাজে। সেই পরিবর্তনের ঢেউ এসে লাগলো নাটকে, মঞ্চে, অভিনেতার চরিত্রে।

মঞ্চের যে ধ্রুপদী ধারাটা এতো দিন বর্তমান ছিল, সে ধারার রূপান্তর ঘটলো। আমরা এই পরিবর্তনের মধ্যে দাঁড়িয়ে কিন্তু বিব্রত বোধ করি নি, বরং সেকালের ধারার সঙ্গে পরিবর্তিত ধারাটি অদ্ভুতভাবে মিলিয়ে নিলাম। এই মিলন সম্ভব হয়েছিল বলেই আমরা অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারলাম।

নাটক, মঞ্চ, অভিনয়—সম্পর্কসূত্র এই তিনের মধ্যে নিবিড়। নাটক তখনই সফল যখন সার্থক অভিনয় হয়। আর মঞ্চশৈলী যদি নাটকের দাবী পূরণ না করে, তাহলে সার্থক অভিনয়ও ব্যর্থ হয়।

একটা কথা বলি, আগের দিনে নাটক আর অভিনয়ের ওপর যতোখানি জোর দেওয়া হতো, মঞ্চরীতি এবং আঙ্গিকের দিকে অতোখানি দৃষ্টি দেওয়া হতো না। কিন্তু পরিবর্তিত যুগে অভিনয়ের সে দাবীটুকুও আমরা পূরণ করলাম।

সম্রাট শাজাহানের মেক আপ কেমন হবে, নবাব সিরাজদ্দৌল্লা কেমন করে পদচারণা করবেন, আবার ষোড়শীর জীবানন্দ কেমন করে চরিত্রকে মঞ্চে উপস্থিত করবে—এই নিয়ে অভিনেতার কতো না চিন্তা। নাটক পড়ে চরিত্রটিকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে তারপর সেই চরিত্রটিকে রূপায়িত করে তোলা। যদি সার্থকতা আসে, ভালো—আর যদি ব্যর্থ হয়? সে গ্লানি অভিনেতার।

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে বলি, দর্শক সাধারণ বলতেন, আমি নাকি শাজাহান, আবন, গোলাম হোসেন, ভোলা মাস্টার এসব চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেছি। আমার আনন্দ এই খানেই। কিন্তু এই চরিত্রগুলি রূপায়িত করতে আমার যে কতো বিনিদ্র রজনী কেটেছে, তা কি দর্শকরা জানেন?

একটা চরিত্র নিয়ে যখন কোন শিল্পী চিন্তা করে, তখন সে নিজেকে সেই চরিত্রের মধ্যে মিশিয়ে দিয়েই চিন্তা করে।

আমি শাজাহান অভিনয় করেছি, শাজাহানের চরিত্রটিকে আয়ত্ত করতে কতো দিন আর কতো রাত কেটেছে তার কি ঠিক আছে! সুতরাং সার্থক রূপকার সেই, যে নিজেকে কোন চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে মিশিয়ে দিতে পারে। পূর্বসূরীদের কাছে আমরা এই শিক্ষাই পেয়েছি।
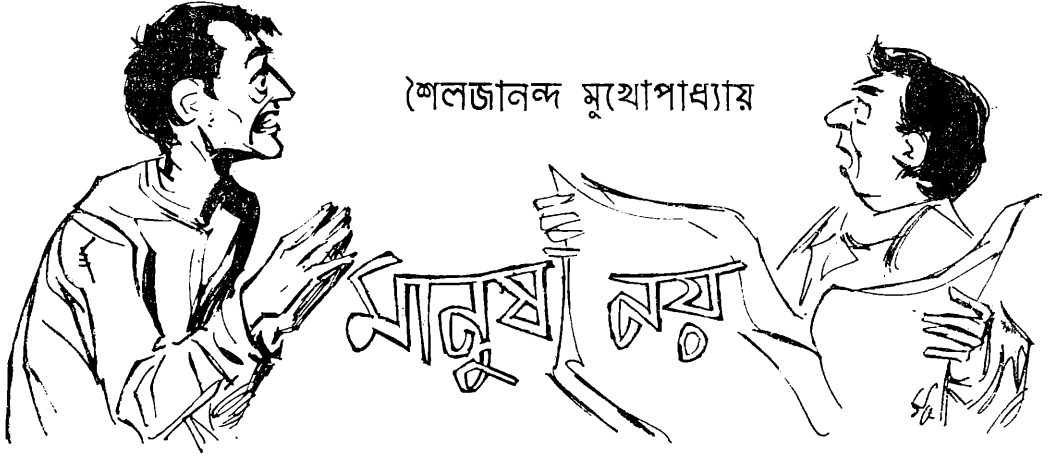
দূরে ঝুঁকোবাবুকে আসতে দেখেই বাচ্চু চেঁচিয়ে উঠলো, মা, এক পেয়ালা কফি।

মা বুঝতে পারলে ঝুঁকোবাবু আসছেন।

রবিবারের সকাল। এক্ষুণি ছেলেদের গল্পের আসর বসবে।

মা বললে, এরপর আবার চা করতে বলিসনে যেন। চিনি ফুরিয়ে গেছে।

কথাটার জবাব দেবার আগেই ঝুঁকোবাবু এসে পড়লেন।—কই রে, কোথায় সব! এই তো—সবাই এসে গেছিস।—ঝণ্টু, বাচ্চু, রঞ্জন, মুকুল।

বাচ্চু বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি আসছেন—আমরা দেখতে পেয়েছি।

ঝুঁকোবাবু তাদের বসতে বলে নিজেও বসলেন একটি চেয়ারে।

মুকুল বললে, কফির পেয়ালাটা আমি নিয়ে আসি মার কাছ থেকে। আমি না এলে গল্প আরম্ভ করবেন না কিন্তু।

না, তা করবো না। যা তুই কফি নিয়ে আয়।

মুকুল কফি আনবার জন্যে বাড়ীর ভেতরে গেল। ঝুঁকোবাবু বললেন, গল্প বলা এখন একটু মুস্কিল হলো দেখছি।

বাচ্চু বললে, কেন, মুস্কিল হলো কেন?

—তোরা সব দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠলি। এখন তোরা কিশোর। এখন আর আগেকার মত গল্প বললে চলবে না।

ঝণ্টু বললে, আগেকার মত গল্প কিরকম?

ঝুঁকোবাবু বললেন, যেমন ধর, আগে একদিন গল্প বলেছিলাম—হিমালয়ের এক গুহায় একজন সাধু আমাকে একটি ফল খেতে দিয়েছিলেন। সেই ফল খেয়ে আমি অমর হয়ে গেলাম। আমার বয়স বলেছিলাম—একশো কুড়ি বছর পেরিয়ে গেছে। তখন তোরা সেকথা বিশ্বাস করেছিলি।

বাচ্চু বললে, আজ্ঞে না, তখনও বিশ্বাস করিনি। এখনও করবো না।

তখনও বিশ্বাস করিস্‌নি।—ঝুঁকোবাবু বললেন, তখন তো প্রতিবাদ করিসনি!

বাচ্চু বললে, গল্পের মজাটাই মাটি হয়ে যাবে বলে কিছু বলিনি।

চোখ বুজে কি যেন ভাবছেন ঝুঁকোবাবু।

মুকুল এলো। গরম কফির পেয়ালাটি তাঁর হাতের কাছে বাড়িয়ে ধরে বললে, নিন, এবার খেতে খেতে গল্প বলুন।

কফির পেয়ালাটি হাতে নিয়ে ঝুঁকোবাবু বললেন, তাই ভাবছি। ভাবছি কী গল্প তোদের বলবো। তোরা—মানে এই যুগের ছেলেরা আমাদের যুগের ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান হয়ে জন্মেছিস। তাই আজ তোদের কাছে একটা অন্য ধরনের গল্প বলি শোন্।

সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলো, বলুন।

পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ঝুঁকোবাবু আরম্ভ করলেন।—

সেদিন আমার বাইরের ঘরে বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছি, এমন সময় ঝড়ো কাকের মত একটি মানুষ—তার কঙ্কালসার দেহ নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। এসেই বিনীতভাবে একটি নমস্কার করলে।

আমি বললাম, কে আপনি? কি চাই?

লোকটি বললে, কিছুই চাই না। আমি এই খবরের কাগজটি একবার দেখবো।

—দেখুন! বলে কাগজখানি তার হাতে তুলে দিলাম।

লোকটি তার পকেট থেকে ততক্ষণে একটি লটারির টিকিট বের করেছে।

সবই বুঝতে পারলাম। কাগজে লটারির 'রেজাল্ট্' বেরিয়েছে। তার টিকিটের নম্বরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবে—কোনও 'প্রাইজ্' সে পেয়েছে কিনা।

সেইখানেই বসে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে নম্বরগুলো।

কোনও নম্বরের সঙ্গেই তার টিকিটের নম্বর মেলেনি।

ভদ্রলোকের শুকনো মুখখানি আরও শুকিয়ে গেল। টিকিটখানি সেইখানে ফেলে দিয়ে কাগজখানা আমাকে ফিরিয়ে দিতে দিতে বললে, একটা টাকা আমার বৃথাই গেল। এগুলো কেনা উচিত নয়। কি বলেন?

বললাম, কিনেছিলেন কেন?

—ওই যে লিখেছিল—আয়বৃদ্ধির যোগ আছে!

জিজ্ঞাসা করলাম, কে লিখেছিল?

লোকটি বললে, আপনি তাও জানেন না? দেখুন, আপনার এই কাগজেই লেখা আছে—'এ সপ্তাহ কেমন যাবে' 'লগ্ন ফল, রাশি ফল'— আপনার কি লগ্ন বলুন —আমি বের করে দিচ্ছি।

কাগজটা আবার নেবার জন্যে সে হাত বাড়িয়েছিল, আমি দিলাম না। বললাম, আপনি এ-সব বিশ্বাস করেন?

লোকটি বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার বৃশ্চিক। গত সপ্তাহে লিখেছিল—আয়বৃদ্ধির যোগ আগে, আবার তার আগের সপ্তাহে লিখেছিল—প্রাপ্তিযোগ। সেইজন্যে লটারির টিকিট কিনেছিলাম। এটাও তো প্রাপ্তিযোগ, না কি বলেন আপনি? সবই ঠিক ঠিক মিলে যায়। কিন্তু এবারে আর মিললো না। আসি। প্রণাম।

হাত বাড়িয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। আমি জানি—আপনি ব্রাহ্মণ। ভট্‌চাজ। আমার নাম শ্রীনরহরি ভট্‌চাজ।

নরহরি ভট্‌চাজ চলে গেল।

তার লটারির টিকিটখানা সেইখানেই পড়ে ছিল। ফেলে দেবার জন্য কুড়িয়ে নিলাম। দেখলাম তার অষ্টেপৃষ্টে সিঁদুর মাখানো। সম্ভবত পুজো-টুজো করেছে।

ভেবেছিলাম নরহরির গল্প সেইখানেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু হলো না।

কয়েকদিন পরেই আমার প্রতিবেশী পরিমলের মেয়ের বিয়ে। পরিমলের অবস্থা ভাল। একটি মাত্র মেয়ে। খুব ঘটা করে বিয়ে দিচ্ছে। নিমন্ত্রণ করতে এলো আমাকে।

বললাম, নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে আমি কিছু খাই না—তুমি তো জানো পরিমল।

—খান না খান আপনাকে যেতেই হবে। আমার ওই একটা মাত্র মেয়ে। আপনি না গেলে চলবে না।

বাধ্য হয়ে যেতে হলো।

প্রকাণ্ড ছাতে ম্যারাপ্ বাঁধা হয়েছে। বরযাত্রীরা খেতে বসেছে।

তার একপাশে ফাঁকা একটা জায়গায় পরিপাটি করে আসন পেতে পরিমল নিজে একরকম জোর করে আমার হাতে ধরে সেইখানে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলে।

—কেন মিছেমিছি আমাকে এখানে নিয়ে এলে পরিমল। আমি দুটো মিষ্টিমুখ করেই চলে যাব।

এদিকে তখন দুতিনজন লোক মস্ত বড় একটা কাঠের 'ট্রে' ধরাধরি করে আবার সুমুখে এনে নামালে। সেই 'ট্রে'র ওপর থালায় বাটিতে মাছ মাংস লুচি পোলাও থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় যা কিছু আয়োজন করেছিল সবই থরে থরে সাজিয়ে এনেছে।

—কেন আনলে এ-সব? তুলে নিয়ে যাও।

পরিমল তাদের যেতে দিলে না। সবকিছু রেখে যেতে বললে।

বুঝলাম বরযাত্রীদের খাওয়াবার আয়োজনটা সে আমাকে দেখাতে চায়। বললে, যা ভাল লাগবে একটু চেখে দেখবেন। তারপর পড়ে থাকে থাকবে।

বলেই পরিমল চলে গেল।

হঠাৎ দেখি সুমুখে একটা গোলমাল উঠলো।

—কিসের গোলমাল?

দু'পা এগিয়ে যেতেই কে একজন আমাকে বললে, দেখুন না স্যার, কোথাকার কে তার ঠিক নেই—বরযাত্রী-দের পিছু পিছু চলে এসেছে খেতে!

লোকটিকে তারা তাড়িয়ে দিচ্ছেন।

হয়ত তাকে তারা তাড়িয়েই দিতো। ভাগ্যিস্ আমার নজর পড়লো লোকটির ওপর।

লোকটি আর কেউ নয়—সেই কঙ্কালসার নরহরি ভট্‌চাজ। ফর্সা কাপড়-জামা পরে বরযাত্রী সেজে খেতে এসেছে। সঙ্গে একটি বারো তেরো বছরের মেয়ে।

সেও আমাকে দেখে এগিয়ে এসে হেঁট হয়ে প্রণাম করলে।

বললাম, আপনাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল?

আমাকে দেখে নরহরির লজ্জা হয়েছে। মাথা হেঁট করে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

পরিমলের লোকজনকে বলে দিলাম, না না তাড়িয়ো না। এই যে আমার পাশে জায়গা রয়েছে, এইখানে বসিয়ে দাও। আমার খাবারগুলো ওদের দুজনকে আমি তুলে দিচ্ছি। ওদের দুটো পাতা এনে দাও শুধু।

—আপনার থালা থেকে কিচ্ছু তুলতে হবে না।

এই না বলে তাদের দুজনকে দুখানা পাতা দিয়ে শাকভাজা থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় যা কিছু সব একে একে তারা এনে দিতে লাগলো।

নরহরি তখন বলতে আরম্ভ করেছে—যার বিয়ে হচ্ছে সে আমার নিকট আত্মীয়। আমার দাদার বড় শালী—তারই দেওরের ছেলে। খোঁজ-খবর না নিয়েই কি আমি এসেছি?

আরও কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলবার অবসর পেলে না। তাদের পাতায় তখন খাবার দিচ্ছে।

মেয়েটিকে বললে, তাড়াতাড়ি করিসনে চিনু, ধীরে ধীরে খা। অনেক জিনিস আছে।

নরহরি নিজে একটুকরো খাবার মুখে দিচ্ছে আর বলছে, খা পেটভরে খা। জিনিসপত্র সব ফাষ্ট্ কেলাস্। খেলে অসুখ করবে না। খা।

এই বলে সে তার নিজের পাতা থেকে খাবারগুলো তুলে তুলে চিনুর পাতায় দিতে লাগলো।

বললাম, ও কি করছো? নিজে না খেয়ে ওকে দিচ্ছ কেন?

নরহরি বললে, আমি তো অনেক খাই বাবু, ওরা খেতে পায় না। তাই আজ বললাম, চল্ আমার সঙ্গে, বড় লোকের মেয়ের বিয়ে—অনেক কিছু খেতে পাবি। তা ভাগ্যিস্ আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তাই ভাল ভাল খাবার—

কথাটা তার শেষ হলো না। দুজন লোক এলো। একজনের হাতে কপির ডাল্‌লা, আর একজনের হাতে বড় বড় মাছের টুকরো।

নরহরি প্রথমে ভাল করে দেখতে পায়নি, তারপর কফি দেখে আনন্দে একেবারে যেন লাফিয়ে উঠলো।—ওরে বাবা, কফি রে!

মুখ দিয়ে বললে, অসময়ের কপি—অনেক দাম। নে খেয়ে নে ভাল করে। এ সময় কফি খাওয়া মানে টাকা খাওয়া। তা বড়লোকের মেয়ের বিয়ে—কফি খাওয়াবে বই-কি!

বলেই একটুখানি কপি চিনুর পাতায় তুলে দিলে।

বললাম, ওকে দিচ্ছ কেন? নিজে খাও।

আমার পাতার খাবারগুলো দেখিয়ে বললাম, এই সব আমি তোমার পাতায় তুলে দেবো।

নরহরি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, আর আপনি? আপনি তো সেই থেকে বসে আছেন হাত গুটিয়ে, কিছুই তো খাচ্ছেন না?

বললাম, এই তো আমার খাবার আমি তুলে রেখেছি।

বলে দুটি সন্দেশ দেখিয়ে দিয়ে বললাম, রাত্রে আমি কোথাও কিচ্ছু খাই না। পরিমল জোর করে এইখানে আমাকে বসিয়ে দিয়ে এই সব দিয়ে গেল।

নরহরি বললে, চিনু, তোর কাপড়ের আঁচলে বেঁধে নিবি সব। বাড়ী গিয়ে কাপড়টা কেচে নিলেই চলবে।

মাটির গ্লাসে জল ছিল। জলটা ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে নিলে নরহরি। তারপর ফাঁকা গ্লাসটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে, সন্দেশগুলো এতে তুলে দিন। নষ্ট হবে না।

তাই দিলাম।

তারপর খাওয়া শেষ হলে চিনুর আঁচলে বেশ পরিপাটি করে লুচি, পোলাও, চপ্, কাটলেট, মাছ মাংস কফির ডাল্‌লা—স কিছু বেঁধে দিয়ে, সন্দেশে ভর্তি মাটির গ্লাসদুটি হাতে ধরিয়ে চিনুকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো নরহরি। বললে, তা ভাগ্যিস্ আপনি ছিলেন স্যার, নইলে আজ আমার স্বজন-বিচ্ছেদ হয়ে যেতো।

দাদার বড় শালীরা দেওরের ছেলে। স্বজন নিশ্চয়ই। মনে মনে হাসলাম। বললাম, তা হতো।

নরহরি বললে, এই সপ্তাহের লগ্নফলটা ঠিকই লিখেছিল তাহলে। লিখেছিল—স্বজনবিচ্ছেদের সম্ভাবনা। কিরকম কাঁটায় কাঁটায় মিলে গেল দেখুন।

কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, কে লিখেছিল?

—রবিবার খবরের কাগজে লেখা থাকে—দেখেন না?

এতক্ষণে বুঝলাম কথাটা। বললাম, ও-সব আমি বিশ্বাস করি না।

বিশ্বাস করে না—এ আবার কেমন লোক! সে এমনভাবে তাকালো আমার দিকে, মনে হলো বুঝি-বা দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দেবে। কিন্তু তা আর দিলে না। অথচ আমার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে এলো আমার

বাড়ীর দরজা পর্যন্ত। জিজ্ঞাসা করলে, আপনি খবরের কাগজ কেনেন রোজ?

ভাবলাম বুঝি-বা লোকটা খবরের কাগজ বিক্রি করে।

—কেন? আপনি কি খবরের কাগজ বিক্রি করেন?

বললে, আজ্ঞে না। এমনি জিজ্ঞাসা করছি।

বলেই আমাকে একটি প্রণাম করে নরহরি বিদায় নিলে।

ভেবেছিলাম, এই বুঝি তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা।

কাগজখানা নিয়ে আয়। আর ওই সঙ্গে এক পেয়ালা চা আনবি।

নরহরি বললে, আবার চা কেন? আপনি ভাবছেন ব্যাটা বুঝি চা খেতে এসেছে। কাগজ পড়াটা একটা ছুতো।

বললাম, না, তা ভাবিনি। সকালে এসেছেন, এক পেয়ালা চা খাবেন না?

বাড়ীর ভেতর থেকে চা এলো, খবরের কাগজ-খানাও এলো।

নরহরি প্রথমেই কাগজখানা নিয়ে বসলো। রবি-বারের কাগজ। অনেকগুলো পাতা। নরহরি কিন্তু খুঁজে খুঁজে একটি পাতা বের করলে, তারপর মন দিয়ে সেই পাতাটা পড়তে লাগলো।

লোকটিকে তারা তাড়িয়ে...

কিন্তু না, রবিবার সকালে দেখি না নরহরি ভট্চাজ আবার আমার বাড়ীতে এসে হাজির!

বাড়ীতে এসেছে যখন, বললাম, বসুন।

বসলো নরহরি ভট্চাজ।

বসেই বললে, সকালের কাগজখানা কি আপনার পড়া শেষ হয়ে গেছে?

বললাম, আপনি পড়বেন?

বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, পেলে একটিবার চোখ বুলিয়ে নিতাম।

চাকরকে ডেকে বললাম, আজকের বাংলা খবরের

জানি কি পড়ছে, তবু জিজ্ঞাসা করলাম, কি পড়ছেন?

জবাব দিলে না নরহরির। একেবারে তন্ময় হয়ে গেছে।

বললাম, চা যে আপনার জুড়িয়ে গেল।

—ও হ্যাঁ। নরহরির যেন ঘুম ভাঙলো। হাত দিয়ে পেয়ালাটি তুলে নিলে। চা খাওয়া শেষ হয়ে গেল, কিন্তু কাগজ পড়া আর শেষ হয় না!

নরহরি কি যেন ভাবছে।

বললাম, কি ভাবছেন অমন করে?

নরহরি কাগজখানি রাখলে। বললে কিরকম কাঁটায় কাঁটায় মিলে যায় তাই ভাবছি। সেদিন স্বজন-বিচ্ছেদটা কিরকম মিলে গিয়েছিল নিজেই তো দেখলেন। লিখেছিল, স্বজনবিচ্ছেদের সম্ভাবনা। স্বজনবিচ্ছেদ হয়ে যাবে তা লেখেনি। তা আপনি না থাকলে সেদিন .....। আর আজ লিখেছে—ব্যয়বাহুল্য। ব্যয়বাহুল্য মানে কি স্যার? বেশী খরচ এই তো?

বললাম, হ্যাঁ।

—দেখুন, একেবারে ঠিক। সেদিন বিয়েবাড়ী থেকে কফির ডাল্‌লা নিয়ে এলো চিনু। তাই না খেয়ে ছ'ছটা মেয়ে ধরে বসলো—কফি খাবে। এ সময় কফির দাম কিরকম বুঝতেই তো পারছেন। কি আর করবো, এক টাকা দিয়ে একজোড়া কফি—তাও এই এতটুকু টুকু—তাই কিনে ফেললাম। নগদ একটি টাকা বেরিয়ে গেল। ব্যয়বাহুল্য নয় তো কী? আপনি কি বলেন? আপনি আবার এ-সব বিশ্বাস করেন না সেদিন বললেন।

বললাম, কি হবে বিশ্বাস করে? না মিললে মন খারাপ করে লাভ কি?

—তা যা বলেছেন! সেদিন দেখলেন তো—লিখেছিল প্রাপ্তিযোগ। তাই না দেখে একখানা লটারির টিকিট কিনে বসলাম। কালীবাড়ীতে পাঁচ আনা খরচ করে মায়ের চরণের সিঁদুর দিয়ে পুজো করলাম। কিন্তু কই, মিললো না তো!

বললাম, তাহলে ভাল করে বুঝে দেখুন। মন খারাপ করে লাভ নেই।

নরহরি বললে, ঠিক বলেছেন। মন খারাপ। তার ওপর সময় নষ্ট। এই দেখুন না—আজ আমার যাবার কথা ছিল বিশুবাবুর বাড়ী। এইখানেই দেরি হয়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করলাম, বিশুবাবু কে?

—সে আপনি চিনবেন না। এই বিশুবাবুর বাড়ীতে আর একখানা কাগজ আসে। সেখানেও একবার করে যাই। দুখানা কাগজ কি লিখেছে মিলিয়ে নিই। বিশুবাবুর ছেলেটা কিন্তু ভারি বজ্জাত। কাগজ কিছুতেই দিতে চায় না। আমাকে দেখলেই ক্ষ্যাপায়। সুর করে বলে—

'নরহরি ভট্‌চাজ—

কাগজ তো নেই আজ!

বললাম, তবু যান সেখানে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আসি, নমস্কার।

এই বলে নরহরি তাড়াতাড়ি ছুটলো।

ছুটলো বোধহয় বিশুবাবুর বাড়ী।

অজানাকে জানবার আগ্রহ লোকটাকে বোধহয় পেয়ে বসেছে।

এই নেশায় যে মাতে তার আর নিস্তার নেই।

ভেবেছিলাম নরহরি আর বোধহয় আসবে না।

কিন্তু বৃথা ভাবনা। এলো।

রবিবার সকালে খবরের কাগজ পড়ছি, তাকিয়ে দেখি নরহরি দাঁড়িয়ে। কাগজের দিকে চোখ ছিল, চুপিচুপি কখন এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারিনি।

একটুখানি তিরস্কারের ভঙ্গীতে বললাম, আবার সেই নেশা?

লোকটা একটু বোকা গোছের। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, আজ্ঞে না, এ কী বলছেন আপনি? কোনও নেশাই তো আমি করি না! না গাঁজা, না আফিং, না মদ,—এমনকি পানও খাই না, বিড়িসিগ্রেটও খাই না।

বললাম, না সে-সব নেশার কথা বলছি না। বলছি তোমার এই কাগজ পড়বার নেশা।

—ও হো, একে আপনি নেশা বলছেন?

হি হি করে হাসতে লাগলো সে।

হাসতে হাসতে কাগজখানা নেবার জন্যে হাত বাড়ালে।

বললাম, না। কাগজ আমি আপনাকে দেবো না।

কাগজখানা জোর করে চেপে রেখে বললাম, তার চেয়ে আপনি বরং বসে বসে এক পেয়ালা চা খান।

চাকর চা আনতে গেল।

নরহরির সে কি কাকুতি-মিনতি!

—দিন না একবারটি দাদা। একবার চোখ বুলিয়েই আমি চলে যাব। এক-একবার ভাবি কিনেই ফেলি একখানা কাগজ। কিন্তু আমার 'বিরৎ' সংসার। ছ'ছটা মেয়ে—আপনাকে তো বলেছি। পয়সা খরচ করতে গায়ে লাগে।

বলেই আবার হাত বাড়ালে কাগজের জন্যে।

কাগজখানা ভাল করে চেপে রেখে বললাম, না, কিছুতেই দেবো না।

হাত জোড় করতে লাগলো। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললে, এই শেষ। বুঝতেই তো পারছেন—ছটি মেয়ে আর আমি। সাত-সাতটি পেট। দু-বেলা চোদ্দটি পাতা পড়ে। সেই পেট ভরাবার জন্যে—নইলে একখানা কাগজের আর কতই বা দাম।

আমি বললাম, বুঝেছি।

নরহরি বললে, না বোঝেননি। চড় চড় করে জিনিস-পত্রের দাম বাড়ছে আর আমার জিব বেরিয়ে যাচ্ছে। বড় মেয়েটার বয়স হলো গিয়ে আঠারো-উনিশ বছর। শাড়ীটা তার এমন ছিঁড়েছে যে কারও সামনে বেরোবার জো নেই। একখানা যেমন-তেমন শাড়ীর দাম তো দশ-বারো টাকা। চোখে জল বেরিয়ে যাচ্ছে আমার, আর আপনি বলছেন বুঝেছি!

কথাগুলো বলেই দেখলাম নরহরি আর সামলাতে পারলে না। চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

লোকটার ওপর দয়াও হচ্ছে আবার রাগও হচ্ছে আমার।

আজকালকার এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিনে—ছ'ছটা মেয়ের বাপ্—ব্যাটা জানোয়ার—জানোয়ার। যাক্‌গে সেসব কথা তোদের আর শুনে কাজ নেই।

কাগজখানা দেবার আগে আবার বললাম—এই নেশাটা আপনি ছাড়ুন।

জামার হাতায় চোখের জল মুছে নরহরি বললে, কেন ছাড়তে পারি না তাহলে শুনুন বাবু। আমার দুঃখে আহা উহু বলবার কেউ নেই, শলা পরামর্শ করব যে তেমন বন্ধু নেই, তাই যদি রবিবার সকালে দেখি—কাগজে কোনও ভাল কথা লিখেছে,—সারা হপ্তাটা বেশ আনন্দে কেটে যায়—বুক ফুলিয়ে কাজ করতে পারি।

দিলাম কাগজখানা।

পড়ে তো পড়ুক্! পড়ে যদি সান্ত্বনা পায় তো পাক্!

খুব মন দিয়ে পড়েন নরহরি। সপ্তাহটা বেশ ভালই যাবে—এই ইঙ্গিত ছিল বোধহয়। খুব খুশী মনে চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে খেতে লাগলো।

খেতে খেতে বললে, আপনি আমাকে 'আপনি' 'আপনি' কেন বলেন বাবু? আমাকে 'আপনি' কেউ বলে না। সবাই বলে 'তুমি', আবার কেউ কেউ বলে 'তুই।' মানুষ বলে কেউ গ্রাহ্যই করে না।

বললাম, না, তুমি ভাল মানুষ।

খুশী হলো নরহরি। বললে, আপনি বলছেন বাবু? আমি ভাল মানুষ?

—হ্যাঁ, বলছি।

—কিন্তু আমি লেখাপড়া জানি না যে! তার ওপর খুব গরীব।

—তা হোক্, নাই-বা জানলে লেখাপড়া, হলেই-বা গরীব, ভাল মানুষ হতে দোষ কি?

—কিন্তু আমি যে কারও উপকার করতে পারি না বাবু। রাস্তার ধারে ভিখারীগুলো কাঁদে, পয়সা চায়, একটি পয়সাও দিতে পারি না। সেদিন বস্তিতে একটা লোক মারা গেল, আমাকে ডাকলে শ্মশানে যাবার জন্যে, আমি যেতে পারলাম না। পেটের ধান্দায় নিজের কাজে চলে গেলাম। সবাই বলতে লাগলো—ব্যাটা স্বার্থপর। আমি তাহলে ভাল মানুষ হলাম কেমন করে বাবু?

বললাম, তবু তুমি ভাল মানুষ।

খুব খুশী হলো নরহরি। মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম।

খুশী হয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল।

নরহরির গল্প কিন্তু এখানেও শেষ হলো না।

অনেকদিন আসেনি। দুটো রবিবার বোধহয় পেরিয়ে গেল। ভাবলাম আর আসবে না।

কিন্তু এলো।

সেদিন রবিবার ছিল না, তবু এলো।

পণ্ডিত নেহেরু মারা গেছেন। মস্ত বড় কাগজ বেরিয়েছে। অনেক ছবি, অনেক বিবরণ। বোধকরি-বা সেই সব দেখতে এসেছে। সেদিনের কাগজখানা আমার হাতেই ছিল।

আমার এক বন্ধু বসেছিল আমার কাছে। তার সঙ্গে পণ্ডিত নেহেরুর গল্প করছিলাম।

ভাবছিলাম, নরহরি এলো কেন? লগ্নফল জানবার জন্যে নয়। তাহলে হয়ত-বা এবার টাকা চাইবে। দুঃখের কথা অভাবের কথা জানিয়ে গেছে, এবার ধার দিন বলে কিছু টাকা নেবে, নিয়ে সেই যে চলে যাবে, তার পর আর এ রাস্তা মাড়াবে না। সেরকম দু-চারটা ঘটনা আমার জীবনে ঘটে গেছে।

কিন্তু আশ্চর্য, নরহরি চাইলো না কিছুই।

কাগজখানা দিতে গেলাম, তাও নিলে না। বললে, আজ তো রবিবার নয় বাবু, আজ তো লগ্নফল ছাপা হবে না!

তাহলে বোধহয় আমার বন্ধু একজন আমার কাছে বসে রয়েছে, সেই লজ্জায় টাকার কথাটা বলছে না।

কিংবা হয়ত ওকে সেদিন ভালমানুষ বলেছি, সেই কথাটা আর একবার শুনতে চায়। প্রশংসা বাক্যের মজাই এই। বারংবার শুনেও সাধ মেটে না। সব মানুষই দেখেছি ভাল মানুষ হতে চায়। হতে পারে না বলে একটা বেদনাবোধ থাকে মনে। তাই নিতান্ত পাষণ্ডকেও যদি ভুল করে ভাল মানুষ বলি তো সে খুশী হয়।

শুনেও তার তৃপ্তি। ভাল মানুষ হবার ক্ষুধা বোধহয় আত্মার ক্ষুধা।

চুপ করে বসে আছে লোকটা, আমাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেছে, ভাল লাগছিল না। তার মুখের পানে তাকিয়ে দেখলাম—মনে হলো কি যেন বলবার জন্যে নরহরি উস্‌খুস্‌ করছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু বলবে?

নরহরি বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। একটা কথা হঠাৎ মনের মধ্যে উদয় হলো। তাই ছুটে এলাম আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে।

—কি কথা বল।

নরহরি বললে, পণ্ডিত নেহেরু মারা গেলেন। ধরতে গেলে গোটা ভারতবর্ষটাই ছিল তাঁর হাতে। রাজা-বাদশাও যা, উনিও তাই। তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্যে অনেক টাকাকড়ি রেখে গেছেন নিশ্চয়ই। না কি বলেন?

বললাম, ওঁর ছেলে নেই। একটি মাত্র মেয়ে।

নরহরি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। বললে—ভাগ্যবান পুরুষ। লগ্নফল খুব ভাল। সংসারের খরচপত্র তাহলে একরকম ছিল না বললেই হয়। থাকতো আমার মতন 'বিরৎ' সংসার, তো বুঝতো মজা! কোনোদিকে নজর দেবার অবসরই পেতো না।

বললাম, এবার থেকে খবরের কাগজ খুলে শুধু লগ্নফলটুকুই পোড়ো না—অন্য খবরগুলো পোড়ো।

নরহরি বললে, পড়বার সময় কোথায় বলুন। এই যে আপনার সঙ্গে বসে বসে গপ্প করছি, কিন্তু তাই কি দুদণ্ড বসতে পারবো? এক্ষুণি ছুটতে হবে পয়সার ধান্দায়।

এই বলে সে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়লো। আপন-মনেই বললে, লিখেছিল তো সপ্তাহটা ভালই যাবে, দেখি কেমন যায়।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি কাজ কর তুমি?

নরহরি বলতে বোধহয় সঙ্কোচবোধ করছিল। আমার যে বন্ধুটি কাছে বসেছিল সে-ই বলে দিলে, ও তো রাস্তার ধারে একগাদা গামছা নিয়ে বিক্রি করে। দ্যাখোনি তুমি?

নরহরি আমার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললে, আপনি জানেন দেখছি।

বন্ধু বললে, জানি। আমি সব জানি। তোমাকে চিনি। তুমি তো ওই শীতলাতলার বস্তিতে থাকো!

নরহরি বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। পনেরো টাকা ভাড়া দিই। 'বিরৎ' সংসার—ভাল জায়গায় ভাল বাড়ীতে থাকতে হলে অনেক টাকা ভাড়া চায়। তাই সস্তা ভাড়ায় বস্তিতে দুখানা ঘর নিয়েছি। নমস্কার। আসি। কথায় কথায় দেরি হয়ে গেল।

বলেই সে আর দাঁড়ালো না—হনহন করে বেরিয়ে গেল।

...বলেই সে আর দাঁড়ালো না—

বাচ্চু উঠে দাঁড়ালো। বললে, বাস্, গল্প শেষ হয়ে গেল। হরিবোল! হরিবোল!

ঝুঁকোবাবু তাকে বসিয়ে দিলেন। বললেন, দূর বোকা! এইখানে গল্প শেষ হয় কখনও? ওরকম গল্প তো সবাই বলতে পারে। ঝুঁকোবাবুকে ডাকলি কি জন্যে?

ঝন্টু বললে, ঠিক বলেছেন। ওরকম গল্প আমিও বলতে পারি। খালি নরহরি আর নরহরি! একটা গরীব মানুষ, এই তো? না আর কিছু?

ঝুঁকোবাবু বললেন, হ্যাঁ, আমার যে-বন্ধু বসেছিল আমার কাছে, সেও ঠিক ওই কথা বললে। বললে,

[শেষাংশ ১২৮ পৃষ্ঠার নীচে দ্রষ্টব্য]

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

।। রহস্যোপন্যাস ।।

১.

ছোটয়-বড়য় মেশানো আটটা হীরাই প্রায় দু ঘণ্টা ধরে নাকের উপর বসানো পুরু লেন্সের চশমার সাহায্যে নিঃশব্দে পরীক্ষা করে, নীল কাগজের মোড়ক সমেত হীরাগুলো একপাশে ঠেলে দিয়ে বিখ্যাত জহুরী বৃদ্ধ রুস্তমজী সোজা হয়ে বসে ঘাড়টা নাড়লেন।

সামনের একটা চেয়ারে গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে ছিল দয়ারাম আগরওয়ালা। সে তার উৎকণ্ঠা আর বুঝি চেপে রাখতে পারে না। শুধায়, দেখলেন হীরাগুলো? সব ঠিক আছে ত?

নেহি!—রুস্তমজী মৃদুভাবে ঘাড় নাড়লেন।

রুস্তমজীর মুখোচ্চারিত শব্দটা যেন একটা বন্দুকের গুলির মতই দয়ারামের বুকে এসে লাগে। থতমত খেয়ে সে বলে, বলচেন কি রুস্তমজী! ওর মধ্যে কোন্‌টা কি—

দয়ারামের কথাটা শেষ হলো না। রুস্তমজী বলে ওঠেন, পাঁচটা হীরা ঠিকই আছে। বাকীগুলো হীরা নয়।

হীরা নয়?—কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে কথাকটি উচ্চারণ করে দয়ারাম।

না।—বিখ্যাত জহুরীর গলাটা একটু বুঝি নির্মম, ওর মধ্যে তিনটে ইমিটেশন হীরা।

সে কি! না, না—আপনি আবার ভাল করে দেখুন!

রুস্তমজী মৃদু হাসলেন। বললেন, আর আমার দেখার কোন প্রয়োজন নেই দয়ারামজী। হীরা চিনতে কখনো আমার ভুল হয় না, অন্তত আজ পর্যন্ত হয় নি। বিলকুল ঝুটা ওগুলো—কোন দামই নেই ওদের।

কিন্তু তা—তা কি করে সম্ভব?—অস্ফুট কণ্ঠে দয়ারাম বলে। তার সারাটা কপাল জুড়ে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। গলাটা শুকিয়ে উঠেছে।

তা জানি না। তবে ঐ তিনটে হীরা নয় এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আচ্ছা, তাহলে আমি উঠি। নমস্তে।—বলতে বলতে রুস্তমজী উঠে দাঁড়ালেন।

রুস্তমজী বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। রোগা লম্বা গড়ন, গাত্রবর্ণ স্বর্ণচাঁপার মত উজ্জ্বল, যদিও বয়সের জন্য গায়ের চামড়া এখন আর মসৃণ নয়। মুখেও তাঁর বয়সের বলিরেখা পড়েছে। পরনে প্যান্ট ও গলাবন্ধ কোট, মাথায় একটা কালো টুপি।

চলি দয়ারামজী।—বলে লম্বা লম্বা পা ফেলে রুস্তমজী ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। আর একতলায় শো রুমের পাশে তার ছোট স্ট্রং রুমটার মধ্যে বসে রইল দয়ারাম একটা পাথরের মূর্তির মত।

রবিবার। দয়ারামের জুয়েলারী শপ্ তাই বন্ধ। শো রুমের আয়রণ শাটারগুলো নামানো, দোকান বন্ধ বলে কোন কর্মচারীই আজ দোকানে আসে নি।

শহরের মধ্যে বিশেষ পরিচিত ও দীর্ঘদিনের রত্ন-ব্যবসায়ী 'দয়ারাম জুয়েলার্স এণ্ড সন্স্'। এক ডাকে চেনে সবাই।

দয়ারামের মাথাটা ঝিমঝিম করতে থাকে। ক্রমে ঝিমঝিম ভাবটা কেটে গিয়ে বিরাট এক শূন্যতা তার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে।

বয়স হয়েছে দয়ারামের। প্রায় ষাটের কাছাকাছি। তাহলেও তাকে দেখে কিন্তু সেটা বুঝবার উপায় নেই এমনি চমৎকার এখনও দেহের বাঁধুনি। লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ দেহ। তীক্ষ্ম দুটি বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু। খাড়া নাক। চোখে চশমা। দুই পুরুষের জুয়েলার্সের ব্যবসা। ঝানু ব্যবসাদার দয়ারামের জীবনে এ এক অকল্পনীয় অভিজ্ঞতা। আটটা হীরের ভেতর তিন-তিনটে ভুয়ো—বেমালুম কাঁচ! তার নিজেরও একটু যেন সন্দেহ হয়েছিল গতকাল। আর সেজন্যেই হীরা-গুলো পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে প্রখ্যাত জুয়েলার রুস্তমজীকে সে আজ সকালে ডেকে পাঠিয়েছিল।

হীরাগুলো স্ট্রং রুমের আয়রন সেফে একটা কৌটোর মধ্যে ছিল। এক-আধটা নয়, ছোট-বড় সাইজের আটটা হীরা—যার দাম প্রায় লাখ টাকার কাছাকাছি হবে। রেয়ার সব হীরা।

দিন সাতেক আগে সন্ধ্যার ঠিক পরেই শো রুম বন্ধ হবার ঘন্টা দুয়েক আগে একজন খরিদ্দার এসেছিল ঝকঝকে একটা মোটরে করে। লম্বা চওড়া মানুষটি। পরনে দামী সুট। ম্যানেজার শিবদাস ভাটিয়া দয়া-রামকে এসে জানাল, একজন খরিদ্দার এসেছে। গোটা দুই দামী হীরা তার প্রয়োজন। দোকানের মালিক খোদ দয়ারামজীর সঙ্গে দেখা করতে চায় সে। দয়ারাম তখন দোকানের মধ্যে তার নিজস্ব ছোট ঘরটিতে বসে ছিল, তার নির্দেশমত ম্যানেজার লোকটিকে তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে যায়।

লোকটি একা নয়, তার সঙ্গে বছর কুড়ি-বাইশের সুশ্রী একটি মেয়েও ঘরে এসে প্রবেশ করে। লোকটির কথায় জানা যায় যে, মেয়েটি তারই মেয়ে আর দুটি হীরার দরকার ঐ মেয়েটির জন্যেই।

বসুন! বসুন!—খরিদ্দারকে দয়ারাম সমাদর করে বসায়। শুধায়, কত দামের মধ্যে কি রকম হীরা চান?

দামের জন্যে ভাববেন না।—লোকটি আশ্বাস দিয়ে বলে, ভাল উমদা চীজ দেখান, আমার এই বেটির পছন্দ হলেই হলো।

একে একে অনেক হীরাই দেখায় দয়ারাম, কিন্তু খরিদ্দার বা তার 'বেটি'র কিছুতেই আর পছন্দ হয় না। অবশেষে দয়ারাম স্ট্রং রুমের আয়রন সেফ থেকে সেই রেয়ার হীরাগুলো বের করে এনে দেখায়। অনেকক্ষণ ধরে সেগুলি নাড়াচাড়া করবার পর দুটো হীরা মেয়েটি বেছে নেয়। জানতে চায়, কত দাম হবে এ দুটোর?

দয়ারাম হীরা দুটি হাতে নিয়ে দেখে বলে, চল্লিশ হাজার টাকা।

লোকটি বলে, কোই বাত নেহি। আজ কিছু advance করে যাচ্ছি—ধরুন হাজার পাঁচেক—পরশু এসে বাকী টাকা দিয়ে হীরা দুটো নিয়ে যাব। অবিশ্যি আপনি যদি চেক নেন ত—

না। নগদই দেবেন।

কোই বাত নেহি। পরশু বেলা বারটা থেকে সাড়ে বারটার মধ্যে টাকা নিয়ে আসব।

তাই আসবেন।

হীরা দুটো কিন্তু বিক্রি করবেন না।

না, না—সে কি—আপনারা পছন্দ করে advance করে যাচ্ছেন! ও হীরা দুটো আপনাদের জন্যই থাকবে।

আলাদা করে রেখে দিন তাহলে হীরা দুটো।

ঠিক আছে। তাই রাখব।

আগন্তুক অতঃপর তার ফোলিও ব্যাগ খুলে একশ

টাকার পঞ্চাশখানা নোট বার করে দেয় গুনে গুনে। বলে, টাকাটা রেখে আমাকে একটা advance রসিদ দিন।

ঝানু ব্যবসায়ী দয়ারাম, নোটগুলো হাতে নিয়ে দু' বার করে গুনতে থাকে সে। যখন সে নোট গুনছে, মেয়েটি বলে ওঠে, Could I have a glass of water?

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই!—দয়ারাম কলিং বেল টেপে। একজন কর্মচারী ঘরে এসে ঢোকে।

ডাকছেন?

এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানী লাও।

কর্মচারীটি চলে যাচ্ছিল, দয়ারাম খদ্দেরকে আপ্যায়িত করবার উদ্দেশ্যে মেয়েটির দিকে চেয়ে বলে, পানী কেন—কোল্ড ড্রিংক দিক না?

মেয়েটি বলে, না, জরুরৎ নেই। ঠাণ্ঠা এক গ্লাস জল হলেই হবে।

ঠিক আছে, তবে ঠাণ্ডা জলই নিয়ে এস।

কর্মচারীটি চলে যায়। দয়ারাম পুনরায় নোট গোনায় মন দেয়। গোনা হয়ে গেলে বলে, তাহলে একটা পাকা রসিদ করে দিতে বলি এ্যাকাউন্টেন্টকে?

লোকটি বলে, কুছ জরুরৎ নেহি। একটা কাগজে আপনি লিখে দিন দু লাইন।

দয়ারাম একটা প্যাডের কাগজ টেনে নেয় লিখবার জন্য, শুধায়, কি নামে রসিদ দেব?

লোকটি বলে, মনিকা দেশাই। ২০/১ কুইন্স পার্ক। আমার বেটির নামেই রসিদ করে দিন।

কর্মচারীটি ঐ সময় জল নিয়ে এল। দয়ারাম একটা কাচা রসিদ করে দেয়, লিজিয়ে।

মেয়েটি জল খেয়ে নিয়ে বলে, আমরা তাহলে কিন্তু পরশুই আসছি টাকা নিয়ে।

আসবেন, আসবেন। ও হীরা আপনার জন্যই রইলো।

অতঃপর খরিদ্দার ও মেয়েটি বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। ঘন্টাখানেক পরে দয়ারামও ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা দেবার জন্য ক্যাশিয়ারের কাছে পাঠিয়ে দেয় দয়ারাম। আর তার মিনিট পনের বাদেই বৃদ্ধ ক্যাশিয়ার নোটের তাড়া হাতে হন্তদন্ত হয়ে দয়ারামের ঘরে এসে ঢোকে।

শেঠজী, এ টাকা কোত্থেকে পেলেন?

কেন, সকালে তোমায় বলছিলাম না—দুটো হীরার জন্য পাঁচ হাজার টাকা advance দিয়ে গিয়েছে, কাল এসে বাকী টাকা দিয়ে হীরা দুটো ডেলিভারী নেবে—

কিন্তু শেঠজী, এর মধ্যে পাঁচটা নোট ছাড়া বাকী পঁয়তাল্লিশটাই জাল নোট!

জাল নোট! কি বলছ ঘনশ্যাম!

দেখুন না।—বলে ঘনশ্যাম নোটের তাড়াটা দয়ারামের দিকে এগিয়ে দেয়।

নোটগুলো হাতে নিয়ে পাশেই রাখা চশমাটা চোখে পরে নিল দয়ারাম। ভাল করে পরীক্ষা করতেই সে বুঝতে পারে যে, ঘনশ্যামের কথা মিথ্যা নয়—সত্যিই একশ টাকার পঁয়তাল্লিশখানা নোটই জাল।

তাই ত—দয়ারামের গলা দিয়ে যেন আর স্বর বের হয় না। গলাটা কেমন যেন শুকিয়ে ওঠে তার। শুকনো গলায় সে কোন রকমে বলে, কিন্তু পাঁচটা ঠিক নোট দিয়ে বাকীগুলো জাল নোট দিলই বা কেন? মালও ত এখনও ডেলিভারী নেয় নি।

ঘনশ্যামও কি বলবে বুঝতে পারে না, সেও ব্যাপারটার কোন খেই খুঁজে পাচ্ছে না। দয়ারাম আবার বলে, হীরা এখনও নেয় নি। পাঁচটা আসল নোট আর বাকীগুলো সব জাল নোট দিয়ে গেল—আমি যে এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না ঘনশ্যাম—

শেঠজী!

বল।

আপনি কি কাল নোটগুলো ভাল করে দেখে নেন নি?

মনে পড়ছে না ঠিক। তবে উপরের চার-পাঁচটা নোটের বাণ্ডিল ঠিকই মনে হয়েছিল।

আপনি ত অনেক সময় ভুল করে চশমা পরেন না, কাল চশমা চোখে ছিল ত?

ঠিক মনে নেই ঘনশ্যাম। কিন্তু এরকমটা করার মানে কি হতে পারে—পরশু এলে যে ধরা পড়বে তা ত সে জানত।

কিন্তু আপনি কি করে প্রমাণ করবেন যে, সে-ই জাল নোটগুলো দিয়ে গিয়েছে? বরং সে হয়ত উলটে আপনাকেই চেপে ধরবে—আপনি যখন রসিদ দিয়ে দিয়েছেন।

রসিদ! হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো।

কত দাম চেয়েছিলেন হীরা দুটোর?

চল্লিশ হাজার টাকা।

যাক তবু রক্ষে এই যে, সাড়ে চার হাজারের উপর দিয়ে ব্যাপারটা যাবে, যদি সে টাকাটা ফেরত চাইতেও—

ঘনশ্যামের কথা শেষ হলো না, একজন কর্মচারী এসে জানাল, মিঃ দেশাই ও তাঁর মেয়ে এসেছেন!

২.

এখন কি করি বল ত ঘনশ্যাম?—দয়ারাম প্রশ্ন করে।

ডেকে পাঠান। দেখাই যাক না কি বলে।

কিন্তু জাল নোট—

আপনি নিজে থেকে কিছু বলবেন না। ওরা কি বলে আগে সেটা শুনুন।

ঘনশ্যামের যুক্তি মেনে নিয়ে দয়ারাম কর্মচারীটিকে বললে তাদের পাঠিয়ে দিতে।

একটু পরেই গতকালের সেই লোকটি ও তরুণীটি দয়ারামের ঘরে এসে ঢুকল। লোকটি বললে, নমস্তে শেঠজী! আমরা কালই ভোরের প্লেনে আমেদাবাদ চলে যাচ্ছি। তাই আজই এলাম হীরা দুটো নিয়ে যাব বলে। বের করুন হীরা দুটো।

দয়ারাম ঘনশ্যামের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকায়। ঘনশ্যাম চোখের ইঙ্গিতে তাকে হীরা দুটো বের করতে বলে। দয়ারাম শ্লথ পায়ে উঠে গিয়ে স্ট্রং রুমের সেফ থেকে হীরার প্যাকেটটা বের করে নিয়ে আসে।

দেখি! এনেছেন হীরা!—আগন্তুক উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। দয়ারাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্যাকেটটা খোলে। জ্বলজ্বল করে ওঠে বহুমূল্য হীরাগুলো।

দেখি।—প্যাকেটটা কাছে টেনে নেয় আগন্তুক, কিন্তু পরক্ষণেই বলে ওঠে, সেই হীরা দুটো কোথায়?

কেন, ওর মধ্যেই ত আছে।

কি বলছেন আপনি! এটা নিশ্চয়ই অন্য প্যাকেট।—আগন্তুক বলে।

না, না, অন্য প্যাকেট হবে কেন—

বেশখ!—টেবিল চাপড়ে বলে ওঠে আগন্তুক, তাছাড়া এর মধ্যে সবগুলো ত হীরাই নয়!

হীরা নয়? কি যা তা বলছেন!

ঠিকই বলছি। এর মধ্যে তিনটে আদৌ হীরা নয়—তাছাড়া কাল যে দুটো হীরা দেখিয়েছিলেন সে দুটোও এর মধ্যে নেই।

মাথাটা বোঁ করে ঘুরে ওঠে দয়ারামের। এ কি সর্বনাশের কথা!

শেষ পর্যন্ত হীরাগুলো পরীক্ষা করে তার নিজেরও

শেঠজী, এ টাকা কোত্থেকে......

সন্দেহ হয়। ততক্ষণে আগন্তুক আর তার মেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ধিক্কারের সুরে আগন্তুক বললে, আপনারা খদ্দেরের সঙ্গে এভাবে কথার খেলাপ করেন জানতাম না। তাছাড়া কাঁচকে হীরা বলে চালাবার চেষ্টা—ছিঃ ছিঃ!

দয়ারাম বোবা—পাথর!

আপনার দোকানের নাম শুনে এসেছিলাম—খুব শিক্ষা হলো! যাক দিন আমার advance ফিরিয়ে। আমি খবরের কাগজে লিখব আপনাদের এই কীর্তির কথা—দয়ারাম জুয়েলার্স এণ্ড সন্স্-এর এই ব্যবসা—

দয়ারামের সারা কপাল জুড়ে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে প্রচণ্ড শীতেও। সে প্রতিবাদ জানায়, কি বলছেন যা তা—টাকা ফেরত চান নিয়ে যান—ওসব কি যা তা—

দয়ারামের কথা শেষ হবার আগেই আগন্তুক গর্জন করে ওঠে, ছোট লোক! আবার গলা চড়িয়ে কথা বলছ!

বচসা শুরু হয়ে যায় দুই পক্ষে। অবশেষে দোকানের সুনাম বাঁচাবার জন্যে দয়ারামই আরো পাঁচ অর্থাৎ সবমিলিয়ে সাড়ে নয় হাজার টাকা খেসারত দিয়ে তবে নিষ্কৃতি পায়। লোকটা টাকাগুলো গুনে নিয়ে মেয়েটিকে সঙ্গে করে বের হয়ে গেল।

দয়ারাম তখনো ঝিম মেরে বসে। ব্যাপারটা কি যে ঘটলো তার বুদ্ধিতে থই পায় না। সব ধোঁয়াটে, এলোমেলো। দুপুর গড়িয়ে গেল, দয়ারাম তখনো তার দোকানের ছোট ঘরটিতে বসে।

হঠাৎ তার মনে বাকী হীরাগুলো সম্পর্কেও সন্দেহ জাগে। তখুনি সে রুস্তমজীকে টেলিফোন করে আগামীকাল একটিবার আসতে অনুরোধ জানায়।

পরদিন রুস্তমজী এসে যা বলে গেলেন তাতে আরো যেন সব তালগোল পাকিয়ে যায়। তিন-তিনটে হীরা—যাদের দাম কমসে কম প্রায় সত্তর হাজার টাকা—আর সেইসঙ্গে নগদ সাড়ে ন হাজার টাকা!

সবকিছু মিলিয়ে ব্যাপারটা যেন স্রেফ একটা ভোজ-বাজি।

দয়ারামের বড় ছেলে কলকাতায় ছিল না, বোম্বাই গিয়েছিল। ঐ দিন সন্ধ্যার প্লেনে কলকাতায় ফিরল সে। বাড়ীতে পৌঁছে বাপকে শয্যায় শুয়ে থাকতে দেখে সে প্রশ্ন করে, কি হয়েছে পিতাজী? শুয়ে যে!

সব কথা ছেলেকে বলে দয়ারাম। জনক বলে, পুলিসে খবর দিয়েছ?

কি খবর দেব—কি বলব তাদের?

তাহলেও ব্যাপারটা এতক্ষণে পুলিসকে জানানো উচিত ছিল।

তারা বিশ্বাস করবে কেন?

বিশ্বাস-অবিশ্বাস পরের কথা। জানানো কর্তব্য ছিল।

মিথ্যেই পণ্ডশ্রম হত!

হঠাৎ ঐ সময় জনক বলে ওঠে, এক কাজ করলে হয় না পিতাজী?

কি?

রায়সাহেবকে ডেকে তার পরামর্শ নিলে ভাল হতো না?

সেই কিরীটী রায়?—দয়ারাম এতক্ষণে শয্যায় উপর উঠে বসে।

হ্যাঁ! রহস্যভেদী কিরীটী রায়!

৩.

দয়ারাম উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, ঠিক বলেছো বেটা! সেবারের সেই জালিয়াতির কেসটা রায়সাহেব আশ্চর্য-ভাবে মীমাংসা করে দিয়েছিলেন। চল, তাঁর কাছেই আমরা—

তাঁকে তাহলে একটা ফোন করে দেখি আছেন কিনা বাড়ীতে।

ফোন করে এসে জনকলাল দয়ারামকে বললে, পিতাজী, রায়সাহেব আছেন—যেতে বললেন।

তাঁর সেই টালিগঞ্জের বাড়ীতেই ত?

না। তিনি ত বেশ কিছু দিন হলো তাঁর গড়িয়া-হাটার নতুন বাড়ীতে উঠে এসেছেন।

ঘন্টাখানেক বাদে।

গড়িয়াহাটার বাড়ীতে তার বসবার ঘরে বসে কিরীটী দয়ারামের মুখে আনুপূর্বিক সব ঘটনাটা শুনল। শুনে বললে, লোকটা দেখছি অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে দুঃসাহসিক হাত-সাফাই করেছে। রীতিমত শয়তানী বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে সে।

ঠিক বলেছেন রায়সাহেব।—দয়ারাম বলে।

রীতিমত risk-ও নিয়েছিল।—কিরীটী আবার বললে, একে তখন সন্ধ্যা—আপনাদের দোকান বন্ধ করবার সময়, ঐ পাঁচ হাজার টাকার টোপটাও চমৎকার-ভাবে ফেলেছিল—একজন মানুষের সহজ বিশ্বাসের দুর্বলতার সুযোগ পুরোপুরিই নিয়েছে। তবে আমার মনে হয়—

কি মনে হয় রায়সাহেব?

হীরা সাফাইয়ের ব্যাপারে সেদিন সন্ধ্যায় তাকে এমন কেউ সাহায্য করেছিল যে আপনার বিশেষ পরিচিত।

আমার বিশেষ পরিচিত? কি বলছেন আপনি রায়সাহেব?—দয়ারাম সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, ঠিক তাই দয়ারামজী। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে—

প্রবাদ?

হ্যাঁ। প্রদীপের নীচেই বেশী অন্ধকার। আচ্ছা একটা কথা—

বলুন।

ঐ হীরা তিনটি কত দিন আপনার কাছে ছিল?

বেশী দিন নয়। ঐ একই সাইজের পাঁচটা হীরা

বছর খানেক আগে রায়পুর স্টেটের মহারানী বিক্রি করে দেন এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকায়। তিনটে হীরা আমি কিনি আর দুটো কিনেছিল সুখলালজী।

মানে সুখলাল এণ্ড ব্রাদার্সের প্রোপ্রাইটার?

জী।

তিনটে আপনি আর দুটো সুখলালজী?

জী।

কিরীটী ক্ষণকাল নিঃশব্দে কি যেন ভাবে। তারপর বললে, একটা কাজ করতে পারেন দয়ারামজী?

কি?

সুখলালজীর সঙ্গে আপনার নিশ্চয়ই পরিচয় আছে?

নিশ্চয়ই।

একটা ফোন করুন ত তাঁকে।

ফোন করব?—দয়ারাম বিমূঢ়ভাবে বললে।

হ্যাঁ ফোন করে জানুন সেই হীরা দুটো এখনো তাঁর কাছে আছে, না তিনি সেগুলো বিক্রি করে দিয়েছেন।

এখুনি করছি।

পাশেই স্ট্যাণ্ডে ফোন ছিল, কিরীটীর নির্দেশে দয়ারাম উঠে গিয়ে ডায়াল করতে থাকে। ঐ সময় সুব্রত এসে ঘরে প্রবেশ করে।

এদিকে ফোনে সুখলালজীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে দয়ারাম বেশ যেন উত্তেজিত হয়ে ওঠে, বলে, সত্যি বলছ সুখলালজী? কবে ঘটল ব্যাপারটা? দিন সাতেক আগে? আর বলো কেন ভাই, আমারও ঐ একই অবস্থা। আমারও হীরা তিনটে গিয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যাব তোমার ওখানে। হ্যাঁ—হ্যাঁ।

বেশ উত্তেজিতভাবেই ফোনটা রেখে দিয়ে দয়ারাম এসে ধপ্ করে সোফার উপর বসে পড়ল। বিস্ময়-ঝরা কণ্ঠে সে উচ্চারণ করে, তাজ্জব কি বাত!

কি হলো?—কিরীটী প্রশ্ন করে।

সুখলালজীরও হীরা দুটো গিয়েছে আর দশ হাজার টাকা!

কেমন করে গেল? কবে?

দিন সাতেক আগে। আমার বেলা যেমনটি ঘটেছে, তারও সেই একই ব্যাপার। এক ভদ্রলোক আর এক খুপসুরৎ লেড়কী—দয়ারাম বলে গেল ঘটনাটা। ঠিক পূর্বানুরূপ ঘটনা।

সুখলালজীও চোরা কিল খেয়ে হজম করেছে, কাউকে জানায় নি তার নির্বুদ্ধিতার কথা। ব্যাপারটা কি বলুন ত রায়সাহেব।

কিরীটী পাইপটা দাঁতে চেপে দয়ারামের কথা শুনছিল নিঃশব্দে, পাইপটা মুখ থেকে হাতে নিয়ে বললে, আচ্ছা দয়ারামজী, ঐ হীরা কিনতে আপনার কাছে আর কেউ কি এসেছিল?

হ্যাঁ—এখন মনে পড়েছে—এসেছিল।

কবে?

ঐ ঘটনার ঠিক দিন সাতেক আগে।

কেনে নি বোধ হয় শেষ পর্যন্ত লোকটা?

না—দাম শুনে চলে যায়। আপনার কি মনে হয় রায়সাহেব?

কিসের কি মনে হয়?—কিরীটী শুধায়।

ঐ হীরাগুলোর আর কোন হদিস পাওয়া যাবে মনে করেন?

ঠিক বলতে পারছি না—কটা দিন আমাকে একটু ভাবতে দিন।

কিন্তু—

বুঝতে পারছি আপনার মনের অবস্থা দয়ারামজী, কিন্তু আমি এখনো কোন পথ খুঁজে পাচ্ছি না। আচ্ছা একটা কথা—

বলুন।

রায়পুরের মহারানীর কাছ থেকে কি আপনারা একই সময় হীরাগুলো কিনে আনেন?

হ্যাঁ। সংবাদ পেয়ে আমরা বলতে গেলে দুজনাই একসঙ্গে যাই—অর্থাৎ একই দিনে একই সময়ে গিয়ে হোটেলে উপস্থিত হয়েছিলাম—বিশ-পঁচিশ মিনিট আগে পরে।

হোটেলে?—কিরীটী প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, গ্র্যাণ্ড হোটেলে। রানীসাহেবা হীরা বিক্রি করার জন্যে কলকাতায় এসেছিলেন—এসে হোটেলে উঠেছিলেন।

৪.

যখন হীরা সম্পর্কে রানীসাহেবার সঙ্গে আপনাদের কথাবার্তা হয় বা বেচাকেনা হয়, সে সময় সেখানে আর কেউ ছিল?—কিরীটী প্রশ্ন করল।

ছিলেন।

কে?

রানীসাহেবার স্টেটের দেওয়ানজী—সম্পৎলালজী।

তাঁর বয়স কত হবে?

তা বয়স হয়েছে—আমারই মত হবে মনে হয়।

রানীসাহেবার স্বামী কি বেঁচে আছেন—রাজাসাহেব?

না—তিনি বিধবা। বছর দশেক আগে রাজাসাহেবের মৃত্যু হয়। পোলো খেলতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় রক্তক্ষরণ হয়ে অজ্ঞান হয়ে যান তিনি, সে জ্ঞান আর ফিরে আসে নি।

তাঁর ছেলেপুলে?

নিঃসন্তান রানীসাহেবা—তবে শুনেছিলাম রাজাসাহেবের এক জ্ঞাতির ছেলেকে তাঁরা নাকি দত্তক নেন।

তাকে দেখেছিলেন হোটেলে?

না।

সংবাদটা কার কাছে পান?—কিরীটীর প্রশ্ন।

সম্পৎলালজীই একদিন বলেছিলেন হীরা কিনতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ—পরে আরো দু-চারবার দেখা হয়েছে। চমৎকার লোক।

তা রানীসাহেবা হীরাগুলো বিক্রি করলেন কেন?

তা ঠিক বলতে পারব না। তবে টাকার জন্যেই হয়ত, নইলে জুয়েল্স্ কে বিক্রী করে বলুন।

তা ঠিক। একটা কাজ করতে পারেন দয়ারামজী?

কি বলুন।

রায়পুরে রানীসাহেবাকে একটা চিঠি দিন।

চিঠি! তিনি কি করবেন এ ব্যাপারে?

না, না, সেসব কিছু নয়—

তবে?

রানীসাহেবাকে এই মর্মে একটা চিঠি দিন যে, তাঁর কাছে যদি আরো কিছু রেয়ার জুয়েল্স্ থাকে ত আপনি কিনতে রাজী আছেন।

সে জন্য চিঠি লেখার বোধ হয় প্রয়োজন হবে না কিরীটী!—কথাটা বললে সুব্রত। এতক্ষণ সে এক-পাশে নিঃশব্দে ওদের কথাবার্তা শুনছিল।

সুব্রতর কথায় কিরীটী ওর মুখের দিকে তাকাল, ও কথা বলছিস কেন সুব্রত? রানীসাহেবাকে তুই জানিস নাকি?

সামান্য পরিচয় হয়েছে গত রাত্রে।

কোথায় হলো?—কিরীটী উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে, কেমন করে?

শুধু রানীসাহেবার সঙ্গেই নয়,—স্মিত মুখে সুব্রত বলে, তাঁর দত্তকপুত্র সঞ্জয়কুমারের সঙ্গেও আলাপ হয়েছে ব্রিজলাল সেটিয়ার মেয়ের বিয়ের পার্টিতে তার বালিগঞ্জ গার্ডেনস্-এর বাড়ীতে।

ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, কাল সেটিয়ার মেয়ের বিয়ে ছিল বটে,—কিরীটী সোৎসাহে বলে, আমারও নিমন্ত্রণ ছিল—আমি যেতে পারি নি।

সুব্রত বললে, রানীসাহেবা মাসখানেক হলো লোয়ার রডন স্ট্রীটে তাঁর ভাইয়ের বাড়ীতে আছেন।

আর তাঁর দত্তক ছেলে?

সঞ্জয়কুমার? সে যথারীতি তাদের নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাট বাড়ীর দুটো ফ্ল্যাট নিয়ে এখনো আছে।

কেন?—কিরীটী জিজ্ঞাসা করে।

আমার মনে হলো, মা ও ছেলের সঙ্গে বনিবনা নেই বড় একটা।

কেমন করে বুঝলি?

আমার তো সেই রকমই মনে হলো। তুই ব্রিজলাল সেটিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেই হয়ত জানতে পারবি, কারণ রানীসাহেবা রঞ্জাবতী ও ব্রিজলাল সেটিয়া—দুজনাই যোধপুরের লোক। ওদের দীর্ঘদিনের পরিচয়।

কিরীটী বলে, তাই নাকি? তুই এখুনি একবার ব্রিজলালকে ফোন কর্।

সুব্রত উঠে গিয়ে ব্রিজলালকে ফোন করতেই তার সাড়া পাওয়া গেল ফোনের অপর প্রান্ত থেকে ঃ কে?

সুব্রত বললে, হ্যালো ব্রিজলালজী! আমি সুব্রত কথা বলছি। কিরীটী আপনার সঙ্গে কথা বলবে।

কিরীটীর হাতে রিসিভারটা তুলে দিল সুব্রত।

কি ব্যাপার রায়সাহেব! কাল আমার বেটির শাদিতে এলেন না।

বোঝেনই ত এ বয়সে বাতের আক্রমণ কি? যাবো একদিন—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, জরুর আসবেন।

একটা কথা জানবার ছিল যে।—কিরীটী বলে।

বোলেন।

রায়পুর স্টেটের রানীসাহেবার সঙ্গে আপনার ত বিশেষ পরিচয় আছে, তাই না?

হ্যাঁ, কেন বোলেন ত?

তাঁর একটি ছেলে আছে না?

কে—সঞ্জয়? সে ত দত্তক নেওয়া ছেলে। অত্যন্ত হারামজাদা! বেচারীর জীবন একেবারে বরবাদ করে দিল!

কেন, কেন?

সেটিয়া তার উত্তরে যা বললে সংক্ষেপে তা হলঃ রায়পুর স্টেটের আর্থিক অবস্থা এখন পড়তির মুখে। কিছু কলিয়ারী ছিল, সব গিয়েছে। অনেক রেয়ার জুয়েল্স্ ছিল, গত তিন-চার বছরে তাও সবই প্রায়

গিয়েছে। গোটা তিনেক ভাল রেসের ঘোড়া ছিল, তাও আর নেই। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে রাজাসাহেব নিউ আলিপুরে একটা প্রাসাদোপম ফ্ল্যাট-বাড়ী করেছিলেন, বর্তমানে ইনকাম বলতে যা কিছু তা ঐ ফ্ল্যাট-গুলোর ভাড়া থেকেই। কিন্তু ভাড়ার টাকার সবটাই সঞ্জয় নিয়ে নেয়—মাকে কিছুই দেয় না। ছেলে ও মার সংগে আদপেই বনিবনা নেই। নিত্য খিটিমিটি ঝগড়া লেগেই ছিল বলেই মাসখানেক হলো রানীসাহেবা নিউ আলিপুরের বাড়ী থেকে চলে এসে লোয়ার রডন স্ট্রীটে তাঁর ভাইয়ের বাড়ীতে আছেন।

কিরীটী অতঃপর জিজ্ঞাসা করে, সঞ্জয় ছেলেটা কেমন?

বদমাস। একটা পাকা শয়তান। রানীসাহেবার ভাই রণধীর সিং বলে, সে নাকি আজকাল নোট জালও করছে!

কিরীটীর চোখের মণি দুটো সহসা যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সেটিয়ার শেষ কথাগুলো শুনে। সে প্রশ্ন করে, সঞ্জয় বিয়ে করেছে?

এখনো করে নি, তবে—

তবে কি?

সে আর এক কেলেঙ্কারী।

কেন?

রানীসাহেবারই ভাইয়ের মেয়ে মধুমতী, তাকেই সে বিয়ে করবে বলে ক্ষেপে উঠেছে। মেয়েটাও ভাল নয়, সে-ও আজকাল ঐ সঞ্জয়ের সংগেই ঘুরছে সর্বক্ষণ।

কিরীটী বলে, ঐ সঞ্জয় ও মধুমতীর সংগে আমি একটু আলাপ করতে চাই।

হঠাৎ!—ব্রিজলাল একটু অবাক।

কারণ যথাসময়েই জানতে পারবেন। কিন্তু কিভাবে আলাপটা করা যায় বলুন ত।

কেন, আমি নিজে নিয়ে যাবো আপনাকে—

না, না, সেভাবে নয়—

তবে?

হয় আপনার ওখানে নয়ত অন্য কোথাও ওদের একদিন সন্ধ্যায় ডেকে পাঠান। আমি সেখানে উপস্থিত থাকব।

বেশ ত। কবে আসবেন বলুন।

আজ সম্ভব হলে কাল নয়।

আজ বা কাল ত হবে না,—ব্রিজলাল বলে, আমার একটু কাজ আছে। পরশু সন্ধ্যায় ব্যবস্থা করতে পারি।

বেশ। তাহলে সেই কথাই থাকল। আপনি ব্যবস্থা করে রাখবেন।—বলে কিরীটী ফোনটা নামিয়ে রাখল।

সুব্রত আর দয়ারাম এতক্ষণ নিঃশব্দে একতরফা কিরীটীর কথাগুলোই শুনছিল। সুব্রত অবশ্য ব্রিজলাল সেটিয়ার কথাগুলো মোটামুটি আঁচ করতে পারলেও দয়ারাম কিছুই বুঝতে পারে নি। কিরীটী এবারে দয়ারামের দিকে তাকায়, বলে, দয়ারামজী, পরশু সন্ধ্যায় আপনাকে একবার আমার এখানে আসতে হবে। এখান থেকে রঙচঙ মেখে আমরা এক জায়গায় বেড়াতে যাবো। সঞ্জয় ও মধুমতী—দুজনেই সেখানে আসবে, আপনি থাকবেন পাশের ঘরে—দূর থেকে তাদের দেখে আপনাকে বলতে হবে আপনি তাদের চেনেন কিনা।

দয়ারাম বলে, আমার হীরা তিনটের কথা কিছু ভাবলেন?

দেখুন দয়ারামজী, ব্যাপারটা খুব একটা জটিল কিছু নয়—স্রেফ হাত সাফাই করে আপনাকে বোকা বানিয়েছে আর টাকার টোপ ফেলে কিছু টাকা আপনার কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়ে গেছে। অতগুলো নগদ টাকা advance পেয়ে আপনি লোকটাকে একটু বেশী বিশ্বাস করে ফেলেছিলেন—চশমাটা চোখে এ'টে নোট-গুলো জাল না ঠিক তা দেখবার কথাও আপনার মনে হয় নি, হলে টাকাটা অন্তত আপনার পরের দিন গচ্চা যেত না বোধ হয়।

সে ত বুঝতেই পারছি। কিছুদিন ধরে নাকের উপর একটা ফোড়া হওয়ায় চশমাটা নাকে লাগালে ব্যথা লাগত, তাছাড়া চশমা পারতপক্ষে আমি ব্যবহারও করি না। দেখতে-শুনতে দিব্যি ভদ্রলোক, অবিশ্বাসই বা তাকে করি কি করে?

তাহলেও ব্যবসায়ী আপনি, রসিদ দেবার আগে টাকাগুলো দেখে নেওয়া উচিত ছিল আপনার। যাক এখন আর ও কথা ভেবে কি করবেন? এখন দেখা যাক আপনার হীরা তিনটের কোন হদিস পাওয়া যায় কিনা।

পাওয়া যাবে?—ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে দয়ারাম।

হাতের মুঠো থেকে একটা জিনিস একবার বার হয়ে গেলে আবার সেটা হাতের মুঠোর মধ্যে ফিরে পাওয়া খুবই অনিশ্চিত দয়ারামজী।—কিরীটী ধীরে ধীরে বলে, তবে চেষ্টা আমাদের করতে হবে।

৫.

দয়ারামজী বিদায় নিল বটে, তবে মনে হলো কিরীটীর কথায় সে যেন একটু হতাশই হয়েছে। সুব্রতও সেই কথাটাই বলতে কিরীটী বললে, বেটা পয়লা নম্বরের কঞ্জুস। নামে-বেনামীতে যে কত টাকা করেছে তার ইয়ত্তা নেই—লাখ খানেক টাকাও ওর কাছে নস্যি। এবারে পড়েছেও তেমনি লোকের পাল্লায়!

ব্যাপারটা কি?—সুব্রত জানতে চায়। কিরীটী হীরা খোয়াবার ঘটনাটা সংক্ষেপে বিবৃত করে।

হুঁ। তাহলে তোর মনে হচ্ছে ঐ সঞ্জয়কুমার আর মধুমতীই?

আপাততঃ তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি অন্য একটা কথা ভাবছি সুব্রত।

কি?

রানীসাহেবার সঙ্গে বনিবনা হোক বা না হোক রায়পুর স্টেটের সবকিছুর মালিক ত ঐ সঞ্জয়কুমারই। সেক্ষেত্রে তার ঐ ধরনের নোংরামি আর আইনবিরুদ্ধ
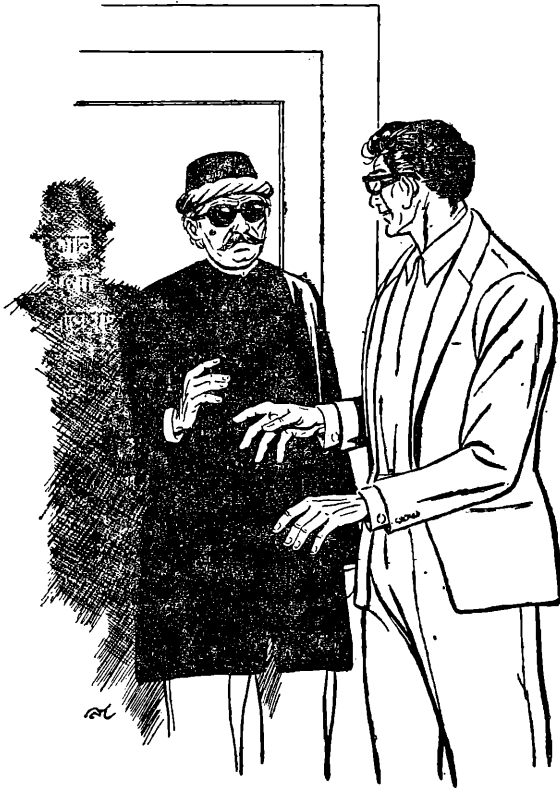
......তখন আর দয়ারামকে চেনার উপায়......

কাজ করবার মানেটা কি? তুই একটা কাজ করতে পারিস?

কি?

রানীসাহেবার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারিস? তোর সঙ্গে ত আলাপ হয়েছে—

তা আর না পারব কেন? কিন্তু কেন?

হীরার প্রসঙ্গটা—কিরীটীর কণ্ঠস্বর মৃদু অথচ শানিত, তুই তাঁর কাছে তুলবি।

তা না হয় তুললাম। তারপর?

যদি পারিস তবে ঐ প্রসঙ্গে কায়দা করে জেনে নেবার চেষ্টা করবি—সঞ্জয়কুমারের প্রতি রানীসাহেবার আসল মনোভাবটা কি?

সুব্রত বললে, বেশ। রানীসাহেবার ভাইয়ের সঙ্গেও সে-রাত্রে আমার আলাপ হয়েছে, কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে দেখা করতে তেমন একটা বেগ পেতে হবে না।

ঐদিনই সন্ধ্যায় সুব্রত লোয়ার রডন স্ট্রীটে রানী-সাহেবার ভাই রণধীর সিংয়ের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলো। লোকটির নানা ধরনের বিজনেস আছে, শহরের অন্যতম একজন ধনী ব্যক্তি বলে সে পরিচিত।

আপন নয়, রানীসাহেবার মামাত ভাই এই রণধীর সিং। বয়সে রানীসাহেবারই মত, দু-এক বছরের এধার-ওধার হবে হয়ত।

ভৃত্যের মুখে সুব্রত তার আসার সংবাদ দিতেই রণধীর তাকে দোতলায় বসবার ঘরে ডেকে পাঠাল। ঘরে রানীসাহেবাও রণধীরের পাশের অন্য একটা সোফায় বসে ছিলেন। ঘরটি সুন্দর রুচিসম্মতভাবে আধুনিক আসবাবপত্রে সুসজ্জিত।

রঞ্জাবতীর বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের বেশী নয়। দেখতে কালোর উপর সত্যিই সুন্দরী। রাজাসাহেবের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী রঞ্জাবতী, চোখে মুখে অদ্ভুত একটা বুদ্ধির দীপ্তি আছে। লেখাপড়া-জানা মেয়ে—দিল্লী ইউনিভারসিটির গ্রাজুয়েট।

রণধীর সুব্রতকে সাদর সম্ভাষণ জানায়, আসুন—আসুন সুব্রতবাবু! আপনি বোধহয় এসময়ে এখানে God sent!

অর্থাৎ দৈব-প্রেরিত!—কথাটা লুফে নিয়ে সুব্রত বলে, কিন্তু ব্যাপার কি?

সুব্রতর যে কিরীটীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আছে

রঞ্জাবতীকে সেটা জানিয়ে রণধীর বলে, সুব্রতবাবু হয়ত আমাদের সাহায্য করতে পারেন রঞ্জা।

সুব্রত কিন্তু তার দিক থেকে বিশেষ উৎসাহ না দেখিয়ে সামনের একটা খালি সোফায় ওদের মুখোমুখি বসল।

তুমি ওঁকে সব কথা বল রঞ্জা।—রঞ্জাবতীর দিকে তাকিয়ে বললে রণধীর।

রঞ্জাবতী বললেন, তুমিই বল না রণধীর।

সুব্রত পর্যায়ক্রমে ওদের দুজনারই মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

রণধীর বললে, বেশ। আমিই বলছি! তাহলে গোড়া থেকেই বলি। মারা যাবার আগে রাজাসাহেব একটা উইল করে যানঃ নিউ আলিপুরের বাড়ী এবং রানীসাহেবার অর্থাৎ রঞ্জাবতীর পার্সোন্যাল ব্যাঙ্কের টাকা ও তাঁর নিজস্ব জুয়েল্‌স্ ছাড়া আর সব কিছু পাবে তাঁর দত্তক পুত্র সঞ্জয়কুমার। এবং রানীসাহেবার অবর্তমানে নিউ আলিপুরের বাড়ীটা সঞ্জয়ই পাবে। পনেরটা ফ্ল্যাট আছে ঐ বাড়ীটাতে—অবশ্য দোতলাটা সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে—একতলা, তিনতলা, চারতলা, পাঁচতলা ও ছয়তলায়। মাসে মাসে ফ্ল্যাটগুলো থেকে ভাড়া আসে প্রায় দশ হাজার টাকা। ঐ টাকায় রঞ্জার কোন অভাব হবার কথা নয়—হয়ও না। খরচ-খরচা বাদে বরং বেশ কিছু উদ্বৃত্তই থাকে। কিন্তু বছর খানেক হলো সঞ্জয় ফ্ল্যাট ভাড়ার টাকার কিছুই রঞ্জাকে দিচ্ছে না।

কেন? ফ্ল্যাটগুলো ত রানীসাহেবারই নামে।

ঠিক। কিন্তু সঞ্জয় কৌশলে ফ্ল্যাটগুলো তত্ত্বাবধান ও ভাড়া আদায়ের ভার রঞ্জাকে দিয়ে নিজের নামে লিখিয়ে নেয় বছর দেড়েক আগে। প্রথম মাস কয়েক কোন গোলমাল করে নি সঞ্জয়, রঞ্জার হাতেই নিয়মিত ভাড়ার টাকা তুলে দিয়েছে। কিন্তু বছর খানেক আগে হঠাৎ ভাড়া দেওয়া বন্ধ করল।

কেন?

প্রথমে ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যায় নি। সঞ্জয় বলে, নিউ আলিপুরেই আর একটা জমি কিনে সে ফ্ল্যাট-বাড়ী করবে। সরল বিশ্বাসে রঞ্জাও বাধা দেয় নি। কিন্তু মাস সাতেক আগে হঠাৎ জানা গেল সব মিথ্যে, ফ্ল্যাট-ট্যাট কিছুই নয়—টাকাটা সে-ই মারছে। ব্যাপারটা রঞ্জা আমাকে জানাতে আমি সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলাম।

কি বললে সে?

সে বললে যে, তাদের ব্যাপারে আমার নাকি মাথা গলাবার কোন এক্তিয়ারই নেই। এই নিয়েই গোলমালের সূত্রপাত এবং ক্রমশ মনকষাকষি।

তারপর?

আমি অবশেষে নিরুপায় হয়ে তাকে এই বলে শাসালাম যে, সে যদি ভাড়ার টাকা না দেয় তবে আমরা আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হব।

নিয়েছিলেন আইনের আশ্রয়?

না।

কেন?

ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার ঘটে। রঞ্জার life-এর উপর দু-তিনবার attempt হয়। শুধু তাই নয়, রঞ্জা বাড়ীর বাইরে বের হলেই কারা যেন তাকে ফলো করতে থাকে।

পুলিসে সংবাদ দিলেন না কেন তখন?

দিতাম। কিন্তু বেনামী চিঠিতে রঞ্জাকে শাসানো হয়—পুলিসের সাহায্য নেবার কোন চেষ্টা করলেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে খতম করে দেওয়া হবে। সেই ভয়ে আমরা এতদিন চুপ করে আছি এবং ওকে আমার এখানে নিয়ে এসেছি। এখানে মানে কলকাতায় আসার কিছু দিন আগে আরো একটা ব্যাপার ঘটে।

কি?

রঞ্জার নিজস্ব কিছু মূল্যবান হীরা-জহরত ছিল, সঞ্জয় সেগুলো হঠাৎ দাবি করে বসে। রঞ্জা ভয় পেয়ে কিছু দামী হীরা ব্যাঙ্কের মারফত এখানে নিয়ে আসে বছর খানেক আগে—আমার পরামর্শে—এবং বিক্রি করে দিতে মনস্থ করে।

জানি, পাঁচটা দামী হীরা উনি বিক্রি করেছেন।—সুব্রত বললে।

আপনি জানলেন কি করে?

যেভাবেই হোক জেনেছি। সেই হীরা বিক্রি করা হয় দয়ারামজী ও সুখলালজীর কাছে। তাই না?

হ্যাঁ।—রণধীর একটু নিস্তেজ স্বরে বলে।

তারপর কি বলছিলেন বলুন।—সুব্রত খেই ধরিয়ে দেয়।

আরো গোটা পাঁচেক দামী হীরা ছিল রঞ্জার কাছে—দাম প্রায় সোয়া লক্ষ টাকার মত হবে—কাল রাত্রে সেগুলো ঘরের সিন্দুক থেকে চুরি গিয়েছে।

সে সিন্দুক কোথায় ছিল?

নিউ আলিপুরের দোতলার ফ্ল্যাটের আয়রন সেফের মধ্যে।

উনি নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাট থেকে কত দিন আপনার এখানে চলে এসেছেন?

মাসখানেক হবে।

সিন্দুকের চাবি নিশ্চয়ই ওঁর কাছেই ছিল?

হ্যাঁ।

আচ্ছা সিংজী,—সুব্রত প্রশ্ন করল, সিন্দুকের মধ্যে যে হীরা ছিল কেউ তা জানত?

একমাত্র সঞ্জয় বোধহয় জানত। আর কেউ এমন কি আমিও জানতাম না। আমি কাল রাত্রেই প্রথম রঞ্জার মুখ থেকে জেনেছি।

এই এক মাসের মধ্যে রানীসাহেবা নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটে আর যাননি?

গিয়েছে চার-পাঁচবার।

একাই?

না। প্রতিবারই আমি ওর সঙ্গে থেকেছি।

এই চার-পাঁচবার উনি যে গেছেন, এর মধ্যে কোন বার সিন্দুক খুলে দেখেছিলেন?

রঞ্জাবতীই এবার জবাব দিলেন, না।

হুঁ।—সুব্রত একটুক্ষণ গুম হয়ে থেকে সহসা জিজ্ঞাসা করে, আপনার ছেলে—মানে ঐ সঞ্জয়কুমারই—তাহলে হীরাগুলো নিয়েছে? তাই কি আপনার ধারণা রানীসাহেবা?

রানীসাহেবা কিছু বলার আগে রণধীরই উত্তর দেয়, তাছাড়া আর কে নিতে পরে বলুন?

এখন তাহলে কি করতে চান?

রঞ্জার ইচ্ছে পুলিসে খবর দেয়—আমারও তাই ইচ্ছে। তবে—

কি?

রায়পুর স্টেটের ফ্যামিলি প্রেস্টিজ ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ত, তাই ভাবছি কি করা কর্তব্য। আপনিই বলুন না সুব্রতবাবু—এখন কি করা আমাদের কর্তব্য।

সঞ্জয়কুমারের সঙ্গে এ সম্পর্কে কোন কথাবার্তা হয়েছে?

হয়েছে। আমিই তাকে আজ সকালে এখানে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সে বললে যে, ও সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। অবশ্য জানতাম, সে কিছুতেই স্বীকার করবে না। অবশেষে আমরা একটা প্ল্যানও করেছিলাম।

কি?

হীরাগুলো যদি ও নিয়ে থাকে ত নিক. কেন না রঞ্জাই ঠিক করে রেখেছিল যে, হীরাগুলো সঞ্জয়ের বিয়েতে তার বধূকে সে যৌতুক দেবে। কিন্তু ফ্ল্যাটগুলো থেকে গত এক বছর যে ভাড়া পাওয়া গেছে, সব তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং ভবিষ্যতেও ভাড়ার টাকা থেকে হাজার দুই রেখে বাকি টাকা তাকে মাসে মাসে নিয়মিত রঞ্জাকে দিতে হবে।

সঞ্জয় কি বললে?

রাজী হয় নি আমাদের প্রস্তাবে।

সুব্রত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, একটা কাজ করলে কেমন হয়?

বলুন।

৬.

পরশু সন্ধ্যার পর ধরুন,—সুব্রত বললে, সঞ্জয়কুমারকে আপনি এখানে ডেকে পাঠান আপনার মেয়েকে দিয়ে। আর মধুমতীকে—মানে আপনার মেয়েকেও—তখন উপস্থিত থাকতে বলবেন।

সুব্রতর কথায় রণধীর যেন বিব্রত বোধ করে। বলে, কেন—মধুমতীকে দিয়ে ডেকে পাঠাব কেন?

সে রাত্রে ব্রিজলাল সেটিয়ার বিয়ের পার্টিতে ওদের দুজনকে দেখে মনে হলো, বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা—মানে বন্ধুত্ব—আছে দুজনার মধ্যে। আপনি হঠাৎ সঞ্জয়কে ডেকে পাঠালে সে অন্য রকম সন্দেহ করতে পারে, কিন্তু মধুমতী তাকে ডেকে পাঠালে সেরকম কিছু সে ভাববে না। ব্যাপারটা সহজভাবেই নেবে।

কিন্তু—রণধীর কেমন যেন ইতস্ততঃ করে, আপনিও কি হীরাচুরির ব্যাপারে সঞ্জয়কেই?

কথাটা তাহলে আপনাকে আরো একটু খুলেই বলি। আমি ভাবছি কিরীটীকেও ঐদিন সন্ধ্যায় এখানে সঙ্গে করে আনব।

কিরীটী রায়?

হ্যাঁ। কারণ সে হয়ত সঞ্জয়কে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কৌশলে সমস্ত ব্যাপারটার একটা মীমাংসা—

সুব্রতর কথা শেষ হবার আগেই রঞ্জাবতী বলে ওঠেন, তাই করো ভাইয়া। উনি ভাল কথাই বলছেন।

রণধীর বললে, তুমি বুঝতে পারছ না রঞ্জা। এটা তোমার ফ্যামিলি প্রেস্টিজের ব্যাপার—বাইরের দশজন লোককে এর মধ্যে টেনে আনা কি যুক্তিযুক্ত হবে?

সুব্রত আশ্বাস দেয়, Don't worry সিংজী! কিরীটী কখনো মুখ খুলবে না।

রানীসাহেবার ইচ্ছা দেখে রণধীর শেষ পর্যন্ত সুব্রতর প্রস্তাবে সম্মত হয়।

সুব্রত কিরীটীর গৃহে এসে সব কথা তাকে জানাল। কিরীটী বললে, চমৎকার ম্যানেজ করেছিস ব্যাপারটা তুই। সেটিয়াকে তুই তাহলে জানিয়ে দে যে, তাঁকে আর কিছু করতে হবে না।

সুব্রত বলে, কিন্তু আমি এখনো তোর মতলবটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

মৃদু হেসে কিরীটী বললে, আমি মনে মনে যে প্ল্যানটা করেছি সেটা যদি successful হয়, তবে পরশুই আসল হীরাচোরকে তুই হাতেনাতে ধরতে পারবি।

হীরাগুলো তুই ফিরে পাবি মনে করিস?

হীরা ফিরে পাবো এমন কথা ত বলছি না। তবে হীরাচোরকে সনাক্ত করতে পারব।

সন্ধ্যায় রণধীরের লোয়ার রডন স্ট্রীটের বাড়ীতে যাবার কথা। কিরীটীর ফোন পেয়ে দয়ারাম বিকেলের দিকেই কিরীটীর গৃহে এসে হাজির হলো।

আসুন দয়ারামজী!—কিরীটী অভ্যর্থনা জানায়, আপনাকে ঘন্টা দুয়েক আগে আসতে বলেছি কারণ আপনার চেহারাটার একটু অদলবদল করতে হবে।

চেহারা অদলবদল করতে হবে! কেন?—দয়ারামের চক্ষু ছানাবড়া।

যাতে হীরাচোর আপনাকে না চিনতে পারে।

অতঃপর দয়ারামকে নিয়ে কিরীটী তার শোবার ঘরের পাশের ছোট ঘরটায় গিয়ে ঢুকল।

ঘন্টাখানেক বাদে দয়ারামকে নিয়ে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এল কিরীটী, তখন আর দয়ারামকে চেনার উপায় নেই। পাকাচুল এক বৃদ্ধ পারসীর ছদ্মবেশ তখন তার। মুখের একদিকে একটা আঁচিল আর অন্য দিকে একটা ক্ষতচিহ্ন। চোখে কালো কাঁচের চশমা। পরনে পারসীদের মত পরিচ্ছদ। দেখে সুব্রতও।

সন্ধ্যার একটু পরে ওরা তিনজনে রণধীরের বাড়ীতে রওনা হলো। রণধীরের বাড়ীতে ওরা গিয়ে যখন পেঁছিল, তখন বাইরের বসবার ঘরে মধুমতী ও রঞ্জাবতী বসে। সুব্রতই কিরীটীর সংগে ওদের আলাপ করিয়ে দেয়। দয়ারাম কিরীটীর একেবারে গা ঘেঁষেই বসেছিল। তার পরিচয় দেয় কিরীটী বম্বের বিখ্যাত জুয়েলার মিঃ দীনশা বলে।

একটু পরে ঘরে এল সঞ্জয়। উপস্থিত সকলের দিকে তাকিয়ে সঞ্জয় সোজা গিয়ে মধুমতীর পাশেই বসল। রঞ্জাবতীর দিকে তাকিয়ে সে বলে, মামাজী কোথায়? তাকে দেখছি না।

এখুনি আসবে।—বললেন রঞ্জাবতী।

তা হঠাৎ তলব কেন? ব্যাপারটা কি বল ত? আর এরাই বা কারা?—সঞ্জয় শুধায়।

কিরীটীর পূর্ব-পরামর্শমত রঞ্জাবতী কিরীটীর পরিচয় দিলেন, উনি একজন ল-ইয়ার—মিঃ রায়।

ল-ইয়ার। তা উনি—

শোন সঞ্জয়, নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাট বাড়ীটার একটা ফয়সালার জন্যই তোমাকে আজ ডেকে পাঠিয়েছি।

তাই বুঝি? তা ল-ইয়ারই যখন ডেকেছো, তখন সোজা একেবারে আদালতে গেলেই ত পারতে!

আদালত আছেই,—কিরীটী এবার মুখ খোলে, কিন্তু আপসে যদি একটা মীমাংসা হয়ে যায়—

হবার নয়।—বাধা দিয়ে সঞ্জয় বলে।

কেন?—কিরীটীর প্রশ্ন।

কারণ ঐ সম্পত্তির উপর ওঁর ন্যায্যত কোন অধিকারই নেই!

কিন্তু আপনার বাবার উইলে—

কিরীটীকে বাধা দিয়ে সঞ্জয় বললে, পিতাজীর কোন উইলই নেই। থাকলে বের করতে বলুন না ওঁকে।

এই যে সঞ্জয়, তুমি এসে গিয়েছ!—রণধীর ঘরে এসে প্রবেশ করে।

হ্যাঁ—কিন্তু এসব কথা আগে আমাকে তুমি জানাওনি কেন মামাজী? এ জানলে আমি আসতাম না!—বলতে বলতে সঞ্জয় উঠে দাঁড়ায় বোধ করি যাবার জন্যই।

দাঁড়ান একটু মিঃ সঞ্জয়কুমার!—কিরীটী বলে ওঠে, আমাদের আরো কিছু বলবার আছে।

তাই নাকি!—সঞ্জয়ের কণ্ঠে যেন ব্যাঙ্গের সুর, তা আর কি বলবার আছে জানতে পারি কি?

আপনার মায়ের কতকগুলো দামী হীরা ছিল আপনি জানেন?

না।

জানেন না?

না। ওঁর কোন দামী হীরা ছিল বলে জানি না। তবে আমার মায়ের ছিল বলে জানি।

সে হীরাগুলো এখন কোথায় জানেন?

ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন না, কারণ উনিই বলতে পারবেন সে কথা।—সঞ্জয় বললে। তারপর একটু থেমে

সে আবার বলে, উনি ভাবেন কিছুই আমি বুঝি জানি না—ওঁর হীরা বিক্রির ব্যাপারটা—

কাকে উনি হীরা বিক্রি করেছিলেন আপনি জানেন নিশ্চয়ই?

না।

দয়ারামজীর নাম শুনেছেন—বিখ্যাত জুয়েলার?

না।

দয়ারামের কাছ থেকে সংগ্রহ-করা গোটা দুই একশ টাকার জাল নোট কিরীটী আচমকা তার পকেট থেকে বের করে সঞ্জয়ের চোখের সামনে তুলে ধরে বলে, এ নোট দুটো চিনতে পারছেন?

সঞ্জয় নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে, একশ টাকার নোটের individually কোন বিশেষত্ব আছে নাকি যে চেনবার কথা উঠছে?

এ দুটোর আছে।—রহস্যময় হাসি কিরীটীর মুখে।

তাই নাকি? তা বিশেষত্বটা কি?

সঞ্জয়ের মুখের প্রতিটি রেখার উপর তীক্ষ্ন অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেলে কিরীটী চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, এ দুটো জাল নোট, মিঃ সঞ্জয়কুমার!

সঞ্জয় নির্বিকার, তবে একটু যেন গম্ভীর।

কিরীটী সেটা লক্ষ্য করে আবার বলে, মিঃ সঞ্জয়কুমার, আপনার অবগতির জন্যই বলছি—এই নোট দুটো দয়ারামজীর কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে, তিনটি হীরার জন্য একজন তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা advance করে এসেছিল যার মধ্যে অধিকাংশই ছিল এমনি জাল নোট। দেখুন না একবার নোট দুটো হাতে করে, ধরলেই বুঝতে পারবেন।

আমার প্রয়োজন নেই।—সঞ্জয় বেপরোয়া।

আপনার না থাকতে পারে, পুলিসের আছে।

মধুমতী এবার উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে ওঠে, কিন্তু সঞ্জয়কে ঐ সব কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? ওর সঙ্গে ঐ জাল নোটের কি সম্পর্ক?

কিরীটী শান্তকন্ঠে বললে, সম্পর্ক আছে বলেই জিজ্ঞাসা করছি মিস মধুমতী।

সম্পর্ক আছে?—মধুমতীর গলায় রীতিমত বিস্ময়।

হ্যাঁ। কারণ উনি জানেন এ নোট কোথা থেকে এসেছে।

সঞ্জয়, উনি কি সত্যি বলছেন?—মধুমতী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

বুঝতে পারছি এসব মার ষড়যন্ত্র!—সঞ্জয় বলে ওঠে, আমাকে ফাঁসাবার জন্য ঐ সব চক্রান্ত করা হয়েছে—তুমি বিশ্বাস করো মতি, ও-সবের কিছুই আমি জানি না—কিছু জানি না!

রানীসাহেবা ঐ সময় বলে ওঠেন, সঞ্জয় তুমি শেষ পর্যন্ত ঐসব জঘন্য ব্যাপারে জড়িত—ছিঃ! ছিঃ!

মা! মুখ সামলে কথা বলো!—সঞ্জয় গর্জন করে ওঠে।

মিঃ সিং!—কিরীটী এবার রণধীরের দিকে তাকায়, এই নোটের ব্যাপারে আপনি কিছু বলতে পারেন?

আমি!

হ্যাঁ, আপনিই ত বোধ হয় সেটিয়ার কাছে একদিন বলেছিলেন যে, সঞ্জয় নোট জাল করে—

তবে রে শয়তান!—সঞ্জয় প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রণধীরের উপর, কিন্তু তার আগেই কিরীটী তাকে ধরে

......তার আগেই কিরীটী তাকে......

ফেলে বলে, বসুন—গোলমাল করবেন না। এ বাড়ীটা বর্তমানে চারিদিক থেকে পুলিসে ঘিরে রেখেছে—ভিতরেও পুলিস রয়েছে।

পুলিস!—মধুমতী অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে, পুলিস কেন? এসবের মানে আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

কিরীটী ঘুরে তাকাল মধুমতীর দিকে, আপনি জানেন না পুলিস কেন? কিন্তু আপনার ত না জানার কথা নয় কেমন করে মাত্র কয়েকদিন আগে এক সন্ধ্যায় দয়ারাম আগরওয়ালার দোকানে ঢুকে হীরা কিনবার ভান করে কারা তারই চোখের সামনে তার হীরাগুলোর মধ্যে থেকে তিনটে দামী হীরা বাছাই করার ফাঁকে হাত সাফাই করেছিল, শুধু তাই নয়—পরের দিন নগদ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যাবে বলে যে পাঁচ হাজার টাকা advance দিয়ে আসে তার প্রায় সবগুলোই জাল নোট ছিল।

এসব কী আজগুবী গল্প বলছেন? আর এসব এখানে বলবার কারণটাই বা কী? সঞ্জয় বলে।

কারণ—কিরীটী পর্যায়ক্রমে সবার মুখের ওপর তার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলে, সেদিনকার হীরাচোর আর জাল নোটের অধিকারী এই মুহূর্তে এই ঘরেই আছে!

৭.

কে? কে সে?—সকলের কণ্ঠ হতে একই সময় কথাটা উচ্চারিত হয়।

বলুন না—আপনারাই বলুন না আপনাদের মধ্যে কে সে।—কিরীটী ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে।

পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

ঘরের মধ্যে ঐ মুহূর্তে যেন একটা অখণ্ড স্তব্ধতা নেমে আসে। একটা অস্বস্তিকর স্বব্ধতা যেন।

কি হলো? আপনারা সবাই চুপ করে রইলেন কেন? Speak out! জবাব দিন!

Absurd! It's a torture! Cruel torture—! সহসা ক্ষিপ্তের মত আক্রোশভরা কণ্ঠে ঘরের তুহিন স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলে ওঠে সঞ্জয়কুমার।

মধুমতী দেবী!—কিরীটী মধুমতীর দিকে তাকায়, একটা কথা ভুলে যাবেন না যে, হাত সাফাই করে হীরা চুরি করার চাইতেও গুরুতর দণ্ডনীয় অপরাধ নোট জাল করা—দীর্ঘ মেয়াদে কারাবাস যার ন্যূনতম দণ্ড। আর যে অন্যায় করে এবং তাকে যে সাহায্য করে আইনের চোখে উভয়েই সমান অপরাধী।

এসব আপনি কি বলেছেন মিঃ রায়, আপনি কি মনে করেন মতি ঐ ধরনের কাজ করেছে?—সঞ্জয় সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে।

সঞ্জয়ের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে কিরীটী সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বললে, সুব্রত, নীচে জীপে পুলিস ইন্সপেক্টার রঞ্জন বোস আছেন। তাঁকে এখানে আসতে বল্।

সুব্রত চলে গেল। কিরীটী আবার বললে, মিস মধুমতী, পুলিস আসবার আগে শেষবারের মত বলছি—এখনো যদি কিছু জানেন ত বলুন!

আমি কিছু জানি না।

মিঃ দীনশা!—কিরীটী দয়ারামের দিকে তাকাল, মধুমতীকে দেখিয়ে বললে, ওকে চিনতে পারছেন?

সবাই যুগপৎ দয়ারামের মুখের দিকে তাকায়। কিরীটী দয়ারামকে বলে, কোথায় এবং কখন্ ওকে দেখেছেন বলুন।

আমার দোকান থেকে যেদিন হীরা চুরি যায়।—দীনশা ওরফে দয়ারাম বলে।

What! কি বললেন?—সঞ্জয় বলে ওঠে, আপনার দোকান থেকে হীরা চুরি?

হ্যাঁ, ওঁরই দোকান থেকে হীরা চুরি গিয়েছিল।—কিরীটী বলে, উনিই সেই জুয়েলার দয়ারাম আগরওয়ালা। Identification-এর জন্যই ওঁকে সঙ্গে এনেছি আজ।

সুব্রত ও রঞ্জন বোস ঐ সময় ঘরে এসে ঢুকল।

কিরীটী আগেই ফোনে ডি. সি.-কে বলে রঞ্জন বোস ও পুলিসের ব্যবস্থা করেছিল ঐদিন। সুব্রত ও রঞ্জন বোস ঘরে ঢুকতেই কিরীটী বললে, মিঃ বোস, সেদিন যে দুজন দয়ারামের দোকানে হীরা চুরি করতে গিয়েছিল ও জাল নোট advance দিয়ে এসেছিল ঐ মধুমতী তাদেরই মধ্যে একজন!

রঞ্জন বোস মধুমতীর দিকে এগিয়ে যেতেই সঞ্জয় কিরীটীর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, But who are you—কে আপনি পুলিসকে আদেশ দেবার?

শ্রদ্ধাপ্লুত কণ্ঠে পুলিস ইন্সপেক্টার রঞ্জন বোস বলেন, উনিই বহুকীর্তিমান বিখ্যাত রহস্যভেদী কিরীটী রায়!

সহসা যেন ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হয়। সঞ্জয়কুমারের সব আস্ফালন মুহূর্তে জল হয়ে যায়, সোফার উপর

ধপ্‌ করে বসে পড়ে সে। রঞ্জন বোস বললেন, মধুমতী দেবী, you are under arrest! আসুন—নীচে পুলিস ভ্যান অপেক্ষা করছে।

মধুমতীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে রঞ্জন বোস ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

আকস্মিক বিমূঢ়তায় সবাই আচ্ছন্ন।

কিরীটীও উঠে পড়ল, চলুন দয়ারামজী। আয় সুব্রত।

৮.

কিরীটী, সুব্রত ও দয়ারাম ঘর থেকে বের হয়ে এল। রাস্তায় কিরীটীর গাড়ি অপেক্ষা করছিল। তিনজনে গাড়িতে উঠে বসে। দয়ারামের নাড়ী অভিমুখে গাড়ি চলতে থাকে।

সুব্রত বললে, মধুমতীই যে মানিকা দেশাই নামে দয়ারামজীর দোকানে সেদিন গিয়েছিল তা বুঝলাম। কিন্তু তার সঙ্গের পুরুষটি কে? ঐ সঞ্জয়কুমারই কি?

দয়ারাম উত্তর দিল, না। তার বয়স কিছু বেশী ছিল—অত কম বয়স নয়—তাছাড়া তার গলার স্বরটা ছিল কর্কশ ও ভাঙা-ভাঙা—অনেকটা সর্দি হলে যেমনটি হয়।

কিরীটী ওদের আলোচনায় যোগ দেয় না। গাড়ির জানালা ঘেঁষে বসে পাইপটা মুখে দিয়ে সে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। সুব্রত কিরীটীকে দেখে বুঝতে পারে যে, সে ঐ মুহূর্তে কিছু একটা গভীরভাবে চিন্তা করছে। সুব্রত দয়ারামের দিকে তাকিয়ে আবার প্রশ্ন করে, তবে কি ঐ রণধীর সিং?

দয়ারাম বললে, তাও মনে হয় না।

তবে লোকটা কে?

কিরীটী হঠাৎ ঐ সময় কথা বললে, দয়ারামজী, আপনাকে আপাততঃ বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। এখন রাত সাড়ে আটটা, রাত ঠিক দশটা-সাড়ে দশটা নাগাদ আপনাকে একবার পাঞ্জাব ক্লাবে আসতে হবে। জানেন ত পাঞ্জাব ক্লাবটা কোথায়?

জানি—বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে।

দয়ারামকে তার পার্ক সার্কাসের বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে কিরীটী ড্রাইভারকে বলে পাঞ্জাব ক্লাবে যেতে।

সুব্রত বুঝতে পারে, কোন বিশেষ কারণেই কিরীটী পাঞ্জাব ক্লাবে যাচ্ছে। ইতিপূর্বে সে-ও বার দুয়েক পাঞ্জাব ক্লাবে গিয়েছে, কাজেই ক্লাবটা তার অপরিচিত নয়। ঠিক বড় রাস্তার উপরে নয়, অনেকটা ভিতরের দিকে একটা পুরনো দোতলা বাড়ীর একতলার সবটা নিয়ে পাঞ্জাব ক্লাব। বাইরে থেকে ক্লাবটা ঠিক বোঝা যায় না। ভিতরে আগাগোড়া ডিস্‌টেম্‌পার করা—সম্পূর্ণ শীততাপনিয়ন্ত্রিত। কেবল ড্রিংকস্‌ ও খানার জন্যই ক্লাবটা বিখ্যাত নয়, ওখানে নানা ধরনের জুয়ো খেলাও চলে।

ক্লাবে ঢুকতেই বেয়ারা সেলাম জানাল। কিরীটী শুধায়, ম্যানেজার সাব হ্যায়?

জী।

কিধার?

উনিকা কামরা মে।

সুব্রতকে লাউঞ্জে বসতে বলে কিরীটী ম্যানেজারের ঘরের দিকে চলে গল।

সুব্রত দেখল, নানা বয়সের নরনারী লাউঞ্জে ভিড় করেছে। পাশের ঘরেই ড্রিংক কাউন্টার—কাঁচের দরজা-পথে দেখা যায় সেখানেও অনেকের ভিড়।

মিনিট পনের বাদে কিরীটী ফিরে এল। বললে, চল্‌ ঐ ঘরে যাওয়া যাক।

সুব্রত নিঃশব্দে কিরীটীকে অনুসরণ করে।

ক্রমে রাত সাড়ে দশটা বাজে। কিরীটী একটা কোল্ড ড্রিংক নিয়ে মধ্যে মধ্যে চুমুক দিচ্ছিল। সুব্রত শুধায়, মনে হচ্ছে তুই যেন কারো জন্যে অপেক্ষা করছিস?

হ্যাঁ।

কে?

দেখতেই পাবি। ব্যস্ত কেন!

ইতিমধ্যে দয়ারাম এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। কিরীটীর নির্দেশে সে অবশ্য আলাদাভাবে বসে আছে এক পাশে। চোখে তার কালো কাঁচের চশমা।

রাত এগারোটা। কাঁচের দরজা ঠেলে দুজন এসে ঢুকল ঐ ঘরে। একজনকে সুব্রত চিনতে পারে—সঞ্জয়কুমার, কিন্তু অন্য জন? চাপা গলায় কিরীটীকে সে জিজ্ঞাসা করে, সঙ্গের ওটি কে রে কিরীটী?

কিরীটী সতর্ক কণ্ঠে ফিসফিস করে বলে, চুপ—আস্তে! চল্‌ কাউন্টারে এগোনো যাক।

কাউন্টারের কাছে তখন সঞ্জয় ও তার সঙ্গীটি দু-গ্লাস ড্রিংক নিয়ে পরস্পরের মধ্যে কথা বলছে নিম্ন কণ্ঠে। তাহলেও কিরীটী বা সুব্রতর অসুবিধা হয় না ওদের কথাবার্তা শুনতে। সঞ্জয়ের সঙ্গী বলছিল, কিছু ভেবো না তুমি কুমার। মধুমতীকে পুলিস ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।

উত্তরে সঞ্জয় বললে, কিরীটী রায়কে তুমি চেনো না। আমার সলিসিটারকে ওরা চলে যাবার পরই আমি ফোন করেছিলাম। সে বললে, ঐ লোকটা নির্ভুল কোন প্রমাণ হাতে না পেলে কখনো কাউকে এ্যারেস্ট করায় না। কিন্তু একটা কথা সত্যিই এখনো আমি বুঝতে পারছি না—মতি কেন হীরা চুরি করতে গিয়েছিল আর তার সঙ্গের লোকটাই বা কে?

তুমি জিজ্ঞাসা করলে না কেন?

সময় পেলাম কোথায়?

যাক ও নিয়ে ভাবতে হবে না। সব আমার উপর ছেড়ে দাও—আমি সব ব্যবস্থা করব।

সঞ্জয় বলে, কিন্তু ঐ জাল নোটগুলো?

তার পাত্তা কেউ পাবে না। চল, পাশের ঘরে যাওয়া যাক।

কিন্তু ওদের আর যাওয়া হলো না, কাঁচের দরজা ঠেলে দুজন পুলিস অফিসার ঘরে এসে ঢুকল। ঘরের মধ্যে তখন ছয়-সাতজনের বেশী লোক নেই। প্রায় সবাই খাবার ঘরে চলে গিয়েছে ডিনার করতে।

মিঃ জনকলাল আগরওয়ালা!—একজন পুলিস অফিসার ওদের সামনে এসে দাঁড়ায়, আপনাকে একটি-বার লালবাজারে যেতে—

কথা শেষ হয় না পুলিস অফিসারের, চকিতে জনকলাল পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করে অফিসারের দিকে তাক করে বলে, এক পা এগিয়েছেন কি ট্রিগারটা টেনে দেব!

কিরীটী জনকলালের ঠিক ধারেই ছিল, চট করে ডান পা দিয়ে প্রচণ্ড একটা লাথি বসায় জনকের হাতে—তার হাত থেকে পিস্তলটা ছিটকে পড়ে। সুব্রত সঙ্গে সঙ্গে জনককে দু-হাতে জাপটে ধরে, জনককে এ্যারেস্ট করতে আর বেগ পেতে হয় না।

জনক ও সঞ্জয়কে নিয়ে সকলে লালবাজারে উপস্থিত।

দয়ারাম স্তম্ভিত—একেবারে যেন বোবা হয়ে গেছে। হীরাচুরির ব্যাপারে তার ছেলে জড়িত! ব্যাপারটা তার স্বপ্নেরও অতীত। কিরীটী বললে, খুব অবাক হয়ে গেছেন দয়ারামজী, তাই না? মনে আছে আপনাকে আমি বলেছিলাম ভিতরে নিশ্চয়ই কোন জানা লোক আছে আর প্রদীপের নীচে বেশী অন্ধকার?

দয়ারাম ক্ষীণকণ্ঠে শুধায়, কিন্তু জনককে আপনি সন্দেহ করলেন কেন?

কিরীটী চট করে ডান পা দিয়ে......

মাত্র একটি কারণে তার উপর আমার প্রথম সন্দেহ পড়ে। রানীসাহেবা হীরাগুলো খুব গোপনে বিক্রি করেছিলেন। কাজেই সে খবর আপনাদের দুজন আর রানীসাহেবা ও তাঁর ভাই রণধীর সিং ছাড়া আর কারো জানার কথা নয়। সুতরাং সন্দেহ করতে হলে রণধীর সিং ও আপনারই কোন ঘনিষ্ঠ আপনজনকে সন্দেহ করতে হয়। কে সে হতে পারে, কথাটা ভাবতে গিয়ে আপনার ঐ ছেলের কথাই সর্বাগ্রে আমার মনে পড়ে। কিন্তু ধরা সে কোন দিনই পড়ত না, যদি একটা মারাত্মক ভুল সে না করত!

কি ভুল?

ব্যাপারটার মধ্যে আমাকে টেনে আনার পরামর্শ আপনাকে দেওয়াই তার পক্ষে সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছে। কিন্তু he was so much confident about himself—আত্মবিশ্বাস তার এর বেশী মাত্রায় ছিল যে, আমার কথাটা সে ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করে নি!

কিন্তু কেন সে ঐ কাজ করতে গেল?

তার কারণ ওর অসংযত জীবনযাত্রা—নানান বদ-

খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য ওর প্রচুর টাকার দরকার হতো—সেটা ত আপনি দিতেন না।

হতভাগা!

তা ত বটেই, নইলে ঐ কাজ করে?

কিন্তু ঐ জাল নোট?

সেটা অবশ্য ওর কাজ নয়, হীরা চুরি করতে সেদিন যে গিয়েছিল ওটাও তারই কীর্তি।

কে সে?

এখুনি তিনি এসে পড়বেন—রথ গিয়েছে তাকে আনতে!

ঐ সময় দুজন পুলিস অফিসারের সঙ্গে ঘরে এসে ঢুকল রণধীর সিং।

এসব কি ব্যাপার মিঃ রায়?—রণধীর প্রশ্ন করে।

কিরীটী বলে, হাত সাফাই করে হীরাচুরি ও জাল নোটের জন্য আপনাকে এরা গ্রেপ্তার করে এনেছে।

What do you mean! কি সব আবোলতাবোল বকছেন?

ছদ্মবেশ নিয়ে ভাঙা গলায় কথা বলে দয়ারামের চোখে ধুলো দিতে পারলেও কিরীটী রায়ের চোখে আপনি ধুলো দিতে পারেন নি মিঃ সিং! জাল নোটের গায়ে আপনার ফিংগার প্রিন্ট-ই সব প্রমাণ করে দেবে। তাছাড়া মধুমতী সব স্বীকার করেছে—আপনার পালিত কন্যা সে।

মিথ্যে কথা!

সত্য কি মিথ্যা আদালতেই তা প্রমাণ হবে। বাজারে যে আপনার অনেক দেনা আছে সেটা প্রমাণ যেমন দেরি হবে না তেমনি মধুমতীকে দিয়ে সঞ্জয়কুমারকে হাত করবার কথাটাও প্রকাশ হতে দেরি হবে না। তাছাড়া আপনি বোধহয় এখনও জানেন না যে, আপনার একান্ত সহচর দয়ারাম-পুত্র জনকলালকে already এ্যারেস্ট করা হয়েছে।

হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে রণধীর সিং, আমাকে জেলে দেবেন! তাই ভেবেছেন বুঝি? Fool! You are a fool —বলতে বলতে চট করে একটা ক্যাপসুল মুখে পুরে দিল সে। এবং মুখে পোরার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রাণহীন দেহটা মেঝের উপর পড়ে গেল।

ঘটনাটা এত চকিত ও আকস্মিক যে, কেউ বাধা দেবারও সময় পায় না।

মানুষ নয়

[১১১ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ও লোকটাকে তুমি এত আমল দাও কেন বল তো? ও কি একটা মানুষ নাকি?

বললাম, মানুষ নয় তো কী?

বন্ধু বললে, মানুষের মতন হাত-পা, বাস্ ওই পর্যন্ত। ও একটা গাধা।

বললাম, ধেৎ, তা কেন? আমার তো তা মনে হয় না। মনে হয়—লোকটা অপরাধের মধ্যে একটা অপরাধ করেছে—নির্বোধ মানুষ—বুঝেসুঝে চলতে পারেনি। তাই ছ'টা মেয়ের বাপ হয়েছে।

আমার বন্ধু হো হো করে হেসে উঠলো। বললে, বাপ আবার ও হলো কখন? ও তো বিয়েই করেনি।

বললাম, তবে যে বললে—আমার 'বিরৎ' সংসার, আমার ছ'টা মেয়ে—

বন্ধু বললে, তাও জানো না বুঝি! মেয়েগুলো ওর কেন হবে?

—তবে কার মেয়ে?

বন্ধু বললে, ওর পরিচিত একটা লোক থাকতো ভবানীপুরে। জগুবাবুর বাজারে সে গেঞ্জি বিক্রি করতো, আর তার পাশে বসে নরহরি বিক্রি করতো গামছা। সেই সূত্রে তাদের পরিচয়। যে গেঞ্জি বিক্রি করতো হঠাৎ তার একদিন হলো কলেরা। সেইদিনই সে মরে গেল। তার দিন-সাতেক পরে মলো তার স্ত্রী। তা মরলো তো মরলো তোর অত মাথাব্যথা কিসের? তুই যেমন তোর গামছার বোঝা নিয়ে চলে এলি শ্যামবাজারে, তেমনি চলে এলেই তো পারতিস! তা না—সেই লোকটার ছ'ছটা মেয়ের বোঝা নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে নিজের সুখ-সুবিধে সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে এখন ঠ্যালা সামলাচ্ছে! গাধা—গাধা—ভারবাহী গর্দভ ব্যাটা—বোকার একশেষ। ওর 'বিরৎ' সংসার না কচু!

ঝন্টু, বাচ্চু, রঞ্জন, মুকুল—সবাই হাঁ করে বসে রইলো।

কারও মুখে কোনও কথা নেই।

ঝুঁকোবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, গল্প হলো?

বাচ্চু বললে, হলো।

নন্টে
আর
ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ

পূজোর ছুটিতে স্কুল বোর্ডিংয়ে
ঐ কেকের স্টক থেকে গোটা কয়েক গ্যাঁড়াফাই করতে হবে ফন্টে!
কিন্তু কি করে সরাবি।
কেক

আমি ওকে কায়দা করে সরিয়ে আনবো, আর সেই ফাঁকে তুই সটাসট!
দারুণ আইডিয়া নন্টে!

একটু পরে
গুঁইদা! ওখানে তোমাকে কে যেন খুঁজছে।

কই, কেউ নেই তো। ছোঁড়ারা কোন মতলব ভাঁজেনি তো?

ঘরে এসে
যা ভেবেছি ঠিক তাই। ছটা কেক হাওয়া। নিশ্চয় নন্টে ফন্টের কম্ম। আমি সুপারিনটেণ্ডেন্টের কাছে এখনি জানাবো।

সুপারিনটেণ্ডেন্ট

স্যার! নন্টে আর ফন্টে আমার চোখে ধুলো দিয়ে একটু আগে ছ'টা কেক নিয়ে ভেগেছে।
সেকি!

শিগ্‌গির ওদের দুজনকে ডাকুন। চোখে ধুলো দিয়ে জিনিস নেওয়ার মজা দেখিয়ে দিচ্ছি।
আচ্ছা স্যার!

ছেলেদের ঘরে
নন্টে-ফন্টে চলো, সুপারিনটেণ্ডেন্টবাবু তোমাদের ডেকেছেন।

তোমরা ওর চোখে ধুলো দিয়েছো কেন?
না স্যার! ধুলো দিইনি তো!

এখনো ওর চোখ লাল হয়ে আছে—আর বলছ ধুলো দিইনি।
সত্যি-বলছি স্যার! ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন।

কি গুঁইবাবু! আপনার চোখে এরা ধুলো দিয়েছে তো?
আ-আজ্ঞে হ্যাঁ—তবে না—ঠিক—

কি হ্যাঁ-না-ঠিক বলছেন? কিসের ঠিক?

আজ্ঞে আমি ওতে অলঙ্কার ব্যবহার করেছিলাম তাই—
চোখে অলঙ্কার ব্যবহার করেছিলেন? সেটা আবার কেমন জিনিস? তাহলে ধুলো দিয়েছে বলছেন কেন?

চোখে নয় বাক্যে অলঙ্কার প্রয়োগ করে বলেছিলাম যে চোখে ধুলো দিয়েছে—সত্যিকার ধুলো নয়।
সেটা বলবেন তো, তা নয় খালি বাজে ব্যাজর ব্যাজর, যত্ত সব—

ঠিক আছে, আপনি যান। আর তোমাদের কেক সরানোর ব্যবস্থা পরে করছি।
সুপারিনটে

কিছুক্ষণ পরে
আমাকে দে!
আমাকেও একটু দিস!
আমাকে!
আমাকে!
ছেলেদের ঘরে এতো গোলমাল কিসের!

আমাকে!
আমাকে একটু!
আমাকে!
নিশ্চয়ই কেকের ভাগ নিয়ে হৈ চৈ হচ্ছে।

কি হচ্ছে সব? এতো হট্টগোল কিসের? হাতে ওটা কি?

একটা বই স্যার!
বই! পুজোর ছুটিতে বই পড়ার জন্যে এতো চেঁচামেচি। দেখি কি বই।

বাবু! একজন দেখা করবেন বলে অনেকক্ষণ বসে আছেন।

এই নাও। এই বইয়ের জন্যেই তোমাদের কেক চুরির অপরাধ ক্ষমা করে দিলুম।

ভাগ্যিস 'কিশোর ভারতী' ছিল, নইলে কি হতো বলতো?
যা বলেছিস। 'কিশোর ভারতীর' জন্যেই এবার রেহাই পেলাম।

[শেষ]

নূতন প্রভাত

রমেশচন্দ্র দত্ত

চৈত্র মাসের শেষভাগে একদিন সায়ংকালে পরাক্রান্ত মোঘল সেনাপতি সায়েস্তা খাঁ আপন অমাত্য ও মন্ত্রিগণকে আহবান করিয়া সভায় বসিয়াছেন। কিরূপে শিবজীকে পরাজয় করিবেন তাহারই পরামর্শ হইতেছিল। দাদাজী কানাইদেবের বাটীর মধ্যে সভাগৃহে এই সভা হইয়াছিল। চারিদিকে উজ্জ্বল দীপাবলী জ্বলিতেছে। জানালার ভিতর দিয়া সায়ংকালের শীতল বায়ু উদ্যানের পুষ্পগন্ধ বহিয়া আনিয়া সকলকে পুলকিত করিতেছে। আকাশ অন্ধকার, কেবল দুই একটি নক্ষত্র দেখা যাইতেছে।

আন্‌ওরী নামে সায়েস্তা খাঁর একজন চাটুকার বলিল,—আমিরের সেনার সম্মুখে মহারাষ্ট্রীয় সেনা যেন মহাবাত্যার সম্মুখে শুষ্ক পত্রের ন্যায় আকাশে উড়িয়া যাইবে, অথবা ভীত হইয়া পৃথিবীর ভিতরে প্রবেশ করিবে।

চাঁদ খাঁ নামক একজন প্রাচীন সেনা কয়েক বৎসর অবধি মহারাষ্ট্রীয়দিগের বল-বিক্রম দেখিয়াছিলেন; তিনি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,—আমি বোধ করি তাহাদের ঐ দুইটি ক্ষমতাই আছে।

সায়েস্তা খাঁ। কেন?

চাঁদ খাঁ। গত বৎসর কতিপয় পার্বতীয় মহারাষ্ট্রীয় যখন চাকন দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, আমাদের সমস্ত সৈন্য দুই মাস অবধি চেষ্টা করিয়া কিরূপে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দুর্গ জয় করিয়াছে, তাহা জাঁহাপনার স্মরণ আছে। একটি দুর্গ হস্তগত করিতে অনেক মোগলের প্রাণনাশ হইয়াছে। আবার এ বৎসর সর্বস্থানে আমাদের সৈন্য থাকাতেও নিতাইজী আসমান দিয়া আহম্মদনগর ও আরাঙ্গাবাদ পর্যন্ত উড়িয়া যাইয়া দেশ ছারখার করিয়া আসিয়াছে!

সায়েস্তা খাঁ। চাঁদ খাঁর বয়স অধিক হইয়াছে, তিনি এক্ষণে পর্বত-ইন্দুরকে ভয় করেন? পূর্বে তাঁহার এরূপ ভয় ছিল না।

চাঁদ খাঁর মুখমণ্ডল আরক্ত হইল, কিন্তু তিনি নিরুত্তর রহিলেন।

ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাস্য করিয়া......

আন্‌ওরী। জাঁহাপনা ঠিক আজ্ঞা করিয়াছেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা ইন্দুর বিশেষ, তাহারা যে পর্বত-ইন্দুরের ন্যায় গর্তে প্রবেশ করিয়া থাকিতে পারে, আমি অস্বীকার করি না।

চাঁদ খাঁ। পর্বত-ইন্দুর পুনার ভিতর গর্ত করিয়া বাহির না হইলে রক্ষা!

সায়েস্তা খাঁ। এখানে দিল্লীর সহস্র সহস্র নখায়ুধ বিড়াল আছে, ইন্দুরে সহসা কিছু করিতে পারিবে না।

সভাসদ্‌ সকলেই 'কেরামৎ', 'কেরামৎ' বলিয়া সেনাপতির এই বাক্যের অনুমোদন করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিষয়ে এইরূপ অনেক রহস্য হইলে পর কি প্রণালীতে যুদ্ধ হইবে তাহাই স্থির হইতে লাগিল। চাকন দুর্গ হস্তগত হওয়া অবধি সায়েস্তা খাঁ দুর্গ হস্তগত করা একেবারে দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—এই প্রদেশ দুর্গপরিপূর্ণ; যদি একে একে সমস্ত দুর্গ হস্তগত করিতে হয়, তবে কতদিনে যে দিল্লীশ্বরের কার্যসিদ্ধ হইবে, কখনও সিদ্ধ হইবে কিনা, তাহার স্থিরতা নাই।

চাঁদ খাঁ। জাঁহাপনা! দুর্গই মহারাষ্ট্রীয়দিগের বল, উহারা সম্মুখরণ করিবে না, অথবা রণে পরাস্ত হইলেও উহাদিগের ক্ষতি নাই। কেননা দেশ পর্বতময়, উহাদিগের সেনা এক স্থান হইতে পলায়ন করিয়া কোন্‌ দিক দিয়া অন্যস্থানে উপস্থিত হইবে, আমরা তাহার উদ্দেশ পাইব না। কিন্তু দুর্গগুলি একে একে হস্তগত করিতে পারিলে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে অবশ্যই দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে।

সায়েস্তা খাঁ। কেন? মহারাষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলে কি আমরা পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিব না? আমাদের কি অশ্বারোহী সেনা নাই, পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় সেনা ধ্বংস করিতে পারিবে না?

চাঁদ খাঁ। যুদ্ধ হইলে অবশ্যই মোগলের জয়, ধরিতে পারিলে আমরা মহারাষ্ট্রীয় সেনা বিনাশ করিব তাহার সংশয় নাই, কিন্তু এই পর্বতপ্রদেশে মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহীকে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ধরিতে পারে এমন অশ্বারোহী হিন্দুস্থানে নাই। আমাদের অশ্বগুলি বৃহৎ, অশ্বারোহী বর্মাবৃত ও বহু অস্ত্র-সমন্বিত, সমভূমিতে, সম্মুখক্ষেত্রে তাহাদের তেজ দুর্দমনীয়, তাহাদের গতি অপ্রতিহত, কিন্তু এই পর্বতপ্রদেশে তাহাদিগের যাতায়াতের ব্যাঘাত জন্মে। ক্ষুদ্র মহারাষ্ট্রীয় অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ যেন ছাগের ন্যায় তুঙ্গশৃঙ্গে লম্ফ দিয়া উঠে ও হরিণের ন্যায় উপত্যকা ও সুরাখের মধ্য দিয়ে পলায়ন করে। জাঁহাপনা, আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন। সিংহগড়ে শিবজী আছেন, সহসা সেই স্থান অবরোধ করুন, এক মাস কি দুই মাস কালের মধ্যে দুর্গজয় করিব, শিবজী বন্দী হইবেন, দিল্লীশ্বরের জয় হইবে। নচেৎ এ স্থানে মহারাষ্ট্রীয়দিগের জন্য অপেক্ষা করিলে কি হইবে? তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবনের চেষ্টা করিলেই বা কি হইবে? দেখুন নিতাইজী অনায়াসে আমাদের নিকট দিয়া যাইয়া আহম্মদনগর ও আরাঙ্গাবাদ ছারখার করিয়া আসিল, রুস্তম জমান তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কি করিল?

সায়েস্তা খাঁ সক্রোধে বলিলেন,—রুস্তম জমান বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে, ইচ্ছা করিয়া নিতাইজীকে পলাইতে দিয়াছে, আমি তাহার সমুচিত দণ্ড দিব। চাঁদ খাঁ, তুমিও সম্মুখযুদ্ধের বিরুদ্ধে পরামর্শ দিতেছ, দিল্লীশ্বরের সেনাগণের মধ্যে কি কেহই সাহসী নাই?

প্রাচীন যোদ্ধা চাঁদ খাঁর মুখমণ্ডল আবার আরক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া একবিন্দু অশ্রুজল মুছিয়া ফেলিলেন, পরে সেনাপতির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,—পরামর্শ দিতে পারি এরূপ সাধ্য নাই, সেনাপতি যুদ্ধের প্রণালী স্থির করুন, যেরূপ হুকুম হইবে, তামিল করিতে এ দাস পরাঙ্মুখ হইবে না।

এই সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সমাচার দিল যে, সিংহগড়ের দূত মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী নামক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, নীচে অপেক্ষা করিতেছেন। সায়েস্তা খাঁ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাকে সভাগৃহে আনিবার আজ্ঞা দিলেন। সভাস্থ সকলে এই দূতকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন।

ক্ষণেক পর মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। ন্যায়শাস্ত্রীর বয়স এখনও চত্বারিংশ বৎসর হয় নাই, অবয়ব মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় ঈষৎ খর্ব ও কৃষ্ণবর্ণ। ব্রাহ্মণের মুখমণ্ডল সুন্দর, বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহুযুগল দীর্ঘ, নয়ন গভীর বুদ্ধিব্যঞ্জক, ললাটে দীর্ঘ তিলক চন্দন, স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। শরীর তূলার কুর্তিতে আবৃত, সুতরাং গঠন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মস্তকে প্রকাণ্ড উষ্ণীষ, এরূপ প্রকাণ্ড যে বদনমণ্ডল যেন তাহার ছায়াতে আবৃত রহিয়াছে। সায়েস্তা খাঁ সাদরে দূতকে আহ্বান করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন।

সায়েস্তা খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন,—সিংহগড়ের সংবাদ কি?

মহাদেওজী একটি সংস্কৃত শ্লোক বলিলেন যাহার অর্থ ঃ দণ্ডকারণ্যে পঞ্চবটীবনে শত শত নদী আছে, কিন্তু তাহা দেখিয়া কি রাঘব সরযূ নদীর বিচ্ছেদ দুঃখ ভুলিতে পারেন? সিংহগড় প্রভৃতি শত শত দুর্গ এক্ষণও শিবজীর হস্তে আছে, কিন্তু পুনা আপনার হস্তগত, সে সন্তাপ কি তিনি ভুলিতে পারেন?

সায়েস্তা খাঁ পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন,—হাঁ, তোমার প্রভুকে বলিও, প্রধান দুর্গ আমি হস্তগত করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহার যুদ্ধ করা বিফল, দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিলে বরং এখনও আশা আছে।

ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাস্য করিয়া পুনরায় একটি সংস্কৃত শ্লোক বলিলেন ঃ চাতক কথা কহিয়া আপন অভিলাষ মেঘকে জানাইতে পারে না, কিন্তু মেঘ সেই অভিলাষ বুঝিয়া আপনার দয়াবশতঃই তাহা পূর্ণ করে। মহজ্জনের যাচককে দিবার এইরূপ রীতি। প্রভু শিবজী এক্ষণে পুনা ও চাকন হারাইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিতেও লজ্জা বোধ করেন, কিন্তু ভবাদৃশ মহল্লোক তাঁহার মনের অভিলাষ জানিয়া অনুগ্রহ করিয়া যাহা দান করিবেন তাহাই শিরোধার্য।

সায়েস্তা খাঁ আনন্দ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন,—পণ্ডিতজী, তোমার পাণ্ডিত্যে আমি যে কতদূর পরিতুষ্ট হইলাম বলিতে পারি না, তোমাদিগের সংস্কৃত ভাষা কি সুমধুর ও ভাবপরিপূর্ণ। যথার্থই কি শিবজী সন্ধির ইচ্ছা করিতেছেন?

মহাদেওজী বলিলেন,—দিল্লীশ্বরের সৈন্যের দোর্দণ্ড প্রতাপে বিপর্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া আমরা কেবল ত্রাহি ত্রাহি এই শব্দ করিতেছি।

সায়েস্তা খাঁ এবার আহ্লাদ সংবরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন,—ব্রাহ্মণ? আপনার শাস্ত্রালোচনায় সন্তুষ্ট হইলাম, এক্ষণে যদি সন্ধির কথাই বলিতে আসিয়া থাকেন তবে শিবজী যে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার নিদর্শন কৈ?

ব্রাহ্মণ তখন গম্ভীরভাবে বস্ত্রের ভিতর হইতে নিদর্শনপত্র বাহির করিলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সায়েস্তা খাঁ সেইটি দেখিলেন পরে বলিলেন,—হাঁ, নিদর্শনপত্র দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে কি কি প্রস্তাব করিবার আছে বলুন।

মহাদেওজী। প্রভুর এইরূপ আজ্ঞা যে যখন প্রথমেই আপনাদিগের জয় হইয়াছে, তখন আর যুদ্ধ করা বৃথা।

সায়েস্তা খাঁ। ভাল।

মহাদেওজী। সুতরাং সন্ধির জন্য তিনি উৎসুক হইয়াছেন।

সায়েস্তা খাঁ। ভাল।

মহাদেওজী। এক্ষণে কি কি নিয়মে দিল্লীশ্বর সন্ধি করিতে সম্মত হইবেন তাহা জানিতে তিনি উৎসুক। জানিলে অবশ্য সেগুলি পালন করিতে যত্নবান হইবেন।

সায়েস্তা খাঁ। প্রথম দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার। তাহাতে আপনার প্রভু স্বীকৃত আছেন?

মহাদেওজী। তাঁহার সম্মতি বা অসম্মতি জানাইবার আমার অধিকার নাই। মহাশয় যে যে কথাগুলি বলিবেন তাহাই আমি তাঁহার নিকট জানাইব, তিনি সেইগুলি বিবেচনা করিয়া সম্মতি অসম্মতি পরে প্রকাশ করিবেন।

সায়েস্তা খাঁ। ভাল, প্রথম কথা আমি বলিয়াছি, দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার। দ্বিতীয়, দিল্লীশ্বরের সেনা যে যে দুর্গ হস্তগত করিয়াছে তাহা দিল্লীশ্বরেরই থাকিবে। তৃতীয়, সিংহগড় প্রভৃতি আরও কয়েকটি দুর্গ তোমরা ছাড়িয়া দিবে।

মহাদেওজী। সে কোন্ কোন্‌টি?

সায়েস্তা খাঁ। তাহা দুই একদিনের মধ্যে পত্র দ্বারা জানাইব। চতুর্থ, অবশিষ্ট যে যে দুর্গ ও দেশ শিবজী আপন অধীনে রাখিবেন তাহাও দিল্লীশ্বরের অধীনে জায়গীরস্বরূপ ভোগ করিবেন, তাহার জন্য কর দিতে হইবে। এইগুলি তোমার প্রভুকে জানাইও, ইহাতে তিনি সম্মত কি অসম্মত তাহা যেন আমি দুই-চারি দিনের মধ্যে জানিতে পারি।

মহাদেওজী। যেরূপ আদেশ করিলেন সেইরূপ করিব। এক্ষণে যখন সন্ধির প্রস্তাব হইতেছে, তখন যতদিন সন্ধি স্থাপন না হয় ততদিন যুদ্ধ ক্ষান্ত থাকিতে পারে?

সায়েস্তা খাঁ। কদাচ নহে। ধূর্ত কপটাচারী মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আমি কদাচ বিশ্বাস করি না, এমত ধূর্ততা নাই যে তাহাদিগের অসাধ্য। যতদিন সন্ধি একেবারে স্থাপন না হয় ততদিন যুদ্ধ চলিবে, আমরা তোমাদিগের অনিষ্ট করিব, তোমরা পার, আমাদিগের অনিষ্ট করিও।

"এবমস্তু" বলিয়া ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতেছিল।

তিনি ধীরে ধীরে প্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

প্রত্যেক দ্বার, প্রত্যেক ঘর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। একজন মোগল প্রহরী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—দূত মহাশয়, কি দেখিতেছেন?

দূত উত্তর করিলেন,—এই গৃহে প্রভু শিবজী বাল্যকালে ক্রীড়া করিতেন তাহাই দেখিতেছি। এটিও তোমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, বোধ হয় একে একে সমস্ত দুর্গগুলিই তোমরা লইবে। হা ভগবান!

প্রহরী হাস্য করিয়া বলিল,—সেজন্য আর বৃথা খেদ করিলে কি হইবে, আপন কার্যে যাও।

ব্রাহ্মণ শীঘ্রই বহু জনাকীর্ণ পুনানগরীর লোকের মধ্যে মিশিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণ একে একে পুনার বহু পথ অতিবাহন করিলেন, যে যে স্থান দিয়া যাইতে লাগিলেন সেই সেই স্থান বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দুই একটি দোকানে দ্রব্য ক্রয়ের ছলে প্রবেশ করিয়া কথায় কথায় নানা বিষয় জানিলেন, পরে বাজার পার হইয়া গেলেন। প্রশস্ত রাজপথ হইতে একটি গলিতে প্রবেশ করিলেন, সেখানে রজনীতে দীপ সমস্ত নির্বাণ হইয়াছে, নাগরিক সকলে দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিজ নিজ আলয়ে সুপ্ত।

ব্রাহ্মণ একাকী অনেক দূরে যাইলেন। আকাশ অন্ধকারময়, কেবল দুই একটি তারা দেখা যাইতেছে, নাগরিক সকলে সুপ্ত, জগৎ নিস্তব্ধ। ব্রাহ্মণের মনে সন্দেহ হইল, তাহার বোধ হইল যেন পশ্চাতে তিনি পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। স্থির হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, কিন্তু সে পদশব্দ আর শুনিতে পাইলেন না।

পুনরায় পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন, ক্ষণেক পরে পুনরায় বোধ হইল যেন পশ্চাতে কে অনুসরণ করিতেছে। ব্রাহ্মণের হৃদয় ঈষৎ চঞ্চল হইল। এই গভীর নিশীথে কে তাহার অনুসরণ করিতেছে? শত্রু না মিত্র? শত্রু হইলে কি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে? আবেগ-পরিপূর্ণ হৃদয়ে ক্ষণেক চিন্তা করিলেন, পরে নিঃশব্দে তুলা-নির্মিত কুর্তির আস্তিনের ভিতর হইতে একখানি তীক্ষ্ম ছুরিকা বাহির করিলেন, একটি পথের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। গভীর অন্ধকারের দিকে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন, কৈ কেহই নাই, সকলে সুপ্ত, নগর শব্দশূন্য ও নিস্তব্ধ!

সন্দিগ্ধমনা ব্রাহ্মণ পুনরায় আলোকপূর্ণ বাজারে ফিরিয়া গেলেন। তথায় অনেক দোকান, নানা জাতীয় বিস্তর লোক এখনও ক্রয় বিক্রয় করিতেছে, তাহার ভিতর মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। আবার তথা হইতে সহসা এক গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন, পরে দ্রুতবেগে অন্যান্য গলির ভিতর দিয়া নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তথায় নিঃশব্দে অনেকক্ষণ শ্বাস-রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, শব্দমাত্র নাই, চারিদিকে পথ, ঘাট, কুটির, অট্টালিকা সমস্ত নিস্তব্ধ, নৈশ গগন গভীর দুর্ভেদ্য অন্ধকার দ্বারা সমস্ত জগৎকে আবৃত করিয়াছে। সহসা একটি চীৎকার শব্দ শ্রুত হইল, ব্রাহ্মণের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, তিনি নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন।

ক্ষণেক পর আবার সেই শব্দ হইল, মহাদেওজীর ভয় দূর হইল, সে নাগরিক প্রহরী, পাহারা দিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে মহাদেও যে গলিতে লুক্কায়িত ছিলেন সেই গলিতেই প্রহরী আসিল। গলি অতি সংকীর্ণ, মহাদেওজী পুনরায় সেই ছুরিকা হস্তে লইয়া দুর্ভেদ্য অন্ধকারে দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রহরী ধীরে ধীরে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে সেই স্থানে আসিল মহাদেও যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন সেই দিকে চাহিল। মহাদেওজীর হৃদয় দুরু দুরু করিতে লাগিল, তিনি শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হস্তে সেই ছুরিকা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রহরী অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইল না, ধীরে ধীরে সে পথ হইতে চলিয়া গেল। মহাদেও ধীরে ধীরে তথা হইতে বাহির হইয়া ললাটের স্বেদ মোচন করিলেন।

পরে নিকটবর্তী একটি দ্বারে আঘাত করিলেন, সায়েস্তা খাঁর একজন মহারাষ্ট্রীয় সেনা বাহির হইয়া আসিল। দুইজনে অতি সঙ্গোপনে নগরের মধ্যে অতি গোপনীয় ও মনুষ্যের অগম্য স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় দুইজনে উপবেশন করিলেন।

ব্রাহ্মণ। সমস্ত প্রস্তুত?

সেনা। প্রস্তুত।

ব্রাহ্মণ। অনুমতিপত্র পাইয়াছ?

সেনা। পাইয়াছি।

আবার অস্পষ্ট পদশব্দ শ্রুত হইল। মহাদেওজী এবার ক্রোধে আরক্ত নয়ন হইয়া ছুরিকা হস্তে সম্মুখে যাইয়া দেখিলেন। অন্ধকারে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, কিছুমাত্র দেখিতে পাইলেন না, ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পরে সেনাকে বলিলেন,—রিক্ত হস্তে আসিয়াছ?

সেনা বক্ষঃস্থল হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া

দেখাইল। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—ভাল, সতর্ক থাকিও! বিবাহ কবে?

সেনা। কল্য।

ব্রাহ্মণ। অনুমতি পাইয়াছ?

সেনা। হ্যাঁ।

ব্রাহ্মণ। কতজন লোকের?

সেনা। বাদ্যকর দশ জন, ও অস্ত্রধারী ত্রিশ জন, ইহার অধিক অনুমতি পাইলাম না।

ব্রাহ্মণ। এই যথেষ্ট, কোন্ সময়ে?

সেনা। রজনী এক প্রহর।

ব্রাহ্মণ। ভাল, এই দিক হইতে বরযাত্রা আরম্ভ হইবে।

সেনা। স্মরণ আছে।

ব্রাহ্মণ। বাদ্যকরেরা সজোরে বাদ্য করিবে।

সেনা। স্মরণ আছে।

ব্রাহ্মণ। জ্ঞাতি কুটুম্ব যত পারিবে জড় করিবে।

সেনা। স্মরণ আছে।

ব্রাহ্মণ তখন অল্প হাস্য করিয়া বলিলেন,—আমি সেই শুভকার্যের পুরোহিত। সে শুভকার্যের ঘটা সমস্ত ভারতবর্ষে রাষ্ট্র হইবে।

সহসা সজোরে নিক্ষিপ্ত একটি তীর আসিয়া ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থলে লাগিল। সে তীরে প্রাণনাশ নিশ্চয় সম্ভব, কিন্তু ব্রাহ্মণের কুর্তির নীচে লৌহ-বর্মে লাগিয়া তীর পড়িয়া গেল!

তারপরেই একটি বর্শা। বর্শার আঘাতে ব্রাহ্মণ ভূমিতে পতিত হইলেন, কিন্তু সে দুর্ভেদ্য বর্ম ভিন্ন হইল না, মহাদেও পুনরায় উঠিলেন। সম্মুখে দেখিলেন, নিষ্কোষিত অসি হস্তে একজন দীর্ঘ মোগল যোদ্ধা,—তিনি চাঁদ খাঁ।

অদ্য সভাতে সেনাপতি সায়েস্তা খাঁ চাঁদ খাঁকে ভীরু বলিয়াছেন। যুদ্ধব্যবসায়ে চাঁদ খাঁর কেশ শুক্ল হইয়াছিল, এ অপবাদ কেহ তাহাকে কখনও দেয় নাই। মনে মর্মান্তিক বেদনা পাইয়াছিলেন, অন্যকে তাহা কি জানাইবেন, মনে মনে স্থির করিলেন, কার্য দ্বারা এ অপবাদ দূর করিব, নচেৎ এই যুদ্ধেই এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণ ত্যাগ করিব।

ব্রাহ্মণের আচরণ দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি শিবজীকে বিশেষ করিয়া জানিতেন। শিবজীর অসাধারণ ক্ষমতা, তাঁহার বহুসংখ্যক দুর্গ, তাঁহার অপূর্ব ও দ্রুতগামী অশ্বারোহী সেনা, তাঁহার হিন্দু ধর্মে আস্থা, হিন্দুরাজ্য স্থাপনে অভিলাষ, হিন্দু-স্বাধীনতা স্থাপনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এ সমস্ত চাঁদ খাঁর অগোচর ছিল না। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ-প্রারম্ভেই যে শিবজী পরাজয় স্বীকার ও সন্ধি যাচ্ঞা করিবেন এরূপ সম্ভব নহে, তথাপি এ ব্রাহ্মণ শিবজীর নিদর্শন-পত্র দেখাইয়াছে। এ ব্রাহ্মণ কে? ইহার গুপ্ত অভি-সন্ধিই বা কি?

ব্রাহ্মণের কথাগুলিতেও চাঁদ খাঁর সন্দেহ জন্মিয়াছিল, মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিন্দা শুনিয়া যখন ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্বলিত হয় তাহাও তিনি দেখিয়াছিলেন। এ সমস্ত সন্দেহের কথা সায়েস্তা খাঁর নিকট বলেন নাই, সত্য বলিয়া কেন আবার তিরস্কার সহ্য করিবেন? কিন্তু মনে মনে স্থির করিলেন, এই ভণ্ড দূতকে ধরিব। সেই অবধি দূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন, পথে পথে, গলিতে গলিতে, অদৃশ্য ভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন। মুহূর্তের জন্যও ব্রাহ্মণ চাঁদ খাঁর নয়ন-বহির্ভূত হইতে পারেন নাই।

সেনার সহিত ব্রাহ্মণের যে কথা হয় তাহা শুনিলেন। তীক্ষ্নবুদ্ধি যোদ্ধা তখনই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, এই দূতকে বিনাশ করিয়া সেনাকে সেনাপতিসদনে লইয়া যাইয়া প্রতিপত্তি লাভের সংকল্প করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন—সায়েস্তা খাঁ! যুদ্ধব্যবসায়ে বৃথা এ কেশ শুক্ল করি নাই, আমি ভীরুও নহি, দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধাচারীও নহি। অদ্য যে ষড়যন্ত্রটি ধরিয়া প্রকাশ করিয়া দিব, তাহার পর বোধ হয় এ প্রাচীন দাসের কথা তুমি অবহেলা করিবে না।

কিন্তু আশা মায়াবিনী!

মহাদেওজী ভূমি হইতে উঠিতে না উঠিতে চাঁদ খাঁ তীর ও বর্শা ব্যর্থ দেখিয়া লম্ফ দিয়া তাহার উপর আসিয়া পড়িলেন ও খড়্গ দ্বারা সজোরে আঘাত করিলেন। খড়্গ বর্মে লাগিয়া সেবারও প্রতিহত হইল।

"কুক্ষণে আমার অনুসরণ করিয়াছিলে,"—এই বলিয়া মহাদেওজী আপন আস্তিন গুটাইয়া তীক্ষ্ন ছুরিকা আকাশের দিকে উত্তোলন করিলেন। নিমেষমধ্যে বজ্রমুষ্টি চাঁদ খাঁর বক্ষঃস্থলে অবতীর্ণ হইল, চাঁদ খাঁর মৃতদেহ ধরাতলশায়ী হইল।

ব্রাহ্মণ সূক্ষ্ম অধরোষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল। ধীরে ধীরে সেই ছুরিকা পুনরায় লুকাইয়া বলিলেন,—সায়েস্তা খাঁ! মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিন্দা করার এই প্রথম ফল, ভবানীর কল্যাণে দ্বিতীয় ফল কল্য ফলিবে।

মহাদেওজী তীক্ষ্ন ছুরিকা আকাশের দিকে উত্তোলন করিলেন।

যোদ্ধার কর্তব্য কার্যে যে সময়ে চাঁদ খাঁ জীবন দান করিলেন, সেনাপতি সায়েস্তা খাঁ সে সময়ে বড় সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন, শিবজীকে বশীকরণ বিষয়ে সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছিলেন!

মহারাষ্ট্রীয় সেনা এই সমস্ত ব্যাপারে বিস্মিত হইয়া বলিল,—প্রভু কি করিলেন? কল্য এ বিষয়ে গোল হইবে, আমাদের সমুদয় সংকল্প বৃথা হইবে।

ব্রাহ্মণ। কিছুমাত্র বৃথা হইবে না। আমি জানিয়াছি চাঁদ খাঁ অদ্য সভায় অপমানিত হইয়াছেন, এখন কয়েকদিন সভায় না যাইলেও কেহ সন্দেহ করিবে না। এই মৃতদেহ ঐ গভীর কূপে নিক্ষেপ কর, আর স্মরণ রাখিও, কল্য রজনী এক প্রহরকালে।

সেনা। রজনী এক প্রহরকালে।

ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে পুনানগর ত্যাগ করিলেন। তিন চারি স্থানে প্রহরিগণ তাঁহাকে ধরিল, তিনি সায়েস্তা খাঁর স্বাক্ষরিত অনুমতিপত্র দেখাইয়া নিরাপদে পুনা হইতে বহির্গত হইলেন।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় রাজপুত রাজা যশোবন্ত সিংহ একাকী শিবিরে বসিয়া রহিয়াছেন। হস্তে গণ্ড-স্থল স্থাপন করিয়া এই গভীর নিশীথেও তিনি কি চিন্তা করিতেছেন। সম্মুখে কেবল একটিমাত্র দীপ জ্বলিতেছে, শিবিরে অন্য লোকমাত্র নাই। সংবাদ আসিল মহারাষ্ট্রীয় দূত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। যশোবন্ত তাঁহাকে আনয়ন করিতে কহিলেন, তাঁহারই জন্য তিনি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী শিবিরে আসিলেন, যশোবন্ত তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন। উভয়ে উপবেশন করিলেন।

ক্ষণেক যশোবন্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, কি চিন্তা করিতেছিলেন। মহাদেও নিঃশব্দে রাজপুতের দিকে সুতীক্ষ্ন দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। পরে যশোবন্ত বলিলেন,—আমি আপনার প্রভুর পত্র পাইয়াছি। তাহাতে যাহা লিখিত আছে অবগত হইয়াছি, তাহা ভিন্ন অন্য কোন প্রস্তাব আছে?

মহাদেও। প্রভু আমাকে কোন প্রস্তাব করিতে পাঠান নাই, খেদ করিতে পাঠাইয়াছেন।

যশোবন্ত। কেবল পুনা ও চাকন দুর্গ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে মাত্র, এইজন্য খেদ?

মহাদেও। দুর্গনাশে তিনি ক্ষুব্ধ নহেন, তাঁহার অসংখ্য দুর্গ আছে।

যশোবন্ত। মোগল-যুদ্ধস্বরূপ বিপদে পড়িয়া তিনি খেদ করিতেছেন?

মহাদেও। বিপদে পড়িলে খেদ করা তাঁহার অভ্যাস নাই।

যশোবন্ত। তবে কি জন্য খেদ করিতেছেন?

মহাদেও। যিনি হিন্দুরাজ-তিলক, যিনি ক্ষত্রিয়-কুলাবতংশ, যিনি সনাতন ধর্মের রক্ষাকর্তা, তাঁহাকে অদ্য ম্লেচ্ছের দাস দেখিয়া প্রভু ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।

যশোবন্তের মুখমণ্ডল ঈষৎ আরক্ত হইল। মহাদেও তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না, গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন,—উদয়পুরের রাণার বংশে যিনি বিবাহ করিয়াছেন, মাড়ওয়ারের রাজচ্ছত্র যাঁহার মস্তকের উপর

ধৃত হইয়াছে, রাজস্থান যাঁহার সুখ্যাতিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সিপ্রাতীরে যাঁহার বাহুবিক্রম দেখিয়া আরংজীব ভীত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষ যাঁহাকে সনাতন হিন্দু ধর্মের স্তম্ভস্বরূপ জ্ঞান করে, দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, মন্দিরে মন্দিরে, যাঁহার জয়ের জন্য হিন্দু মাত্রেই, ব্রাহ্মণ মাত্রেই জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, অদ্য তাঁহাকে মোগলদের পক্ষ হইয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া প্রভু ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। রাজন্! আমি সামান্য দূতমাত্র, আমি কি বলিতেছি জানি না, অপরাধ হইলে মার্জনা করিবেন, কিন্তু এ যুদ্ধসজ্জা কেন? এ সৈন্যসামন্ত কেন? এ সমস্ত বিজয় পতাকা কি জন্য উড্ডীন হইতেছে? স্বাধিকার বৃদ্ধি করিবার জন্য? হিন্দু-স্বাধীনতা স্থাপন করিবার জন্য? ক্ষত্রিয়োচিত যশোলাভের জন্য? আপনি ক্ষত্রকুলর্ষভ! আপনি বিবেচনা করুন, আমি জানি না।

যশোবন্ত অধোবদনে রহিলেন। মহাদেও আরও বলিতে লাগিলেন,—আপনি রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়েরা রাজপুত-পুত্র, পিতাপুত্রে যুদ্ধ সম্ভবে না, স্বয়ং ভবানী এ যুদ্ধ নিষেধ করিয়াছেন। আপনি আজ্ঞা করুন আমরা পালন করিব। রাজপুতের গৌরবই অনাথ ভারতবর্ষের একমাত্র গৌরব, রাজপুতের যশোগীত আমাদিগের রমণীগণ এখনও গাহিয়া থাকে, রাজপুতদিগের উদাহরণ দেখিয়া আমাদিগের বালকগণ শিক্ষিত হয়। ক্ষত্রকুলতিলক! রাজপুত-শোণিতে আমাদিগের খড়্গ রঞ্জিত হইবার পূর্বে যেন মহারাষ্ট্র নাম বিলুপ্ত হয়, রাজ্য বিলুপ্ত হয়, আমরা যেন বর্শা ও খড়্গ ত্যাগ করিয়া পুনরায় লাঙ্গল ধারণ করিতে শিখি।

যশোবন্ত সিংহ তখন নয়ন উঠাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—দূতপ্রধান! তোমার কথাগুলি বড় মিষ্ট, কিন্তু আমি দিল্লীশ্বরের অধীন, মহারাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ করিব বলিয়া আসিয়াছি, মহারাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ করিব।

মহাদেও। এবং শত শত স্বধর্মীকে নাশ করিবেন, হিন্দু হিন্দুর মস্তক ছেদন করিবে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের বক্ষে ছুরিকা বসাইবে, ক্ষত্রিয়ের শোণিতস্রোতে ক্ষত্রিয় শোণিতস্রোত মিশাইবে, শেষে ম্লেচ্ছ সম্রাটের সম্পূর্ণ জয় হইবে!

যশোবন্তের মুখ আরক্ত হইল, কিন্তু উদ্বেগ সম্বরণ করিয়া কিঞ্চিৎ কর্কশভাবে বলিলেন,—কেবল দিল্লীশ্বরের জয়ের জন্য যুদ্ধ নহে, আমি তোমার প্রভুর সহিত কিরূপে মিত্রতা করিব? শিবজী বিদ্রোহাচারী, চতুর শিবজী অদ্যকার অংগীকার অনায়াসে কল্য ভংগ করে।

এবার ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্বলিত হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—মহারাজ! সাবধান, অলীক নিন্দা আপনার সাজে না। শিবজী কবে হিন্দুর নিকট যে বাক্য দান করিয়াছেন তাহার অন্যথা করিয়াছেন? কবে ব্রাহ্মণের নিকট যে পণ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়ের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন? দেশে শত শত গ্রাম, শত শত দেবালয় আছে, অনুসন্ধান করুন, শিবজী সত্য পালন করিতে, ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দিতে, হিন্দুর উপকার করিতে, গোবৎসাদি রক্ষা করিতে, দেবদেবীর পূজা দিতে কবে পরাঙ্মুখ? তবে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ! জেতা ও বিজিতদিগের মধ্যে কবে কোন্ দেশে সখ্য? বজ্রনখ যখন সর্পকে ধারণ করে, সর্প সে সময় মৃতবৎ হইয়া থাকে। মৃত বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবামাত্র জর্জরিত-শরীর নাগরাজ সময় পাইয়া দংশন করে। এটি বিদ্রোহাচরণ, না স্বভাবের রীতি? কুক্কুর যখন খরগোসকে ধরিবার চেষ্টা করে, খরগোস প্রাণ রক্ষার জন্য কত যত্ন করে, একদিকে পলাইবার উদ্যোগ করিয়া সহসা অন্যদিকে যায়। এটি চাতুরী, না স্বভাবের রীতি? যাবতীয় জীবজন্তুকে জগদীশ্বর যে প্রাণ রক্ষার যত্ন ও উপায় শিখাইয়াছেন, মনুষ্যকে কি তিনি সে উপায় শিখান নাই? আমাদিগের প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন স্বরূপ স্বাধীনতা যে বিজাতীয়েরা শত শত বৎসর অবধি হরণ করিয়াছে, হৃদয়ের শোণিত স্বরূপ বল, মান, দেশ গৌরব ও ধর্ম বিনাশ করিতেছে, তাহাদিগের সহিত আমাদিগের সখ্য ও সত্য সম্বন্ধ? তাহাদিগের নিকট হইতে যে উপায়ে সেই জীবনস্বরূপ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারি, স্বধর্ম ও জাতি-গৌরব রক্ষা করিতে পারি, সে উপায় কি চতুরতা, সে উপায় কি নিন্দনীয়? জীবন রক্ষার্থ পলায়নপটু মৃগের শীঘ্রগতি কি বিদ্রোহ? শাবককে বাঁচাইবার জন্য পক্ষী যে অপহারককে অন্য দিকে লইয়া যাইতে যত্ন করে সে কি নিন্দনীয়? ক্ষত্রিয়রাজ! দিনে দিনে, মোঘলদিগের নিকট মহারাষ্ট্রীয় চতুরতার নিন্দা শুনিতে পাই, কিন্তু হিন্দু প্রবর! আপনি হিন্দু-জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়কে নিন্দা করিবেন না, শিবজীকে নিন্দা করিবেন না।—মহাদেওজীর জ্বলন্ত নয়নদ্বয় অশ্রুজলে প্লাবিত

হইল।

ব্রাহ্মণের চক্ষে জল দেখিয়া যশোবন্ত হৃদয়ে বেদনা পাইলেন। বলিলেন,—দূতপ্রবর! আমি আপনাকে কষ্ট দিতে চাহি না, যদি অন্যায় বলিয়া থাকি মার্জনা করিবেন। আমি কেবল এইমাত্র বলিতেছিলাম যে, রাজপুতগণও স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে, কিন্তু তাহারা সাহস ও সম্মুখ-রণ ভিন্ন অন্য উপায় জানে না। মহারাষ্ট্রীয়েরাও কি সেই উপায় অবলম্বন করিয়া সেইরূপ ফললাভ করিতে পারে না?

মহাদেও। মহারাজ! রাজপুতদিগের পুরাতন স্বাধীনতা আছে, বিপুল অর্থ আছে, দুর্গম পর্বত বা মরুবেষ্টিত দেশ আছে, সুন্দর রাজধানী আছে, সহস্র বৎসরের অপূর্ব রণশিক্ষা আছে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের ইহার কোন্‌টি আছে? তাহারা দরিদ্র, তাহারা চিরপরাধীন, তাহাদের এই প্রথম রণশিক্ষা। আপনাদিগের দেশ আক্রমণ করিলে আপনারা পুরাতন রীত্যনুসারে যুদ্ধ দেন, পুরাতন দুর্ধর্ষ তেজ ও বিক্রম প্রকাশ করেন, অসংখ্য রাজপুত সেনার সম্মুখে দিল্লীশ্বরের সেনা পলায়ন করে। আমাদিগের দেশ আক্রমণ করিলে আমরা কি করিব? পূর্বরীতি বা রণশিক্ষা নাই, অসংখ্য সৈন্য নাই, যাহারা আছে তাহারা কখনও রণ দেখে নাই। যখন দিল্লীশ্বর কাবুল, পাঞ্জাব, অযোধ্যা, বিহার, মালয়, বীর-প্রসবিনী রাজস্থানভূমি হইতে সহস্র সহস্র পুরাতন রণদর্শী যোদ্ধা প্রেরণ করেন, যখন অপরূপ বৃহৎ ও অনিবার্য রণ-অশ্ব ও রণ-গজ প্রেরণ করেন, যখন তাঁহার কামান, বন্দুক, বারুদ, গোলা, রৌপ্যমুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রা সহস্র সহস্র শকটে আনিয়া রাশীকৃত করেন, তখন দরিদ্র মহারাষ্ট্রীয়েরা কি করিবে? তাহাদিগের সেরূপ অসংখ্য যুদ্ধদর্শী সেনা নাই, সেরূপ অশ্ব গজ নাই, সেরূপ বিপুল অর্থ নাই। ত্বরিৎগতি ও পর্বতযুদ্ধ ভিন্ন তাহাদিগের আর কি উপায় আছে? ক্ষত্রিয়রাজ! জীবন-প্রারম্ভে দরিদ্রজাতির এইরূপ আচরণ ভিন্ন উপায় নাই। জগদীশ্বর করুন মহারাষ্ট্রীয় জাতি দীর্ঘজীবী হউক, তাহাদিগের অর্থ ও যুদ্ধা-য়োজনের উপায় সংস্থান হইলে, দুই তিন শত বৎসরের রণশিক্ষা হইলে, তাহারাও রাজপুতের অসাধারণ গুণ অনুকরণ করিবে।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া যশোবন্ত চিন্তায় অভিভূত হইয়া রহিলেন, হস্তে ললাট স্থাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহাদেও দেখিলেন তাহার বাক্যগুলি নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই, আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—আপনি হিন্দুশ্রেষ্ঠ, হিন্দু-গৌরব-সাধনে সন্দেহ করিতেছেন কেন? হিন্দুধর্মের জয় অবশ্যই আপনি ইচ্ছা করেন, শিবজীরও ইহা ভিন্ন অন্য ইচ্ছা নাই। মোগল-শাসন ধ্বংসকরণ, হিন্দু-জাতির গৌরবসাধন, স্থানে স্থানে দেবালয় স্থাপন, সনাতন ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি, হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা, ব্রাহ্মণকে আশ্রয়দান, গোবৎসাদি রক্ষা করণ, ইহা ভিন্ন শিবজীর অন্য উদ্দেশ্য নাই। এই বিষয়ে যদি তাঁহাকে সাহায্য করিতে বিমুখ হয়েন, তবে স্বহস্তে এই কার্য-সাধন করুন। আপনি এই দেশের রাজত্ব গ্রহণ করুন, মোগলদিগকে পরাস্ত করুন, মহারাষ্ট্রে হিন্দু-স্বাধীনতা স্থাপন করুন। আদেশ করুন দুর্গের দ্বার এইক্ষণেই উদ্ঘাটিত হইবে, প্রজারা আপনাকে কর দিবে, আপনি শিবজী অপেক্ষা সহস্রগুণ বলবান, সহস্রগুণ দূরদর্শী, সহস্রগুণ উপযুক্ত, শিবজী সন্তুষ্টচিত্তে আপনার একজন সেনাপতি হইয়া মোগলদিগের ধ্বংসসাধন করিবেন। তাঁহার অন্য বাসনা নাই।

এই প্রস্তাবে উচ্চাভিলাষী যশোবন্তের নয়ন যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, কিন্তু অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেন,—মাড়ওয়ার ও মহারাষ্ট্র অনেক দূর, এক রাজার অধীনে থাকিতে পারে না।

মহাদেও। তবে আপনার উপযুক্ত পুত্র থাকিলে তাঁহাকেই এই রাজ্য দিন, নচেৎ কোন আত্মীয় যোদ্ধাকে দিন। শিবজী ক্ষত্রিয় রাজার অধীনে কার্য করিবে, কিন্তু কদাচ ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করিবে না।

যশোবন্ত। এই বিপদকালে আরংজীবের সহিত যুদ্ধ করিয়া এদেশ রাখিতে পারিবে এমত আত্মীয় নাই।

মহাদেও। কোন ক্ষত্রিয় সেনাপতিকে নিযুক্ত করুন। হিন্দুধর্ম ও স্বাধীনতা রক্ষা হইলে শিবজীর মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, শিবজী সানন্দচিত্তে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন।

যশোবন্ত। সেরূপ সেনাপতিও নাই।

মহাদেও। তবে যিনি এই মহৎ কার্যসাধন করিতে পারিবেন, তাঁহাকে সাহায্য করুন। আপনার সাহায্যে, আপনার আশীর্বাদে, শিবজী অবশ্যই স্বদেশ ও স্বধর্মের গৌরবসাধন করিতে পারিবেন। ক্ষত্রিয়রাজ! ক্ষত্রিয় যোদ্ধাকে সহায়তা করুন, ভারতবর্ষে এরূপ হিন্দু নাই, আকাশে এরূপ দেবতা নাই, যিনি এজন্য আপনাকে প্রশংসাবাদ না করিবেন।

যশোবন্ত। দ্বিজবর, তোমার তর্ক অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু দিল্লীশ্বর আমাকে স্নেহ করিয়া এই কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি কিরূপে অন্যরূপ আচরণ করিব? সে কি ভদ্রোচিত?

মহাদেও। দিল্লীশ্বর যে হিন্দুগণকে কাফের বলিয়া জিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছেন, সে কার্য কি ভদ্রোচিত? দেশে দেশে যে হিন্দু মন্দির, হিন্দু দেব-দেবীর অবমাননা করিতেছেন, সে কি ভদ্রোচিত? কাশীর পবিত্র মন্দির চূর্ণ করিয়া তাহার প্রস্তর দ্বারা সেই পুণ্যধামে মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছেন, সে কি ভদ্রোচিত?

ক্রোধকম্পিতস্বরে যশোবন্ত বলিলেন,—দ্বিজবর! আর বলিবেন না, যথেষ্ট হইয়াছে! অদ্যাবধি শিবজী আমার মিত্র, আমি শিবজীর মিত্র। অদ্যাবধি শিবজীর পণ ও আমার পণ এক, শিবজীর চেষ্টা ও আমার চেষ্টা অভিন্ন। সেই হিন্দুবিরোধী দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে এত দিন যিনি যুদ্ধ করিয়াছেন সে মহাত্মা কোথায়? একবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের সন্তাপ দূর করি।

ব্রাহ্মণবেশধারী দূত তখন ব্রাহ্মণবেশ ত্যাগ করিলেন, ব্রাহ্মণের উষ্ণীষের নীচে যোদ্ধার শিরস্ত্রাণ দৃষ্ট হইল, তুলার কুর্তির নীচে লৌহবর্ম প্রকাশিত হইল! মহারাষ্ট্রীয় বীর ধীরে ধীরে বলিলেন,—"রাজন্! ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আপনার নিকটে আসিয়াছিলাম সে দোষ গ্রহণ করিবেন না। এ দাস ব্রাহ্মণ নহে, মহারাষ্ট্রীয় ক্ষত্রিয়;—নাম মহাদেওজী নহে, দাসের নাম শিবজী!

রাজা যশোবন্ত সিংহ বিস্ময় ও হর্ষোৎফুল্ল লোচনে সেই খ্যাতনামা মহারাষ্ট্র যোদ্ধার দিকে চাহিয়া রহিলেন, চকিত হইয়া সেই দিল্লীশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী, দাক্ষিণাত্যের বীরশ্রেষ্ঠ, শিবজীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেকপর গাত্রোত্থান করিয়া সানন্দে ও সজল নয়নে সেই পরম শত্রুকে আলিঙ্গন করিলেন। শিবজীও সম্মান ও প্রণয়ের সহিত খ্যাতনামা রাজপুত বীরকে আলিঙ্গন করিলেন।

সমস্ত রাত্রি কথোপকথন হইল, যুদ্ধের সমস্ত কথা ঠিক হইল, তৎপরে শিবজী বিদায় লইলেন। বিদায় লইবার সময়ে কহিলেন,—মহারাজ, অনুগ্রহ করিয়া কল্য কোন ছলে পুনা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে থাকিলে ভাল হয়।

যশোবন্ত। কেন, কল্য তুমি পুনা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে?

মহারাষ্ট্রীয় বীর হাস্য করিয়া বলিলেন,—না একটি বিবাহ কার্য সম্পাদন হইবে, মহারাজ থাকিলে শুভ-কার্যে ব্যাঘাত হইতে পারে।

যশোবন্ত। ভাল, দূরেই থাকিব। বিবাহ কার্যের মন্ত্রাদি ন্যায়শাস্ত্রী মহাশয়ের এক্ষণে স্মরণ আছে কি?

শিবজী। আছে বৈকি! আমার শাস্ত্রবিদ্যা দেখিয়া দিল্লীর সেনাপতি সায়েস্তা খাঁ বিস্মিত হইয়াছেন। কল্য তিনি অন্যরূপ বিদ্যা দেখিবেন।

যশোবন্ত দ্বার পর্যন্ত সঙ্গে যাইলেন, পরে বিদায়ের সময়ে বলিলেন,—তবে যুদ্ধবিষয়ে যেরূপ-কথোপকথন হইল সেইরূপ কার্য করিবেন।

শিবজী। সেইরূপ কার্য করিবার জন্য প্রভু শিবজীকে বলিব।

যশোবন্ত। হাঁ, বিস্মৃত হইয়াছিলাম, সেইরূপ কার্য করিতে আপনার প্রভুকে বলিবেন। এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে যশোবন্ত সিংহ শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

পূর্বদিকে রক্তিমাচ্ছটা দেখা যাইতেছে, এমন সময় ব্রাহ্মণবেশধারী শিবজী সিংহগড়ে প্রবেশ করিলেন। উষ্ণীষ ও তুলার কুর্তি ফেলিয়া দিলেন, প্রাতঃকালের আলোকে মস্তকের লৌহ-শিরস্ত্রাণ ও শরীরের বর্ম ঝক্-মক্ করিয়া উঠিল। বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণ ছুরিকা, কোষে "ভবানী" নামক প্রসিদ্ধ খড়্গ। বক্ষঃস্থল বিশাল, শরীর ঈষৎ খর্ব বটে, কিন্তু সুবদ্ধ, সুদৃঢ় বন্ধনী ও পেশী-গুলি বর্মের নীচে হইতেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। পেশোয়া মুরেশ্বর ত্রিমূল সানন্দে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—ভবানীর জয় হউক! আপনি এতক্ষণ পরে কুশলে ফিরিয়া আসিলেন।

শিবজী। আপনার আশীর্বাদে কোন্ বিপদ হইতে উদ্ধার না পাইয়াছি?

মুরেশ্বর। সমস্ত স্থির হইয়াছে?

শিবজী। সমস্ত।

মুরেশ্বর। অদ্য রাত্রে বিবাহ?

শিবজী। অদ্যই।

মুরেশ্বর। সায়েস্তা খাঁ কিছু জানেন না? তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি চাঁদ খাঁ কিছু জানেন না?

শিবজী। সায়েস্তা খাঁ ভীত শিবজীর নিকট হইতে সন্ধি প্রার্থনা প্রতীক্ষা করিতেছেন; যোদ্ধা চাঁদ খাঁ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, তিনি আর যুদ্ধ করিবেন না।

মুরেশ্বর। রাজা যশোবন্ত?

শিবজী। আপনি পত্রে যে সমস্ত যুক্তি দেখাইয়া-

ছিলেন, তাহাতেই তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছিল। আমি যাইয়াই দেখিলাম, তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিয়াছেন, সুতরাং অনায়াসেই আমার কার্য সিদ্ধ হইল।

মুরেশ্বর। ভবানীর জয় হউক! আপনি এক রাত্রিতে একাকী যে কার্যসাধন করিলেন, তাহা সহস্রের অসাধ্য। যে অসমসাহসী কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ভাবিলে এখনও হৃৎকম্প হয়। প্রভো, এরূপ কার্যে আর প্রবৃত্ত হইবেন না, আপনার অমঙ্গল হইলে মহারাষ্ট্রের কি থাকিবে?

শিবজী। মুরেশ্বর! বিপদভয় করিলে অদ্যাবধি জায়গীরদার মাত্র থাকিতাম, বিপদে ভয় করিলে এ মহৎ উদ্দেশ্য কিরূপে সাধন হইবে? চিরজীবন বিপদে আচ্ছন্ন থাকি ক্ষতি নাই, কিন্তু ভবানী করুন যেন মহারাষ্ট্র দেশ স্বাধীন হয়।

মুরেশ্বর। বীরশ্রেষ্ঠ! আপনার জয় অনিবার্য, স্বয়ং ভবানী সহায়তা করিবেন। কিন্তু দ্বিপ্রহর রজনীতে, শত্রুশিবিরে, একাকী ছদ্মবেশে?

শিবজী। এ ত শিবজীর অভ্যস্ত কার্য! কিন্তু অদ্য সত্যই অন্য একটি মহাবিপদে পতিত হইয়াছিলাম।

মুরেশ্বর। কি?

শিবজী। এমন মূর্খকেও আপনি সংস্কৃত শ্লোক শিখাইয়াছিলেন? যে আপনার নাম স্বাক্ষর করিতে পারে না, সে শ্লোক স্মরণ রাখিবে?

মুরেশ্বর। কেন, কি হইয়াছিল?

শিবজী। আর কিছু নহে, সায়েস্তা খাঁর সভায় যাইয়া ন্যায়শাস্ত্রী মহাশয় প্রায় সমস্ত শ্লোকগুলি ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

মুরেশ্বর। তাহার পর?

শিবজী। দুই একটি মনে ছিল তদ্দ্বারাই কার্য-সিদ্ধি হইল।

সূর্য অস্তাচল-চূড়া অবলম্বন করিয়াছেন, সিংহগড় দুর্গের ভিতর সৈন্যগণ নিঃশব্দে সজ্জিত হইতেছে, এরূপ নিঃশব্দে যে দুর্গের বাহিরের লোকও দুর্গের ভিতর কি হইতেছে, তাহা জানিতে পারে নাই।

দুর্গের একটি উন্নত স্থানে কয়েকজন মহাযোদ্ধা দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, সেই দুর্গচূড়া হইতে দৃশ্য অতি মনোহর। পূর্বদিকে সুন্দর নীরানদী প্রবাহিত হইয়াছে, সেই নদীর উপত্যকা বসন্তকালের নব পুষ্পপত্র ও দূর্বাদলে সুশোভিত হইয়া মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে। উত্তর দিকে বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র, বহুদূর পর্যন্ত সুন্দর হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র সূর্যকিরণে উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে। বহুদূরে বিস্তীর্ণ পুনা নগরী সুন্দর শোভা পাইতেছে, যোদ্ধৃগণ প্রায় সেই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, অদ্য রজনীতে সেই নগরীতে কি বিষম ঘটনা সংঘটিত হইবে তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে পর্বতের পর পর্বত, যতদূর দেখা যায়, অনন্ত পর্বত অস্তাচল-চূড়াবলম্বী সূর্য-কিরণে অপূর্ব শোভা পাইতেছে। কিন্তু বোধকরি যোদ্ধৃগণ এই চমৎকার পর্বতদৃশ্যের বিষয় ভাবিতে-ছিলেন না, অন্য চিন্তায় অভিভূত রহিয়াছেন।

যে যুদ্ধে বা যে অসমসাহসিক কার্যে একেবারে বহুকালের বাঞ্ছিত ফললাভ হইতে পারে, বা এককালে সর্বনাশ হইতে পারে, তাহার প্রাক্কালে মুহূর্তের জন্য অতিশয় সাহসিক হৃদয়ও চিন্তাপূর্ণ হয়। অদ্য সায়েস্তা খাঁ ও মোগল সৈন্য ছিন্নভিন্ন ও পরাভূত হইবে, অথবা অসমসাহসে মহারাষ্ট্র-সূর্য একেবারে চির অন্ধকারে অস্ত যাইবে, এইরূপ চিন্তা অগত্যা যোদ্ধা-দিগের হৃদয়ে উদ্রেক হইতে লাগিল। কেহ এ চিন্তা ব্যক্ত করিলেন না, তথাপি যখন নিঃশব্দে যোদ্ধা যোদ্ধার দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, তখন কাহারও মনোগত ভাব লুক্কায়িত রহিল না। কেবল বিংশ বা পঞ্চবিংশ মাত্র সেনা লইয়া শিবজী শত্রুসেনার মধ্যে যাইয়া আক্রমণ করিবেন, এরূপ ভীষণ কার্যে শিবজী কখনও লিপ্ত হইয়াছেন কিনা সন্দেহ। কেনই বা যোদ্ধাদিগের ললাট মুহূর্তের জন্য চিন্তা-মেঘাচ্ছন্ন না হইবে?

সেই বীরমণ্ডলীর মধ্যে বহুদর্শী পেশোয়া মুরেশ্বর ত্রিমূল ছিলেন। অল্প বয়সে তিনি শিবজীর পিতা শাহজীর অধীনে যুদ্ধ-ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, পরে শিবজীর অধীনে আসিয়া প্রতাপগড়ের চমৎকার দুর্গ তিনিই নির্মাণ করেন। চারি বৎসরাবধি পেশোয়াপদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি সেই পদের যোগ্যতা বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আবুল ফাজেলকে শিবজী হত্যা করিলে পর মুরেশ্বরই তাঁহার সেনাকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিয়াছিলেন, পরে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হওয়াবধি তিনিই পদাতিক সৈন্যের সরনৌবৎ অর্থাৎ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। যুদ্ধকালে সাহসী, বিপদকালে স্থির ও অবিচলিত, পরামর্শে বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী, মুরেশ্বর অপেক্ষা কার্যদক্ষ কর্মচারী ও প্রকৃত বন্ধু শিবজীর আর কেহ ছিল না।

আবাজী স্বর্ণদেব নামে তথায় দ্বিতীয় একজন দূরদর্শী ও যুদ্ধপটু ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত

নাম নীলপন্ত স্বর্ণদেব, কিন্তু আবাজী নামেই তিনি খ্যাত ছিলেন। তিনিই ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কল্যাণ দুর্গ ও সমস্ত কল্যাণী প্রদেশ হস্তগত করেন, এবং সম্প্রতি রায়গড়ের প্রসিদ্ধ দুর্গ নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধনামা অন্নজীদত্তও অদ্য সিংহগড়ে উপস্থিত ছিলেন। চারি বৎসর পূর্বে তিনি পবনগড় হস্তগত করেন, এবং শিবজীর কর্মচারীর মধ্যে একজন প্রধান ও অতিশয় কার্যদক্ষ ছিলেন।

অশ্বারোহীর সরনৌবৎ অর্থাৎ সেনাপতি নিতাইজী সিংহগড়ে ছিলেন না; তিনি কিরূপে মোগল-সৈন্যের সম্মুখ দিয়া যাইয়া আরাঙ্গবাদ ও অহম্মদনগর ছারখার করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা আমরা সায়েস্তা খাঁর সভায় চাঁদ খাঁর প্রমুখাৎ শুনিয়াছি। সিংহগড়ে সে সময়ে কেবল অল্পসংখ্যক অশ্বারোহী সেনা কর্তাজী গুর্জর নামক একজন নীচস্থ সেনানীর অধীনে অবস্থিতি করিতেছিল।

শিবজীর তিনজন প্রধান মাউলী বাল্য-সুহৃদের মধ্যে বাজী ফাসলকরের তিন বৎসর পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। তন্নজী মালশ্রী ও যশজীকঙ্ক অদ্য সিংহগড়ে উপস্থিত ছিলেন। বাল্যকালের সৌহার্দ্য, যৌবনের বিষম সাহস, ইঁহারা এখনও ভুলেন নাই। ইঁহারা শিবজীকে প্রাণসম ভালবাসিতেন, শতবার রজনীযোগে মাউলীসৈন্য লইয়া শিবজীর সহিত শত পর্বতদুর্গে নিঃশব্দে আরোহণ করিয়া সহসা অধিকার করিয়াছিলেন।

সূর্য অস্ত গেল। সন্ধ্যার ছায়া যেমন স্তরে স্তরে জগতে অবতীর্ণ হইতেছে, তখনও সেই যোদ্ধৃমণ্ডলী দুর্গশৃঙ্গে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান, এমত সময়ে শিবজী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল গভীর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-ব্যঞ্জক, ভয়ের লেশমাত্র দৃষ্ট হয় না। বস্ত্রের নীচে তিনি বর্ম ও অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, অদ্য নিশির অসমসাহসিক কার্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। যোদ্ধার নয়ন উজ্জ্বল, দৃষ্টি স্থির ও অবিচলিত।

শিবজী ধীরে ধীরে বলিলেন,—সমস্ত প্রস্তুত, বন্ধুগণ বিদায় দিন।

মুরেশ্বর। তবে স্থির করিয়াছেন, অদ্য রজনীতে স্বর্ণদেব কি অন্নজী কি আমাকে সঙ্গে যাইতে দিবেন না? মহাত্মন্! বিপদকালে কবে আমরা আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছি?

শিবজী। পেশোয়াজী! ক্ষমা করুন, আর অনুরোধ করিবেন না। আপনাদের সাহস, আপনাদের বিক্রম, আপনাদের বিজ্ঞতা আমার নিকট অবিদিত নাই, কিন্তু অদ্য ক্ষমা করুন। ভবানীর আদেশে আমি অদ্য বিষম প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অদ্য আমিই এই কার্য সাধন করিব, নচেৎ অকিঞ্চিৎকর প্রাণ বিসর্জন দিব। আশীর্বাদ করুন, জয়লাভ করিব; কিন্তু যদি অমঙ্গল হয়, যদি অদ্যকার কার্যে নিধনপ্রাপ্ত হই, তথাপি আপনারা তিন-জন থাকিলে মহারাষ্ট্রের সকলই রহিল। আপনারা আমার সহিত বিনষ্ট হইলে কাহার দূরদর্শী বুদ্ধিবলে দেশ থাকিবে? কাহার বাহুবলে স্বাধীনতা থাকিবে? হিন্দুগৌরব কে রক্ষা করিবে? যাত্রাকালে আর অনুরোধ করিবেন না।

পেশোয়া বুঝিলেন আর অনুরোধ করা বৃথা, সুতরাং আর কিছু বলিলেন না। তখন অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে শিবজী পেশোয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—মুরেশ্বর, আপনি পিতার নিকট কার্য করিয়াছেন, আপনি আমার পিতৃতুল্য; আশীর্বাদ করুন যেন আজ জয়লাভ করিতে পারি, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ অবশ্যই ফলিবে। আবাজী! অন্নজী! আশীর্বাদ করুন, আমি কার্যে প্রস্থান করি।

মুরেশ্বর, আবাজী ও অন্নজী সজল নয়নে মহারাষ্ট্র-বীরকে আশীর্বাদ করিলেন। তৎপর শিবজী তাঁহার মাউলী সুহৃদদ্বয় তন্নজী ও যশজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—বাল্যসুহৃদ! বিদায় দেও!

তন্নজী। প্রভো! কি অপরাধে আমাদিগকে সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিতেছেন? কোন্ নৈশ ব্যাপারে, কোন্ দুর্গজয়ের সময়ে আমরা প্রভুর সঙ্গে না ছিলাম? পূর্ব-কাল স্মরণ করিয়া দেখুন, কঙ্কণদেশে আপনার সহিত কে ভ্রমণ করিত? শৈলচূড়ে, উপত্যকায়, পর্বতগহ্বরে, তরঙ্গিণীতীরে কে আপনার সহিত দিবায় শিকার করিত, রজনীতে একত্র শয়ন করিত, বা দুর্গজয়ের পরামর্শ করিত? যশজী, মৃত বাজী আর এই দাস তন্নজী। বাজী প্রভুর কার্যে হত হইয়াছে, আমাদেরও তাহা ভিন্ন অন্য বাসনা নাই। অনুমতি করুন অদ্য প্রভুর সঙ্গে যাই, জয়লাভ হইলে প্রভুর আনন্দে আনন্দিত হইব, যদি প্রভু বিনষ্ট হন, আমাদের এস্থানে জীবিত থাকিলে কোন উপকার নাই। আমাদের এরূপ বুদ্ধিবল নাই যে, রাজকার্যে কোন সাহায্য করি। আপনার বাল্যসুহৃদকে বঞ্চিত করিবেন না।

শিবজী দেখিলেন, তন্নজীর চক্ষে জল। মুগ্ধ হইয়া তন্নজী ও যশজীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, —ভ্রাতঃ! তোমাদিগকে অদেয় আমার কিছুই নাই,

শীঘ্র রণসজ্জা করিয়া লও।

তৎপরে শিবজী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দুঃখিনী জীজী একাকিনী একটি ঘরে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, পুত্রের অদ্যকার বিপদে রক্ষা প্রার্থনা করিতেছিলেন, এমত সময়ে শিবজী আসিয়া বলিলেন,—মাতঃ! আশীর্বাদ করুন, বিদায় হই।

জীজী স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন,—বৎস! আইস, একবার তোমাকে আলিঙ্গন করি। কবে তোমার এ বিপদরাশি শেষ হইবে, কবে এ দুখিনীর শোক ও চিন্তা শেষ হইবে?

শিবজী। মাতঃ! আপনার আশীর্বাদে কবে কোন্ বিপদ হইতে উদ্ধার না হইয়াছি? কোন্ যুদ্ধে জয়ী না হইয়াছি?

জীজী। বৎস! দীর্ঘজীবী হও, ঈশানী তোমাকে রক্ষা করুন। এই বলিয়া মাতা সস্নেহে শিবজীর মস্তকে হাত দিলেন, দুই নয়ন বহিয়া অশ্রুজল শীর্ণ বক্ষঃস্থলের উপর পড়িতে লাগিল।

শিবজী সকলের নিকট বিদায় লইয়াছেন; এতক্ষণ তাঁহার দৃষ্টি স্থির ও স্বর অকম্পিত ছিল। এক্ষণ আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, চক্ষুর্দ্বয় ছল্‌ছল্ করিতে লাগিল। উদ্বেগ-কম্পিতস্বরে শিবজী বলিলেন,—স্নেহময়ী জননী! আপনিই আমার ঈশানী, আপনাকে যেন ভক্তিভাবে চিরজীবন পূজা করি, আপনার আশীর্বাদে সকল বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিব।

বৃদ্ধা জীজী বহু অশ্রুপাত করিয়া বিদায়কালে বলিলেন,—বৎস! হিন্দুধর্মের জয়সাধন কর, স্বয়ং দেবরাজ শম্ভু তোমার সাহায্য করিবেন। আমার পিতৃকুল দেবগড়ের অধিপতি ছিলেন, হিন্দুধর্মের অবলম্বন ছিলেন। বাছা, আমি আশীর্বাদ করিতেছি তুমিও মহারাষ্ট্র দেশে রাজা হও, দাক্ষিণাত্যে হিন্দুধর্মের অবলম্বন হও।

সমস্ত সেনা সজ্জিত। শিবজী নিঃশব্দে অশ্বারোহণ করিলেন, নিঃশব্দে সৈন্যগণ দুর্গদ্বার অতিক্রম করিল।

দুর্গদ্বার অতিক্রম করিবার সময়ে একজন অতি অল্প বয়স্ক যোদ্ধা শিবজীর সম্মুখে আসিয়া শির নামাইল; শিবজী তাহাকে চিনিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি রঘুনাথজী হাবিলদার! এ সময়ে তোমার কি প্রার্থনা?

রঘুনাথ। প্রভু, যেদিন তোরণদুর্গ হইতে পত্রাদি আনিয়াছিলাম সেদিন প্রসন্ন হইয়া পুরস্কার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

শিবজী। অদ্য এই উৎকট ব্যাপারের প্রারম্ভে কি পুরস্কার চাহিতে আসিয়াছ?

রঘুনাথ। এই পুরস্কার চাই যে, ঐ উৎকট ব্যাপারে আমাকে যাইতে দিন। যে পঞ্চবিংশ মাউলী যোদ্ধার সহিত পুনা নগরে প্রবেশ করিবেন, দাসকে তাহাদের সহিত যাইতে আদেশ করুন।

শিবজী। রাজপুত বালক! কেন ইচ্ছাপূর্বক এ

...সহসা দেখিলেন পশ্চাৎ হইতে একটি বর্শা আসিয়া...

সংকটে আসিতেছ? অল্প বয়সে কেন প্রাণ হারাইতে উৎসুক হইয়াছ?

রঘুনাথ। রাজন্! আপনার সঙ্গে যাইলে প্রাণ হারাইব এরূপ আশঙ্কা করি না। যদি হারাই, আমার জন্য আক্ষেপ করিবে জগতে এরূপ কেহই নাই। আর যদি প্রভুকে কার্যের দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারি, জীবিত থাকিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারি, তবে,—তবে ভবিষ্যতে আমার মঙ্গল।

রঘুনাথের সেই ঘনকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ ভ্রমরবিনিন্দিত নয়নের উপর পড়িয়াছে, বালকের সরল উদার মুখ-মণ্ডলে যোদ্ধার স্থির প্রতিজ্ঞা বিরাজ করিতেছে! অল্পবয়স্ক যোদ্ধার এই কথা শুনিয়া ও উদার মুখমণ্ডল দেখিয়া শিবজী সন্তুষ্ট হইলেন, সঙ্গে পুনার ভিতর যাইতে অনুমতি দিলেন। রঘুনাথ আবার শির নত করিয়া পরে লম্ফ দিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন।

সিংহগড় হইতে পুনা পর্যন্ত সমস্ত পথে শিবজী নিজ সৈন্য রাখিলেন। সন্ধ্যার ছায়ায় নিঃশব্দে সেই পথের স্থানে স্থানে সেনা সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন। একটী দীপ জ্বালিলে বা সৈন্যেরা শব্দ করিলে পুনায় তাঁহার এই কার্য প্রকাশ হইতে পারে, সুতরাং নিঃশব্দে অন্ধকারে সৈন্য সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন।

সে কার্য শেষ হইল, রজনী জগতে গাঢ় অন্ধকার বিস্তার করিল। শিবজী, অন্নজী ও যশজী ২৫ জন মাত্র মাউলী লইয়া পুনার নিকটে একটি বৃহৎ বাগানে পৌঁছিয়া তথায় লুক্কায়িত রহিলেন। রঘুনাথ ছায়ার মত প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ রহিলেন।

আরও গাঢ়তর অন্ধকার সেই আম্রকাননকে আবৃত করিল, সন্ধ্যার শীতল বায়ু আসিয়া সেই কাননের মধ্যে মর্মর শব্দ করিতে লাগিল। সন্ধ্যার পথিক একে একে সেই কাননের পার্শ্ব দিয়া পুনাভিমুখে চলিয়া যাইল, নিবিড় অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু দেখিল না, পত্রের মর্মর শব্দ ভিন্ন আর কিছু শ্রবণ করিল না।

ক্রমে পুনার গোলমাল নিস্তব্ধ হইল, দীপাবলী নির্বাণ হইল, নিস্তব্ধ নগরে কেবল প্রহরিগণ এক একবার উচ্চ শব্দ করিতে লাগিল, ও সময়ে সময়ে শৃগালের স্বর বায়ুপথে আসিতে লাগিল।

ঢং ঢং ঢং সহসা শব্দ হইয়া উঠিল, শিবজীর হৃদয় চমকিত হইল। সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন, গলির মধ্যে শব্দ হইতেছিল, নগরের বাহির হইতে দেখা যায় না।

ঢং ঢং ঢং পুনরায় শব্দ হইল, আবার শিবজী চাহিয়া দেখিলেন। বহু লোকে দীপাবলী লইয়া বাদ্য করিতে করিতে প্রশস্ত পথ দিয়া আসিতেছে; —এই বরযাত্রা!

বরযাত্রা নিকটে আসিল। পুনার চারিদিকে প্রাচীর নাই, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। পথ লোকে সমাকীর্ণ, ও নানা বাদ্যযন্ত্র দ্বারা অতি উচ্চ রব হইতেছে। অনেক অশ্বারোহী, অধিকাংশ পদাতিক।

শিবজী নিঃশব্দে বাল্যসুহৃদ তন্নজী ও যশজীকে আলিঙ্গন করিলেন। পরস্পরে পরস্পরের দিকে চাহিলেন মাত্র। "হয়ত এই শেষ বিদায়"—এই ভাব সকলের মনে জাগরিত হইল ও নয়নে ব্যক্ত হইল, কিন্তু বাক্য অনাবশ্যক। নিঃশব্দে শিবজী ও তাঁহার লোক সেই যাত্রীদিগের সহিত মিশিয়া গেলেন।

যাত্রিগণ সায়েস্তা খাঁর বাটীর নিকট দিয়া যাইল, বাটীর কামিনীগণ গবাক্ষে আসিয়া শেই বহুলোক-সমারোহ দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে যাত্রিগণ চলিয়া গেল, কামিনীগণও শয়ন করিতে গেলেন, যাত্রীদিগের মধ্যে প্রায় ত্রিংশৎ জন খাঁ সাহেবের গৃহের নিকট লুক্কায়িত রহিল, তাহা কেহ দেখিতে পাইল না। ক্রমে বরযাত্রার গোল থামিয়া গেল।

রজনী আরও গভীর হইল। সায়েস্তা খাঁর রন্ধন গৃহের উপর একটি গবাক্ষ ছিল, তথায় অল্প অল্প শব্দ হইতে লাগিল। খাঁ সাহেবের পরিবারের কামিনীগণ সকলে নিদ্রিত অথবা নিদ্রালু, সে শব্দ শুনিয়াও গ্রাহ্য করিলেন না।

একখানি ইষ্টকের পর আর একখানি, পরে আর একখানি সরিল, ঝর্ ঝর্ করিয়া বালুকা পড়িল। নারীগণ তখন সন্দিগ্ধ হইয়া সেই স্থান দেখিতে আসিলেন, ছিদ্রের ভিতর দিয়া একজন, পরে আর এক-জন, পরে আর একজন যোদ্ধা পিপীলিকা-সারের ন্যায় গৃহে প্রবেশ করিতেছে! তখন চীৎকার-শব্দ করিয়া যাইয়া সায়েস্তা খাঁর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে সমুদয় অবগত করিলেন।

শিবজী সন্ধি প্রার্থনার মিনতি করিতেছেন, খাঁ সাহেব এইরূপ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। সহসা জাগরিত হইয়া শুনিলেন, শিবজী পুনা হস্তগত করিয়া তাঁহার প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছেন।

পলায়নার্থে খাঁ সাহেব এক দ্বারে আসিলেন, দেখিলেন, বর্মধারী মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা! অন্য দ্বারে আসিলেন, তাহাই দেখিলেন। সভয়ে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিলেন, গবাক্ষ দিয়া পলাইবার উপক্রম করিতে-

ছিলেন, এমত সময়ে সভয়ে শুনিলেন, "হর হর মহাদেও" বলিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ পার্শ্বের গৃহ পরিপূর্ণ করিল।

তখন রাজপুরী আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া চারিদিকে গোল হইল। প্রাসাদের রক্ষকগণ সহসা আক্রান্ত হইয়া হতজ্ঞান হইয়াছিল। অনেকেই হত ও আহত হইয়াছিল। তথাপি অবশিষ্ট লোক প্রভুর রক্ষার্থ দৌড়িয়া আসিল ও সেই পঞ্চবিংশ জন মাউলীকে চারিদিকে বেষ্টন করিল।

শীঘ্রই ভীষণ রবে সেই প্রাসাদ পরিপূরিত হইল। প্রাসাদের আলোক নির্বাণ হইয়াছে, অন্ধকারে মাউলীগণ চীৎকার করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, অন্ধকারে হিন্দু ও মোগলেরা যুদ্ধ করিতেছে। কবাটের ঝন্‌ঝনা শব্দ, আক্রমণকারীদিগের মুহুর্মুহুঃ উল্লাস-রব, এবং আক্রান্ত ও আহতদিগের আর্তনাদে প্রাসাদ পরিপূরিত হইল। সেই সময়ে শিবজী বর্শা-হস্তে লম্ফ দিয়া যোদ্ধাদিগের মধ্যে পড়িলেন, "হর হর মহাদেও" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মাউলীগণ সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, মোগল প্রহরিগণ পলায়ন করিল, অথবা সমস্ত হত ও আহত হইল। শিবজী ভীষণ বর্শাঘাতে দ্বার ভগ্ন করিয়া সায়েস্তা খাঁর শয়নঘরে আসিয়া পড়িলেন।

সেনাপতির রক্ষার্থে তৎক্ষণাৎ কয়েকজন মোগল সেই ঘরে ধাবমান হইল। শিবজী দেখিলেন, সম্মুখে মৃত চাঁদ খাঁর বিক্রমশালী পুত্র শম্‌শের খাঁ! পিতা অপমানিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে, তথাপি পুত্র সেই প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ও অগ্রগণ্য। শিবজী এক মুহূর্ত দণ্ডায়মান হইলেন, শেষে খড়্গ রাখিয়া বলিলেন, যুবক, তোমার পিতার রক্তে এখনও আমার হস্ত কলুষিত রহিয়াছে, তোমার জীবন লইব না, পথ ছাড়িয়া দাও।

শম্‌শের খাঁ উত্তর করিলেন না। শম্‌শের খাঁর নয়ন অগ্নিবৎ জ্বলন্ত। শিবজী আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইবার পূর্বেই শম্‌শেরের উজ্জ্বল খড়্গ আপন মস্তকোপরি দেখিলেন।

শিবজী মুহূর্তের জন্য প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া ইষ্টদেবতা ভবানীর নাম লইলেন, সহসা দেখিলেন পশ্চাৎ হইতে একটি বর্শা আসিয়া খড়্গধারী শম্‌শেরকে ভূতলশায়ী করিল। পশ্চাতে দেখিলেন, রঘুনাথজী হাবিলদার!

শিবজী। হাবিলদার! একার্য আমার স্মরণ থাকিবে। কেবল এইমাত্র বলিয়া শিবজী অগ্রসর হইলেন।

এই অবসরে গবাক্ষ দিয়া রজ্জু অবলম্বন করিয়া সায়েস্তা খাঁ পলাইলেন। কয়েক জন মাউলী সেই গবাক্ষ-মুখে ধাবমান হইয়াছিল, একজন খড়্গের আঘাত করিয়াছিল, তাহা সায়েস্তা খাঁর অঙ্গুলীতে লাগিয়া একটি অঙ্গুলী ছেদন করিল, কিন্তু সায়েস্তা খাঁ আর পশ্চাতে না দেখিয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার পুত্র আবদুল ফতে খাঁ ও সমস্ত প্রহরী নিহত হইল। তখন শিবজী দেখিলেন ঘর, বারান্দা, প্রাঙ্গণ রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে প্রহরিগণের মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে, স্ত্রীলোক ও পলাতকগণের আর্তনাদে প্রাসাদ পরিপূরিত হইতেছে, মাউলীগণ মোগলদিগের ধ্বংস সাধনার্থ চারিদিকে ধাবমান হইতেছে। মশালের অস্পষ্ট আলোকে কাহারও মৃতদেহ, কাহারও ছিন্নমুণ্ড, কোথাও বা রক্ত-প্রণালী ভীষণ দেখাইতেছিল। তখন শিবজী আপন মাউলীদিগকে নিকটে ডাকিলেন। সকল সময়ে, সকল যুদ্ধেই, তিনি জয়লাভ করিলে পর বৃথা প্রাণনাশ দেখিলে বিরক্ত হইতেন, এবং শত্রুরও সেরূপ প্রাণনাশ যাহাতে না হয় সেজন্য যথেষ্ট যত্ন করিতেন। শিবজী আদেশ করিলেন,—আমাদের কার্য সিদ্ধ হইয়াছে, ভীরু সায়েস্তা খাঁ আর আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না, এক্ষণে দ্রুতবেগে সিংহগড়াভিমুখে চল।

অন্ধকার রজনীতে শিবজী অনায়াসে পুনা হইতে বহির্গত হইয়া সিংহগড়ের দিকে ধাবমান হইলেন। প্রায় দুই ক্রোশ আসিয়া মশাল জ্বালিবার আদেশ দিলেন। বহু সংখ্যক মশাল জ্বলিল। পুনা হইতে সায়েস্তা খাঁ দেখিতে পাইলেন, মহারাষ্ট্র সেনা নিরাপদে সিংহগড়ে উঠিল।

পরদিন প্রাতে ক্রুদ্ধ মোগলগণ সিংহগড় আক্রমণ করিতে আসিল, কিন্তু গড়ের কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। কর্তাজী গুর্জর ও তাঁহার অধীনস্থ মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহিগণ বহুদূর পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করিয়া গেল।

[মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত থেকে]

কোনো এক গাঁয়ের ধারে — শিল্পী নীলরতন চট্টোপাধ্যায়
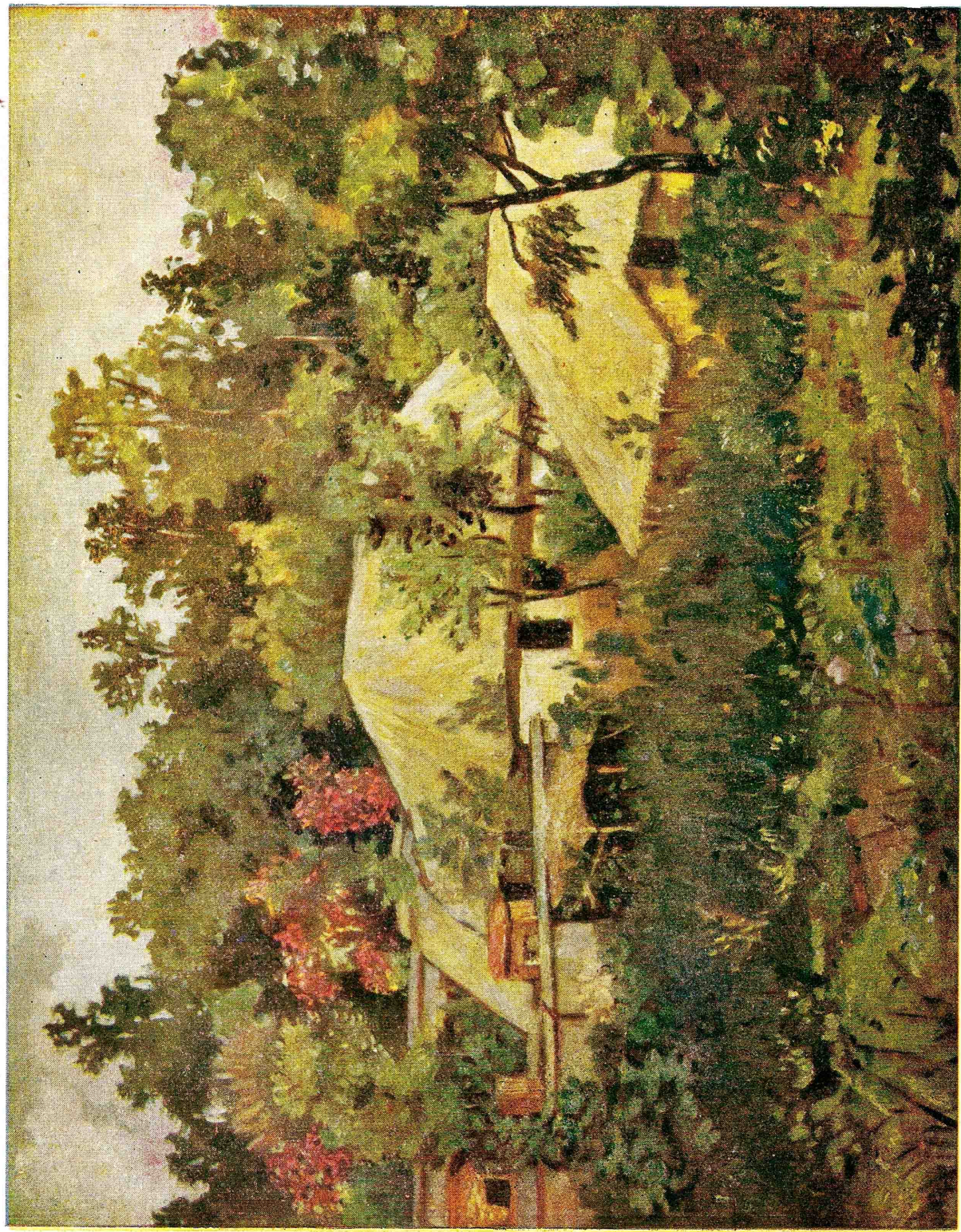
নেমন্তন্ন

সন্দীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে বুলু বললে, ওরা বোধহয় আর আমাদের নেমন্তন্ন করবে না, না রে বিনু?

এরিয়ালের ওপর বসে-থাকা একটা শালিক পাখীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিনু একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। বুলুর কথাটা ঠিকমত বুঝতে না পেরে তাই জিজ্ঞেস করল, কারা?

—এই মানে নীতুদি'রা।

হ্যাঁ। বোধহয় না। কিন্তু আর সক্কলকে তো করেছে। বকুদের করেছে, হাবুলদের করেছে, হারুদিদের করেছে......।—তার জানা নিমন্ত্রিতদের নামগুলো একে একে মুখস্থ বলে গেল বিনু। তারপর বুলুর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, আমাদের কেন করলো না বল্ তো?

বুলু উদাস গলায় বলল, কে জানে!

—বোধহয় আমরা গরীব বলে, তাই না?

বুলু এক পলক স্তব্ধ হয়ে রইল। বিনুর কথার মধ্যে যে চাপা ব্যথাটুকু লুকিয়ে ছিল, তার বুকে সেটা বেজেছে। কিন্তু বোধহয় ভাইকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই মনের ভাবটা খুব তাড়াতাড়ি পালটে ফেলল বুলু। তারপর ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, করল না তো ভারী বয়েই গেল, কি বলিস?

পাশাপাশি দুখানা বাড়ী। একখানা নতুন, একখানা জীর্ণ। একখানা বড়, একখানা ছোট। সেই বড় বাড়ীর মেয়ে নীতু অর্থাৎ সুনীতার বিয়ে।

বেশ কিছুদিন ধরেই তোড়-জোড় চলছিল। সমস্ত বাড়ীটাকে নতুন করে রং করানো হচ্ছিল। সামনে লতানে ফুলের গাছ লাগানো হচ্ছিল।

এই সব দেখতে দেখতে বুলুর মন অকারণে খুশী হয়ে উঠছিল।

বিনুকে ডেকে ঐ নতুন বাড়ীটার দিকে আঙুল দেখিয়ে সে একদিন বলল, ঐ বাড়ীর বড় মেয়ের বিয়ে জানিস?

বিনু সংক্ষেপে বলল, হ্যাঁ।

বুলু খুশী-খুশী অথচ সঙ্কোচ-মেশানো গলায় বলল, আমাদের নিশ্চয়ই নেমন্তন্ন করবে, না?

হ্যাঁ, মনে হয় করবে।—বিনুর কথায় দ্বিধার সুর।

গলার স্বরে প্রলোভন মিশিয়ে বুলু বলল—দেখে রাখিস, ওরা ঠিক নেমন্তন্ন করবে। শুনছি, ওরা নাকি পাড়াসুদ্ধ সকলকে ঝেঁটিয়ে বলছে।

বিনু খুশী হয়ে বলল, তাহলে ভারী মজা হয়। কদ্দিন নেমন্তন্ন খাইনি?

বুলু চোখ পাকিয়ে কৃত্রিম ধমকের সুরে বলল, যাঃ! হ্যাংলা কোথাকার!

কে বেশী হ্যাংলা বোঝা গেল না। তবে বড় বাড়ীর অনুষ্ঠান-আয়োজনের সাথে তাল রেখে ভাই-বোন উভয়ের মনেই মধুর একটা আশা স্ফীত থেকে স্ফীততর হয়ে উঠতে লাগল।

ক্রমে বড়-বাড়ীর ছাদে প্যাণ্ডেল বাঁধা হল। সামনে খাটানো হল সামিয়ানা। বিজলী-বাতির মালা গলায় পরে যেন হাসতে লাগল সমস্ত বাড়ীটা।

সব আয়োজনই সম্পূর্ণ হল। হল না শুধু বুলু আর বিনুর নেমন্তন্ন পাওয়া।

সতৃষ্ণ নয়নে উৎসব-মুখরিত বাড়ীটার দিকে চেয়ে

[শেষাংশ ১৪৯ পৃষ্ঠায়]

কি কুক্ষণে বিলটুর কাঁধে এই দুষ্টু সরস্বতী ভর করেছিল। ফল যা দাঁড়াল তাতে তার মতো বিচ্ছু ছেলেরও দুই চক্ষু স্থির। মন্ত্র-বলে মাটি ফাঁক করে যদি তার মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে পারত বিলটু মজুমদার তাই করত। এত লোকের জোড়া-জোড়া অবাক চোখ, বড়দা আর দিদির মিটিমিটি হাসি যদি বা এড়ানো গেল—কাকা আর কাকীমাকে বিলটু এ-জীবনে আর এই পোড়া-মুখ দেখাবে কি করে জানে না। দু'দিনের জন্য শ্রীরামপুরে মাসির বাড়ি পালিয়ে এসেছে, যে মাসির বাড়ি ওর দু'চক্ষের বিষ, কারণ সেখানে মেসোমশাই নামে এক জীব আছেন যিনি সর্বক্ষণ উপদেশ ঝাড়েন। ভালোতেও উপদেশ, মন্দতেও উপদেশ! তা বিলটুর কুষ্ঠিতে তো মন্দ ছাড়া ভালো কিছু লেখা নেই-ই।...দু'দিন বাদে তো আবার সেই কাকা-কাকীমার সামনে গিয়ে পড়তেই হবে—তখন?

...ইস্কুলের যে-ক'টি মন্দ-মতি ছেলের গুরু ও, তাদের একটু তাক লাগিয়ে দেবার ঝোঁকে এই কাণ্ডটা করে বসেছিল। আর সেই ঝোঁকেই আরো একটু মজা করার লোভ সামলাতে পারেনি। সেটা যে এমন বিপাকের দিকে গড়াবে কে জানত?

ব্যাপার আর কিছুই নয়। স্কুলের দু'চারটে ভাল ছেলের সঙ্গে রেষারিষি করে আর মাস্টারদের এক-চোখোমির একটা মজাদার জবাব দেবার জন্যে বিলটু মজুমদার গোঁ-ভরে এক রচনা প্রতিযোগিতার আসরে গিয়ে বসেছিল। আর তার পর ওর মাথায় একটা ভূত চেপেছিল। সেই ভূত যে উল্টে ওকেই মাথায় করে ওই প্রতিযোগিতার ফলাফলের একেবারে মগ-ডালটিতে বসিয়ে দেবে তা ও কল্পনা করবে কেমন করে! ফল যেদিন ঘোষণা করা হল সে-দিনটা শনিবার। পরদিন রবিবার—এমনিতেই ছুটি। তার পরদিন সোমবার—রথের ছুটি। তার পরদিন মঙ্গলবার—বিলাস ওরফে বিলটু মজুমদার এত বড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে বলে গোটা ইস্কুল ছুটি। আর তার পরদিন টাউন হল-এ ঘটা করে প্রাইজ দেওয়া আর নেওয়ার উৎসব।

ফল ঘোষণার পরে সব থেকে বেশি হকচকিয়ে গেছল বিলটু মজুমদার নিজেই। প্রথমে বিশ্বাসই করেনি। তারপর প্যামফ্লেটে ছাপার অক্ষরে নিজের নাম আর নিজের রচনা দেখে দুই চক্ষু ছানাবড়া। ফল ঘোষণার সঙ্গে প্রথম দ্বিতীয় আর তৃতীয়—তিনটে রচনাই ছাপা হয়। চার আনা দামের সে-বই মাস্টারদের চোখরাঙানির ভয়ে ওই বয়সের সব ছেলেমেয়েকেই কিনতে হয়। যারা প্রাইজ পায় তারা শুধু বিনা পয়সায় পাঁচ কপি করে সেই বই পায়। ইস্কুলে বিলটুর নামে বইও এসে গেছে। তাছাড়া সকালের সব ক'টা খবরের কাগজেও ওর নাম আর ইস্কুলের নাম ছাপা হয়ে গেছে।

হে ধরণী, দ্বিধা হও!

বর্ধমান বিভাগের সমস্ত স্কুলের চৌদ্দ থেকে ষোল বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই কমপিটিশন। রচনার প্রধান কেন্দ্র হুগলি শহর, যেখানে বিলটু থাকে এবং পড়ে। সমস্ত বিভাগে এ-রকম সাত আটটা কেন্দ্র আছে—যেখান থেকে ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা দেয়। শেষে উৎসব হয় হুগলিতে। ওই বয়সের বিশ-পঁচিশ হাজার ছেলেমেয়ের অত রচনা কে দেখে? তাই প্রত্যেক স্কুল তাদের সেরা পাঁচটি করে ছেলে বা মেয়েকে কমপিটিশনে

পাঠায়। তাইতেই সংখ্যা দাঁড়ায় কম করে চার পাঁচশ। তাই থেকে নম্বর অনুযায়ী প্রথম দশটা রচনা বেছে নিয়ে আবার তিনজন নামী সাহিত্যিক অর্থাৎ হেড বিচারকের কাছে পাঠানো হয়। ওই দশটা রচনার ওপর প্রত্যেকে আলাদা আলাদা নম্বর দেয়। তার গড়পড়তা নিয়ে যে প্রথম হল সে-ই প্রথম। বিলটু শুনে হাঁ, প্রত্যেক হেড বিচারকের কাছেও নাকি আলাদা-আলাদা করে ও-ই প্রথম হয়েছে।

বিলটুর বয়েস পনের। পড়ে ক্লাস নাইনে। মাস্টাররা বেশির ভাগই তাকে ডাকে বিচ্ছু বলে। ক্লাস এইট আর টেন থেকে দুটো ভালো ছেলের নাম বাছা হয়ে গেছে—রাশভারী ক্লাস টিচার সারদাবাবু ওদের জিজ্ঞাসা করলেন, কমপিটিশনে কারা নাম দিতে চায়—এখনো তিনটে নাম দেওয়া যেতে পারে। লজ্জা-লজ্জা মুখ করে ভালো ছেলে কটা বসেছিল—অর্থাৎ মাস্টার-মশাই-ই নাম করুক, প্রাইজ তো পাবেই না, মাঝখান থেকে অন্য ছেলেরা ঠাট্টা তামাসার সুযোগ পাবে।

ভালো মুখ করে পিছনের বেঞ্চের এক কোণ থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল বিলটু শর্মা। কি বলতে চায় বুঝতে না পেরে সারদাবাবু মুখের দিকে তাকান।—কি?

—আমার নামটা দিন সার।

সদাগম্ভীর সারদাবাবুকে ছেলেরা ভয়ই করে একটু। তা সত্ত্বেও ক্লাসে খুক-খুক চাপা হাসির শব্দ। চশমাটা নাকের ডগায় ঠেলে দিয়ে ভদ্রলোক ভালো করে একটু দেখলেন আগে।—এটা কি ইয়ারকির জায়গা?

—না সার।......আমি ঠিক করেছি এবার থেকে যা-কিছু ভালো তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

ছেলেরা জানে রাগী সারদাবাবু এই বিলটুকেই আবার একটু প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। ভদ্রলোক খেলা-ধুলা ভালবাসেন, ও-দিকে বিলটু স্কুলকে জেতাবার জন্যে বিপক্ষ-দলের দু'চারটে ছেলের ঠ্যাং অনায়াসে খোঁড়া করে দিতে পারে। সারদাবাবু এই জন্যে ওকে ধমকান, কিন্তু মনে মনে আবার একটু পছন্দও করেন। সেদিন তাঁর মুখ দেখে মনে হল যত পছন্দই করুন, এবারে ওর কপালে দুঃখু আছে।

কিন্তু ছেলেরা যা আশা করেছিল তা অন্তত হল না। গম্ভীর মুখে সারদাবাবু ওর নাম লিখে নিলেন। তারপর ঠাণ্ডা কঠিন গলায় বললেন, আমিই সেদিন কনডাকটিং অফিসার (পরিচালক), যদি তোমাকে না দেখি কমপিটিশনে তাহলে পিঠের ছাল বলে আর কিছু থাকবে না।

মস্করা করতে গিয়ে এমন ফ্যাসাদেও পড়বে বিলটু ভাবেনি।

সকালের কাগজে ফলাফল দেখে বিলটু নিজেই হাঁ। কাকা-কাকীমা, বড়দা আর দিদির জেরা এড়িয়ে তাড়া-তাড়ি স্কুলে পালিয়ে বেঁচেছে। স্কুলে ওকে নিয়ে এমন হুলস্থূল কাণ্ড যে টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই স্কুল থেকে পালাতে হয়েছে। চুপিচুপি বাড়ি আসতেই দিদির মুখোমুখি—ওকে আড়ে আড়ে দেখতে লাগল আর মুখ টিপে হাসতে লাগল। সে-যে এ-সময় কলেজ কামাই করে বাড়িতে বসে আছে বিলটু জানবে কি করে? মুখের দিকে এক নজর তাকিয়েই বুঝে নিয়েছে রচনার ছাপা প্যামফ্লেট দিদিও যোগাড় করেছে একখানা এবং সর্বনাশ যা হবার হয়েই গেছে।

দিদির পাশ কাটিয়ে বিলটু নিজের ঘরে ছুটে চলে গেল।...কাকীমা স্কুল থেকে ফিরবে সাড়ে চারটেয়, কাকা অফিস থেকে সোয়া পাঁচটায়, আর বড়দা ব্যাঙ্ক থেকে সাড়ে ছটায়। অতএব বিলটুর হাতে সময় কম।

জন্মদিনে মাসিমা পাঁচটা টাকা দিয়েছিল। তার দু'টাকা অবশিষ্ট আছে। টাকা দুটো পকেটে ফেলল। একটা প্যান্ট আর একটা শার্ট কাগজে মুড়ে নিল।

নীচে নামতেই বারান্দায় আবার দিদির সঙ্গে দেখা। হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় চললি?

—শ্রীরামপুরে, মাসির ওখানে—মহেশের রথ দেখতে।

—তার মানে? বলা নেই কওয়া নেই—বিলটু—শোন্ শোন্—বাবা মা আর বড়দা ফিরলে কিন্তু তোকে আস্ত রাখবে না—

বিলটু ততক্ষণে দরজার বাইরে। আধমরা তো হয়েই আছে, ওই তিনজনকে এড়াবার জন্যেই পলায়ন—জীবনে আর এ-মুখো হবে কিনা সন্দেহ।

হ্যাঁ, সারদাবাবুর হুমকির ফাঁড়া কাটানোর জন্যই বিলটু রচনা প্রতিযোগিতার হল-এ উপস্থিত হয়েছিল। প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু বড় বড় হরপে বোর্ডে লেখা—"তোমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা অথবা পরিকল্পনা গল্পের ছাঁদে লেখো।"

বিলটু প্রথমে ভেবেছিল সারদাবাবুর চোখে ধুলো দিয়ে এক ফাঁকে সাদা খাতা জমা দিয়ে পালাবে। কিন্তু হঠাৎ মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি চাপল তার। যত ভাবতে লাগল ব্যাপারটা তত মজাদার মনে হল।...এই ফাঁকে মনের সাধে কিছু লেখা যেতে পারে—সত্যি না হোক,

ভালোরকম একটা কাল্পনিক প্রতিশোধ নেওয়া যেতে পারে।...কে আর দেখছে, এ-লেখা কোথায় কার কাছে চলে যাবে—কে লিখল না লিখল কেউ কোনদিন জানতেও পারবে না।

যেমন চিন্তা তেমনি কাজ। মনের সাধে মনের কথা লেখায় মশগুল বিলটু। যত লিখছে, প্রতিশোধ নিতে পারার আনন্দ ততো মাথায় চেপে বসছে।

বিলটুর রচনার আসল অংশগুলো সাজালে এই রকম দাঁড়ায়ঃ

"আমার জীবনে স্মরণীয় ঘটনা কিছু নেই। বরং হঠাৎ আমি মরে গেলে আমাদের বাড়ির অথবা পাড়ার অথবা স্কুলের পক্ষে সেটা স্মরণীয় ঘটনা হতে পারে। কারণ, তাহলে অ-নে-কে-র হাড় জুড়োবে।

অন্য দিকে আমি যখন যা করি, প্রায় সবই স্মরণীয় হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ, লঙ্কাকান্ড গোছের কিছু হয়। লঙ্কাকান্ড কি স্মরণীয় নয়? যখন কিছু করি না, তখনো সকলে ভাবে কিছু করার মতলবে আছি। আর তার শাস্তিও অনেক সময় আগেভাগে পেয়ে যাই। তাছাড়া (অবিশ্যি আমার স্বভাব গুণে) অন্যের দোষও বহু সময় আমার কাঁধে চাপে আর তার শাস্তিও মেলে। আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করি না, বা কার দোষে শাস্তি পেলাম তা নিয়ে মাথা ঘামাই না।

আমার বয়স পনের। ডাক নাম বিলটু। ইস্কুলের মাস্টারমশাইরা বলে বিচ্ছু। পাড়ার লোকে আর বাড়ির লোকে বলে বাঁদর। না, পাড়ার লোকে সামনাসামনি বলে না, আমার কান বাঁচিয়ে বলে। আমি একটি নির্ভেজাল মন্দ ছেলে—যাকে বলে ব্যাড বয়। আজকাল শুনি ভেজাল ছাড়া কিছু নেই। শুধু আমার মধ্যে ভেজাল নেই।

আমার বাবা মা নেই। বাবাকে মনে পড়ে না। মা-কে মোটামুটি মনে আছে। বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছিল আর মিষ্টি মিষ্টি হাসত। কাকীমা আমার ওপর বেশি রেগে গেলে আমার স্বর্গের বাবা মা-কে ধরে টানাটানি করে। এমন ছেলের হাত থেকে বাঁচার জন্যেই নাকি তারা নিজেরা সরে গেছে, আর কাকা-কাকীমার হাড়-মাস জ্বালিয়ে খাবার জন্যেই আমাকে তাদের কাঁধে চাপিয়ে গেছে।

আমার জীবনে স্মরণীয় ঘটনা কিছু নেই বটে, কিন্তু একটা ঘটনা ঘটলে সেটা স্মরণীয় হতে পারে। পরিকল্পনাও কিছু নেই, তবে একটা ইচ্ছে মাঝে মাঝে মাথায় এমন চেপে বসে যে সেটাকে যে-কোনো পরিকল্পনার বাপ-ঠাকুরদা বলা যেতে পারে।

...আমার কিছু শত্রু আছে। তার মধ্যে প্রধান শত্রু কাকীমা। (রেগে গেলে কাকীমা অবশ্য বলে আমিই তার শত্রু।) দ্বিতীয় শত্রু কাকা। তার পরের শত্রু বড়দা আর দিদি। ইস্কুলের মাস্টারমশাইদের মধ্যেও বেশির ভাগই শত্রু, কিন্তু তাদের আমি কেয়ার করি না (কাকেই বা করি?)। এখন ক্লাস নাইন, তিন বছরের মধ্যে স্কুলের পাট শেষ হলে কে আর আমার টিকির নাগাল পাচ্ছে? আসল শত্রু আমাদের বাড়ির মধ্যেই।

নীচে নামতেই দিদির সঙ্গে দেখা।

এই শত্রুদের আমি মনের মতো জব্দ করতে চাই—টিট করতে চাই। পারলে সেটাই হবে স্মরণীয় ঘটনা—আর এই পারার চিন্তাটাই আমার পরিকল্পনা। আমার প্রধান শত্রু কাকীমা—মেয়ে ইস্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মিসট্রেস। মুখখানা ইচ্ছে করলে হয়ত মিষ্টি মিষ্টি করতে পারে, কিন্তু মান খোয়া যাবার ভয়ে কক্ষনো তা করে না। যেমন রোগা, তেমনি খিটখিটে। হবে না কেন, সারাক্ষণ তো বুক জ্বালা পেট জ্বালা লেগেই আছে। খাওয়ার থেকে ওষুধ গেলে বেশি। কাকীমা প্রধান শত্রু, কারণ কাকার কান ওই সর্বদাই বিষোচ্ছে। আজকাল নিজে আর শাসন করে এঁটে উঠতে পারে না, পাখার ডাঁট দিয়ে

মারতে এলে সেটা আমি কেড়ে নিয়ে দুমড়ে ভেঙে দিই—হাতের কাছে পেলে তবে চড়-চাপড় কষাতে পারে, কিন্তু চড় খাবার জন্যে আমি তো আর তার সামনে গাল পেতে বসে থাকি না। কেবল কাকার আর বড়দার অত্যাচারে রোজ রাতে কাকীমার কাছে পড়তে বসতে হয়—কিন্তু আশ্চর্য, কাকীমা তখন হাতে পেয়েও বিশেষ মারধর করে না। সেয়ানা মেয়ে তো, ঠিক জানে তার কাছে পড়তে বসাটাই আমার কাছে সব থেকে বড় শাস্তি।

অন্য সময় রাগের জ্বালায় কাকার কাছে নালিশ ঠোকে। কাকা না থাকলে বড়দার কাছে। আমার পিঠ দুরমুশ করতে করতে তাদের হাতে বোধ হয় কড়া পড়ে গেছে। কাকার একটা শৌখিন ছড়ি ছিল। বেশি রাগলে ওটা দিয়ে আমার পিঠের চামড়া ফাটিয়ে দিত। ফাঁকতালে একদিন ওটা উনুনে দেবার পর ধরা পড়ে গেলাম। রাগের চোটে কাকা সেদিন চ্যালাকাঠ নিয়ে পিটল আমাকে। সে-ও কাকীমার নালিশের ফল। এই জন্যেই কাকা দ্বিতীয় শত্রু, কাকীমা প্রথম। তৃতীয় শত্রুর দলে বড়দা আর দিদি। বড়দা এখানকার ব্যাঙ্কে চাকরি করে। হিসেবের পোকা হয়ে এখন সকলের চালচলনের হিসেবেও গরমিল দেখে। তার হাতের চড়টা-চাপড়টা গায়ের ধুলো ঝাড়ার মতো সয়ে গেছে আমার। এখন আবার আপিসের কি পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছে বলে মেজাজ আরো তিরিক্ষি। পাশ করে যেন সগ্গে তুলবে সকলকে।

তারপর দিদিটাও এক নম্বরের পাজী মেয়ে, দেমাকিও। আজকাল কাকীমার মুখে মুখে তর্ক করে, তার সঙ্গে ঝগড়াও করে। গেল বারে বি. এ. পাশ করেছে। এখন আবার অনার্স নিয়ে সেই বি. এ.-ই পড়ছে। ফাঁক পেলে চড়-চাপড়টা সেও লাগিয়ে দেয়। আর আমার দিকে তাকালেই যেন ফাঁক মেলে। এই সেদিনের কাণ্ডটা ধরুন না। সেন পাড়ার এক মুখ-চেনা লোক, নাম ধীরেন—সাইকেলে করে এসে আমার হাতে একটা খাম দিল। বলল, দরকারী চিঠি তোমার দিদিকে দেবে। দিলাম। সেই চিঠি পড়েই দিদি রক্তবর্ণ। 'পাজী! উল্লুক!' বলে আমাকে ঠাস-ঠাস চড়। কাকীমা ছুটে এলো। চিঠি পড়ে সেই ঠাকরুনও আমাকে কয়েক ঘা বসালে। তারপর বড়দা এসে তার সেই রাম চড় গোটাকতক। সবশেষে কাকার ঠেঙানি। আমি যত বলি, ওই লোকের সঙ্গে আমি মিশি না, তাকে ভালো জানিও না, ততো তারা আমাকে দিয়ে স্বীকার করাবে যে আমার সঙ্গে ওই লোকটার নিশ্চয় খুব ভাব।

আমি এটুকু বুঝেছিলাম, খারাপ চিঠি কিছু। তার দু'দিন বাদে ধীরেন লোকটাকে তীরের মতো সাইকেল চালিয়ে যেতে দেখে সেই স্পীডের মুখেই আমি তার হ্যাণ্ডেল ধরে এক হ্যাঁচকা টান। লোকটা উল্টে সাইকেল সুদ্ধু একেবারে ড্রেনের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ল। মাথা ফেটে চৌচির। সেই রাতেই কাকার কাছে আবার কি মার, কি মার। লোকটা নাকি তখনো হাসপাতালে অজ্ঞান হয়ে আছে।

কাকা-কাকীমারা সব আমার পয়লা নম্বরের শত্রু হলেও আমাকে অবিবেচক ভাববেন না। তারা যে নিছক মন্দ লোক, এ-কথা আমি বলব না। উল্টে হয়তো বা ভালো লোকই। সকলে ভালই বলে। আমার হঠাৎ কখনো অসুখ করলে কাকা ডাক্তারের কাছে ছোটে, আর কাকীমা তখন মুখে বকাবকি করলেও সামনে এসে বসে। কিন্তু এমনই ঘন্টার শরীর আমার যে বছর-দু-বছরেও একটি বার অসুখের নাম নেই।

তাদেরই বা দোষ কি, নালিশের জ্বালাতেই সক্কলের কান ঝালাপালা। পাড়ার লোকের নালিশ, ইস্কুলের মাস্টারদের নালিশ। ওদিকে আমিও যে সর্বদা মন্দ কাজ করব বলে করি তা নয়। করে ফেলার পর অনেক সময় দেখি বিতিকিচ্ছিরি মন্দ হয়ে গেছে।

যেমন ধরুন, সকলে মিলে আম গাছে ঢিলোচ্ছি। শিবুটা গাছে উঠে বসেছে। নেপা বলল, ওর মাথায় একটা ঢিল লাগাতে পারিস? দেখি কেমন টিপ তোর—

না ভেবেই আমি ধাঁ করে ইঁট ছুঁড়ে দিলাম। ঠিক মাথায় গিয়ে ওটা লাগারই বা কি দরকার ছিল? টুপ করে আমের মতই শিবুটা গাছ থেকে পড়ে গেল। তারপর কাকার কাছে নালিশ আর ধোলাই।

...ড্রিলের মাস্টারমশাই তখন থেকে জ্বালাচ্ছিল। হারু তার ফাউনটেন পেনটা হাতে দিয়ে বলল, কলমে কালি নেই, ভদ্রলোককে চমকে দেবার জন্য কলমটা তার পিঠের কাছে নিয়ে ঝাড় না। কিন্তু পাজীটার যে কলম-ভরতি কালি আমি কি জানি! ড্রিল মাস্টারের সাদা জামার পিঠটা কালির বুটিতে ভরে গেল। ব্যস, কাকার কাছে চিঠি গেল হেডমাস্টারের—তোমার ছেলেকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। কাকা হেড-মাস্টার আর ড্রিল মাস্টারকে বাড়িতে ডেকে আমাকে আধ-মরা করার পর তাদের রাগ পড়ল।

আর একবার সামান্য ভুলে কি নির্দোষ হয়েও বড়দার হাতে রাম ঠেঙানি খেলাম। গঙ্গায় ডুবোচ্ছিলাম। রোজ ঘন্টাখানেক করে আমার গঙ্গায় চান বরাদ্দ। দেখলাম অদূরে চান করছে গাঙ্গুলী মশাই। কতকগুলো নোঙর-করা নৌকোর আড়াল থেকে তাকে দেখলাম। গাঙ্গুলী মশাই আমাকে দেখেনি। কত ছেলেই তো চান করছে। এই ভদ্রলোকের ওপর আমার বিষম রাগ। যখন তখন কাকার কাছে আর কাকীমার কাছে আমার নামে নালিশ করে। আমি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। যেই পৈতে হাতে জপে তপে মন দেবে, ডুব সাঁতার দিয়ে আমি তার পা টেনে নাকানি-চোবানি খাওয়াবই। তারপর ডুব সাঁতর দিয়ে নৌকোর পিছনে চলে যাব। তারপর চুপিসারে অন্য নৌকোগুলোর পিছনে।

বড়দা যে তখন চানে এসেছে লক্ষ্যই করিনি।

যাকগে। তাকে পৈতে হাতে নিতে দেখেই পিছনের নৌকোগুলোর থেকে আমি সামনের নৌকোর আড়ালে এলাম। তাতে সময় লাগল একটু। তারপর ডুব সাঁতার দিয়ে এসে সোজা দু'পা ধরে হ্যাঁচকা টান। কিন্তু কি-রকম হয়ে গেল যেন, জলের তলায় দুজনে একসঙ্গে লপটা-লপটি। গাঙ্গুলী মশাই যে এত ভারী আমি কল্পনা করতে পারিনি। আর শক্তিও তেমনি, চুলের মুঠি ধরে খপ করে আমাকে তুলেই ফেলল।

তারপরেই চক্ষু স্থির আমার। আমার চুলের মুঠি ধরে আছে সাক্ষাৎ যম অর্থাৎ বড়দা। গাঙ্গুলী মশাই তার তিন হাত দূরে পৈতে হাতে জপ করছে। তার পা টানতে গিয়ে আমি বড়দার পা ধরে টেনেছি!

তার পরের দুরবস্থার কথা আর বলে কি লাভ। আমার পয়লা শত্রু কাকীমা প্রায়ই বলে, মার খেয়ে খেয়ে বিড়ালের হাড় হয়ে গেল তবু যদি এক ফোঁটা জল দেখতাম চোখে! চোখের জলের সঙ্গে কারবার নেই বলেই অনেক সময় ডবল মার খেতে হয় আমাকে।

যাক, এবারে আসল কথায় আসি। একটা স্মরণীয় ঘটনা আমার এই জীবনে কেমন করে ঘটানো যেতে পারে? অর্থাৎ আমার এই শত্রুদের টিট আমি কেমন করে করতে পারি? এই পরিকল্পনা নিয়েই আমি মাঝে মাঝে মাথা ঘামাই।

আমাদের এই দেশটা তো কত মন্ত্রতন্ত্রর দেশ শুনি। অথচ আজ পর্যন্ত ভিখিরি ভণ্ড ছাড়া একটা সাধু দেখি না। কিন্তু যদি এমন হয় যে তেমন কোনো বিভূতি-অলা বিরাট সাধু আমাকে ভালবেসে ফেলল। সে বলল, কি বর চাস বল্।

আমি বলব, আমার শত্রুদের টিট করতে চাই।

—কে তোর শত্রু?

—আমার কাকীমা, কাকা, বড়দা আর দিদি।

সাধু জিজ্ঞাসা করল (করবেই), কাকীমাকে কি করতে চাস?

অনেক রকম শাস্তির কথা ভাবলাম। কিন্তু ঠিক মাথায় আসছে না বা পছন্দ হচ্ছে না। শেষে বললাম,
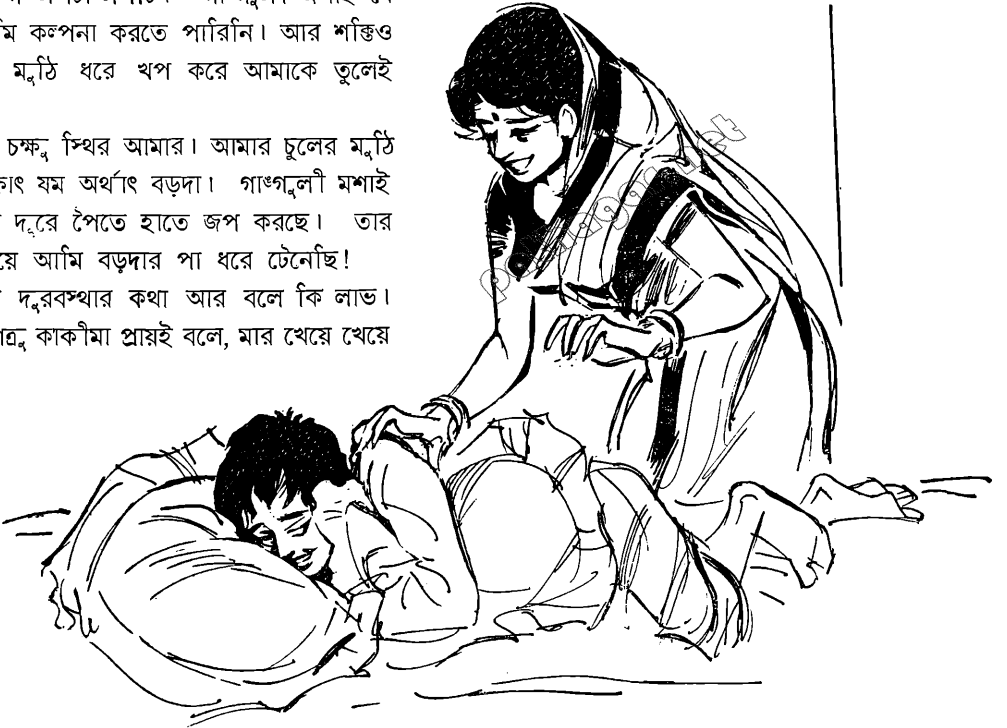
'আঃ! আমার মাথা ধরেছে।'

মন্ত্রগুণে আমাকে এমন মস্ত একজন করে দাও যাতে করে সকলের সব দুঃখু দূর করতে পারছি—আর কাকীমা তাই দেখে কাঁদবে আর বলবে, ও-যে এই হবে কে জানত! তার কান্না দেখে আমি খুব হাসব।...আর কাকীমার বুক-জ্বালা পেট-জ্বালা সারিয়ে দাও, অনেকটা আমার সেই মোটা-সোটা মিষ্টি-মিষ্টি মুখ মায়ের মতো করে দাও, যাতে সহজে আর রাগতেই না পারে।

সাধুর প্রশ্ন, তারপর তোর কাকার কি শাস্তি?

—কাকা খেটে খেটে সারা, আমার রোজগারে বুড়ো বয়সে সে পায়ের ওপর পা তুলে শুয়ে বসে কাটাক আর আরাম করে তামাক খাক। আমি যখন লোকের কাছে হেসে হেসে গল্প করব, কি মারটাই না খেয়েছি কাকার কাছে, কাকা যেন তখন ভয়ানক লজ্জা পায়।

সাধু জিজ্ঞাসা করবে, তারপর তোর বড়দা?

—বড়দাকে আপিসের পরীক্ষায় পাস করিয়ে মস্ত অফিসার করে বাইরে পাঠিয়ে দাও। আমার এক নম্বর শত্রু ওই কাকীমার কাছে বেশির ভাগ সময় আমি একলাই যেন থাকতে পাই।

সবশেষে সাধু জিজ্ঞাসা করবে, আর তোর দিদির কি শাস্তি?

—তাকে খুব একটা কড়া মেজাজের ভালো লোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও। কাকীমা প্রায়ই আজকাল তার বিয়ের কথা ভাবে। মোট কথা, দিদির বরটা দিদিকে যেন খুব কড়া শাসনে রেখে আমাকে মারা আর কাকীমার সঙ্গে ঝগড়া করার শোধ নেয়।"

উৎসবের দিন বিকেলে পা দুটো যেন বিলটুকে টেনে এনে ট্রেনে তুলে দিল।

বাড়ির সক্কলে—কাকা কাকীমা বড়দা দিদি, এমন কি পাড়ার মানুষেরাও ওকে দেখছে আর হাসছে মুখ টিপে টিপে।

বুক টান করেই বিলটু শেষ পর্যন্ত টাউন হল-এ প্রাইজ নিতে গেল। নিল—মস্ত কাপ একটা। কত-লোক কত ভালো ভালো কথা বলল রচনা সম্পর্কে—তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝল না বিলটু। মজা দেখার জন্য বাড়ির দঙ্গালসুদ্ধু টাউন হল-এ গেছে। তাদের এড়িয়ে বিলটু বাড়ি পালিয়ে এসেছে—তারপর সোজা নিজের ঘরে।

আধ-ঘন্টা বাদে কাকীমা ঘরে ঢুকে বলল, কি রে পাজী, শুয়ে আছিস যে বড়।

তার সাড়া পেয়েই বিলটু ও-পাশ ফিরে বালিশে মুখ গুঁজেছে। কাছে এসে কাকীমা কাঁধ ধরে টানল, এ-দিকে ফের বলছি!

—আঃ! আমার মাথা ধরেছে।

দেখি কে মাথা ধরেছে।—হাসতে হাসতে কাকীমা জোর করেই ওর মাথাটা নিজের দিকে ফিরিয়ে দিল।

তারপরেই অবাক। স্মরণীয় ঘটনাই যেন। বিলটু কাঁদছে।

আর, অবাক বিলটুও কম নয়। কাকীমা হাসছে বটে, কিন্তু তারও দুই গাল বেয়ে চোখের জল নেমেছে।

নেমন্তন্ন

[১৪৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ওরা শুধু বসে রইল নেমন্তন্ন পাবার আশায়।

বিয়ের দিন সন্ধ্যাবেলা।

কাজকর্ম সেরে বুলু উঠল ছাদে।

গরম কালের সন্ধ্যে। বাতাসে কোমল স্নিগ্ধতা। নিথর মেঘের ফাঁকে দেখা যায় একফালি চাঁদ। ছাদের কোণে রাখা ডালিম গাছটার ফাঁক দিয়ে অল্প-অল্প দেখা যাচ্ছে সেটাকে।

সুনীতাদের বাড়ীটা বুলুদের বাড়ীর উত্তর দিকে। পাঁচিলে দাঁড়ালে সব কিছু দেখা যায়। উৎসবের কোলাহল আর বেলফুল ও লুচির মিলিত সৌরভ বুলুর মনকে টেনে নিয়ে গেল সেই দিকে। চাইবো-না চাইবো-না করেও চোখ ফেরাতে পারল না। পা-পা করে এগিয়ে গেল।

পাঁচিলে বুক রেখে সুনীতাদের বাড়ীর দিকে ঝুঁকে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, বুলুর খেয়াল নেই। হঠাৎ খস্ খস্ শব্দে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল বিনু কখন এসে দাঁড়িয়েছে।

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল দুজনে। ডালিম গাছের পাতাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে। ভিজে যুঁই ফুলের একটা গন্ধ কোথা থেকে ভেসে এসে বাতাসটাকে ভারী করে তুলেছে। তন্ময় হয়ে সুনীতাদের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে আছে বিনু। দিদির সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ায় একটু লজ্জা পেয়ে অপ্রতিভের হাসি হেসে বলল, সানাইটা ভারী সুন্দর বাজাচ্ছে, না দিদি?

গভীর জঙ্গল। শ্বাপদসংকুল এ অরণ্যের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে কেউ চায় না এক সৈন্যবাহিনী ছাড়া। তাই নেফার পাহাড়ঘেরা এই অরণ্য অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়েছে মিলিটারী। আকাশ থেকে দেখা যায় না গোপন বিমান-ঘাঁটির রানওয়ে। নিখুঁত ক্যামোফ্লেজ একেই বলে। কাছে এলে চোখে পড়ে বিমান দৌড়োনোর মসৃণ পথ। বিমান রাখবার হ্যাঙগার। সৈন্যশিবির। আরো কত কি।

পাণ্ডব-বর্জিত এই দেশে হিংস্র জানোয়ারের ভয় ছিল। শত্রুপক্ষের ভয় ছিল। কিন্তু ডানপিটে যোদ্ধারা ভয় পায় নি। লৌহকঠিন স্নায়ু তাদের কোনোদিন বিচলিত হয় নি! হল একদিন। ভয়ংকর সেই দিন! পৃথিবীর চরম দুর্দিন ঘনিয়ে এল পৃথিবীর বাইরে থেকে—মহাশূন্য থেকে। কোটি কোটি মানুষ জানতেও পারল না কি নিষ্ঠুর নির্মম নিশ্চিহ্ন মৃত্যুর দিকে পলে পলে এগিয়ে চলেছে বিশ্ববাসী! সারা পৃথিবী যখন দৈনন্দিন কর্মসূচী নিয়ে মত্ত, তখন নেফার এই গহন অরণ্যে অভিনীত হল এক অবিশ্বাস্য নাটক।

অবিশ্বাস্য? হয়ত তাই। এখনো যখন সে কাহিনী ভাবি, মনে হয়, সত্যিই কি এ ঘটনা ঘটেছিল? সত্যিই কি মহাকাশ থেকে এসেছিল হুঁশিয়ার-বার্তা? মূর্তি-মান প্রহেলিকার মত অরণ্য-শীর্ষে চক্রাকারে পাক খেয়েছিল নিঃশব্দগতি ফ্লাইং সসার? বিস্ময় জাগে। মনে হয়, সবই বুঝি অলীক। অলীক সেই শ্বাসরোধী মুহূর্তগুলি। অলীক তাদের আবির্ভাব। অলীক তাদের তিরোধান।

কিন্তু ছায়াপথের সেই ছবিটি তো অলীক নয়। লক্ষ কোটি তারকার অবস্থান-চিহ্নিত সেই ছবিটি তো মিথ্যা নয়। আমি যা দেখেছি, তা এ যুগের যে কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানী না দেখেও হিসেব কষে বার করতে পারে। কিন্তু আমি দেখেছি তা নিজের চোখে।

দশ হাজার বছর আগেকার এক লুপ্ত অতীতের কয়েকটি রহস্য-মানব এসে দেখিয়েছে ছায়াপথের সেই ছবি......দেখিয়েছে পারার ধূমকেতুর গতিপথ......

পারার ধূমকেতু! কাল্পনিক বলেই মনে হয় বটে। কিন্তু এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবই কি আর ধারণায় আনা যায়? যায় না। আমরাও পারি নি পারার ধূমকেতুর সম্ভাবনাকে কল্পনায় আনতে। তাই শত-শতাব্দীর সর্বনাশ যখন আসন্ন, যখন সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ এই পৃথিবীর নিষ্প্রাণ হওয়ার আর বেশী দেরি নেই, ঠিক তখুনি দশ হাজার বছর আগেকার প্রেতমূর্তির

মত তারা এসেছিল ফ্লাইং সসার নিয়ে...এসেছিল... আমাদের হুঁশিয়ার করেছিল...কিন্তু মূর্খ আমরা... বন্ধুকে ভেবেছি শত্রু...হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও অবিশ্বাস করেছিলাম...শত্রুপক্ষের চর ভেবেছিলাম...

তারপর? তার পরের ঘটনা আরও ভয়ংকর। কিন্তু গোড়া থেকেই শোনা যাক!

আগেই বলে রাখি, আমি সামরিক বিভাগের কেউ নই। আমি অ্যাসট্রো-ফিজিসিস্ট। জ্যোতির্বিজ্ঞানের অসীম রহস্য আমাকে উন্মাদ করেছিল কলেজ-জীবন থেকেই। তাই জ্ঞানের সন্ধানে ছুটেছিলাম সুদূর মার্কিন দেশে। সেখানে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা সেরে যখন দেশে ফিরলাম, তখন আমার বয়স হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানস্পৃহা এতটুকু কমেনি—বরং বেড়েছে। বিশ্বরহস্য তার সীমাহীন অঙ্গন মেলে ধরেছে আমার অবাক চোখের সামনে। আমি অন্তরের অশান্তি নিয়ে ছটফট করছি। আরও জানতে চাইছি। চাঁদ ছাড়িয়ে, মঙ্গল ছাড়িয়ে, শুক্র ছাড়িয়ে, সৌরজগৎ ছাড়িয়ে ছায়াপথের দূর দূর গ্রহে প্রাণের বিকাশ ঘটেছে কিনা জানতে চাইছি। অথচ পারছি না। জ্ঞান-তৃষ্ণার এ জ্বালা যে না সয়েছে, সে বুঝবে না। আমি যেন সত্যিই উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম।

এই সময়ে ফ্লাইং সসারের ঘন ঘন আবির্ভাব ঘটতে লাগল ভারতের আকাশে। বিশেষ করে নেফার এই অঞ্চলে রহস্যময় উড়ন্ত চাকতিকে নক্ষত্রবেগে উড়তে দেখল অনেকে। কেউ আতংকিত হল। কেউ কৌতূহলী হল। আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম।

সামরিক বাহিনী কিন্তু সতর্ক হল। শত্রুপক্ষের নয়া কৌশল কিনা কে জানে! উড়ন্ত চাকতির ছদ্মবেশে নতুন ধরনের বিমান হয়ত টহল দিচ্ছে—দেশের সামরিক খুঁটিনাটির ছবি তুলে পগারপার হচ্ছে। তাই ওরা হুঁশিয়ার হল।

নেফায় আমি এসেছিলাম এই কারণেই। বিজ্ঞানী-মহলে আমি পরিচিত। কিন্তু সামরিকমহলেও যে আমার নাম আগ্রহের সঞ্চার করেছে, তা জানলাম নেফায় এসে। মিলিটারী বেসের এক হোমরাচোমরা অফিসার আমাকে বিলক্ষণ খাতির করলেন এবং তাঁর ডেরায় আমাকে থাকতে বাধ্য করলেন।

দিনসাতেকের মধ্যেই সেই উড়ন্ত রহস্যকে দেখা গেল। রাতের আঁধারে নয়, গোধূলির ছায়ামায়ায় নয়, মধ্যাহ্নের ঝলমলে আলোয় আবির্ভূত হল সেই প্রহেলিকা। আচম্বিতে সাইরেনের বিকট শব্দে আমরা চমকে উঠেছি। শত্রুপক্ষের বিমান নাকি? হন্তদন্ত হয়ে শিবির ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছি। তারপর স্তম্ভিত হয়ে গেছি শূন্যে ভাসমান বিচিত্র যন্ত্রটিকে দেখে।

ফ্লাইং সসার! নিঃসন্দেহে উড়ন্ত পিরিচ! অবিকল চায়ের পিরিচের মতই গোলাকার গড়ন। পিরিচের ওপর যেন উপুড়করা একটা বাটি। সেটাই উড়ন্ত যন্ত্রযানের ককপিট—কন্ট্রোল কেবিন। সূর্যা-লোকে ঝলমল করছে। চোখ ধাঁধিয়ে দেয়! প্ল্যানে-টেরিয়ামের মত বিশাল গম্বুজে বহু গবাক্ষ। কাঁচের মত স্বচ্ছ বস্তু দিয়ে আবৃত। কয়েকটি গবাক্ষ দিয়ে একই সঙ্গে ঘন নীল ও গাঢ় লাল দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আলোগুলো জ্বলছে আর নিবছে। কিসের সংকেত করছে যেন।

ফ্লাইং সসার এতদিন সবাই দেখেছে বিদ্যুৎরেখার মত চকিতে আকাশের এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্তে অপসৃত হয়েছে। তাই নিয়ে কতই না জল্পনাকল্পনা হয়েছে।

কিন্তু এ কী কাণ্ড! উড়ন্ত পিরিচ তো ছুটছে না! অবিশ্বাস্য বেগে মেঘের আড়ালে সে তো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে না! সাইরেনের বিকট কান্নায় কর্ণ বধির হবার উপক্রম; অথচ উড়ন্ত পিরিচের রহস্য-চালকরা তো ভয় পাচ্ছে না—শিউরে উঠে চম্পট দিচ্ছে না!

বিমানঘাঁটির বেতারে এবার শোনা গেল এক অদ্ভুত সংকেত—কারা যেন বিপদে পড়েছে...সাহায্য চাইছে... মানুষের শেষ দিন ঘনিয়ে আসছে...হুঁশিয়ার হতে বলছে। কিন্তু সংকেত-ভাষা ধরেও ধরা যাচ্ছে না।

সামরিক কর্তারা প্রমাদ গণলেন। বিমানবিধ্বংসী কামানগুলো প্রস্তুত হয়ে রইল। হুকুম পেলেই শুরু হবে বোমাবর্ষণ। বিশ্বাস নেই—কাউকে বিশ্বাস নেই! কে জানে উড়ন্ত পিরিচের ছদ্মবেশে প্রলয় ঘনিয়ে এসেছে কিনা!

সহসা উড়ন্ত পিরিচ দুলে উঠল। এতক্ষণ যা স্থির হয়ে ভাসছিল প্রখর সূর্যালোকে, আচম্বিতে তা দুলে উঠেই নামতে শুরু করল। নিঃশব্দে কিন্তু বিদ্যুৎগতিতে বিচিত্র আকাশযানের সেই অবতরণ-পর্ব দেখে আঁতকে উঠল মিলিটারী। সাজ-সাজ রব পড়ে গেল!

অবতরণ-ক্ষেত্রের ঠিক কেন্দ্রে নেমে পড়ল ফ্লাইং সসার। দেখে মনে হয়, যেন একটা অতিকায় বোতাম

অথবা কুমোরের চাকা। ভূমি স্পর্শ করতে না করতেই অটোমেটিক বন্দুক হাতে ঘিরে ধরল শান্ত্রীরা। বেচাল দেখলেই গুলি চালাবে। শত্রুর কারসাজি কত রকমের হতে পারে। কিন্তু নষ্টামি করে চম্পট দেওয়ার সব পথই বন্ধ। নিমেষে যন্ত্রযানকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য জোড়া জোড়া আগ্নেয়াস্ত্র উদ্যত।

সহসা ফ্লাইং সসারের নিচের একটা ঢাকনি খুলে গেল। একটা ধাতুর মই নেমে এল। মইয়ের ধাপে পা দিয়ে নেমে এল দুটি মূর্তি। দুটি মনুষ্যমূর্তি!

এ কী রহস্য! অন্য গ্রহের জীব কি তবে মানুষের মতই দেখতে? দিব্যি লম্বাচওড়া দুটি পুরুষ মূর্তি হন হন করে এগিয়ে এল আমাদের দিকে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ অবশ্য অন্য রকমের। মুখে তাদের হাসি। দুই হাত সামনে প্রসারিত।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সৈন্যবাহিনী। আমিও হতভম্ব। দুরু দুরু বুকে এতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম সৃষ্টিছাড়া জীবদের দেখবো বলে। না জানি কি বীভৎস তাদের গড়ন হবে, কি বিকট তাদের মুখশ্রী হবে! সিনেমায়, গল্পে গ্রহান্তরবাসীর চেহারার কত বর্ণনাই না পেয়েছি। কিন্তু কী আশ্চর্য! এরা তো দেখছি মানুষ!

আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল বিচিত্র পোশাকধারী দুই মূর্তি। হ্যাঁ, অবিকল মানুষ। দুই চোখে গভীর দৃষ্টি—শান্ত, সুন্দর, কিন্তু যেন কিছুটা উদ্বিগ্ন।

আচমকা কথা বলল ওরা। চমকে উঠলাম। কেন না, যে-ভাষায় ওরা সম্বোধন করল, তা সংস্কৃত—খাঁটি সংস্কৃত।

আমি চমকালাম সব চাইতে বেশি। কারণ, ওরা আমাকে নাম ধরে ডাকল। বলল,—"ডক্টর ভাণ্ডারী, আপনার সঙ্গেই কথা বলতে আমরা এসেছি।"

সৈনিকপুরুষরা হাঁ হয়ে শুনছিল আগন্তুক-দ্বয়ের সংস্কৃত-ভাষণ। প্রথমটা কিছু বুঝেও বোঝেনি। আমার কথা অবশ্য আলাদা। সংস্কৃত আমাকে জানতে হয়েছে জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটাতেই।

প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলাম। সংস্কৃত সম্বোধনের জবাব সংস্কৃততেই দিলাম। বললাম "তোমরা ফ্লাইং সসার থেকে নামলে। অথচ তোমরা —মানুষ। তবে কি অন্য গ্রহের জীব নও তোমরা? কে তোমরা?"

ওদের একজন বলল,—"ঠিক ধরেছেন। আমরা অন্য গ্রহের জীব নই। আমরা বাইরের গ্রহ থেকেও আসি নি। আমরা এ গ্রহেরই মানুষ। অনেক—অনেক বছর আগে হিমালয় অঞ্চলে আমরা থাকতাম। আমাদের দেশের নাম ছিল অষ্টনাগ। অষ্টনাগ সভ্যতার শীর্ষে উঠেছিল।"

আমি কপাল কুঁচকে বললাম,—"অষ্টনাগ-সভ্যতা? এ রকম কোনো সভ্যতার নাম তো আমি শুনিনি?"

ওরা বলল,—"কি করে শুনবেন? দশ হাজার বছর আগে আমাদের দেশ জ্ঞানের শিখরে উঠেছিল। মনের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে বস্তুজগতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। দশ হাজার বছর আগেকার সেই বিশাল সভ্যতার আজ আর কোনো চিহ্নই আপনি হিমালয় অঞ্চলে দেখতে পাবেন না। সব মুছে গেছে!"

আমার মাথা ঘুরতে লাগল। বললাম,—"তোমাদের মাথা কি খারাপ হয়েছে? দশ হাজার বছর আগে যদি কোনো সভ্যতা লোপ পেয়েও থাকে তো তোমরা কোত্থেকে এলে? হিমালয় অঞ্চলের সব রহস্য এখনো আমরা জানি নি। অনেক অজ্ঞাত সভ্যতার উত্থানপতন হয়ত সেখানে ঘটেছে—পুরাণে হয়ত তার আভাস আছে। কিন্তু তোমরা কে?"

ওরা ম্লান হাসল। বলল,—"ডক্টর ভাণ্ডারী, সেই কথাই বলতে আমরা এসেছি। এতদিন ধরে আমাদের পুষ্পক রথ নিয়ে পৃথিবীর সবদেশে চক্কর দিয়েছি, কিন্তু—"

বাধা দিয়ে বললাম,—"পুষ্পক রথ কি হে? ফ্লাইং সসারকে তোমরা পুষ্পক রথ বলো নাকি?"

ওরা বলল,—"আমরা শুধু নয়, আপনাদের পুরাণেও তো তাই বলে। এ যুগে আপনারা আমাদের পুষ্পক রথেরই নাম দিয়েছেন উড়ন্ত পিরিচ—ফ্লাইং সসার। কত বছর হয়ে গেল, পৃথিবীকে পাক দিচ্ছি। কত জায়গায় নেমেছি। কিন্তু সবাই ভয় পেয়েছে। আমাদের নিয়ে কত জল্পনাকল্পনা হয়েছে কাগজে কাগজে। কত মিথ্যে গুজব ছড়িয়েছে। কত আতংক কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কাউকে বলবার সুযোগ পাই নি যে, আমরাও মানুষ—দশ হাজার বছর আগে এই পৃথিবীতেই আমরা ছিলাম।

"তারপর দশ হাজার বছর আমরা একনাগাড়ে ঘুমিয়েছি। ঘুম ভাঙার পর থেকেই আমরা হন্যে হয়ে ঘুরছি পৃথিবীবাসীকে সজাগ করার জন্যে। বিপদ আসছে। চরম বিপদ! মহাশূন্য থেকে সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে। পৃথিবী নিষ্প্রাণ হতে আর বেশী দেরি নেই! ডক্টর ভাণ্ডারী, বিশ্বাস করুন, এমন

একজনকেও পাই নি যাকে একথা বলা যায়—যাকে দিয়ে পৃথিবীর প্রত্যাসন্ন বিপদকে ঠেকানো যায়! কিন্তু আপনি ব্যতিক্রম। আপনার সমস্ত খবর আমরা মহাশূন্যে বসেই জেনেছি। কি করে জেনেছি? আপনাকে বললাম তো মনের শক্তিতে আমরা শক্তিমান। মন দিয়ে আমরা পারি না এমন কাজ নেই। মহাশূন্যে বসেও তাই আমরা আপনাকে খুঁজে বার করেছি।

"আপনাকে এ-অঞ্চলে আনার জন্যেই আমরা ঘন ঘন এখানকার আকাশে দেখা দিয়েছি। আমাদের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। আপনি এসেছেন। আমরাও নেমেছি। হাতে আর বিশেষ সময় নেই। শুনুন আমাদের কাহিনী।"

অষ্টনাগের বৈজ্ঞানিকরা দিবারাত্র হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে অভিনব এই যন্ত্রের প্রথম মডেলটা প্রায় শেষ করে এনেছেন, এমন সময়ে মহাশূন্য থেকে এল মহাকাশের শমন, ধ্বংসের দেবতার প্রলয়-নৃত্যের আর বুঝি দেরি নেই!

সেদিনের কথা আমাদের আজও মনে পড়ে। ভোর হয়েছে। ঊষার অরুণাভা পূব দিগন্তকে রাঙিয়ে তুলেছে। এমন সময়ে দিকচক্রবালের ঠিক ওপরে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। যেন একটা জলন্ত ঝাঁটা নেমে আসছে পৃথিবীর দিকে!

আমি দেখেই বুঝেছিলাম ধূমকেতু। বিশাল একটা ধূমকেতু—ঝাঁটার মত যার আকার, সূর্যের প্রতিফলিত

আমরা অন্য গ্রহের জীব নই।

অষ্টনাগে আমরা যে সভ্যতা গড়ে তুলেছিলাম, তা আপনারা কল্পনাতেও আনতে পারবেন না। আপনাদের মহাভারতে তার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু দুপাতা ইংরেজীপড়া অল্প বিদ্যায় বিদ্বানরা সে সব কাহিনী বুজরুকি বলে উড়িয়ে দেন। এই যে পুষ্পক রথ আপনারা দেখছেন—যা নিয়ে আপনাদের গবেষণার অন্ত নেই—এ পুষ্পক রথেও আমরা খুশী হইনি। যন্ত্রযানে চেপে মহাকাশে বিচরণ করায় অনেক ফ্যাসাদ। আমরা তাই এমন একটা যন্ত্রের কথা ভাবছিলাম যার কল্যাণে নিমেষমধ্যে ছায়াপথের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে উপস্থিত হতে পারব। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা কল্পকাহিনীর ভক্ত, তাঁরা অবশ্য এ যন্ত্রের নাম দিয়েছেন টেলিপোর্টেশন মেশিন। অর্থাৎ সুইচ টিপলেই গন্তব্য স্থানে পোঁছোনো যাবে ইথারের মধ্যে দিয়ে।

আলোয় যার সমগ্র দেহ যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

আমরা দুজনেই দেখলাম আগুয়ান ধূমকেতুর ভয়ংকর রূপ। দেখেই মতলব স্থির করে ফেললাম। পুষ্পক রথে চেপে সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে উঠলাম। উদ্দেশ্য ছিল ধূমকেতুর কাছে গিয়ে অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করা। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা।

নক্ষত্রবেগে আমাদের পুষ্পক রথ ধূমকেতুর কাছে গিয়ে পোঁছোলো। ধূমকেতুর গতিবেগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরা ছুটে চললাম। গোটা ধূমকেতুকে এক-পাক ঘুরেও এলাম। তাজ্জব হলাম তখনি।

কারণ, এ ধূমকেতু সাধারণ ধূমকেতু নয়। অনেক রকম ধূমকেতু ছায়াপথে ঘোরাফেরা করে, কিন্তু পারার ধূমকেতুও যে থাকতে পারে, তা সেই প্রথম জানলাম। তরল পারদ—যা কিনা ব্রহ্মাণ্ডের সব চাইতে ভারি বস্তু—তাই দিয়েই গড়া এই ছায়াপথ—যাযাবরের

প্রলয়-কলেবর।

পুষ্পক রথে অঙ্ক কষার যন্ত্রপাতি চালু করে দিলাম। দেখলাম, পারদ-ধূমকেতু যত প্রলয়ংকরই হোক না কেন, পৃথিবীর ওপর আছড়ে তো পড়ছেই না, বরং বেশ খানিকটা নিরাপদ ব্যবধানে ফের উধাও হয়ে যাচ্ছে মহাশূন্যে।

হিসেবে আমাদের ভুল হয়নি। কিন্তু এর পরেই এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটল যার জন্যে আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

আচমকা পারদ-ধূমকেতুর মাথার কাছে খানিকটা পারা ফুলে উঠে ছিটকে বেরিয়ে এল। তরল পারার বিশাল একটা পিণ্ড শূন্যপথে ছুটে চলল পৃথিবীর দিকে!

সর্বনাশ! পৃথিবীর টানেই যে এ কাণ্ড ঘটেছে, তা বুঝতে এক সেকেণ্ডও লাগল না। ধূমকেতুটার দেহ তরল পারায় গড়া, না হলে এ সর্বনাশ ঘটত না। চাঁদের টানে যেমন সমুদ্রের জল ফেঁপে ওঠে, ঠিক তেমনি ভাবেই পৃথিবীর টানে ধূমকেতুর পারা ছুটে চলল পৃথিবী লক্ষ্য করে।

আমরা নিরুপায় হয়ে তাকিয়ে রইলাম। করবার কিছুই ছিল না। নিয়তির মার একেই বলে। তা না হলে তরল পারার বিশাল তরঙ্গ আমাদের অষ্টনাগ অঞ্চলেই এসে আছড়ে পড়বে কেন?

যেন একটা উপসাগর ভেঙ্গে পড়ল হিমালয় অঞ্চলে। পড়ল ঠিক অষ্টনাগ অঞ্চলেই। যুগ যুগ ধরে যে সভ্যতা উন্নতির শিখরে উঠেছিল, নিমেষে তা চুরমার হয়ে গেল গুরুভার পারদের প্রচণ্ড সংঘাতে। আকাশচুম্বী ইমারত-গুলো বালির প্রাসাদের মত চোখের সামনে ভেঙে পড়ল। অসহায় চোখে আমরা দেখলাম, মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের সাধের অষ্টনাগের আর কোনো চিহ্নই রইল না। ফুলে-ফুঁসে পারার উপসাগর দিকে দিকে প্রবাহিত হল। যেখানে যা ছিল, সব নিশ্চিহ্ন করে দিল।

ধূ-ধূ মহাশ্মশানের ওপর উন্মাদের মত চরকিপাক খেতে লাগল আমাদের পুষ্পক রথ। কোথায় যাব? কোথায় নামব? অষ্টনাগই আমাদের ঘর। সে ঘর যে নিশ্চিহ্ন করেছে, ঐ তো সেই পারার ধূমকেতুর পুচ্ছ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। তবে কি আমরা ধূমকেতুর পেছনেই ধাওয়া করবো?

কর্তব্য স্থির করতে কয়েক মিনিট লাগল। সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যানমত কাজ শুরু করলাম। আমরা দুজনেই বৈজ্ঞানিক। মানবকল্যাণ আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। তাই সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতি নিয়ে আঁকজোক করতে বসলাম। প্রলয়-ধূমকেতুর গতিপথ বার করতেই হবে। তাহলেই দূর ভবিষ্যতে আবার যখন সেই পথে ধূমকেতু হানা দেবে পৃথিবীর আকাশে, তখন যেন ভবিষ্যতের পৃথিবী হুঁশিয়ার হতে পারে।

মাস কয়েক গেল হিসেব শেষ করতে। পুষ্পক রথের হিসাব-কক্ষে বসেই ছবি আঁকলাম। ছায়াপথের অগণিত তারকার মধ্যে দিয়ে যে পথে প্রলয়-ধূমকেতু আবার ফিরে আসতে পারে পৃথিবীকে লক্ষ্য করে, তা এঁকে ফেললাম। কালো বোর্ডের ওপর ডিম্বাকার গতি-পথের দিকে তাকিয়ে দেখে বুঝলাম, আরও দশ হাজার বছর পরে পারার ধূমকেতুর পুনরাবির্ভাব ঘটবে পৃথিবীর আকাশে।

দশ হাজার বছর! দশ হাজার বছর পর পারদ-ধূমকেতু পুচ্ছ উড়িয়ে আসবে পৃথিবীর আরও অনেক মহাদেশের সর্বনাশ করতে! কিন্তু কি করি? কি করে রোধ করা যায় তার সর্বনাশা অভিযান?

ভেবে ভেবে সে পথও এক সময় বেরুলো। ঠিক করলাম, এমন একটা প্রচণ্ড যন্ত্র সৃষ্টি করব—যা দিয়ে পারদ-ধূমকেতুকে মহাশূন্যেই ধ্বংস করা যাবে। কিন্তু তার জন্যে দশ হাজার বছর প্রতীক্ষা করা দরকার।

কিন্তু অতকাল প্রতীক্ষা করা কি করে সম্ভব? সে উপায়ও স্থির করলাম। আপনারা এখন যাকে 'সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশন' বলেন, আমাদের যুগে তা চালু ছিল। কুম্ভকর্ণের মত আমরা হিম-ঘুম ঘুমোতে পারতাম। হিমাঙ্কে নামিয়ে আনা হত শয়নকক্ষের তাপমাত্রা, তারপর সেই কনকনে ঠাণ্ডায় আমরা মৃতের মত নিশ্চল হয়ে ঘুমোতাম। কয়েক শ বা কয়েক হাজার বছর একটানা ঘুমোলেও আমরা বুড়িয়ে যেতাম না। আপনারা এখন এই হিম-ঘুম নিয়ে জোর গবেষণা করছেন। কেননা, মহাকাশে রকেট নিয়ে অভিযান চালাতে গেলে হিম-ঘুম আয়ত্ত করতেই হবে। মহাশূন্যে এক নক্ষত্র থেকে আর এক নক্ষত্রের জগতে যেতে কয়েক পুরুষ কেটে যায়, হিম-ঘুম ছাড়া এ দীর্ঘ সময় রকেটে কাটানো কোনো মতেই সম্ভব নয়।

আমরাও তাই ঠিক করলাম, দশ হাজার বছরের জন্যে একনাগাড়ে হিম-ঘুম ঘুমোবো। অটোমেটিক মেশিন চালু থাকবে। দশ হাজার বছর পরে আপনা হতেই ঘুম ভাঙবে। তাছাড়া আরো একটা জিনিস হবে। পুষ্পক রথ সূর্যের শক্তিতে চলে। কাজেই এই দশ হাজার বছর

ধরে পৃথিবীকে সূর্যের শক্তিতে প্রদক্ষিণ করবে পুষ্পক রথ। পৃথিবীর লোক অবশ্য দেখতে পাবে না, কেননা রথ থাকবে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে পঁচাত্তর হাজার মাইল ঊর্ধ্বে।

একনাগাড়ে কথা বলার পর আগন্তুকরা থামল। মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিলাম আমি। আমি যাঁর অতিথি, সেই সামরিক অফিসারও ভ্রূকুঞ্চন করে বসেছিলেন।

কিছুক্ষণ থমথমে নৈঃশব্দের পর আমি শুধোলাম,—"ধূমকেতু-ধ্বংসের যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন?"

"করেছি।"—বলল একজন আগন্তুক।

"দেখাবেন?"—শুধোলাম আমি।

"নিশ্চয়। আসুন।"—বলে ওরা আমাকে এবং মিলিটারী অফিসারকে নিয়ে গেল ফ্লাইং সসারের মধ্যে। বিশাল গম্বুজের মধ্যে ঢুকে চক্ষুস্থির হয়ে গেল আমার। বিশ্বের বহু শ্রেষ্ঠ গবেষণাগারে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু এত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিতে ঠাসা এমন আজব ল্যাবরেটরী আমি জীবনে দেখিনি। হরেক রকম কলকব্জার কোনোটাই আমি চিনতে পারলাম না। এত জটিল যন্ত্রবিজ্ঞান যারা আয়ত্ত করেছে, তারা যে সাধারণ পুরুষ নয়—তা দেখলেই উপলব্ধি হয়। আগন্তুকরা যে শুধু মনোবিজ্ঞান নয়, বস্তুবিজ্ঞানেও চরম উন্নত, তা আমি নিজে বৈজ্ঞানিক হয়ে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম।

গম্বুজ-গবেষণাগারের ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটা মস্ত ব্ল্যাকবোর্ড। তার ওপরে ছায়াপথের ছবি আঁকা। কালো মহাকাশে নক্ষত্রের কুচি। একটি মাত্র ডিম্বাকার রেখা ঘিরে রয়েছে সমস্ত ছায়াপথটিকে। বুঝলাম এটাই হল পারার ধূমকেতুর গতিপথ।

একদৃষ্টে চেয়েছিলাম কালো বোর্ডে আঁকা ছায়াপথের নিখুঁত মানচিত্রের দিকে। বিস্ময় আর অবিশ্বাস যেন একসাথে তালগোল পাকিয়ে এক দুরূহ ধাঁধার সৃষ্টি করেছিল আমার মাথায়।

আগন্তুকদের একজন বলল,—"আর বেশি সময় নেই। পারার ধূমকেতুর আসবার সময় হয়ে গিয়েছে। অটোমেটিক যন্ত্রের সাহায্যে ধূমকেতু-ধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রটা এবার আমরা নিক্ষেপ করব। কিন্তু আমাদের কোনো কাজে কেউ বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না।"

আমি ওদের ইচ্ছে তর্জমা করে বললাম সঙ্গী অফিসারকে। উনি বললেন—"বেশ তো, তার আগে ডক্টর ভাণ্ডারীর সঙ্গে আমি একটু গোপন আলোচনা করতে চাই। আপনারাও আসুন।"

দুই আগন্তুককে ডেকে নিয়ে আমরা উড়ন্ত পিরিচের বাইরে এলাম। জমিতে নেমে ওরা একটু দূরে দাঁড়াল। মিলিটারী অফিসার হঠাৎ পুরোদস্তুর মিলিটারী হয়ে গেলেন। কয়েকজন অধস্তন অফিসারকে ডেকে নিম্নকণ্ঠে কি সব হুকুম দিতে লাগলেন। ওরা ফ্লাইং সসার ঘিরে ছুটোছুটি করতে লাগল।

আমি অবাক হয়ে বললাম,—"একী করছেন? সময় কম, ওরা যা করতে চাইছে করতে দিন।"

মুচকি হেসে অফিসার বললেন,—"ওদের গালগল্প আপনিও বিশ্বাস করেছেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওরা পৃথিবীর কেউ নয়। পৃথিবীর বাইরে থেকে এসেছে পৃথিবীকে জয় করতে। মানুষের ছদ্মবেশে সংস্কৃত বুলি আউড়ে ওরা আপনাকে ধোঁকা দিয়েছে। কিন্তু আমি এত বোকা নই। বিনা বাধায় ওদের যন্ত্রপাতি নাড়তে দেওয়া মানেই আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনা।"

এমন সময় চোখ আমার পড়ল আগন্তুকদের ওপর। ওরা পলকহীন চোখে তাকিয়ে ছিল সঙ্গী অফিসারের দিকে। আমি তাকাতেই একজন বলল, "আগেই বলেছি আমাদের মনের শক্তি অসীম। আপনার বন্ধুর ভাষা আমরা জানি না, কিন্তু তার মনোগত অভিপ্রায় আমরা জেনে ফেলেছি। তাই আমরা চললাম। বিদায়, বন্ধু, বিদায়।"

বলেই তারা দৌড়োলো ফ্লাইং সসারের সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ির গোড়ায় দুজন শান্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিল। আগন্তুকদের রোখবার জন্যে বন্দুক তুলল তারা। কিন্তু তার আগেই একজন আগন্তুক কোমর থেকে একটা বল বার করে মাথার ওপর তুলল। সঙ্গে সঙ্গে নীল আলোর ঝলকানি দেখা গেল বলের মধ্যে। আলোক-রশ্মি ধেয়ে গেল শান্ত্রী দুজনের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে তারা পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত অবশ দেহে বসে পড়ল।

নিঃশব্দ নীল বিদ্যুতের এই আশ্চর্য শক্তিহরণ ক্ষমতা দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দেখলাম, আগন্তুকরা অন্তর্হিত হয়েছে উড়ন্ত পিরিচের মধ্যে। দেখতে-দেখতে ধাতুর সিঁড়ি অদৃশ্য হল ভেতরে। ডালা বন্ধ হয়ে গেল এবং শূন্যে উঠল ফ্লাইং সসার।

সহসা তীক্ষ্ণকণ্ঠের চীৎকারে চমকে উঠলাম। হুকুম দিচ্ছেন অফিসার। বিমান-বিধ্বংসী কামানে শেল লোড

করছে গোলন্দাজ। আর একজন কামানের নল ঘুরিয়ে তাক করছে পুষ্পক রথকে।

যে মুহূর্তে কামান থেকে শেল নিক্ষিপ্ত হবে, ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎচমকের মতই একটা চিন্তা খেলে গেল আমার মস্তিষ্কের কোষে কোষে। লাফিয়ে এগিয়ে গেলাম আমি। কামানের লক্ষ্য যে স্থির করছিল, তাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিলাম। আর তক্ষুণি বিপুল গর্জনে মাটি থর থর করে কেঁপে উঠল, কিন্তু গোলা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। উড়ন্ত পিরিচ মেঘের আড়ালে অন্তর্হিত হল নক্ষত্রবেগে।

বাজের মত হুঙ্কার দিলেন অফিসার,—"ডক্টর ভাণ্ডারী! এ কী করলেন! এ যে বিশ্বাসঘাতকতা! এর শাস্তি আপনাকে পেতে হবে!"

আমি তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি। রুদ্ধশ্বাসে শুধু বললাম,—"দেখুন!"

চোখ তুললেন অফিসার।

দূর দিগন্তে দেখা গেল সুবিশাল এক পুচ্ছ।

যেখানে যা ছিল, সব নিশ্চিহ্ন...

জ্যোতির্ময় পুচ্ছের বর্তুলাকার অগ্রভাগ যেন জ্বলছে সূর্যালোকে! ঠিক যেমনটি বর্ণনা করেছিল আগন্তুকরা। পারদ-ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটেছে পৃথিবীর আকাশে! দশ হাজার বছর পর প্রলয়-ধূমকেতু ফিরে এসেছে পারার তরল স্রোতে জনপদের পর জনপদ নিশ্চিহ্ন করে দিতে!

এর পরেই আকাশে যে নাটক অভিনীত হল, তা আরো ভয়ানক।

মেঘের আড়াল থেকে সহসা আবির্ভূত হল অন্ট-নাগের পুষ্পক রথ। খসে-পড়া তারার মতই উল্কা-বেগে সিধে ধেয়ে গেল পারার ধূমকেতুর দিকে। গতি-পথ দেখেই শিহরিত হলাম আমি। মুখোমুখি সংঘর্ষের জন্য একান্ত লালায়িত উড়ন্ত পিরিচ, যেন ধূমকেতুর পারদ-কবরে সমাহিত হবার জন্যেই উন্মত্ত হয়েছে পুষ্পক রথ! কিন্তু কেন? কেন এই আত্মঘাতী অভিযান?

জবাব পেলাম সঙ্গে সঙ্গে। মনে পড়ল, আগন্তুকরা বলেছিল, অটোমেটিক যন্ত্রের সাহায্যে ওরা ধূমকেতু-ধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করবে। কিন্তু তার সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু সে সুযোগ আমরা দিই নি। অটোমেটিক যন্ত্র ওরা তাই চালু করতে পারে নি। কিন্তু ধূমকেতুর করাল মূর্তির আবির্ভাব ঘটেছে। অগত্যা ওরা নিজেরাই ক্ষেপণাস্ত্র হয়ে গিয়েছে। ধূম-কেতু-ধ্বংসী যন্ত্র নিয়ে নিজেরাই এগিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের কেন্দ্রে—প্রলয়ের জঠরে......

পরমুহূর্তেই চোখের সামনে দেখলাম আকাশ-নাটকের শেষ দৃশ্য। আলোকরশ্মির মত তীব্র গতি-বেগে ধূমকেতুর মাথার মধ্যে কি যেন প্রবেশ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রলংকর বিস্ফোরণ ঘটল।

কয়েক মিনিট পর দেখা গেল, ধূমকেতুর আর চিহ্ন নেই। পারার পিণ্ড মহাশূন্যেই বিলীন হয়ে গিয়েছে।

অভিভূতের মত চেয়েছিলেন মিলিটারী অফিসার। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলতেই বললেন,—"সরি, ডক্টর ভাণ্ডারী! কিন্তু আপনি কি করে বুঝলেন যে, ওরা মিথ্যে বলেনি?"

"ওদের ব্ল্যাকবোর্ডে আঁকা ছায়াপথের ছবি দেখে। আমি ছায়াপথ নিয়ে গবেষণা করছি। আমি জানি, যুগ যুগ ধরে ছায়াপথে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ক্রমাগত পালটে যাচ্ছে। রাতের আঁধারে আকাশে তাকিয়ে

[শেষাংশ ১৬১ পৃষ্ঠার নীচে দ্রষ্টব্য]

[**ধর্মধর** ঠাকুরের গৃহ-বহির্ভাগ পার্শ্বে রাজপথ। সকাল বেলা। চারজন ধূর্ত প্রবঞ্চক ধর্মধরকে ডাকছে।]

১ম॥ ধর্মধর ঠাকুর বাড়ী আছেন?

২য়॥ ধর্মধর ঠাকুর!

৩য়॥ নেই।

৪র্থ॥ তা হলে গঙ্গাস্নানে গেছে।

১ম॥ এখনি ফিরবে। একটু অপেক্ষা করা যাক্।

২য়॥ এ অঞ্চলে এই একটি মাত্র লোক যে কাউকে ঠকায় নি। আর যাকে আমরা ঠকাই নি।

৩য়॥ সেতো ইচ্ছে করেই ঠকাই নি। নইলে আজ আমরা এখানে কী করে আসতাম—কার কাছে গচ্ছিত রাখতাম......আমাদের হক্কের ধন।

২য়॥ ঠাকুরের কাছে এই টাকাটা যে আমরা রেখে যাচ্ছি—ফিরে এসে পাব তো!

৩য়॥ সে বলতে হবে না। এ অঞ্চলে এই একটি মাত্র লোকই আছে যাকে—আমরা যে আমরা—আমরাও বিশ্বাস করতে পারি।

৪র্থ॥ সে নিশ্চয়।

১ম॥ এখানে না রাখলে আর রাখছিই বা কোথায়! দেশ-বিদেশে তো আর এতগুলো টাকা সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে পারি নে।

২য়॥ তা ঠিক। চুরির ওপর বাটপাড়ির ভয়ই বেশী।

৩য়॥ নাঃ বুড়ো ফিরতে বড্ডো দেরি করছে!

কাজীর বিচার

মন্মথ রায়

('হক্কের ধন' কথাটি শুনে আর তিনজন হো হো করে হেসে উঠল।)

১ম॥ হক্কের ধনই বটে!

৩য়॥ তা ছাড়া কি! চুরি বাটপাড়ি কি ব্যবসা নয়?

২য়॥ তা ঠিক। কোন্ ব্যবসায় চুরি-বাটপাড়ি নেই!

৪র্থ॥ শাস্ত্রে আছে—চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা!

১ম॥ নিশ্চয়। নইলে এই চারটি বেকার লোক বিদেশে গিয়ে এক মাসে চারটি হাজার টাকা রোজগার করে নিয়ে এলুম! গায়ে একটি আঁচড়ও লাগে নি! আর কোন ব্যবসায় আমাদের এটা হত?

৪র্থ॥ বাজে গল্প না করে কাজের কথা বল দিকি—

১ম॥ যা বলেছ। এবার সাজব আমরা স্যাক্‌রা, বুঝলে?

২য়॥ স্যাকরা!

১ম॥ হ্যাঁ, স্যাকরা। ফোঁটা তিলক কেটে...স্যাকরা সেজে এবার আমরা পাণ্ডুয়ায় গিয়ে স্যাকরার দোকান দিচ্ছি—আমরা এবার পরম বৈষ্ণব, বুঝলে?

৩য়॥ পরম বৈষ্ণব।

৪র্থ॥ বকধার্মিক। বুঝলে না?

১ম॥ স্যাকরার দোকান। বাইরে বসব আমি। আমার বুলি হবে "গোপাল!" "গোপাল!" বুঝলে? [২য়কে] তোমার হবে "কেশব! কেশব!" তুমি যে ঘরে

বসে কাজ করবে—তার পাশের ঘরে বসবে [৩য়কে] তুমি। তোমার বুলি হবে "হরি! হরি।" খিড়কির দোরের কাছে যে ঘরটি থাকবে—সেখানে বসে কাজ করবে—[৪র্থকে] তুমি...তোমার বুলি হবে "হর। হর।"—

২য়॥ মানে সোনার জিনিস গড়তে সোনা নিয়ে লোক এল। আমি তা দেখেই তোমায় লক্ষ্য করে বলব, ...কে-সব? কে-সব?

১ম॥ যারা এল...যদি আমি বুঝি...তারা গো-বুদ্ধি...বলব...গো-পাল! গোপাল! তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব।

৪র্থ॥ আমরা যদি বুঝি...শিকার ভালো। [৩য়কে] পাঠিয়ে দেব তোমার কাছে।

৩য়॥ আমি বলব হরি? হরি? মানে হরণ করি?

৪র্থ॥ আমি সব দেখে শুনে যখন বলব "হর! হর!"

৩য়॥ তখনই আমি "হরি! হরি!" বলেই... বুঝেছি!

১ম॥ বুঝেছ?

আর তিনজন॥ বুঝেছি।

১ম॥...[৩য়কে] তুমিও...একলম্ফে...আমারও... লম্ফে-লম্ফে—।

৪র্থ॥ হরির কৃপায় দশজনে খায়

আমরাই কেন খাব না।

(সকলে গান ধরিল।)

[বৃদ্ধ ধর্মধর সাধু গঙ্গাস্নান করে ফিরে এলেন।]

ধর্মধর॥ কি হে! তোমরা কতক্ষণ?

(সকলে ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করল।)

১ম॥ আজ্ঞে বিদেশে চার বন্ধু ব্যবসা করতে গিয়েছিলুম......কাল ফিরেছি—আজই আবার চলে যাচ্ছি—

ধর্মধর॥ আজই চলে যাচ্ছ! কেন হে, দেশে এসেছ —দুদিন থাকো—

২য়॥ আজ্ঞে, আপনার শ্রীচরণের আশীর্বাদে ব্যবসাটা দিব্যি—

ধর্মধর॥ ফেঁপে উঠেছে। বেশ! বেশ! তা ব্যবসাটা কিসের হে?......

(চারজনের মধ্যেই ত্বরিত দৃষ্টি বিনিময়।)

১ম॥ আজ্ঞে সোনা রূপোর ব্যবসা!

ধর্মধর॥ বেশ! বেশ! তা আমার এখানে...?

১ম॥ আজ্ঞে, একটু কথা ছিল—

ধর্মধর॥ বল—

২য়॥ আজ্ঞে একটু গোপনে—

ধর্মধর॥ গোপনে! তা আর ত এখানে কেউ নেই! বল না হে।

১ম॥ আজ্ঞে আপনার শ্রীচরণের আশীর্বাদে আমরা কিছু জমিয়েছি!

ধর্মধর॥ বেশ! বেশ! ভারি খুশি হলুম!

২য়॥ তা সেটা আপনার কাছেই গচ্ছিত রেখে যেতে চাই—

ধর্মধর॥ কেন হে?

৩য়॥ বিদেশ বিভূঁয়ে অতগুলো টাকা—

ধর্মধর॥ কত?

১ম॥ অতি সামান্য—অতি সামান্য মাত্র চারটি হাজার—

ধর্মধর॥ বেশ দাও। পরের বোঝা বয়ে বয়েই আমার দিন গেল।

৪র্থ॥ মহাজন। মহাজন! কবি বলেছেন মহাজনের লক্ষণই এই!

ধর্মধর॥ চিনির বলদের লক্ষণও এই! তা দাও। সবই টাকা?

১ম॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—[টাকার থলিটি বের করে] চলুন ভেতরে—গুনে দিচ্ছি—

ধর্মধর॥ গুনবে আবার কি হে! তোমরা কি মিছে বলছ!

৪র্থ॥ বিশ্বাস! বিশ্বাস! কবি বলেছেন, বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর!

১ম॥ কিন্তু একটা সর্ত আমাদের রইল যে, আমরা চারজন এক সংগে এসে চাইলে তবে আপনি টাকা আমাদের দেবেন—নইলে দেবেন না! বুঝেছেন তো— চারজনের উপার্জন—চারজনের সমান ভাগ!

ধর্মধর॥ 'চারজন এক সংগে এসে টাকা চাইলে তবেই টাকা দেব—নইলে দিতে পারব না'—বেশ। [টাকার থলি নিয়ে] আচ্ছা তা হলে আমি আসি— আমার আবার পুজোয় বসতে হবে।

সকলে॥ আসুন! প্রণাম হই—প্রণাম। [সকলে প্রণাম করল]

ধর্মধর॥ ধর্মে মতি হোক বাবা, ধর্মে মতি হোক! [গৃহমধ্যে প্রস্থান]

১ম॥ তাহলে চল—

২য়॥ কেশব! কেশব!

১ম॥ গোপাল! গোপাল!

৩য়॥ হরি! হরি!

৪র্থ॥ হর! হর!

(গোয়ালার প্রবেশ।)

গোয়ালা॥ চাই দই! খাসা দই!

১ম॥ দধি যাত্রা।

গোয়ালা॥ দেখেই যদি যাত্রা শুভ।
খেলে হবে আরো শুভ॥

৩য়॥ ঠিক—

৪র্থ॥ কবি প্রশ্ন করেছেন—
"দেখার চেয়ে খাওয়া ভালো
কোন জিনিসটি সই?

গোয়ালা॥ সে আমারই দইরে দাদা,
সে আমারই দই॥"

১ম॥ কিন্তু ট্যাঁকে যে পয়সা নেই, সবই যে দিয়ে দিলুম।

২য়॥ তাই তো!

৩য়॥ হরি! হরি!

৪র্থ॥ হর! হর!

(গোয়ালাকে আক্রমণ করে আর কি।)

১ম॥ না-না, এটা হচ্ছে যাত্রার জিনিস! এখানে ওটা উচিত হবে না! [৪র্থকে] যাও না একটা টাকা চেয়ে নিয়ে এস—

৪র্থ॥ একলা গেলে দেবে কেন?

২য়॥ না দেয়, আমরা এখান থেকে বলে দিচ্ছি!

৪র্থ॥ [যেতে যেতে]
দেখার চেয়ে খাওয়া ভালো
কোন্ জিনিসটি সই?

গোয়ালা॥ সে আমারই দইরে দাদা,
সে আমারই দই॥

(৪র্থ চলে গেল। গোয়ালা গান করতে লাগল। এরা তিনজন দইয়ের ভাঁড়গুলি দেখা শোনা করতে লাগল।)

—গোয়ালার গান—

যাত্রা শুভ দেখলে দধি,
থাকবে সুখে নিরবধি;
এ দধি যে তুলবে মুখে
ভুলবে ভুবন আমা বই!
দধি আমার মধু-ঢালা,
জুড়ায় খেলে সকল জ্বালা
দধির গুণে বধির শুনে,
বোবার মুখেও ফোটে খই।

তিনজনে॥ দেখার চেয়ে খাওয়া ভালো
কোন্ জিনিসটি সই?

৪র্থ॥ [ভেতর থেকে—চীৎকার করে] তোমরা এস। তোমরা তিনজন না এলে ধর্মঠাকুর আমায় টাকা দিচ্ছেন না—

এরা তিনজন॥ [চীৎকার করে] দিন্—দিন—ঠাকুর মশাই, একটা টাকা ওকে দিন—

গোয়ালা॥ [গাইতে লাগল]
'দধি আমার মধু ঢালা' ইত্যাদি

(ভেতরে ধর্মধর ঠাকুরের চীৎকার শোনা গেল)।

ধর্মধর॥ [ভেতরে]—একি! একি! পালাল। টাকার থলি নিয়ে পালাল! গেল। গেল। সব গেল।

১ম॥ পালাল! কে পালাল?

২য়॥ তাই তো!

(ছুটতে ছুটতে ধর্মধর এলেন।)

ধর্মধর॥ সর্বনাশ! সব গেল। যেই থলিটি ওর হাতে দিয়েছি—থলিটি নিয়েই এক লম্ফে—

এরা সকলে॥ কী সর্বনাশ!

১ম॥ ওর পেটে এত!

২য়॥ এখন উপায়!

৩য়॥ ধরতে হবে—ও শয়তানকে ধরতেই হবে—

১ম॥ আর ধরেছ! ওর মতো কেউ ছুটতে পারে না—

২য়॥ কী হবে!

৩য়॥ এই এক দই-এর জন্যেই দেখছি মজলাম—

২য়॥ [গোয়ালার প্রতি আক্রোশে] মার ব্যাটাকে!

গোয়ালা॥ ওরে বাবারে বাবা—

(পলায়ন।)

১ম॥ ঠাকুর মশাই, আমাদের টাকা দিন—

ধর্মধর॥ কি করে দেব বাবা—!

১ম॥ তা বললে শুনছি না, কথা ছিল—আমরা চারজন একসঙ্গে চাইলে আপনি টাকা দেবেন, বলুন কথা ছিল কি না?

ধর্মধর॥ তা ছিল—কিন্তু তোমরাও তো দিতে বললে—

১ম॥ দিতে বলেছি—কিন্তু চারজন একসঙ্গে কি গিয়েছিলাম?

২য়॥ ঠিক! ও টাকা আপনাকেই দিতে হবে—

৩য়॥ [চেঁচিয়ে] দিতেই হবে—নইলে আমরা ছাড়ছিনে—জানেন কে আমরা?

ধর্মধর ॥ ওরে বাবা! দোহাই তোমাদের—আমার কী দোষ—

দোহাই ধর্মাবতার! সুবিচার করুন।

৩য় ॥ [চীৎকার করে] হরি—হরি—

১ম ॥ হর—হর—

ধর্মধর ॥ দোহাই তোমাদের—দোহাই তোমাদের আমার কী দোষ?

(সদলবলে কাজী ও কোতোয়ালের প্রবেশ। সঙ্গে পথিক ও বালকগণ।)

সকলে ॥ কী হয়েছে? কী হয়েছে?

ধর্মধর ॥ এই যে কাজী সাহেব। আমার কি দোষ বলুন দেখি। এরা চারজন আমার কাছে ওদের চার হাজার টাকা গচ্ছিত রেখেছিল—সর্ত করেছিল ওরা চারজন একসঙ্গে এসে যখন চাইবে তখন আমি টাকা দেব।

১ম ॥ হ্যাঁ, নইলে উনি দেবেন না—এই ছিল সর্ত। আমাদের মধ্যে একজন—একা গিয়ে ওর কাছে একটি টাকা চেয়েছে—

ধর্মধর ॥ আমি তা দিতে চাইলুম না। সে ওদের চীৎকার করে তা জানাল। তখন ওরা এখান থেকে চীৎকার করে বলল, দিন—একটা টাকা দিন—আমি তা শুনে টাকার থলিটি যেই তার হাতে দিয়েছি—অমনি সে থলিটি নিয়ে খিড়কি দোর দিয়ে উধাও।

কাজী ॥ [ঐ তিনজনকে] তোমরা তো টাকা তাকে দিতেই বলেছিলে—

১ম ॥ দিতে বলেছিলুম—কিন্তু চারজন একসঙ্গে গিয়ে তো চাইনি—

২য় ॥ তবে কেন উনি দিতে গেলেন।

৩য় ॥ উনি সর্ত ভেঙেছেন। দোহাই ধর্মাবতার! সুবিচার করুন।

কাজী ॥ আমরা একটি জরুরী কাজে যাচ্ছি—[কোতোয়ালকে] তা এ তো অতি সহজ বিচার—বিচারটা করেই যাই—[ধর্মধর] সর্ত তুমি ভেঙেছ ঠাকুর! ও টাকা তোমাকেই দিতে হবে। [অনুচরদের প্রতি] টাকা আদায় করে এদের দিয়ে দাও।

ধর্মধর ॥ অত টাকা! ওরে বাবা। ঘরদোর যে তবে আমার কিছুই থাকবে না। একেবারে পথে বসতে হবে।

কাজী ॥ তা কী করব। বিচার, বিচার! কারো মুখ চাইলে চলবে না।

কোতোয়াল ॥ [অনুচরদের প্রতি] ব্রাহ্মণ সহজে টাকা না দিলে ওর বাড়ীঘর গরু বাছুর যা' পাও—সব বিক্রি করে ওদের চার হাজার টাকা মিটিয়ে দাও। চলুন কাজী সাহেব!

কাজী ॥ চলুন।

ধর্মধর ॥ হায় ভগবান—হায় ভগবান! তোমার মনে এই ছিল। এই বয়সে শেষটা পথে বসতে হল! আমার কী দোষ? আমার কী দোষ!

(ব্রাহ্মণ কাঁদতে লাগলেন। একটি বালক কাজীর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল।)

বালক ॥ আপনি ধর্মাবতার, না অধর্মাবতার!

(সকলে চমকে উঠল।)

কোতোয়াল ॥ সাবধান বালক!

বালক ॥ সাবধান আপনাদেরই হওয়া দরকার—এত বড় অধর্ম করবেন না। নিরপরাধ ব্রাহ্মণের প্রতি এত বড় অবিচার করে যাচ্ছেন—ধর্মে সইবে না।

কোতোয়াল ॥ [অনুচরদের প্রতি] ঐ অশিষ্ট বালককে বাঁধো—আর ওর পিঠে চাবুক মারো—

(অনুচরগণ অগ্রসর হতেই কাজী বাধা দিলেন!)

কাজী ॥ দাঁড়াও। [বালকের প্রতি] অবিচার করেছি আমি?

বালক॥ নিশ্চয় করেছেন।

কাজী॥ তুমি হলে কী বিচার করতে?

বালক॥ আমি হলে কী বিচার করতুম দেখতে চান?

কাজী॥ দেখতে চাই। যদি বুঝি আমারই ভুল হয়েছে, তুমি বেঁচে গেলে—আর যদি দেখি ছেলেখেলা —তুমি মরবে।

বালক॥ আমি রাজী।

কাজী॥ কর বিচার।

বালক॥ [তিন বন্ধুকে] আমি সব শুনেছি। তবু আবার বল—কী কথা ছিল।

১ম॥ কথা ছিল আমরা চারজন একসঙ্গে গিয়ে এই ব্রাহ্মণের কাছে টাকা চাইলে তবে উনি টাকা দেবেন।

বালক॥ তাই উনি দেবেন। কিন্তু কোথায় তোমরা চারজন? মোটে তো তিনজন আছে দেখছি। আর একজনকে আনো।

কাজী। [ছুটে এসে বালককে বুকে নিয়ে] বালক! বালক! কে তুমি আমি জানি না—কিন্তু তুমি আমার নমস্য!

ধর্মধর॥ জয় ধর্ম! জয় ধর্ম।

(ছুটে এসে বালককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।)

কাজীসাহেব ছুটে এসে বালককে...

প্রলয় এনেছিল পারার ধূমকেতু : ১৫৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ

'কালপুরুষ'কে আপনি যেখানে দেখবেন, দশ হাজার বছর পরে বা আগে সেখানে দেখতে পাবেন না। ওদের ব্ল্যাকবোর্ডে আঁকা নক্ষত্রদের অবস্থান দেখে কি রকম যেন খটকা লেগেছিল। মনে মনে হিসেব করছিলাম। আচমকা উত্তর পেলাম। দশ হাজার বছর আগে না আঁকলে ছায়াপথের অমন মানচিত্র কখনই সম্ভব নয়। অর্থাৎ ওরা সত্যিই দশ হাজার বছর আগেকার বিজ্ঞানী, হিম-ঘুম ঘুমিয়ে এ যুগে জেগেছে শুধু পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্যেই। ওরা শুধু মানুষ নয়—ওরা মহামানব!"

গদগদ কন্ঠে মিলিটারী অফিসার বললেন,—"বিশ্ব-বাসী আপনার ঋণ কোনোদিন ভুলবে না, ডক্টর ভান্ডারী। আপনি মহামানব।"

ম্লান হেসে বললাম,—"কিন্তু তাতে তো আমার মনের গ্লানি মুছবে না। ঐ দুই অতিমানুষ দশ হাজার বছর প্রতীক্ষা করেছিল শুধু আমাদের বাঁচিয়ে নিজেরা বাঁচবে বলে। কিন্তু ওদের আমরা বাঁচতে দিলাম না। অথচ ওরা মরে আমাদের বাঁচিয়ে গেল। মহামানব আমি নই, মহামানব ওরা—যারা আর মহাকাশ থেকে ফিরবে না!"

পাখীরালা

পরেশ ভট্টাচার্য

শেষ ভাঁটায় ডিঙি ছেড়ে জোয়ারের মুখে বুধাই মাঝির ডিঙি এসে পৌঁছয় পুঁইজালির বড় গাঙের মুখে। **'উজোন'** বেয়ে যাবে না আর। তাই তো বড় গাঙের মুখে ডিঙি 'গেরাবি' করে রাখলো বুধাই।

'গেরাবি' কথাটার মানে আগে জানতাম না। এখন জেনে নিয়েছি। নোঙরকে এ তল্লাটের মাঝি-মাল্লারা গেরাবি বলে।

চলেছি সুন্দরবনে। চৈত্র মাসের দিনে হালকা ডিঙি নিয়ে কেউ-ই বাদাবনে আসতে চায় না। কিন্তু ডাকসাইটে মাঝি বুধাই ঝড়-তুফানকে পরোয়া করে না। এ অঞ্চলের লোক ওর নাম দিয়েছে নোনা-গাঙের দুশমন। আমি যখনই বাদাবনে বেড়াতে এসেছি, তখনই খোঁজ নিয়েছি বুধাই মাঝির। ওর ডিঙিতেই গিয়েছি বাদাবনের দেশে।

এবারেও মোল্লাখালির ঘাটে এসে দাঁড়িয়ে বুধাই মাঝির খোঁজ করেছিলাম। ঘাটেই ছিল সে। আমাকে দেখেই বলেছিল, কি গো, কেমন আছো বাবু? বাদায় যাবা নাকি?

বলেছিলাম, তুমি যদি নিয়ে যাও, যাবো, নইলে নয়।

এরপর আর কোন কথা নয়। ডিঙির মুখ পাড়ে লাগিয়েছিল বুধাই।

তখনো ভাঁটার টান ছিল গাঙে। সেই টানেই ডিঙি ভাসালো বুধাই।

বুধাই বসেছে হাল ধরে। আর দাঁড়ে বসেছে ওর সাকরেদ নারান।

ভাঁটার টান শেষ হলো। পুঁইজালির গাঙের মুখে এসে যখন পৌঁছলাম, তখন জোয়ার এসেছে গাঙে। আমরা যাবো দক্ষিণে, সাগরের দিকে। এখন যেতে হলে উজানে যেতে হবে। কিন্তু উজানে যেতে চায় না বুধাই। তাই ডিঙি নোঙর করলো বড় গাঙের মুখে।

চৈত্র মাস। আকাশে সূর্য জ্বলছে। সেই কড়া রোদের মধ্যেও বুধাই বসে আছে ডিঙির পাটাতনে। নারান রান্না করছে ছই-এর ভিতর ডোরায় বসে।

ডিঙির রান্না করার জায়গাকে এরা ডোরা বলে।

আর আমি তখন ছই-এর মুখে বসে নোনা গাঙের সৌন্দর্য দেখছি।

আশ্চর্য মানুষ এই বুধাই। এই আগুন-ঝরা

রোদ মাথায় নিয়ে বসে আছে ডিঙির পাটাতনে। রোদের মধ্যে ডিঙি বেয়ে চলা, আর রোদ মাথায় নিয়ে বসে থাকা এক কথা নয়। তবু সে বসে আছে।

ফিরে চাই বুধাই-এর দিকে। দীর্ঘ-বলিষ্ঠ চেহারার পুরুষ। বারো মাস নোনা গাঙে ডিঙি বেয়ে দিন কাটায়। ডিঙিই ওর কাছে ঘর-বাড়ি। খুব দরকার না পড়লে মাটিতে পা দেয় না। বসে আছে সেই কড়া রোদের মধ্যে। রোদে পুড়ে মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে। ঘামে ভেজা দেহটা শুকিয়ে তামাটে হয়ে গেছে। পেশীর ভাঁজে ভাঁজে ঘাম শুকিয়ে শাদা-খড়ির রেখার মতো ফুটে উঠেছে। আমার চোখে মানুষটা যেন পাথরে কোঁদা মূর্তি।

এক সময় নারান জিজ্ঞাসা করে, চান করবা না বুধাইদা? আমার রান্না হয়ে গেছে।

বুধাই শুধু ফিরে চায়। কথা বলে না।

এবারে আমি জানতে চাই, রোদের মধ্যে বসে আছো কেন?

বুধাই বলে, শরীরটারে রোদ-পোড়া করে নিচ্ছি। রোদের তেজে দেহের শক্তি বাড়ে।

অবাক হয়ে যাই বুধাই-এর কথা শুনে। নতুন করে ফিরে চাই ওর মুখের দিকে। এই রোদের মধ্যেও কেমন বসে আছে সে।

ভাঁটার টান শুরু হলো দুপুরের পর। ডিঙির গেরাবি তুললো নারান। গেরাবি তুলতেই ডিঙি টাল খেয়ে উঠলো। বুধাই হাল ধরে ডিঙির মুখ ঘোরালো দক্ষিণে।

পুঁইজালির গাঙ চলে গেছে দক্ষিণ মুখো। বাঘনায় বিদ্যে নদীর সঙ্গে মিশেছে। বিদ্যে নদী এ অঞ্চলের ভাষায় 'বিদে'।

বিদ্যে নদী জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মিশেছে রায়-মঙ্গলে। রায়মঙ্গল ভয়ংকর নদী। শীতের ক'মাস একটু শান্ত থাকে। নয়তো ঝড়-তুফান লেগেই আছে।

আমরা যাবো রায়মঙ্গল পেরিয়ে মরিচঝাঁপির জঙ্গলে।

গাঙের মাঝদরিয়া বরাবর ডিঙি চলেছে। 'মুখোট' বাতাসে ডিঙি ঠিক মতো এগোচ্ছে না। তাছাড়া ভাঁটার টানটা এখনো তেমন জোরালো হয়ে ওঠেনি।

চুপচাপ বসে আছি ছই-এর মুখে। ফিরে তাকাচ্ছি গাঙের এপারে-ওপারে। পুঁইজালি গ্রাম পিছনে পড়ে রইলো। পিছনে পড়ে রইলো কুমিরমারি, পিছনে হারিয়ে গেল আরো কতো গ্রাম।

কুমিরমারির বাঁকের কাছ থেকে রায়মঙ্গলের মুখ দেখা যায়। ওই মুখ থেকে আরো কয়েকটা শাখা নদী বিভিন্ন নাম নিয়ে এদিক-ওদিক জঙ্গলের মধ্যে চলেছে। গোটা সুন্দরবন অঞ্চলে নদীগুলো ছড়িয়ে আছে মাকড়সার জালের মতো। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ভূখন্ড। সেগুলিকে দ্বীপ বললেও ভুল হয় না। এই দ্বীপগুলি জুড়ে রয়েছে গভীর জঙ্গল।

ভাঁটার টানে রায়মঙ্গলে এসে পৌঁছলাম। বুধাই এবারে পশ্চিম পারের দিকে ডিঙি নিয়ে চললো।

রায়মঙ্গলের এপারে ওপারে গভীর অরণ্য। এতো গভীর যে, সূর্যের আলো পর্যন্ত পৌঁছয় না। এই অরণ্যের মধ্যেই ওত পেতে থাকে রাজা বাঘের দল।

এই জল-জঙ্গলের দেশের নাড়ি-নক্ষত্র বুধাই-এর জানা। এমন নদী নেই, যেখানে তার ডিঙি ভাসেনি। বাদার মধ্যে 'খাড়ি' ছড়িয়ে আছে মাকড়সার জালের মতো—সে সব খাড়ির মধ্যেও বার বার ডিঙি নিয়ে গেছে সে। কতো সময় একাই গেছে। গভীর অরণ্যের মধ্যে খাড়ির মাঝে ডিঙি বেঁধে রেখে সারা রাত কাটিয়েছে ছই-এর ওপর বসে। বুধাই বলে, বাদা-বনের রাতের তুলনা নেই। তার ভাষাতেই বলি, "বাদার মধ্যে খাড়িতে ডিঙি বেঁধে রাত কাটানো আমার একটা নেশা। এ নেশা যারে পেয়েছে, তার আর 'ছাড়ান' নেই। তারপর যদি 'চান্নি' রাত হয়—সে রাতে হুরী-পরীরা নেমে আসে বাদাবনের রাজ্যে। আমার কাছে সে এক সগ্য। সুবাই বলে বাদায় যম লুকিয়ে আছে। জলে কুমির, হাঙর, কামোট আর ডাঙায় বাঘ বাবা, বুনো শুয়োর, সাপ—একবার তেনাদের মুখে পড়লে আর রক্ষে নেই। আমি বলি ওসব বাজে কথা—মনটারে ঠিক রেখে ওদের ভালোবাসতে জানলে, ওরা কোন 'ক্ষেতি' করে না। ও রাজ্যিটা যাদের, সেখানে গেলে তাদের মান রেখে চলতি হয়। বাদায় গে বাঘ বাবারে বন্দুক দে মারবো মনে করলে, বাঘ বাবা কি আমারে সুনজরে দ্যাখবে। দ্যাখবে না। বাঘের রাজ্যিতে গেলে, সেখানে তেমন করে থাকতি হয়। তাতে তারা কোন ক্ষেতি করে না। বাদাবনে গেলে আমি ভয় পাইনে, সুখ পাই। তাই তো আমি বাদাবনে যেতে ভালোবাসি।'

ভাঁটার টানে ভেসে চলেছে ডিঙি। নারান দাঁড় তুলে বসে আছে। জলের এমনই টান যে দাঁড় টানতে

হচ্ছে না। বুধাই হাল ধরে বসে আছে ডিঙির মাথায়। বসে তার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা শোনাচ্ছে। অবাক হয়ে শুনি বুধাই-এর কথা, গল্প। শুনে অবাক হয়ে যাই।

শীতের সূর্য। দেখতে দেখতে অস্ত গেল। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে ফিকে অন্ধকার নামলো নোনা গাঙের বুকে। হোক অন্ধকার—তবু নোনা গাঙ অন্ধকারে হারিয়ে যায় না। চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে থাকে। কিন্তু এপার-ওপারের জঙ্গল অন্ধকারের মধ্যে ভুতুড়ে ছায়ার মতো হয়ে যায়।

ভাঁটার টান শেষ হলো। আবার জোয়ার এলো নদীতে। আসুক জোয়ার, তবু ডিঙি বাইতে হবে। এখানে তো ডিঙি নোঙর করা চলবে না। যেতে হবে সজনেখালির জঙ্গলের অফিস পর্যন্ত। সেখানেই বাঁধতে হবে ডিঙি।

এবারে বুধাই দাঁড় টানতে আরম্ভ করলো। হাল ধরে বসলো নারান। বলিষ্ঠ হাতে দাঁড় টেনে উজানে চললো বুধাই।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক লাগলো সজনেখালির জঙ্গলের অফিসের ঘাটে পোঁছতে। ঘাটে পোঁছে গাঙের পারে একটা গরান গাছের গোড়ায় ডিঙি বাঁধলো নারান।

ঘাটে আরো ডিঙি, কিস্তি বাঁধা। এই সব গাঙ-পথে রাত নামার আগেই সাধারণত নিরাপদ জায়গায় ডিঙি-কিস্তি 'গেরাবি' করে রাখে। অপেক্ষা করে দিনের জন্যে। এ-সব অঞ্চলে গাঙ-পথে রাহাজানি হামেশাই লেগে আছে। বিশেষ করে ডিঙি-কিস্তিতে মাল-পত্তর কিংবা টাকা পয়সা থাকলে কেউ-ই রাতের বেলায় চলা-চল করে না। তবে যাদের পেশা গাঙে মাছ ধরা, তাদের কাছে দিন-রাত দুই-ই সমান।

মাঝ রাতে ভাঁটার টান লাগলো।

আবার ভাঁটার টানে শুরু হলো আমাদের চলা।

এবারে আর মাঝেরদরিয়া নয়, রায়মঙ্গলের পশ্চিম তীর ঘেঁষে চলেছে বুধাই-এর ডিঙি।

হাল ধরে বসে আছে বুধাই। মাঝে মাঝে নিজের ইচ্ছেয় আমাকে জঙ্গলের গল্প শোনাচ্ছে। ওর মুখ থেকে শোনা গল্প। গল্প নয়, ওর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার কাহিনী।

জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে অজস্র ছোট-বড়ো 'খাড়ি'। যেসব খাড়ি-পথে ডিঙি নিয়ে কসাড় জঙ্গলের মধ্যে ও ঢুকেছে। যেখানে ডাঙায় বাঘ-সাপ, আর জলে হাঙর, কুমির, কামোট। জোয়ারের জলে খাড়িগুলো ছাপিয়ে যায়। সে জলে পারের জঙ্গলের মাটি ডুবে যায়। জোয়ারে খাড়িগুলোকে অনেক চওড়া মনে হয়। তীরে গাছপালার ডালগুলো ছুঁয়ে থাকে খাড়ির জল। আবার ভাঁটার টানে সে জল নেমে যায় অনেক নীচে। জঙ্গলের ভিজে মাটিতে জড়িয়ে থাকে পলি-কাদার প্রলেপ। যার ওপর কিলবিলিয়ে বেড়ায় নোনা পোকা, মেকো কাঁকড়া। কাদাখোঁচা পাখী আর বক নোনা পোকাগুলো ধরে ধরে খায়।

জেলে-মালোরা অনেক সময় জঙ্গলের এই খাড়িতে মাছ ধরতে আসে। তবে কসাড় জঙ্গলের মধ্যে বড় একটা যায় না। ভরা জোয়ারে ছোট ছোট খাড়ির মুখে জাল পেতে রাখে জেলেরা। তারপর জোয়ারের জল নেমে গেলে খাড়ির তলার মাটি পর্যন্ত বেরিয়ে যায়, তখন জাল টেনে তোলে। জালের মাছ তুলে রাখে ডিঙির 'খোলে'। খাড়িতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। কিন্তু জঙ্গলের ভিতরের খাড়িতে মাছ মারতে আসার মতো সাহসী জেলে-মালোর সংখ্যা খুবই কম। এসব জায়গায় মাছ মারতে আসা জীবন হাতে করে। বড় দেবতা, অর্থাৎ বাঘের হাতে পড়লে আর রক্ষে নেই। মা-বাবার নাম স্মরণ করার আগেই সব শেষ।

রায়মঙ্গলের পার বরাবর চলেছি আমরা। এখনো রাত শেষ হয়নি। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে আকাশে। বাঁকা চাঁদ। ও চাঁদ ডুবে যাবে রাত শেষের মুহূর্তে।

চাঁদের আলোয় অন্ধকার ফিকে হয়ে গেছে। দেখছি পারের নিবিড় অরণ্যের দিকে তাকিয়ে। কী নিবিড় অরণ্য। ভিতরে কী কালো অন্ধকার। অবাক চোখে দেখছি. গরান, গর্জন, গেঁয়ো, ওড়া, কাকড়া গাছের বিচিত্র বিন্যাস। মাঝে মাঝে হেঁতালের ঝোপ, কোথাও নোনা ঘাস কিংবা হোগলার ঝোপ ঝাড়।

যেখানেই নোনা ঘাস সেখানেই ভয়। কচি কচি নোনা ঘাসের ডগা খেতে আসে হরিণের দল। আর তাদের জন্যে হোগলার ঝোপের আড়ালে বসে থাকে সুন্দরবনের রাজা বাঘ।

একেবারে পার ঘেঁষে চলেছি আমরা। স্পষ্ট দেখছি জঙ্গলের বিভীষিকা। না বিভীষিকা নয়, সৌন্দর্য।

এক সময় বুধাই বলে, এবারে আমরা পাখীরালায় এ্যালাম।

পাখীরালার কথা শুনেছি, কিন্তু কখনো আসি নি। এই প্রথম পাখীরালায় আসা।

বুধাই আবার বলে, এই বাদা-বনের দেশে পাখীরালার জুড়ি নেই। জেটিতে ডিঙি বাঁধি—তুমি ওপরে উঠে দ্যাখো—দেখবা কি সুন্দর!

এরপর বুধাই বলে তার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। বছর তিনেক আগে পাখীরালায় এসেছিল সে। একাই এসেছিল ডিঙি নিয়ে। না ছিল সওয়ারী, না ছিল আর কেউ।

বিরাট সুন্দরবনের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর পাখীরালার জঙ্গল। দেশ-বিদেশের পাখীরা এখানে আসে শীতের মরসুমে। পাখীর সন্ধানে আসে শিকারীরা। লোকে বলে, পাখীরালা নাকি শিকারীর স্বর্গ। শীতের মরসুমে এখানে যতো পাখী, ততো হরিণ।

বুধাই বলে, শিকার করতি যারা আসে, তারা শুধু পাখী আর হরিণ খুঁজেই মরে। পাখীরালার জঙ্গলের রূপ তারা দেখতি পায় না। তা যদি পেতো তাহলে শিকার করার কথা ভুলেই যেত তারা।

শিকারী মানুষদের সহ্য করতে পারে না বুধাই। বলে, সোন্দরবন যদি দেখতি চাও, তা হলি শিকার করতি যেও না।

যতবার এ পথে সুন্দরবনে এসেছে বুধাই, যাওয়া-আসার পথে একবার না একবার ঘুরে গেছে এই পাখীরালা। কিন্তু বছর তিনেক আগে, সেবারে প্রথম শীতের মরসুমে নিজের ইচ্ছেয় পাখীরালায় বেড়াতে এসেছিল সে।

মোল্লাখালির ঘাট থেকে দুপুরের ভাঁটায় ডিঙি ভাসিয়ে সন্ধ্যেবেলা পোঁছেছিল সজনেখালির জঙ্গলের অফিসের ঘাটে। কিন্তু ডিঙি বাঁধেনি ঘাটে, সেই সন্ধ্যেয় ডিঙির মুখ ঘুরিয়েছিল পাখীরালার দিকে।

ঘাটে যারা ডিঙি বেঁধে অপেক্ষা করছিল, তাদের অনেকেই বুধাইকে মানা করেছিল। বলেছিল, রাতের বেলায় পাখীরালায় যেও না।

কিন্তু বুধাই তাদের কথায় কান দেয় নি। নিজের খেয়ালেই ডিঙি নিয়ে চলে পাখীরালার দিকে।

সে রাত ছিল রাস-পূর্ণিমার।

গাঙ-দেশের আকাশের প্রান্তে সন্ধ্যালগ্নেই সোনালী চাঁদ দেখা দিয়েছিল। সে চাঁদের আলোয় ভরে গিয়েছিল নোনা গাঙ, আকাশ, মাটি আর অরণ্য। নদীতে তখন ভরা জোয়ার, তারপর পূর্ণিমার টান। গাঙের এ কূল, ও কূল ভেসে গিয়েছিল জোয়ারের জলে। খাড়িগুলোর দু-কূল ছাপিয়ে জোয়ারের জল ঢুকে ছিল বাদা-বনের ভিতরে।

পাখীরালার সরকারী 'জেটি'র মুখে ডিঙি বেঁধে বুধাই এক নজরে চেয়েছিল চারদিকে। তারপর বুনো কাঠের তৈরী উঁচু 'জেটি'র ওপর উঠে, 'চান্নি' রাতের পাখীরালার সোন্দর্য দেখেছিল।

হেমন্তের শিশির-ধোয়া পাখীরালার সবুজ বন। তার ওপর পড়েছে চাঁদের আলো। শিশির-ভেজা পাতায় পাতায় যেন মুক্তাবিন্দু ছড়ানো।

এবারে বুধাই মাঝির ভাষাতেই বলি, "সে রূপের তুলনা নেই। পাখীরালার দিকে সে 'চান্নি' রাতে তাকিয়ে দ্যাখলাম—মনে হলো, কোন ভোজবাজীর খেলোয়াড় এই বনের রাজ্যে সাত-রাজার ধন মণিমুক্তো ছড়িয়ে দেছে। সে খেলোয়াড় পাকা খেলোয়াড়। নয়তো অমন খেলা খেলতি পারে!"

সে রাতের কথা কোনদিনই ভুলবে না বুধাই। প্রায় সারা রাত সে ঠায় দাঁড়িয়েছিল পাখীরালার জেটির ওপর। দেখেছিল চাঁদের আলোয় জঙ্গলের শোভা। শুনেছিল রাত জাগা পাখীর কাকলি, হরিণের ডাক, বুনো শুয়োরের ঘোঁৎ-ঘোঁৎ, বানরের কিচির-মিচির। তারপর শুনতে পেয়েছিল এই জঙ্গলের রাজ্যে রাজা বাঘের ডাক।

জেটির অদূরেই হরিণ-চরা মাঠ। দুটো খাড়ির মুখে ত্রিভুজের মতো খানিকটা ফাঁকা জায়গা সবুজ ঘাসে ঢাকা। এক দিকে খাড়ির কাছে হেঁতালের ঝোপ।

গভীর রাতে একদল হরিণ এসেছিল সেই ফাঁকা জায়গায়। জ্যোৎস্না-ধোয়া রাতে তারা খেলায় মেতেছিল। জেটির ওপরে দাঁড়িয়ে বুধাই দেখছিল হরিণ-হরিণীর খেলা। দেখতে দেখতে হঠাৎ শুনতে পেল বানরের কিচির-মিচির। বানর ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমন্ত পাখীরা জেগে উঠলো। খেলা বন্ধ হলো হরিণ-দলের। ভয় পেয়ে জঙ্গলের দিকে তাকালো। ঠিক সেই সময় হেঁতাল ঝোপের আড়াল থেকে নিঃশব্দে রাজা বাঘ এগিয়ে এলো। ঝাঁপিয়ে পড়লো হরিণ-দলের সামনে। কিন্তু কী আশ্চর্য, বাঘের ঝাঁপিয়ে পড়ার মুহূর্তে পলকের মধ্যে গভীর বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল হরিণের দল। আক্রোশে গর্জন করে উঠলো রাজা বাঘ। এদিকে আশপাশের গাছের ডালে বানরের দল এক সঙ্গে কিচির-মিচির শুরু করে দিয়েছে।

সে গভীর রাত্রে বুধাই সে-দৃশ্য দেখে হো হো করে হেসে উঠেছিল।

জঙ্গলের রাজ্যে মানুষের উচ্চ-কণ্ঠের হাসিতে রাজা বাঘেরও যেন চমক লেগেছিল। গোলার মতো দুটি চোখ তুলে তাকিয়েছিল জেটির ওপরের দিকে। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে জল-জঙ্গলের দেশের ডাকসাইটে মাঝি বুধাই।

তারপরেই বুধাই-এর চোখ পড়েছিল জেটির নীচের দিকে। যেখানে ভয়ংকর বাঘটা দাঁড়িয়ে আছে গোলার মতো চোখ মেলে।

কিন্তু বিপদকে ভয় পায় না বুধাই। জল-জঙ্গলের দেশে বিপদের মুখে সে অনেকবার পড়েছে, কিন্তু এমন বিদ্ঘুটে অবস্থায় কখনো পড়তে হয়নি।

যাই হোক, আস্তে আস্তে জেটির নীচের দিকে নেমে এলো বুধাই। দেখলো, ডিঙিটা কাছাকাছি কোথাও আছে কিনা। ডিঙি দেখতে পেল না, কিন্তু দেখলো ডিঙি বাঁধার 'কাছি'র মুখটা তখনো গরান গাছের গুঁড়িতে বাঁধা। এবারে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারে। ভরা জোয়ারে জল অনেক ওপরে উঠেছিল। টান করে ডিঙি বেঁধে রেখেছিল। তারপর ভাঁটায় জল নেমে

এরপর বুধাই ফিরে তাকায় খাড়ির পাড়ে, যেখানে বাঁধা ছিল তার ডিঙি।

কিন্তু ডিঙিটা কোথায় গেল!

ডিঙি নেই দেখে বুধাই কেমন যেন তাজ্জব বনে যায়।

পূর্ণিমার চাঁদ তখন পশ্চিম দিগন্তে। তার অস্ত যাওয়ার সময় হয়ে এলো। বুধাই-এর মনে তখন নানা চিন্তা। ভাবছে, কী করে ওপর থেকে নীচে নামবে সে? আর নেমেই বা কোথায় যাবে? তাছাড়া নামতে গেলেই তো বাঘের মুখে পড়তে হবে।

যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিঙিটাও নামতে থাকে। শেষ পর্যন্ত টান পড়ে কাছিতে। ডিঙির ভার সইতে পারবে কেন পাট-দড়ির কাছি? ছিঁড়ে গেছে।

কিন্তু ডিঙিটা কোথায়? যদি ভাঁটার টানে বড় গাঙে ভেসে গিয়ে থাকে!

তবু বুধাই এদিক-ওদিক ফিরে তাকায়, যদি ডিঙিটা নজরে পড়ে।

সত্যিই এবারে সে ডিঙিটাকে দেখতে পেল। খাড়ি যেখানে গাঙে গিয়ে মিশেছে, সেখানে একটা গাছের গোড়ায় ডিঙিটা আটকে আছে।

কিন্তু ওখানে বুধাই যাবে কেমন করে?

তবু যেতে হবে বুধাইকে। এখানে বসে থাকলে তো চলবে না। দেহে আছে অসীম শক্তি, মনে আছে প্রচণ্ড ইচ্ছেশক্তি—সে নিশ্চয়ই এই বিপদের বাধা পেরিয়ে যাবে।

জীবনে অনেক বার এমনি করে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েছে বুধাই। কিন্তু কখনো সে ভয় পায় নি। ভয় কি তা সে জানে না।

আগু-পিছু ভাববার সময় নেই। জেটি থেকে একটা গরানের 'কোড়া' খুলে নিলে বুধাই। তারপর পরনের কাপড়টা আঁট-সাঁট করে মালকোঁচা দিয়ে পরলে। একটা কেওড়া গাছ ডাল-পালা বিস্তার করে আছে জেটির ওপর। হঠাৎ তার মাথায় এক বুদ্ধি এলো—কেওড়ার ডাল ধরে সজোরে নাড়া দিয়ে চিৎকার করে উঠলো।

তারপরেই লক্ষ্য করলো বুধাই, বাঘটাও নিষ্ফল আক্রোশে চাপা গর্জন করে উঠে জেটির পাশে থাবা বিস্তার করে বসলো।

কেওড়া গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়লো বুধাই। এ ডাল থেকে ও ডালে গেল। এ গাছ থেকে আর এক গাছে। তারপর একটা গেঁয়ো গাছের ডালে বসে গরানের কোঁড়াটা ছুঁড়ে দিল হরিণ-চরা মাঠে। যা ভেবেছিল তাই, বাঘটা সেই মুহূর্তে লাফ দিয়ে পড়লো সেই গরানের কোঁড়ার ওপর।

শুধু এইটুকু দেখার অবসর। বুধাই আর কোন দিকে না তাকিয়ে গাছের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়লো খাড়ির ধারে নরম পলির ওপর, সেখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো খাড়ির জলে। প্রথমেই ডুব সাঁতার দিয়ে মাথা তুললো বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে। দেখলো সেই বাঘটাও তীরে এসে দাঁড়িয়েছে।

ভাঁটার টানে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করলো বুধাই। বাঘটা প্রথমে কেমন কেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, নতুবা সেই মুহূর্তে সে-ও নামতে পারতো। সুন্দরবনের বাঘ, সাঁতার দিতেও জানে।

অবশেষে খাড়ির পারে গাঙের মুখে পৌঁছলো বুধাই—যেখানে গাছের শিকড়ে আটকে আছে তার ডিঙি।

এতোক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে।

পাখীরালার জেটির মুখে এসে বুধাই বলে, গল্প তো শুনলে—এবারে জেটির ওপর উঠে দ্যাখো গে।

সামনেই খাড়ির মুখে কাঠের উঁচু পাটাতন। একেই বলে জেটি।

জেটির মুখে ডিঙি বাঁধলো বুধাই। বললে, ভয় নেই—ওপরে উঠে যাও।

তবু কেমন যেন গা ছম ছম করে ডিঙি থেকে নামতে। কিন্তু বুধাই আমাকে সাহস দিলে।

শেষ পর্যন্ত ডিঙি থেকে নেমে পায়ে পায়ে জেটির ওপরে উঠতে আরম্ভ করলাম। উঠতে গেলে অদ্ভুত ভাবে নড়তে থাকে কাঠের পাটাতন। মনে হয়, এই বুঝি ভেঙে পড়বে।

উঠে এলাম। একেবারে ওপরে। অবাক চোখে ফিরে তাকাই পূব আকাশের দিকে। সূর্য উঠছে সবুজ অরণ্যের ওপার থেকে। তারপর চারদিকের দৃশ্য-পটে চোখ বুলিয়ে নিই। দেখতে পাই, সবুজ বন, দেখতে পাই দুরন্ত নদী রায়মঙ্গল আর বাঘনার মোহনা।

কিন্তু মুগ্ধ হয়ে যাই পাখীরালার সৌন্দর্যে। অরণ্যের দেশে যে এতো সৌন্দর্য—না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

চোখের সামনে দেখছি পাখীরালার পাখীরা ভোরের আলোর স্পর্শে আকাশে ডানা মেলতে আরম্ভ করেছে। মিছিল করে উড়ে যাচ্ছে পাখীরা। কতো রকমের নাম-না-জানা পাখী। কতো বিচিত্র তাদের কাকলি।

অধিকাংশ পাখী এখানে আগন্তুক। দূর-দূর দেশ থেকে এরা শীতের মরসুমে আসে। ক' মাস এখানে থাকে, তারপর বর্ষার আগেই আবার দেশান্তরে পাড়ি দেয়। অনেক পাখী আবার শীতান্তেই চলে যায়। যারা এখন এখানে নেই।

পাখীর আলয়—এর থেকেই নাম হয়েছে পাখীরালা।

রাবণের গুষ্টি

অমলেন্দু সেন

একজনের যদি অনেকগুলো ছেলেপুলে থাকে তাহলে লোকে বলে, বাপ রে! যেন রাবণের গুষ্টি! কেন? না, রামায়ণের রাবণ রাজার নাকি পুরো এক লক্ষ ছেলে আর সোয়া লক্ষ নাতি ছিল।

মহাভারতের সগর রাজারও ছেলেপুলে নিতান্ত কম ছিল না। তাদের সংখ্যা ছিল ষাট হাজার। তারা কপিল মুনিকে ঘোড়া-চোর বলে সন্দেহ করে তাঁর ওপর তম্বি করেছিল বলে তিনি তাদের চোখের দৃষ্টিতে ছাই করে দিয়েছিলেন, সে কথা তোমরা নিশ্চয় জান।

এ তো অনেক দিন আগেকার ব্যাপার, আজকাল আর অত ছেলেপুলের কথা শোনা যায় না। তবু যা জানা গিয়েছে, তা শুনলেও অবাক হতে হয়। ইটালীর নেপল্‌সে একজন ছিলেন, তাঁর ছেলেমেয়ে ছিল তেত্রিশটি। আমেরিকার এক চাষীর ছবি এক পত্রিকায় বেরিয়েছিল, তাতে দেখা যায় যে তাঁর ৪১টি ছেলেমেয়ে মা-বাবার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আর, শ'খানেক বছর আগে রাশিয়াতে নাকি এক মহিলার একে একে ৬৯টি সন্তান হয়েছিল।

তবে, এ বিষয়ে রেকর্ড আফরিকায়। 'বিশ্বাস করো আর না করো' বলে একখানা বইয়ে আছে যে এক কাফরি রাজার ছেলেমেয়ে ছিল তিনশোরও বেশী!

মানুষের ব্যাপারে এইটেই হয়তো রেকর্ড। কিন্তু এমন অনেক প্রাণী আছে যারা এত কম ছেলেপুলে হবার কথা শুনলে হেসেই ফেলবে।

যেমন, ধর, মাছেদের মধ্যে আমাদের ইলিশ মাছ। তারা একবারে কত ডিম দেয়, ভাবতে পার? বারো থেকে চোদ্দ লাখ! হাজার হাজার ইলিশ মাছ তো তাহলে গঙ্গায় কোটি কোটি ডিম ছাড়ে। সেই কোটি কোটি ডিম ফুটে যদি কোটি কোটি ইলিশ মাছ হয়, তাহলে তো ইলিশে-ইলিশে গঙ্গা নদীটাই বুজে যাবার কথা। তা হয় না কেন? বেশীর ভাগ ডিমই ফুটতে পায় না, তাই। মাছেরা তা খেয়ে ফেলে, কিংবা অন্য কোনও না কোনও কারণে ডিমগুলো নষ্ট হয়ে যায়।

এত ডিম পাড়তে পারে, তবু ডিম পাড়ার ব্যাপারে ইলিশমাছকে চ্যাম্পিয়ন বলা যায় না। বিলিতী হ্যালিবাট মাছ একবারে ৩৫ লাখ পর্যন্ত ডিম দেয় বলে জানা গিয়েছে।

এর দাদা বলা যেতে পারে কড মাছকে। সেই যে যার পেট থেকে কডলিভার অয়েল বলে একরকম ওষুধ পাওয়া যায়, সেই কড মাছ। তাদের রেকর্ড হচ্ছে আশী লাখ ডিম পাড়বার।

তবে, সকলের বড়দা হলো টারবট মাছ। তারা একবারে ডিম দেয় এক কোটি চল্লিশ লক্ষ। ভাগ্যিস এই সব ডিম খেয়ে ফেলবার জন্যেও লাখে লাখে মাছ আছে সমুদ্রে, নইলে সমুদ্রই হয়তো কবে বুজে যেত।

যা বেঁচে যায়, তা-ও অবশ্য কম নয়। একবার কতকগুলো মাছ-ধরা জাহাজ সমুদ্রে গিয়ে মস্ত এক ঝাঁক ম্যাকারেল মাছের দেখা পেয়েছিল। সমুদ্রে পঞ্চাশ মাইল জায়গা জুড়ে চলছিল মাছগুলো। জেলেদের তখন মজাটা দেখে কে! জাল ফেলতে আর তুলতেই যা দেরি।

শুধু মাছেদের মধ্যেই নয়, কীটপতঙ্গ এমনকি পাখীদের মধ্যেও এরকম বড় বড় ঝাঁক বেঁধে চলাফেরা করবার কথা সদাসর্বদা শোনা যায়। আফরিকায় এক রাক্ষুসে জাতের পিঁপড়ে আছে, তারা এক একবার ঐ রকম বিরাট দল বেঁধে বেরোয়। মাইলের পর মাইল জুড়ে সেই দল যখন এগিয়ে যায়, তখন তাদের হাত থেকে কারও রক্ষা নেই। মেরে তাদের শেষ করা যায় না, আগুন জেবলেও তাদের ঠেকানো যায় না। এত পিঁপড়ে এসে সেই আগুনের ওপর পড়বে যে আগুনই নিভে যাবে। কাজেই পালিয়ে যেতে না পারলে নিস্তার নেই। পিঁপড়ের ভয়ে হাতী পালাচ্ছে, গণ্ডার পালাচ্ছে, পাখীরা আকাশ থেকে নেমে গাছের ডালে বসতে পর্যন্ত সাহস পাচ্ছে না—সে এক তাজ্জব ব্যাপার!

দক্ষিণ আমেরিকার ছোট্ট ম্যারিপোসা প্রজাপতিরা একবার এক কাণ্ড করেছিল। সেবার দক্ষিণ আমেরিকার এক বন্দরে একখানা জাহাজে নতুন রং করা হয়েছে, তখনও রং ভাল করে শুকোয় নি। এমন সময় আকাশ অন্ধকার করে বিরাট এক ঝাঁক ম্যারিপোসা প্রজাপতি সেখান দিয়ে উড়ে গেল। কয়েক মিনিট ধরে আর কিছু দেখা যায় না—খালি ছোট্ট ছোট্ট হলদে ম্যারিপোসা চারিদিকে ফুরফুর করে উড়ে চলেছে। তারপর যখন

দলটা চলে গেল, তখন দেখা গেল যে পুরো জাহাজটা ছেয়ে তার গায়ে লাখে লাখে প্রজাপতি আটকে গিয়েছে কাঁচা রঙের সঙ্গে। দেখতে নিশ্চয় বেশ সুন্দর হয়েছিল, কিন্তু সেভাবে তো রাখা চলে না। আবার ডবল খরচ করে, প্রজাপতিগুলোকে তুলে ফেলে, জাহাজকে রং করানো হল।

কিন্তু মাছ, পিঁপড়ে, প্রজাপতি, যার কথাই বল না কেন, এই দল বাঁধার ব্যাপারে তারা কেউই লাগে না পঙ্গপালদের কাছে। পঙ্গপাল হলো একরকম পতঙ্গ মানে, উড়ুক্কু পোকা। এরা লম্বায় তিন-চার ইঞ্চি পর্যন্ত বড় হয়, বালি কিংবা আলগা মাটির মধ্যে তারা একসঙ্গে একজায়গায় কোটি কোটি ডিম পেড়ে রাখে।

সেই ডিম ফুটে যখন বাচ্চারা বেরোয় তখন তারা খাবারের খোঁজে দল বেঁধে আকাশে উঠে পড়ে, আর, কি করে জানো, সবাই একদিকে চলতে থাকে। সে যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তা না দেখলে বোঝা যায় না। হয়তো পঞ্চাশ-ষাট মাইল লম্বা, পনেরো-কুড়ি মাইল চওড়া, আর হাত পঞ্চাশেক পুরু সেই ঝাঁক আকাশ জুড়ে চলেছে। অতখানি জায়গায় তারা মেঘের মত আড়াল করে রেখেছে সূর্যকে। পথে যেখানে গাছপালা, বনজঙ্গল, শস্যের আর ফলের ক্ষেত পাবে, সেইখানে তারা নেমে পড়বে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সব খেয়ে ফেলে আবার উড়তে শুরু করবে।

এদের কেউ ঠেকাতে পারে না। হিসেব করে দেখা যায় যে বড় সড় একটা দলে পাঁচশো কোটি পঙ্গপাল থাকাটা অসম্ভব নয়। তার মধ্যে মানুষ আর ক'টাকে মারতে পারে? লাখ, দুলাখ, কোটি, না হয় দশ কোটিই মারো। যতক্ষণে তুমি দশ কোটি মারছো, ততক্ষণে বাকী ৪৯০ কোটি পঙ্গপাল মিলে দেশটাকে মরুভূমি করে ফেলেছে। বড্ড ক্ষতি করে এরা।

তবে, একবার একটা মজা হয়েছিল। আমেরিকার এক মরুভূমির ধারে মরমন বলে একটা দল নতুন উপনিবেশ করেছিল, বহু কষ্টে কিছু চাষ করে ফসল ফলিয়েছিল মন্দ না। তারপর ফসল যখন পেকে উঠেছে, তখন আকাশ অন্ধকার করে দূরে দেখা দিল পঙ্গপালের ঝাঁক। এখন উপায়?

উপায় না দেখতে পেয়ে মরমনরা সবাই হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল, আর প্রার্থনা করতে লাগল ভগবানের কাছে। ভগবান সেই প্রার্থনা শুনলেন।

পঙ্গপালগুলো প্রায় এসে পড়েছে, এমন সময় দেখা গেল যে দূর থেকে নতুন আর একখানা বিশাল মেঘের মত কি যেন উড়ে আসছে। ক্রমে বোঝা গেল যে সেটা হচ্ছে গাল্ পাখীর ঝাঁক—বাংলায় গাংচিল বলতে পার। ওখান থেকে কয়েক মাইল দূরে প্রকান্ড একটি লবণহ্রদ আছে, তারা আসছে সেখান থেকে।

পঙ্গপালরা ক্ষেতে নামবার আগেই গাংচিলেরা এসে তাদের ধরে ফেলল। তারপর লেগে গেল মহা-ভোজ। লাখে লাখে পেটুক গাংচিল কোটি কোটি পঙ্গপাল খেয়ে ফেলল। আর, তাদের যা স্বভাব—পেট ভরে গেলেও তারা থামে না, খাওয়া জিনিস উগরে দিয়ে আবার নতুন করে খেতে শুরু করে।

এমন শত্রুর কাছে পঙ্গপালরাও হার মানল। তারা আর মাটিতে না নেমেই চম্পট দিল সেখান থেকে। মরমনদের ফসল ভগবান এইভাবে রক্ষা করলেন।

ঠিক ১২২ বছর আগে এই ঘটনাটি ঘটেছিল আমেরিকার উটা রাজ্যে। কৃতজ্ঞ মরমনরা উটা রাজ্যের সল্ট লেক সিটীতে তাই গাংচিলদের নামে একটি স্মৃতি-স্তম্ভ স্থাপন করেছে শহরের মাঝখানে।

পঙ্গপালেরা মানুষের অশেষ ক্ষতি করে। তাদের সেই ক্ষমতাকে একবার বুদ্ধি খাটিয়ে কিরকম কাজে লাগানো হয়েছিল, তা বলি শোনো।

দক্ষিণ আমেরিকায় অ্যান্ডিজ পাহাড়ের কাছাকাছি দুটি রাজ্যের মধ্যে একবার ঝগড়া বেধে যায়। আর দুই দেশের ঝগড়া মানেই তো যুদ্ধ। যুদ্ধ প্রায় লাগে-লাগে, এই অবস্থা। দুটি দেশের মধ্যে একটি বড়, তার ক্ষমতাও অনেক বেশী। কাজেই ছোট রাজ্যটির লোকেদের ভারী দুশ্চিন্তা হল। যাই হোক, দেশরক্ষার তো যত-দূর সম্ভব বন্দোবস্ত করতে হবে। তাই সেনাপতি দেখতে গেলেন অ্যান্ডিজ পাহাড়ের দিকটায় কি ব্যবস্থা করা যায়।

পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে তিনি দেখলেন—সর্বনাশ! বহুদূর জুড়ে পাহাড়ের গায়ে ডিম পেড়ে রেখে গেছে পঙ্গপালেরা। আর কয়েকদিনের মধ্যেই সেগুলো ফুটবে। তা দেখে হঠাৎ তাঁর একটা কথা মনে হল।

তারপর তিনি যে হুকুম দিলেন, তা শুনে সৈন্যরা বুঝল যে ভাবনা চিন্তায় তাঁর মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। কারণ, তিনি বললেন, আর সব কাজ ছেড়ে পাহাড়ে মাইলের পর মাইল ধরে উঁচু করে কাঠ সাজাও।

তাই করা হল। ততদিনে ডিম ফুটে পঙ্গপালরা বেরোতে শুরু করেছে, এবার দু'এক দিনের মধ্যেই

[শেষাংশ ১৭৬ পৃষ্ঠার নীচে]
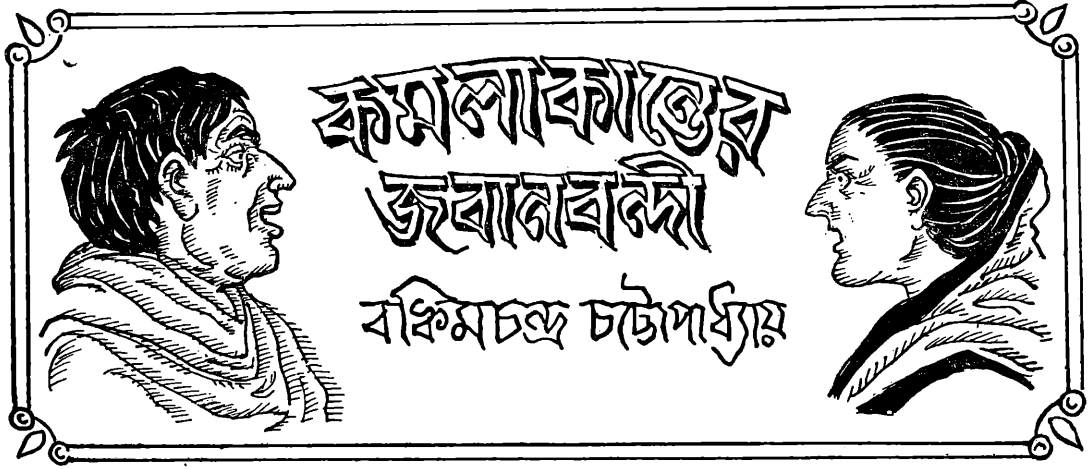
সেই আফিঙগখোর কমলাকান্তের অনেকদিন কোন সম্বাদ পাই নাই। অনেক সন্ধান করিয়া ছিলাম, অকস্মাৎ সম্প্রতি একদিন তাহাকে ফৌজদারী আদালতে দেখিলাম। দেখি যে, ব্রাহ্মণ এক গাছতলায় বসিয়া, গাছের গুঁড়ি ঠেসান দিয়া, চক্ষু বুজিয়া ডাবায় তামাকু টানিতেছে। মনে করিলাম, আর কিছু না, ব্রাহ্মণ লোভে পড়িয়া কাহার ডিবিয়া হইতে আফিঙগ চুরি করিয়াছে—অন্য সামগ্রী কমলাকান্ত চুরি করিবে না—ইহা নিশ্চিত জানি। নিকটে একজন কালোকোর্তা কনেষ্টবলও দেখিলাম। আমি বড় দাঁড়াইলাম না—কি জানি যদি কমলাকান্ত জামিন হইতে বলে। তফাতে থাকিয়া দেখিতে লাগিলাম যে, কাণ্ডটা কি হয়।

কিছুকাল পরে কমলাকান্তের ডাক হইল। তখন একজন কনেষ্টবল রুল ঘুরাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া এজলাসে লইয়া গেল। আমি পিছু পিছু গেলাম। দাঁড়াইয়া, দুই একটি কথা শুনিয়া, ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিলাম।

এজলাসে, প্রথামত মাচানের উপর হাকিম বিরাজ করিতেছেন। হাকিমটি একজন দেশী ধর্মাবতার—পদে ও গৌরবে ডিপুটি। কমলাকান্ত আসামী নহে—সাক্ষী। মোকদ্দমা গরু চুরি। ফরিয়াদী সেই প্রসন্ন গোয়ালিনী।

কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাটারায় পুরিয়া দিল। তখন কমলাকান্ত মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। চাপরাশি ধমকাইল—"হাস কেন?"

কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল, "বাবা, কার খেতের ধান খেয়েছি—যে, আমাকে এর ভিতর পুরিলে?"

চাপরাশী মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না। দাড়ি ঘুরাইয়া বলিলেন, "তামাসার জায়গা এ নয়—হলফ পড়।"

কমলাকান্ত বলিল, "পড়াও না বাপু।"

একজন মুহুরি তখন হলফ পড়াইতে আরম্ভ করিল। বলিল, "বল, আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া......"

কমলাকান্ত। (সবিস্ময়ে) কি বলিব?

মুহুরী। শুনতে পাওনা—"পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—"

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে! কি সর্বনাশ!

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষীটা কি একটা গণ্ডগোল বাধাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সর্বনাশ কি?"

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনেছি—এ কথাটা বলতে হবে?

হাকিম। ক্ষতি কি? হলফের বয়ানই এই।

কমলা। হুজুর সুবিচারক বটে। কিন্তু একটা কথা বলি কি, সাক্ষ্য দিতে দিতে দুই একটা ছোট রকম মিথ্যা বলি, না হয় বলিলাম—কিন্তু গোড়াতেই একটা বড় মিথ্যা বলিয়া আরম্ভ করিব, সেটা কি ভাল?

হাকিম। এর আর মিথ্যা কথা কি?

কমলাকান্ত মনে মনে বলিল, "তত বুদ্ধি থাকিলে তোমার কি এ পদবৃদ্ধি হইত?" প্রকাশ্যে বলিল, "ধর্মাবতার, আমার একটু একটু বোধ হইতেছে কি যে, পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। আমার চোখের দোষই হউক আর যাই হউক, কখনও ত এ পর্যন্ত পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম না। আপনারা বোধহয় আইনের চশমা নাকে দিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন—কিন্তু আমি যখন তাঁহাকে এ ঘরের

ভিতর প্রত্যক্ষ পাইতেছি না—তখন কেমন করিয়া বলি —আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—"

ফরিয়াদীর উকীল চটিলেন—তাঁহার মূল্যবান সময়, যাহা মিনিটে মিনিটে টাকা প্রসব করে, তাহা এই দরিদ্র সাক্ষী নষ্ট করিতেছে। উকীল তখন গরম হইয়া বলিলেন, "সাক্ষী মহাশয়! Theological Lectureটা ব্রাহ্মসমাজের জন্য রাখিলে ভাল হয় না ? এখানে আইনের মতে চলিতে মন স্থির করুন।

কমলাকান্ত তাঁহার দিকে ফিরিল। মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি বোধ হইতেছে উকীল।"

উকীল। (হাসিয়া) কিসে চিনিলে ?

কমলা। বড় সহজে। মোটা চেন আর ময়লা শামলা দেখিয়া। তা, মহাশয়! আপনাদের জন্য এ Theological Lecture নয়। আপনারা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখেন স্বীকার করি—যখন মক্কেল আসে।

উকীল সরোষে উঠিয়া হাকিমকে বলিলেন, "I ask the protection of the Court against the insults of this witness."

কোর্ট বলিলেন, "O Baboo! the witness is your own witness, and you are at liberty to send him away if you like."

এখন কমলাকান্তকে বিদায় দিলে উকীলবাবুর মোকদ্দমা প্রমাণ হয় না—সুতরাং উকীলবাবু চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। কমলাকান্ত ভাবিলেন, এ হাকিমটা জাতিভ্রষ্ট-পালের মত নয়।

হাকিম গতিক দেখিয়া, মুহুরিকে আদেশ করিলেন যে, "ওথের প্রতি সাক্ষীর objection আছে—উহাকে simple affirmation দাও।" তখন মুহুরি কমলাকান্তকে বলিল, "আচ্ছা, ও ছেড়ে দাও—বল, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি—বল।"

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেটা জানিয়া প্রতিজ্ঞাটা করিলে ভাল হয় না?

মুহুরি হাকিমের দিকে চাহিয়া বলিল, "ধর্মাবতার! সাক্ষী বড় সের্‌কশ্‌।"

উকীলবাবু হাঁকিলেন, "Very obstructive."

কমলাকান্ত। (উকীলের প্রতি) শাদা কাগজে দস্তখত করিয়া লওয়ার প্রথাটা আদালতের বাহিরে চলে জানি—ভিতরেও চলিবে কি ?

উকীল। শাদা কাগজে কে তোমার দস্তখত লইতেছে ?

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, তাহা না জানিয়া, প্রতিজ্ঞা করা, আর কাগজে কি লেখা হয় তাহা না দেখিয়া, দস্তখত করা, একই কথা।

হাকিম তখন মুহুরিকে আদেশ করিলেন যে, প্রতিজ্ঞা আগে ইহাকে শুনাইয়া দাও—গোলমালে কাজ নাই।" মুহুরি তখন বলিল, "শোন, তোমাকে বলিতে হইবে, যে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি যে সাক্ষ্য দিব, তাহা সত্য হইবে, আমি কোন কথা গোপন করিব না—সত্য ভিন্ন আর কিছু হইবে না।"

কমলা। ওঁ মধু মধু মধু।

মুহুরি। সে আবার কি ?

কমলা। পড়ান, আমি পড়িতেছি।

কমলাকান্ত তখন আর গোলযোগ না করিয়া প্রতিজ্ঞা পাঠ করিল। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য উকীল বাবু কমলাকান্তকে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিলেন, "এখন আর বদ্‌মায়েশি করিও না—আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তার যথার্থ উত্তর দাও। বাজে কথা ছাড়িয়া দাও।"

কমলা। আপনি যা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাই আমাকে বলিতে হইবে ? আর কিছু বলিতে পাইব না ?

উকীল। না।

কমলাকান্ত তখন হাকিমের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "অথচ আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, 'কোন কথা গোপন করিব না।' ধর্মাবতার, বে-আদবি মাফ হয়। পাড়ায় আজ একটা যাত্রা হইবে, শুনিতে যাইব ইচ্ছা ছিল; সে সাধ এইখানেই মিটিল। উকীল বাবু অধিকারী—আমি যাত্রার ছেলে, যা বলাইবেন, কেবল তাই বলিব; যা না বলাইবেন, তা বলিব না। যা না বলাইবেন, তা কাজেই গোপন থাকিবে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধ লইবেন না।"

হাকিম। যাহা আবশ্যক বিবেচনা করিবে, তা না জিজ্ঞাসা হইলেও বলিতে পার। কমলাকান্ত তখন সেলাম করিয়া বলিল, "বহৎ খুব।" উকীল তখন জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন, "তোমার নাম কি ?"

কমলা। শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী।

উকীল। তোমার বাপের নাম কি ?

কমলা। জোবান বন্দীর আভ্যুদয়িক আছে না কি ?

উকীল গরম হইলেন, বলিলেন, "হুজুর! এসব Contempt of Court." হুজুর, উকীলের দুর্দশা দেখিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট নন—বলিলেন, "আপনারই

সাক্ষী।” সুতরাং উকীল আবার কমলাকান্তের দিকে ফিরিলেন, বলিলেন, “বল। বলিতে হইবে।”

কমলাকান্ত পিতার নাম বলিল। উকীল তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি জাতি?”

কমলা। আমি কি একটা জাতি?

উকীল। তুমি কোন্ জাতীয়।

কমলা। হিন্দু জাতীয়।

উকীল। আঃ কোন্ বর্ণ?

কমলা। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ।

উকীল। দূর হোক ছাই। এমন সাক্ষীও আনে! বলি তোমার জাত আছে?

কমলা। মারে কে?

হাকিম দেখিলেন, উকীলের কথায় হইবে না। বলিলেন, “ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত, হিন্দুর নানা প্রকার জাতি আছে জান ত—তুমি তার কোন্ জাতির ভিতর?”

কমলা। ধর্মাবতার! এ উকীলেরই ধৃষ্টতা! দেখিতেছেন আমার গলায় যজ্ঞোপবীত, নাম বলিয়াছি চক্রবর্তী—ইহাতেও যে উকীল বুঝেন নাই যে, আমি

—তবে থাক কোথা?
—যেখানে সেখানে।

ব্রাহ্মণ, ইহা আমি কি প্রকারে জানিব?

হাকিম লিখিলেন, “জাতি ব্রাহ্মণ।” তখন উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার বয়স কত?”

এজ্‌লাসে একটা ক্লক ছিল—তাহার পানে চাহিয়া হিসাব করিয়া কমলাকান্ত বলিল, “আমার বয়স একান্ন বৎসর, দুই মাস, তের দিন, চারি ঘণ্টা, পাঁচ মিনিট—”

উকীল। কি জ্বালা! তোমার ঘণ্টা মিনিট কে চায়?

কমলা। কেন, এই মাত্র প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন যে, কোন কথা গোপন করিব না।

উকীল। তোমার যা ইচ্ছা কর! আমি তোমায় পারি না। তোমার নিবাস কোথা?

কমলা। আমার নিবাস নাই।

উকীল। বলি, বাড়ী কোথা?

কমলা। বাড়ী দূরে থাক্, আমার একটা কুঠারীও নাই।

উকীল। তবে থাক কোথা?

কমলা। যেখানে সেখানে।

উকীল। একটা আড্ডা ত আছে?

কমলা। ছিল, যখন নসীবাবু ছিলেন। এখন আর নাই।

উকীল। এখন আছ কোথা?

কমলা। কেন, এই আদালতে।

উকীল। কাল ছিলে কোথা?

কমলা। একখানা দোকানে।

হাকিম বলিলেন, “আর বকাবকিতে কাজ নাই—আমি লিখিয়া লইতেছি, নিবাস নাই। তারপর?”

উকীল। তোমার পেশা কি?

কমলা। আমার আবার পেশা কি? আমি কি উকীল যে, আমার পেশা আছে।

উকীল। বলি, খাও কি করিয়া?

কমলা। ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে গ্রাস তুলিয়া, মুখে পুরিয়া গলাধঃকরণ করি।

উকীল। সে ডাল ভাত জোটে কোথা থেকে?

কমলা। ভগবান্ জোটালেই জোটে, নইলে জোটে না।

উকীল। কিছু উপার্জন কর।

কমলা। এক পয়সাও না।

উকীল। তবে কি চুরি কর?

কমলা। তাহা হইলে ইতিপূর্বেই আপনার শরণাগত হইতে হইত। আপনি কিছু ভাগও পাইতেন।

উকীল তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া, আদালতকে বলিলেন, "আমি এ সাক্ষী চাহি না। আমি ইহার জোবানবন্দী করাইতে পারিব না।"

প্রসন্ন বাদিনী, উকীলের কোমর ধরিল; বলিল, "এ সাক্ষী ছাড়া হইবে না। এ বামন সত্য কথা বলিবে, তাহা আমি জানি—কখনও মিছা বলে না। উহাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে জান না—তাই ও অমন করিতেছে। ও বামনের আবার পেশা কি? ও এর বাড়ী খেয়ে বেড়ায়, ওকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, উপার্জন কর! ও কি বলবে?"

উকীল তখন হাকিমকে বলিল, "লিখুন, পেশা ভিক্ষা।"

এবার কমলাকান্ত রাগিল, "কি? কমলাকান্ত চক্রবর্তী ভিক্ষোপজীবী? আমি মুক্তকণ্ঠে হলফের উপর বলিতেছি, আমি কখনও কাহারও কাছে একপয়সা ভিক্ষা চাই না।"

প্রসন্ন আর থাকিতে পারিল না—সে বলিল, "সে কি ঠাকুর! কখন আফিঙ্গ চেয়ে খাও নাই?"

কমলা। দূর হ ধেমো গোয়ালার মেয়ে! আফিঙ্গ কি পয়সা! আমি কখন একটি পয়সাও কাহারও কাছে ভিক্ষা লই নাই।

হাকিম হাসিয়া বলিলেন, "কি লিখিব, কমলাকান্ত?"

কমলাকান্ত নরম হইয়া বলিল, "লিখুন, পেশা ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ-গ্রহণ।" সকলে হাসিল— হাকিম তাই লিখিয়া লইলেন।

তখন উকীল মহাশয় মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ফরিয়াদীকে চেন?"

কমলা। না।

প্রসন্ন হাঁকিল, "সে কি ঠাকুর! চিরটা কাল আমার দুধ দই খেলে, আজ বল চিনি না?"

কমলাকান্ত বলিল, "তোমার দুধ দই চিনি না, এমন কথা ত বলিতেছি না—তোমার দুধ দই বিলক্ষণ চিনি। যখনই দেখি এক পোয়া দুধে তিন পোয়া জল, তখনই চিনিতে পারি যে, এ প্রসন্ন গোয়ালিনীর দুধ; যখনই দেখতে পাই যে, ঘোলের চেয়ে দই ফিকে, তখনই চিনতে পারি যে, এ প্রসন্নময়ীর দধি। দুধ দই চিনি নে?"

প্রসন্ন নথ ঘুরাইয়া বলিল, "আমার দুধ দই চেন, আর আমায় চিনিতে পার নাই?"

কমলাকান্ত বলিল, "মেয়েমানুষকে কে কবে চিনিতে পেরেছে, দিদি? বিশেষ, গোয়ালার মেয়ের কাঁকালে যদি দুধের কেঁড়ে থাকিল, তবে কার বাপের সাধ্য তাকে চিনে উঠে?"

উকীল তখন আবার সওয়াল করিতে লাগিলেন, "বুঝা গেল; তুমি বাদিনীকে চেন—উহার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ আছে?"

কমলা। মন্দ নয়—এত গুণ না থাকিলে কি উকীল হয়!

উকীল। তুমি আমার কিগুণ দেখিলে?

কমলা। বামনের ছেলে গোয়ালার মেয়েতেও আপনি একটা সম্বন্ধ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

উকীল। এমন সম্বন্ধ কি হয় না? কে জানে তুমি ওর পোষ্যপুত্র কি না?

কমলা। ওর নয়, কিন্তু ওর গাইয়ের বটে।

উকীল। বুঝা গেল, তোমার সঙ্গে বাদিনীর একটা সম্বন্ধ আছে, একেবারে সাফ বলিলেই হইত—এত দুঃখ দাও কেন? এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি এ মোকদ্দমার কি জান?

কমলা। জানি যে, এ মোকদ্দমায় আপনি উকীল, প্রসন্ন ফরিয়াদী, আমি সাক্ষী, আর এই নেড়ে আসামী।

উকীল। তা নয়, গোরুচুরির কি জান?

কমলা। গোরুচুরি আমার বাপ দাদাও জানে না। বিদ্যাটা আমায় শিখাইবেন? আমার দুধ দধির বড় দরকার।

উকীল। আঃ বল গোরুচুরি দেখিয়াছ?

কমলা। একদিন দেখিয়াছিলাম। নসীবাবুর এক বক্‌না—এক বেটা মুচি—

উকীল। কি যন্ত্রণা! বলি প্রসন্ন গোয়ালিনীর গোরু যখন চুরি যায়, তখন তুমি দেখিয়াছ?

কমলা। না—চোর বেটার এত বুদ্ধি হয় নাই যে, আমাকে ডাকিয়া সাক্ষী রাখিয়া গোরুটা চুরি করে। তাহা হইলে আপনারও কাজের সুবিধা হইত, আমারও কাজের সুবিধা হইত।

প্রসন্ন দেখিল, উকীলকে টাকা দেওয়া সার্থক হয় নাই—তখন আপনার হাতে হাল লইবার ইচ্ছায়, উকীলের কানে কানে বলিয়া দিল, "ও বামুন সব কিছুর সাক্ষী নয়—ও কেবল গোরু চেনে।"

উকীল মহাশয় গর্জিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গোরু চেন?"

কমলাকান্ত মধুর হাসিয়া বলিল, "আহা চিনি বই কি—নইলে কি আপনার সঙ্গে এত মিষ্টালাপ করি?"

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষী বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে—

বলিলেন, "ওসব রাখ।" প্রসন্ন গোয়ালিনীর শ্যামলা গাই আদালতের সম্মুখে মাঠে বাঁধা ছিল—দেখা যাইতেছিল। ডিপুটিবাবু সেই দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গোরুটিকে চেন?"

কামলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল, "কোন্ গরুটি, ধর্মাবতার?"

হাকিম বলিলেন, "কোন্ গরুটি কি? একটি বই ত সামনে নাই?"

কমলা। আপনি দেখিতেছেন, একটি—আমি দেখিতেছি, অনেকগুলি।

হাকিম বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "দেখিতে পাইতেছ না—ঐ শামলা?"

কমলাকান্ত শ্যামলা গাইয়ের দিকে না চাহিয়া উকীলের শামলার প্রতি চাহিল। বলিল, "এ শামলাও চুরির না কি?"

কমলাকান্তের নষ্টামি হাকিম আর সহ্য করিতে পারিলেন না—বলিলেন, "তুমি আদালতের কাজের বড় বিঘ্ন করিতেছ—Contempt of Court জন্য তোমার পাঁচ টাকা জরিমানা।"

কমলাকান্ত আভূমিপ্রণত সেলাম করিয়া জোড়হাত করিয়া বলিল, "বহুৎ খুব হুজুর। জরিমানা আদায়ের ভার কার প্রতি?"

হাকিম। কেন?

কমলা। কিরূপে আদায় করিবেন, সে বিষয়ে তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিব।

হাকিম। উপদেশের প্রয়োজন কি?

কমলা। ইহলোকে ত আমার নিকট জরিমানা আদায়ের কোন সম্ভাবনা নাই—তিনি পরলোকে যাইতে প্রস্তুত কি না জিজ্ঞাসা করিব।

হাকিম। জরিমানা না দিতে পার, কয়েদ যাইবে।

কমলা। কতদিনের জন্য, ধর্মাবতার?

হাকিম। জরিমানা অনাদায়ে এক মাস কয়েদ।

কমলা। দুই মাস হয় না?

হাকিম। বেশী মিয়াদের ইচ্ছা কর কেন?

কমলা। সময়টা কিছু মন্দ পড়িয়াছে—ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ আর তেমন সুলভ নয়—জেলখানায় যাহাতে মাস দুই ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ হয়, সে ব্যবস্থা যদি আপনি করেন, তবে গরীব ব্রাহ্মণ উদ্ধার পায়।

এরূপ লোককে জরিমানা বা কয়েদ করিয়া কি হইবে? হাকিম হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি যদি গোল না করিয়া সোজা জোবানবন্দী দাও, তবে তোমার জরিমানা মাপ করা যাইতে পারে। বল—ঐ গোরু তুমি চেন কি না?"

হাকিম তখন একজন কনষ্টেবলকে আদেশ করিলেন যে, গোরুর নিকট গিয়া প্রসন্নের গাই দেখাইয়া দেয়। কনষ্টেবল তাহাই করিল। বিষণ্ণ উকীলবাবু তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ গোরু তুমি চেন?"

কমলা। সিংওয়ালা গোরু—তাই বলুন।

উকীল। তুমি বল কি?

কমলা। আমি বলি শামলাওয়ালা—তা যাক্—আমি সিংওয়ালা গোরুটা চিনি। বিলক্ষণ আলাপ আছে।

উকীল। ও কার গোরু?

কমলা। আমার।

উকীল। তোমার?

কমলা। আমারই।

হরি হরি! প্রসন্নের মুখ শুকাইল। উকীল দেখিল, মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যায়। প্রসন্ন তখন তর্জন গর্জন করিয়া বলিল, "তবে রে বিট্লে! গোরু তোমার!"

কমলাকান্ত বলিল, "আমার না ত কার! আমি ওর দুধ খেয়েছি, ওর দই খেয়েছি—ওর ঘোল খেয়েছি, ওর ছানা খেয়েছি—ওর মাখন খেয়েছি, ওর ননী খেয়েছি—ও গোরু আমার হলো না, তুই বেটী পালিস্ বলে কি তোর বাবার গোরু হলো!"

উকীল অতটা বুঝিলেন না। বলিলেন, "ধর্মাবতার, witness hostile! permission দিন, আমি ওকে cross করি।"

কমলা। কি? আমায় cross করিবে?

উকীল। হাঁ, করিব।

কমলা। নৌকায়, না সাঁকো বেঁধে?

উকীল। সে আবার কি?

কমলা। বাবা! কমলাকান্ত-সাগর পার হও, এত বড় হনুমান তুমি আজও হও নাই।

এই বলিয়া কমলাকান্ত চক্রবর্তী রাগে গর্ গর্ করিয়া কাটারা হইতে নামিয়া যায়—চাপরাশী ধরিয়া আবার কাটরায় পুরিল। তখন কমলাকান্ত আলুথালু হইয়া নিশ্চেষ্ট হইল—বলিল, কর বাবা ক্রস্ কর!—আমি অগাধ সমুদ্র পড়িয়া আছি—যে ইচ্ছা সে লম্ফ দাও—'অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গং!'—উকীল মহাশয়! এ প্রশান্ত মহাসমুদ্র তরঙ্গ বিক্ষেপ করে না, আপনি স্বচ্ছন্দে উল্লম্ফন করুন।"

উকীল তখন কোর্টকে বলিলেন, ধর্মাবতার, দেখা যাইতেছে যে, এ ব্যক্তি বাতুল; ইহাকে আর ক্রস্ করিবার

প্রয়োজন নাই। বাতুল বলিয়া ইহার জোবানবন্দী পরিত্যক্ত হইবে। ইহাকে বিদায় দেওয়া হউক।

হাকিম কমলাকান্তের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে বাঁচেন, বিদায় দিতে প্রস্তুত, এমত সময়ে প্রসন্ন হাতযোড় করিয়া আদালতে নিবেদন করিল, "যদি হুকুম হয়, তবে আমি স্বয়ং উহাকে গোটা কতক কথা জিজ্ঞাসা করি, তারপর বিদায় দিতে হয়, দিবেন।"

হাকিম কৌতূহলী হইয়া অনুমতি দিলেন। প্রসন্ন তখন কমলাকান্তের প্রতি চাহিয়া বলিল, "ঠাকুর! মৌতাতের সময় হয়েছে না?

কমলা। মৌতাতের আবার সময় কি রে বেটী—"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যাং নেশাঞ্চ চিন্তয়েৎ।"

প্রসন্ন। ও গোরু আমার কি না?

কমলা। তুই বেটী কখন ওর একবিন্দু দুধ খেলি নে, কেবল বেচে মর্‌লি, গোরু তোর হলো? ও গোরু যদি তোর হয়, তবে বাঙ্গাল বেঙ্কের টাকাও আমার। দে বেটী, গোরু চোরকে ছেড়ে দে—গরীবের ছেলে দুধ খেয়ে বাঁচুক।

হাকিম দেখিলেন, দুইজনে বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে—আদালত মেছো-হাটা হইয়া উঠিল। তখন উভয়কে ধমক দিয়া, জিজ্ঞাসাবাদ নিজ হস্তে লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রসন্ন এই গোরুর দুধ বেচে?"

কমলা। আজ্ঞে, হাঁ।

"উহার গোহালে এই গোরু থাকে?"
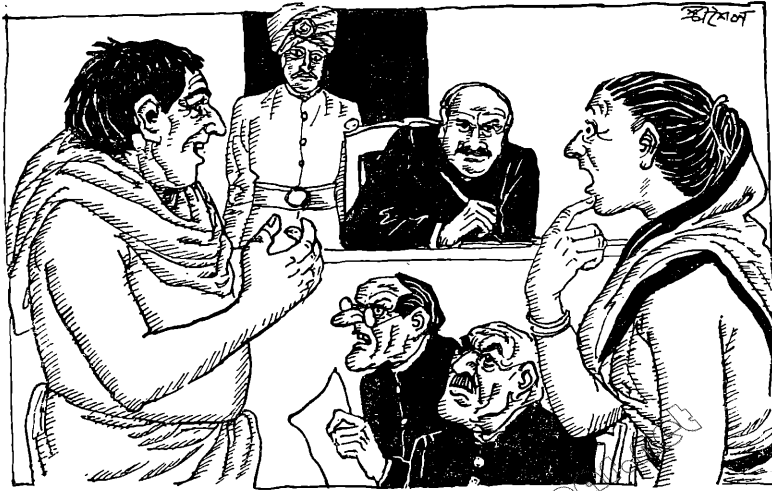
তুই বেটী কখন ওর এক বিন্দু দুধ খেলিনে গোরু তোর হলো?

প্রসন্ন। অং বং এখন রাখ—এখন মৌতাত করিবে?

কমলা। দে!

প্রসন্ন। আচ্ছা, আগে আমার কথার উত্তর দাও—তারপর সে হবে।

কমলা। তবে জল্‌দি জল্‌দি বল—জল্‌দি জল্‌দি জবাব দিই।

প্রসন্ন। বলি, গোরু কার?

কমলা। গোরু তিনজনের; গোরু প্রথম বয়সে গুরুমহাশয়ের; মধ্য বয়সে স্ত্রীজাতির; শেষ বয়সে উত্তরাধিকারীর; দড়ি ছিঁড়িবার সময়ে কারও নয়।

প্রসন্ন। বলি, ঐ শামলা-গাই কার?

কমলা। যে ওর দুধ খায় তার।

কমলা। ও গোরুও থাকে, আমিও কখন কখন থাকি।

"ঐ খাওয়ায়?"

কমলা। উভয়কে।

বাদিনীর উকীল তখন বলিলেন, "আমার কার্য সিদ্ধ হইয়াছে—আমি উহাকে আর জিজ্ঞাসা করিতে চাই না।" এই বলিয়া তিনি উপবেশন করিলেন। তখন আসামীর উকীল গাত্রোত্থান করিলেন। দেখিয়া কমলাকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার তুমি কে?"

আসামীর উকীল বলিলেন, "আমি আসামীর পক্ষে তোমাকে ক্রস্ করিব।"

কমলা। একজন ত ক্রস্ করিয়া গেল, আবার তুমি কুমার বাহাদুর* এলে না কি?

উকীল। কুমার বাহাদুর কে?

কমলা। রাজপুত্রকে চেন না? ত্রেতা যুগে আগে ক্রস্ করিলেন, পবনাঙ্গজ মহাশয়। তারপর ক্রস্ করিলেন, কুমার বাহাদুর।*

উকীল। ওসব রাখ—তুমি গোরু চেন বলেছ—কিসে চেন?

কমলা। কখন শিঙ্গে—কখন শামলায়।

উকীল রাগিয়া উঠিয়া, গর্জন করিয়া, টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন, "তোমার পাগলামি রাখ—তুমি এই গোরু চিনিতে পারিতেছ কিসে?"

কমলা। ঐ হাম্বা-রবে।

উকীল হতাশ হইয়া বলিলেন, "Hopeless!" উকীল মহাশয় বসিয়া পড়িলেন—আর জেরা করিবেন না। কমলাকান্ত বিনীতভাবে? "দাঁড়ি ছেঁড় কেন, বাবা?"

উকীল আর জেরা করিবেন না দেখিয়া হাকিম কমলাকান্তকে বিদায় দিলেন।

কমলাকান্ত ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল। আমি কিছু কাজ সারিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে, কমলাকান্ত থেলো হুঁকা হাতে করিয়া বসিয়া আছে—চারিদিকে লোক জমিয়াছে—প্রসন্নও সেখানে আসিয়াছে। কমলাকান্ত তাহাকে তিরস্কার করিতেছে আর বলিতেছে, "তোর মঙ্গলার বাঁটের দিব্য, তোর দুধের কেঁড়ের দিব্য, তুই যদি চোরকে গোরু ছেড়ে না দিস্!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "চক্রবর্তী মহাশয়! চোরকে গোরু ছাড়িয়া দিবে কেন?"

কমলাকান্ত বলিল, "পূর্বকালে মহারাজ শ্যেনজিৎকে এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল যে, 'বৎস, গোপস্বামী ও তস্কর, ইহাদের মধ্যে যে ধেনুর দুগ্ধ পান করে, সেই তাহার যথার্থ অধিকারী। অন্যের তাহার উপর মমতা প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র।' এই হলো ভীষ্মদেব ঠাকুরের Hindu Law, আর ইহাই এখনকার ইউরোপের International Law। যদি সভ্য এবং উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া খাইবে। গো শব্দে ধেনুই বুঝ আর পৃথিবীই বুঝ, সনি তস্কর ভোগ্য। সেকেন্দার হইতে রণজিৎ সিংহ পর্যন্ত সকল তস্করই ইহার প্রমাণ। Right of Conquest যদি একটা right হয়, তবে Right of theft কি একটা right নয়? অতএব, হে প্রসন্ন নামে গোপকন্যে! তুমি আইনমতে কার্য কর। ঐতিহাসিক রাজনীতির অনুবর্তী হও। চোরকে গোরু ছাড়িয়া দাও।"

এই বলিয়া কমলাকান্ত সেখান হইতে চলিয়া গেল। দেখিলাম, মানুষটা নিতান্ত ক্ষেপিয়া গিয়াছে।

* অঙ্গদ।

রাবণের গুষ্টি : ১৬৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ

তাদের ডানা মেলবার শক্তি হবে। সেনাপতি সেই সময়টার ওপর লক্ষ্য রাখলেন।

তারপর সময় হতেই সেই মাইলের পর মাইল লম্বা কাঠের গাদার সব জায়গায় একসঙ্গে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। পঙ্গপালরা তখন উড়তে শুরু করেছে, কোন্ দিকে যাবে তা ঠিক করেনি। এদিকে আগুনের বেড়া দেখে তারা মুখ ফেরাল। তারপর আকাশ ছেয়ে যে দিকে চললো, সেই দিকেই সেই বড় দেশ, শত্রুদের রাজ্য।

পঙ্গপালরা সে দেশে গিয়ে তাদের শস্য ছারখার করে দিল, সেখানে দুর্ভিক্ষ লেগে গেল। আর তারা যুদ্ধ করতে আসবে কি খেয়ে? ছোট রাজ্যটি এই ভাবে বেঁচে গেল পঙ্গপালের সাহায্যে আর সেনাপতির বুদ্ধিতে।

শুদ্ধসত্ত্ব বনাম বোধিসত্ত্ব
(এককথায় — শোধবোধ)
॥ সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় ॥
এই শুদ্ধ
কি র‍্যা বুদ্ধু ?
ফের যদি বুদ্ধু-বুদ্ধু করবি তো শুদ্ধশুদ্ধ উড়িয়ে দেব।
তুই যদি শুদ্ধু-শুদ্ধু করবি তো তোকে আমসত্ত্ব বানিয়ে দেব।
আচ্ছা! দেখে নেব...
ঠিক আছে। আমিও বদলা নেব...
পরদিন সকালে
পুরস্কার !
কি বলছিলি যেন তখন ?
দ্যাখনা কি লিখেছে। আরে,, ভালই লেখেছিস। হ্যাঁরে শোন,
তোর যে লেখাটা কিশোর সভায় পড়ে শুনিয়েছিলি সেটা আছে তো ?
কেন ?
যাব্বাবা! কেন কি ? সেটেই লাগিয়ে দে না। না পারিস তো আমায় দে। কড়কড়ে একশো টাকা — বুঝলি।...

একমাস প
বোধিসত্ত্ব খবরের কাগজ হাতে নৃত্য করছে।
মার দিয়া! কেল্লা ফতে!!
বদমাইশ! আমার লেখা নিজের নামে পাঠিয়ে পুরস্কারটা বেমালুম মেরে দেবে ভেবেছ? রোসো —
কানামাছি সঙ্ঘের কার্যালয়
কয়েকদিন পরে সম্পাদকের নামে একটি চিঠি
মশামাছি সম্পাদক সমীপেষু,
আপনার গুল মারার দলে আমাকে টানার চেষ্টা করেছেন দেখে আপনার দাঁত তুলে দেবার ইচ্ছে হচ্ছে।
ইতি বোধিসত্ত্ব ঘোষ
এত বড় অপমান! দাঁড়াও !!
এদিকে বোধিসত্ত্ব জামা-কাপড় পরে
আঃ, কি মজা! আজ যখন খামে ভরা একশটা টাকা পাব, — ইঃ ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে!
আমাকে নিতে এল বোধহয়।
খট
খট
দ্বারে করাঘাত
তোমাকে নিতে এলাম
একি!
কোথায়?
থানায়। কানামাছি সঙ্ঘের সম্পাদককে গালি দিয়ে যা লিখেছ, তার পুরস্কার নেবে চল।
বুঝেছি এ কার কাজ। নিশ্চয়ই শোধ!
শুধু শোধ নয়, শোধবোধ!
শেষ

ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

রাত্রির স্তব্ধ যবনিকা কাঁপিয়ে চলেছে পাঞ্জাব মেল। বাইরে নিকষকালো অন্ধকার। ফার্স্ট ক্লাস কামরায় মৃদু আলো যেন ভীরু হয়ে জ্বলে। কেমন ভয় ভয় করে শেঠ লছমন দাসের।

ভয় নয়ত কী? এই কামরায় একমাত্র প্যাসেঞ্জার শেঠ লছমন দাস। শেঠ চন্ডীগড়ের নাম করা জহুরী। আর শেঠের সঙ্গে ছোট অ্যাটাচি কেসে রয়েছে নাম করা কমলহীরে। বাইরে যার দাম নিদেনপক্ষে পঞ্চাশ লাখ—কিন্তু দিল্লী থেকে মাত্র এক লাখে কিনেছে শেঠ লছমন দাস। চোরাইমাল—তাই জলের দরে পেয়েছে শেঠ।

...রাত দুটো। শেঠের চোখে তখন ঘুমের ঢল। ঘুম নেমেছে ট্রেনের সব কামরায় কামরায়। সকলেই তন্দ্রাচ্ছন্ন।...

ঠিক এমন সময় শেঠের কামরায় ঢুকল আততায়ী। কালো কাপড়ে ঢাকা মুখ—চোখে জিঘাংসা—হাতে রিভলভার।

মুহূর্তের ভেতর গর্জে উঠল হত্যাকারীর রিভলভার। পর পর দুবার। রক্তে ভিজল শেঠের বুক। লুটিয়ে পড়ল প্রাণহীন দেহ। নিমিষের ভেতর এ্যাটাচি কেসটা ছিনিয়ে নিল হত্যাকারী।

হ্যাঁ—এই সেই এ্যাটাচি কেস—যার মধ্যে বহুমূল্যবান কমলহীরে—বাইরে দাম প্রায় পঞ্চাশ লাখ......

"খুন! খুন।"—সিনেমা দেখতে দেখতে অস্ফুট কণ্ঠে চিৎকার করে উঠেছে তখন শোভনলাল। বদ্রীপ্রসাদের পাশে বসে থরথরিয়ে কাঁপছে। চোখমুখ কেমন যেন ফ্যাকাশে—চোখের দৃষ্টি আতঙ্কে স্থির।

অবাক হল বদ্রীপ্রসাদ। শোভনলালের হাত জড়িয়ে মৃদু কণ্ঠে বলে উঠল, "কী হল ফ্রেন্ড? কী হল? শরীর খারাপ নাকি?"

সিনেমা হলে বসে ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে তখনও শোভনলাল। ভয়ে পর্দার দিকে তাকাতেই পারে না।

বলে,—"বাড়ি চল বদ্রীপ্রসাদ। প্লীজ, এখুনি চল—খুন—খুন—আমার কেমন ভয় ভয় করছে ভাই।"

বদ্রীপ্রসাদ পর্দায় চোখ রেখে হাসে, "ভয়! কেন? ভয়?"

শোভনলাল নিরুত্তর। বদ্রীপ্রসাদের কাঁধে মাথা রেখে কাঁপছে বার বার।

এবার বদ্রীপ্রসাদ সত্যি সত্যি ভয় পেল। সিনেমা হলে আতঙ্কে অজ্ঞানই হয়ে যাবে নাকি শোভনলাল? আর এখানে অজ্ঞান হলেই বিপদ—হল ভর্তি লোক সিনেমা দেখতে ব্যস্ত—কোথায় এখানে ওষুধ আর কোথায় বা ডাক্তার?

বদ্রীপ্রসাদ বলল; "চল ফ্রেণ্ড—আমরা ফিরে যাই। আজ সিনেমা থাক।"

শোভনলালকে সঙ্গে করে হলের বাইরে এল বদ্রীপ্রসাদ। গাড়িতে উঠে বসল।

শোভনলালের উপর দিয়ে মস্ত এক ঝড় বয়ে গেছে যেন। চোখ মুখ বিবর্ণ—অবিন্যস্ত চুল—কপালে জমেছে মৃদু মৃদু ঘাম। দেখে কেমন মায়া হয় বদ্রীপ্রসাদের।

স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে বলে—"তুমি হঠাৎ ভয় পেলে কেন শোভনলাল?"

কথা কানে ঢোকে না বুঝি শোভনলালের। একটু সামনের দিকে ঝুঁকে বসে। কাঁপা গলায় বলে, "খুন করলে ফাঁসি হয়—তাই না বদ্রীপ্রসাদ?"

খুন দেখে ভয় পেল কেন শোভনলাল? এই ত সেদিন দাড়ি কাটতে গিয়ে রক্ত দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল শোভনলাল? তবে কি শোভনলাল অপরাধী? কী এমন অপরাধ যার কথা সব সময় ভাবছে ও? বেশ কিছুদিন ধরেই এসব লক্ষ্য করছে বদ্রীপ্রসাদ।

তবু হো হো করে হাসে বদ্রীপ্রসাদ। বন্ধুকে সাহস দিতে চায়। বলে, "খুন করলে ফাঁসি হয় শোভনলাল—কিন্তু খুনের প্রমাণ চাই—ফাঁসির আদেশ দেবার আগে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ চাই। ফাঁসি দেওয়া কি অতই সোজা?"

শোভনলাল হঠাৎ বলে ওঠে, "যদি খুনের কোন প্রমাণ না থাকে—যদি সে খুন কেউ না দেখে থাকে তবে? তাহলে? তাহলে কী হয় বদ্রীপ্রসাদ—ফাঁসি হয়?"

শোভনলাল কি খুনী? ও কী কোন ফেরারী আসামী? কেমন সন্দেহ জাগে বদ্রীপ্রসাদের।

বলে, "শোভনলাল—প্লীজ, ডোন্ট মাইণ্ড—কী ভাবছ বল? আমি তোমার ফ্রেণ্ড—বিপদে বন্ধুই বন্ধুকে সাহায্য করে।"

"বদ্রীপ্রসাদ, আজ নয়—আরেক দিন বলব",—বলতে বলতে হাতে হাত রাখে শোভনলাল—অনুনয়ের কণ্ঠে বলে, "তোমার দয়াতেই বেঁচে আছি বদ্রীপ্রসাদ"—

"দয়া—না, না শোভনলাল",—সঙ্কোচ বোধ করে যেন বদ্রীপ্রসাদ। বলে, "না ফ্রেণ্ড—দয়া নয়। বল কোঅপারেশন—সহযোগিতা। তোমার চাকরি ছিল না —বহুদিন পর তোমার সাথে দেখা হল, আমার ফ্যাক্টরির ম্যানেজার করে দিলাম। এতে দয়ার কী আছে বল? আফটার অল তুমি আমার বাল্যবন্ধু! কত দিন পর তোমার সাথে দেখা বলত?"

ঠিকই বলেছে বদ্রীপ্রসাদ। শোভনলালের সাথে দেখা হবে আবার জানত নাকি? সুদীর্ঘ বার বছর পর দেখা—প্রায় এক যুগ। সেই এক স্কুলে পড়ত দুজনে—একসাথে পড়াশুনা—খেলাধুলা—তখন প্রাণের বন্ধু ছিল শোভনলাল। ওর বাবার তখন সরকারী চাকরি—আজ এখানে বদলী কাল সেখানে। বাবার বদলীর সাথে সাথে স্কুল ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল শোভনলাল। শেষ দিনে স্কুল-মাঠে দাঁড়িয়ে দুই বন্ধুর সে কী কান্না—সেই বিচ্ছেদ বেদনার কথা আজও বুঝি মনে পড়ে দুজনার।

তারপর মাস ছয়েক আগে হঠাৎ-ই দেখা—শোভনলালই এসে হাজির। এত বছর বাদেও দেখতে পেয়ে চিনতে পেরেছিল বদ্রীপ্রসাদ।

আনন্দে লাফিয়ে উঠল, "তুমি!"

মুখে হাসি নেই তখন শোভনলালের, "আমার একটা চাকরির দরকার বদ্রীপ্রসাদ। তোমার ত এতগুলো ফ্যাক্টরি—নানা ধরনের বিজনেস—আমাকে যে কোন জায়গায় ঢুকিয়ে দাও।"

ঠিক লোকের কাছেই এসেছে যেন শোভনলাল। বদ্রীপ্রসাদ এদিককার নাম করা শিল্পপতি—মস্ত বড়লোক। বদ্রীপ্রসাদই পারে শোভনলালকে সাহায্য করতে।

তবে পুরোনো চাকরিটা থাকলে এ সাহায্যের দরকার হত না শোভনলালের। ও ছিল একটা ফ্যাক্টরির ম্যানেজার—ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাবার সাথে সাথে আজ অদৃষ্টের পরিহাসে বেকার। বাবা মরে গেছেন কবেই—কিন্তু রেখে গেছেন হাজার দায়-দায়িত্ব। দেশের বাড়িতে বিধবা মা আর ছোট ছোট ভাইবোনেরা বসে আছে শোভনলালের মুখ চেয়ে। তাই চাকরি দরকার—অর্থের এত প্রয়োজন।

বহু বছর বাদে শোভনলালের দেখা পেয়ে বদ্রীপ্রসাদ

ত খুব খুশী। এত কষ্টে আছে শোভনলাল তা ওর প্রাণে সয় নাকি? চাকরি দেওয়া বদ্রীপ্রসাদের পক্ষে এমন কি কঠিন কাজ? শোভনলালকে নতুন ফ্যাক্টরির ম্যানেজার করে দিল বদ্রীপ্রসাদ। বন্ধুর সঙ্গ পেয়ে যেন বাঁচল।

তা নয়ত কি? খোলামেলা সুখের জীবন বদ্রীপ্রসাদের। কাকার মৃত্যুর পর অগাধ সম্পত্তি হাতের মুঠোয় এসে গেছে তখন। সংসার বলতে একমাত্র বুড়ি মা--আর কেউ নেই বদ্রীপ্রসাদের। একা একা থেকে হাঁফিয়ে উঠছিল তখন। সময় কাটানই যেন মস্ত এক সমস্যা—শোভনলাল আসাতে যেন নতুন করে মেতে উঠল। বন্ধুকে একেবারে বাড়িতে নিয়ে এল—একই সঙ্গে এক ঘরে থাকতে লাগল দুজনায়। ওদের তখন আর পায় কে? জমজমাটি আড্ডায় সময় কাটছে তরতরিয়ে। দুই বন্ধু আবার এল প্রাণের কাছাকাছি।

মাস ছয়েক যাবৎ বন্ধুর সাথে একই ঘরে এক সাথে আছে শোভনলাল। কিন্তু গত মাস থেকেই একটা সন্দেহ দানা বাঁধছে যেন বদ্রীপ্রসাদের মনে।

প্রায় রাতেই স্বপ্ন দেখে বুঝি শোভনলাল—ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠে। ঘুম ভেঙে যায় বদ্রীপ্রসাদের।

ঘুম ভেঙে দেখে বিছানায় থরথরিয়ে বসে কাঁপে শোভনলাল। আতঙ্কে পাণ্ডুর চোখ মুখ। জানালার দিকে বোবা দৃষ্টি মেলে বিড়বিড় করে কী যেন বলে।

বদ্রীপ্রসাদ আলো জ্বালায়, "কী হল শোভনলাল? কী বলছ—কী?"

অস্ফুট কণ্ঠ শোভনলালের, "ওরা আসছে! ওরা আমায় খুন করবে!"

"ওরা কোথায়? কেন খুন করবে? কেন?"

শোভনলালের ঠোঁট কাঁপে, "ওরা—স্বপ্নের ওরা, স্বপ্নের সব লোকজন!"

বদ্রীপ্রসাদ উঠে এসে শোভনলালের কাঁধে হাত রাখে, "কী হয়েছে খুলে বল শোভনলাল।"

শোভনলাল বলে, "আজ নয়—আরেক দিন বলব বদ্রীপ্রসাদ। আরেক দিন বলব।"

এসব কথা ভাবতে ভাবতে গাড়ি চালাচ্ছিল বদ্রীপ্রসাদ। পাশে শোভনলাল চুপ করে বসে। আজ সিনেমায় খুন দেখে ভয় পেল শোভনলাল। কিন্তু কেন? আজও বললো আরেক দিন সে বলবে—জানাবে ওর ভয়ের কথা—আতঙ্কের কথা। কিন্তু কবে জানাবে? কবে বলবে?

থমথমে নিশুতি রাত। রাস্তাঘাট সব অন্ধকার। মাঝে মাঝে দু একটা কুকুরের ডাক শুধু শোনা যায়।

...আবার চিৎকার করে উঠল শোভনলাল, "খুন। খুন! ওরা আসছে! আসছে!"

ঘুম ভেঙে গেল বদ্রীপ্রসাদের। আলো জেবলে দেখে বিছানায় বসে ঠক-ঠকিয়ে কাঁপছে শোভনলাল।

বদ্রীপ্রসাদের কণ্ঠে বিরক্তি ঝরে, "কেন তুমি চিৎকার করে ওঠ? কেন তুমি আমায় সব বল না?"

বড় বড় শ্বাস ফেলে শোভনলাল, "বলব—সবই আজ বলব বদ্রীপ্রসাদ। কিন্তু তুমি যদি কাউকে বলে দাও—যদি পুলিশ জানতে পারে তাহলে হয়তো আমার ফাঁসি হয়ে যাবে বদ্রীপ্রসাদ, আর,"—একটু থামে শোভনলাল, "আমার কথা খুলে বলতে না পারলে শান্তি পাচ্ছি না বদ্রীপ্রসাদ— কথা দাও কেউ জানবে না— কাউকে বলবে না।"

বদ্রীপ্রসাদ শোভনলালের পাশে বসে, "বিশ্বাস কর ফ্রেন্ড—কাউকে বলব না—কেউ জানবে না।"

শোভনলাল বলতে থাকে, "আমি খুনী বদ্রীপ্রসাদ—খুনী। বেকার হবার পর সব রাগ আমার ফ্যাক্টরির ডিরেক্টারের উপর পড়েছিল। আমি একদিন রাত্রিতে"—বলতে বলতে উত্তেজনায় কাঁপছিল শোভনলাল।

বদ্রীপ্রসাদ কাঁধে হাত রেখে বলে, "কি হল সেই রাত্তিরে—বল—বল"—

"হ্যাঁ বদ্রীপ্রসাদ—রাত্তিরে ডিরেক্টারের বাড়িতে দেওয়াল টপকে ঢুকেছিলাম। ধারালো ছোরার আঘাতে আমি—হ্যাঁ, আমি খুন করে ফেললাম। তারপর পালিয়ে এলাম সবার অলক্ষ্যে। কেউ দেখল না—কেউ জানল না। সেই খুনের আজও কিনারা হয়নি বদ্রীপ্রসাদ। তবু আমার সব সময়ই ভয় হয়—ভাবি পুলিশ যেন আমায় খুঁজছে—আমার ফাঁসি হবে।"

থামে শোভনলাল। মনের কথা বলতে পেরে হালকা হয়।

"পুলিশ? ফাঁসি?"—বদ্রীপ্রসাদ গলা চড়িয়ে হাসে, "তুমি স্বীকার না করলে পুলিশের বাবার সাধ্যি নেই তোমায় ধরে। খুন করেছো বেশ করেছো—মিটে গেছে—অত ঘাবড়ালে কী চলে?"

"কিন্তু আমি শান্তি পাই না বদ্রীপ্রসাদ!"—ধরা গলা শোভনলালের।

"দূর দূর—ওসব কথা ভাবলেই অশান্তি। ওসব মন থেকে মুছে ফেল ফ্রেন্ড।"—ফস্ করে একটা সিগ্রেট ধরায় বদ্রীপ্রসাদ।

"তুমি বুঝবে কি?"—ভয়ের গলা শোভনলালের, "তুমি কি কোনদিন খুন করেছ যে বুঝবে?"

"খুন?"—আবার হাসে বদ্রীপ্রসাদ, "আমায় দেখে কি খুনী বলে মনে হয়?"

"না, না"—শোভনলাল বলে, "দেখে কি কাউকে বোঝা যায় ভাই? তাছাড়া তুমি খুনী হতে যাবে কেন?"

"তোমাকে বলতে বাধা নেই", ঘনিষ্ঠতার গলা বদ্রীপ্রসাদের, "তুমি তোমার গোপন কথা আমায় বলেছ—আর আমি বলব না? তোমাকে বিশ্বাস করি বলেই বলছি—পুলিশ জানতে পারলে আমার ফাঁসি হয়ে যাবে শোভনলাল।"

শোভনলালের যেন বিশ্বাসই হয় না বদ্রীপ্রসাদের কথা। অবাক হয়ে শুনছিল।

বদ্রীপ্রসাদ বলে, "আমার কাকা জীবনে বিয়ে থা করেন নি। বিয়ে করবার সময়ই পাননি বলতে হয়। ফ্যাক্টরির লাভের দিকে আর টাকার জন্যে সারা জীবন ছুটতে ছুটতে বুড়িয়ে গেলেন দেখতে দেখতে।

শেষ জীবনে কাকার ধর্মে কর্মে মতি গেল। কানা-ঘুষায় শুনতে পেলাম উনি নাকি উইল করবেন। সব সম্পত্তি তুলে দেবেন ধর্মপ্রতিষ্ঠানের হাতে। তখন আমি কাকাকে সরিয়ে দেবার প্ল্যান আঁটতে লাগলাম।"

সিগ্রেটে জোরে জোরে টান দেয় বদ্রীপ্রসাদ। আজ যেন কথার নেশায় পেয়ে বসেছে। শোভনলালের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসে।

বলে, "ইতিমধ্যে বাবা মারা গেলেন। বাবার ব্যবসাগুলো আমার হাতে এল। কাকার তিন তিন খানা বড় বড় ফ্যাক্টরি—এগুলো উইল করার আগেই আমার হাতের মুঠোয় আনার জন্য ছটফট করছিলাম। সুযোগ এসে গেল।"

"দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও বদ্রীপ্রসাদ"—বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল শোভনলাল জানালাগুলো বন্ধ করে দিল।

"জানালা বন্ধ করলে যে?" —অবাক হল বদ্রীপ্রসাদ।

"হ্যাঁ ভাই," শোভনলাল ভয় পায়, "সাবধানের মার নেই—দেয়ালেরও কান আছে ফ্রেন্ড।"

"তুমি ভীতু—রাম ভীতু", বদ্রীপ্রসাদ আবার হাসে, "ভাবতেই পারি না তুমি কি করে মার্ডার করলে। যাক্‌গে আমার কথা শোন।" ফের শুরু করে বদ্রীপ্রসাদ, "ইয়েস ফ্রেন্ড, সুযোগ এল। কাকা বলল—বুড়ো হচ্ছি আর কদিন বাঁচব বদ্রী? তুই আমাকে তীর্থস্থানে ঘুরিয়ে নিয়ে আয়।

বেনারস যাবার গাড়ি এখান থেকে গভীর রাতে ছাড়ে। আমি মনস্থির করে ফেললাম। কাকা খেয়ে দেয়ে একটু শুয়েছিলেন। আমি রাত্রিতে তাঁকে ধারাল ভোজালী দিয়ে খুন করে ফেললাম।"

"খুন!"—চমকে উঠল শোভনলাল।

"ইয়েস ফ্রেন্ড মার্ডার", ঠাণ্ডা গলা বদ্রীপ্রসাদের, "এই খুন কেউ দেখল না—জানল না। মা তখন মাসীর বাড়িতে দিল্লীতে—এমন সুযোগের অপেক্ষাতেই আমি বসেছিলাম এদ্দিন।"

"কিন্তু ডেড বডি?"

"ডেডবডি চটের থলিতে মুড়ে গাড়িতে করে নিয়ে গিয়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দিলাম। আমি সে রাত্তিরেই চলে গেলাম বেনারস। লোকে জানল কাকাকে নিয়ে আমি বাইরে গেছি।"

"কিন্তু পুলিশ?"—ভয়ের গলা শোভনলালের।

"দুত্তোর ছাই পুলিশ! বেনারস থেকে এসে রটিয়ে দিলাম কাকা কলেরায় মারা গেছে। ওখান থেকে টাকা পয়সা দিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট ম্যানেজ করে দিব্যি সব সম্পত্তির মালিক হয়ে বসলাম। লোকে জানে আমার কাকা অসুখে মরেছে—কিন্তু দিস্ ইজ মার্ডার।"

"পুলিশ তোমাকে একেবারেই সন্দেহ করেনি?" —বদ্রীপ্রসাদের কথা শুনে বিশ্বাস হচ্ছে না যেন শোভনলালের। এত ঠাণ্ডা গলায় কি কেউ খুনের কথা বলতে পারে?

"করেছিল—তবে একটু আধটু। আরে ভাই টাকা দিলে কি না হয়—দিন রাত হয়ে যায়। কাকার কঙ্কাল পুলিশ পেয়েছিল। কাকার একটা পা ছোটবেলা থেকেই খোঁড়া—দু হাতেই ছটা করে আঙ্গুল। ছ আঙ্গুলে খোঁড়া মানুষের কঙ্কাল থেকে কারও কিছু বলা সম্ভব নয়—কিন্তু কাকার হাতে সোনার মাদুলী ছিল—নাম লেখা মাদুলী। ঐ মাদুলী নিয়েই পুলিশ একটু হেনস্থা করল আর কি! হেনস্থা না ঘোড়ার ডিম—এক নামের কি দুজন লোক হয় না? তবে বাহাদুরী আছে বটে পুলিশের—কঙ্কাল দেখে কাকার বয়েস, গড়ন—এমন কি কি অসুখে খোঁড়া হয়েছিল সব বলে-দিল। পুলিশ আমার কাছে এসেছিল—ডেথ সার্টি-ফিকেট দেখে তবে নিশ্চিন্ত হল।"

একটানা কথা বলে থামল বদ্রীপ্রসাদ। শোভন-লালের কাছে এসব কথা বলতে ভালই লাগে

বদ্রীপ্রসাদের। আজ দুজনই অপরাধী—মনের কথা বলে দুজনে চলে এসেছে আরো মনের কাছাকাছি।

শোভনলাল বলে ওঠে,—"বিশ্বাস হয় না—সত্যিই কী তুমি খুনী? সত্যিই কি তুমি তোমার কাকাকে খুন করেছিলে?"

আরেকটা সিগ্রেট ধরায় বদ্রীপ্রসাদ, "হ্যাঁ ভাই, আমিই খুনী। কাকাকে আমি খুন করেছি। কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার—ঠাণ্ডা মাথায় খুন।"

বদ্রীপ্রসাদ—আমি শোভনলাল। এখন রাত চারটা। ঘণ্টা খানেক আগে আমি তোমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি—তুমি তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এ চিঠি আমি পুলিশ-স্টেশন থেকে লিখছি বদ্রীপ্রসাদ।

পুলিশ তোমাকে তোমার কাকার খুনের জন্য বরাবরই সন্দেহ করেছিল। পুলিশের ধারণা তুমিই খুনী। কিন্তু তোমায় গ্রেপ্তার করেনি—কারণ মামলা টিকত না। খুনের প্রমাণ কোথায়—সাক্ষী কোথায়? কেউ নেই। তোমার স্বীকৃতিই সব চেয়ে বড় প্রমাণ। তুমি অত কাঁচা লোক নও যে নিজের মুখে খুনের কথা স্বীকার করবে—কেউ করে না। শাস্তির ভয় ত সকলেরই আছে বদ্রীপ্রসাদ।

বদ্রীপ্রসাদ—তুমি আমায় ক্ষমা করো। তোমার কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য দিনের পর দিন আমায় অভিনয় করতে হয়েছে। সাজতে হয়েছে বেকার—চাকরি করতে হয়েছে তোমার কাছে। বলতে হয়েছে বানান এক খুনের ঘটনা—তা না হলে তোমার স্বীকৃতি পেতাম না বদ্রীপ্রসাদ।

তুমি একেবারেই বুঝতে পারনি বদ্রীপ্রসাদ—বুঝতে পারনি তোমার সব কথাবার্তা রোজই রেকর্ড হয়ে যেত বিছানার তলায় লুকোনো টেপ রেকর্ডারে। আজকের রাত্রিটাই আমার কাছে সব চেয়ে মূল্যবান। আমার সামনেই এখন সেই টেপ রেকর্ডারটা বাজছে—আমি তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি।..."ইয়েস মার্ডার—আমিই খুনী—কাকাকে আমি খুন করেছি....।"

এই কথা তোমার কাছে থেকে আদায় করার জন্য মাস ছয়েক ধরে তোমার সাথে আমি মিশে গেছলাম। বার বছর পর তোমার সাথে দেখা—তুমি আমার আসল পরিচয় জানতে না। জানতে না যে আমি ফ্যাক্টরির ছাঁটাই হওয়া ম্যানেজার নই—আমি গোয়েন্দা বিভাগের একজন বড় অফিসার। তোমার কাকার খুনের কিনারার জন্যে কর্তৃপক্ষ আমায় পাঠিয়েছিলেন।

বদ্রীপ্রসাদ. ইন্সপেক্টার দুবে এ চিঠি তোমায় দেবে। তোমার নামে ওয়ারেন্ট বার করা হল—খুনের দায়ে তুমি এখন পুলিশের হেফাজতে।

সব শেষে তোমার আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ।

—শোভনলাল

• হাতের কাজ •

নকল ফুল গাছ

ঘরে সাজানোর জন্য তোমাদের একটা সুন্দর হাতের কাজ শিখিয়ে দিচ্ছি। এটি তৈরি করা যেমন সহজ, খরচও তেমনি নেই বললেই চলে।

কুল অথবা বাবলা গাছের শুকনো ছোট একটা ডাল যোগাড় কর। ডালটি যত ঝাঁকড়া হয় ততই ভাল। এবার একটা মাটির ছোট টব বা হাঁড়ির মধ্যে মাটি ভরে ডালটিকে ভালভাবে পুঁতে দাও। তারপর কিছু মুড়ি বা খই নিয়ে ঐ ডালের প্রত্যেক কাঁটায় একটা করে মুড়ি বা খই গেঁথে দাও। সাবধান, হাতে কাঁটা ফুটে যায় না যেন! সব কাঁটাতে মুড়ি বা খই গাঁথা হয়ে গেলে টবটির গায়ে পছন্দ মত রঙ করে নাও। এবার দেখ তো, কেমন চমৎকার একটা গাছ হয়েছে!

গাছশুদ্ধ টবটিকে ঘরের এক কোণায় ছোট্ট টেবিলে অথবা তোমাদের পড়ার টেবিলে রেখে দাও। তোমাদের বন্ধুরা এমন কি বড়রাও ওটা দেখে আনন্দ পাবেন।

—মিলন মজুমদার

রোহ্‌টাং-এর বন্ধু

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

বেশ লাগছিল। সূর্যকে এত ভালো জীবনে আর কোনদিন লাগে নি। একে হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা, তায় চারদিকে জমাট বরফ। বারবার মনে হচ্ছিল, এহেন সময়ে সূর্যকে যদি ঠিক মাথার ওপরটিতে না পেতুম তো আমাকে জমে গিয়ে বরফ হতে হত।

হ্যাঁ, বরফ। শুধুই জমাট বরফ। এ ছাড়া আর কী-ই বা আছে রোহ্‌টাং-এ! জনপ্রাণী নেই, গাছপালা নেই। ঘরবাড়ি বা দোকান-বাজার তো দূরের কথা। রোহ্‌টাং গিরিসংকট তার সারা দেহে বরফ মুড়ি দিয়ে মূর্তিমান একটা রহস্যের মতো যেন পড়ে আছে।

বরফ সূর্যের আলোয় চকমক করছে থেকে থেকে। চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। আর ওদিকে দূরে, বেশ খানিকটা দূরে তুষারে ঢাকা কয়েকটা চূড়া উঁকিঝুঁকি মারছে।

রোহ্‌টাং ধরে খানিকদূর গেলে লাহুল উপত্যকা। কুলু-মানালী আর লাহুলের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে এই রোহ্‌টাংই। এই চৌদ্দ হাজার ফুটেরও বেশি উঁচু সমতল পথ।

ঠিক পথ নয়, প্রায়-পথ। দুর্গম-বন্ধুর পাহাড়ীয়া দেশে দুই উপত্যকা বা দুই অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ-রক্ষাকারী এই ধরনের পথকেই বলা হয় গিরিসংকট।

রোহ্‌টাং গিরিসংকটের বদনাম খুব। এ পেরোতে গিয়ে আজ অবধি কত শত লোক যে মরেছে, সীমা সংখ্যা নেই তার।

লোকে বলে, যখন-তখন নাকি ঝড় ওঠে এখানে। তুষার-ঝড়। চারিদিক দেখতে দেখতে ঝাপ্‌সা হয়ে যায়। আর রোহ্‌টাং ধরে চলা হতভাগ্য পথিকরা হাহাকার করতে করতে মুখ থুবড়ে পড়ে।

এখানে আশেপাশে কয়েক মাইলের মধ্যে লোকালয় নেই। অতএব, কে ওদের সাহায্য করবে?...মুখ থুবড়েই হতভাগ্যরা পড়ে থাকে; এবং তারপর তুষার ধীরে ধীরে ওদের সমাধি দেয়।

অনেকদিন বাদে তুষার গললে বা খুঁড়লে হয়তো বা দেখা পাওয়া যায় ওদের। ঠিক আগে ওরা যেমন ছিল, তেমন ভাবেই পাওয়া যায়। ঠাণ্ডার দৌলতে এতটুকু বিকৃত হয় না ওদের দেহগুলো। প্রাণ নামক আসল বস্তুটিই শুধু দেহ-ছাড়া হয়।

লোকে বলে, দীর্ঘদিন ধরে এই বদনাম আছে বলেই এ গিরিসংকটের নাম হয়েছে রোহ্‌টাং বা মৃত্যুপুরী।

তা হোক,—রোহ্‌টাং ধরে চলতে চলতে ভাবি, হিমালয়ের দেশে গিরিসংকট মানেই দুর্গম ও ভয়াবহ কিছু। কিন্তু তাই বলে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে মানুষ? পথ চলবে না? এগোবে না?

এগোচ্ছি আমরাও। তুষার-ঢাকা রোহ্‌টাং-এর ওপর খুব সাবধানে পা ফেলছি।

তুষার এক এক জায়গায় বেশ নরম। পা বসে যাচ্ছে। সন্দেহ হল, এ-তুষার কাল রাত্তিরে পড়েছে; জমাট বাঁধবার অবকাশ পায়নি এখনও।

সহযাত্রী বন্ধুটিকে বললুম,—সাবধান! দেখে শুনে পা ফেলো!

বন্ধুটি দেখলুম, আমার চেয়েও আর এক কাঠি সরেস। পা ফেলতে গিয়ে এক একবার পড়ি-পড়ি করছে।

বললুম,—এক কাজ করি। জিরিয়ে নি একটু।

বন্ধু বললো,—বেশ!......এবং বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বরফের ওপর দুম করে বসে পড়ল।

বসলুম আমিও। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই দেহটাকে তুষার-শয্যার ওপর এলিয়ে দিলুম।

বন্ধু বললে,—আপাততঃ নিশ্চিন্তি। কয়েক মিনিট বিশ্রাম না নিয়ে উঠছি নে।

যা বলেছ!—সায় দিলুম তৎক্ষণাৎ। এবং পরক্ষণেই দিব্যি আরামে খোলা আকাশের দিকে তাকালুম। মনে হল, আকাশের অনেক কাছে আমি এখন। পৃথিবীর কলকোলাহল থেকে আমি এখন অনেক দূরে। কোলাহল-মুখরিত শহর পাঠানকোট এখান থেকে দুশো মাইলেরও বেশি পেছনে। আর কোলকাতা, যেখানে আমি থাকি, তার দূরত্ব এখান থেকে প্রায় চৌদ্দ শ মাইল। ...মনে হল, শিয়ালদা-পাঠানকোট এক্‌স্‌প্রেসে চেপে আমার এতদিনের চেনা জানা শহরটা ছেড়ে কত যুগ আগে যেন বেরিয়েছি! বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব পেরিয়ে এসে হিমালয়ের এই দুর্গম তল্লাটে যেন পথ চলছি কত কাল ধরে!

হ্যাঁ, দিব্যি চলছিলুম পথ। কিন্তু হঠাৎ কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল! ভুল বোঝাবুঝি হল গাইড ব্রিজ সিং ও তার ছোট ভাই সুরথ সিং-এর সঙ্গে।

ব্রিজ আর সুরথ দুজনেই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছিল রাহালা থেকে। যে খচ্চর দুটিতে চেপে আমরা রোহ্‌টাং-এর দিকে এগোচ্ছিলুম, তাদের মালিকও ওরাই।

যখনকার কথা বলছি, ন হাজার ফুট উঁচু রাহালা অবধি তখন মোটামুটি ভাল রাস্তা হয়েছে। ছোটখাটো বাস, জীপ ইত্যাদি তখন চলাচল করছে মানালী ও রাহালার মধ্যে।

কিন্তু রাহালার পরেই ভীষণ দুর্গম চারিদিক। হাঁটা-পথ না ধরলে অথবা খচ্চরের পিঠে না চাপলে রোহ্‌টাং পৌঁছুবার উপায় নেই। আমরা মানালী থেকে গাড়িতে রাহালা অবধি এসে দুটি খচ্চর ভাড়া করলুম। ব্রিজ আর সুরথ সিং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল। কিন্তু খানিকদূর এগিয়েই, ঠিক রাহালা জলপ্রপাত এলাকাটি পেরিয়েই ব্রিজ সিং বেঁকে দাঁড়াল হঠাৎ। বললো, মোটা রকম বকশিশ না পেলে রোহ্‌টাং যাবো না। বললুম,—বকশিশ? তা বেশ তো! নেবে।

এদিকে ব্রিজ সিং দেখলুম, কাঁচা কথায় ভুলতে রাজী নয়; পাকা বন্দোবস্ত চায়। বললে,—কী দেবে, আগে তা ঠিক হোক।

এবার রীতিমত বিরক্ত হলুম আমি। কড়া এক ধমক দিয়ে বললুম,—কী মুশকিল! ঠিক তো হয়েই আছে। রাহালাতে তোমাদের সঙ্গে দরদস্তুর করেই তো পথে বেরিয়েছি!

ব্রিজ সিং বললে,—তা বেরিয়েছ। কিন্তু এখন দেখছি, তোমরা পথ চলছ খুব ধীরে ধীরে; চারিদিকের সব তামাসা দেখতে দেখতে। এভাবে চললে পয়সা আরও বেশি দিতে হবে।

অস্বীকার করবো না, দেখতে দেখতেই খাড়া পাহাড়ী পথ ধরে আমরা এগোচ্ছিলুম। খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে মাঝে মাঝে জিরিয়েও নিচ্ছিলুম। কিন্তু এ নিয়ে যে এমন একটা সমস্যা দেখা দিতে পারে, তা স্বপ্নেও ভাবি নি। আমার সহযাত্রী বন্ধুটি অবিশ্যি সমস্যার সমাধান করলেন শেষ অবধি। ব্রিজ সিংকে বললেন,—বেশ! আরও দুটাকা করে তোমরা পাবে।

ব্রিজ আর সুরথ এ-প্রস্তাবে আপত্তি করল না কিছু। মোটামুটি খুশি মনেই এগোল।

ভাবলুম, যাক! নিশ্চিন্তে যাওয়া যাবে আবার। গেলুমও। রোহ্‌টাং অবধি দিব্যি নির্ভাবনায় পথ চললুম। কিন্তু রোহ্‌টাং পৌঁছেই বিপদ। যেই খচ্চর থেকে আমরা নেমে ব্রিজ সিংকে বললুম, এবার এই বরফের দেশে আমরা একটু হেঁটে বেড়াবো, অমনি

...হঠাৎ কাকে যেন জড়িয়ে ধরলুম।

বেঁকে দাঁড়াল সে। বললো,—নেহি হুজুর! ওসব 'খেইল' করলে দেরি হবে। পড়তা পোষাবে না।

ব্রিজ সিং-এর কথা শুনে আমি আর আমার বন্ধু দুজনেই অবাক। বললুম,—পোষাবে না? মানে?

মুহূর্তের মধ্যে ব্রিজ সিং পরিষ্কার করে দিল মানেটা। যা বললো, তার বাংলা দাঁড়ায়,—আরও গোটা দশেক টাকা দাও। হুকুম তামিল করছি।

সুরথ সিংও সায় দিল তার দাদার কথায়। পরিষ্কার হিন্দীতে বললো,—জী হজুর! সাচ্ বাত্।

সাচ্ বাত?—আমি রাগে ফুঁসিয়ে উঠলুম সঙ্গে সঙ্গে। আর ভাবলুম, আচ্ছা শয়তানের পাল্লায় পড়েছি যা হোক। বাগে পেয়ে সর্বস্ব না ছিনিয়ে নেয়!

বন্ধু তো বলেই বসলেন,—না না। আর একটি পয়সাও দিচ্ছি না। না পোষায়, চলে যেতে পারো।

ব্রিজ সিং বললে,—বেশ! যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের পাওনাটা মিটিয়ে দাও।

শেষ অবধি তাই দিলুম। অনেক কষ্টে মোটামুটি একটা রফা করে রেহাই পেলুম আমরা।

বন্ধু বললে,—ভয় কী! হেঁটে ফিরবো। অনেকেই তো রাহালা থেকে হাঁটা-পথে এখানে যায়-আসে।

বললুম,—নিশ্চয়! আর তা ছাড়া, এমন জিনিস ভালো করে না দেখে কেউ ফেরে?

সত্যি! কেউ ফেরে?—সেদিন রোহ্‌টাং গিরি-সংকটে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলুম কত কী। এমন সময় হঠাৎ পুব-দিগন্তে কয়েক টুকরো মেঘ দেখা দিল।

বন্ধু বললে,—দেখেছ! ভারী সুন্দর! তাই না? নীল আকাশের বুকে কয়েক খণ্ড পেঁজা তুলো যেন!

বললুম,—হ্যাঁ, অনেকটা সেই রকমই মনে হচ্ছে। কিন্তু তুলো না আবার সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ে! পড়লেই বিপদ।

বন্ধু বললে,—বিপদ মানে তুষারপাত তো?

বললুম,—হ্যাঁ, তাছাড়া আর কী! নভেম্বরের শুরু এখন। কিছুই বলা যায় না।

এতক্ষণে দুই বন্ধুতে উঠে দাঁড়িয়েছি। রোহ্‌টাং-এর তুষার-পথ ধরে চলতে শুরু করেছি আবার। খানিকদূর চলতেই স্পষ্ট মনে হল, হাওয়ার বেগটা ক্রমেই যেন বাড়ছে। আর পুব-দিগন্তের সেই মেঘের টুকরোগুলো আরও অনেক সঙ্গী পেয়ে খ্যাপা শিশুর মতো যেন ছুটোছুটি করছে আকাশে।

বন্ধু বললে,—আর এগোন ঠিক হবে না। এবার ফেরা যাক।

বললুম,—হ্যাঁ, ফেরা-ই ভালো। ভাবগতিক খুব একটা সুবিধের মনে হচ্ছে না।

ওফ্! দারুণ শীত লাগছে আমার!—ফেরবার মুহূর্তে হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল বন্ধু।

বললুম,—ও কিছু নয়। দমকা হাওয়া। তাইতেই... কথা শেষ করতে পারলুম না। তার আগেই হাওয়ার বেগটা মুহূর্তের মধ্যে যেন তিন গুণ বেড়ে গেল। প্রায় সারা আকাশ মেঘে ঢেকে গিয়ে অদ্ভুত এক আঁধার নেমে এলো রোহ্‌টাং-এ।

এবার কাঁপতে কাঁপতে বন্ধুর কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বললুম,—সর্বনাশ! তুষার-ঝড় শুরু হয় বুঝি! এগোও তাড়াতাড়ি!

আর তাড়াতাড়ি! কথা শেষ হতে না হতেই শুরু হয়ে গেল। দমকা হাওয়ার সঙ্গে রাশি রাশি তুষার কণারা ছুটে এসে আমাদের চোখে মুখে ছুঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে যেন।

এদিকে এগোন মানে প্রায় এক মাইল যেতে হবে আরও। গেলে হয়তো খাড়া পাহাড়ের আড়ালে আশ্রয় মিলবে।

কিন্তু কোথায় পাহাড় আর কোথায় আশ্রয়! তুষার-ঝড়ের দাপটে আমরা দুই বন্ধু দুদিকে ছিটকে পড়লুম।

তুষার-ঝড় বেয়োনেট উঁচিয়ে আমার দিকে তেড়ে এলো যেন। আর আমি যেন স্পষ্ট শুনলুম, ঝড়ের গর্জন ভেদ করে রোহ্‌টাং-এ হারিয়ে যাওয়া মানুষ-গুলোর কান্না ভেসে আসছে।

কে তোমরা? কে কে?—বলতে বলতে পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলুম আমি। এবং পরমুহূর্তেই হঠাৎ কাকে যেন জড়িয়ে ধরলুম।

—কে তুমি? কে?

—আমি ব্রিজ সিং। চিনতে পারলে না হজুর?

—তুমি?

হ্যাঁ আমি। আমার ভাই সুরথ সিং-ও আছে। ঝড় উঠছে দেখে আমাদের আর ফেরা হল না। তোমাদের কথা ভেবে রোহ্‌টাংই-এ আসতে হল।—সে বলে।

—কিন্তু সর্বনাশের কি এখনও বাকী আছে? আমার বন্ধু তো নিশ্চয় শেষ হয়ে গেছে এতক্ষণে?

—না হজুর! শেষ হয় নি। সুরথ সিং একটু আগেই খোঁজ পেয়েছে তার।

[শেষাংশ ১৮৬ পৃষ্ঠার নীচে]

রাজার গল্প

ইন্দিরা দেবী

আজকাল রাজা-রাজড়াদের দেখতে পাওয়া যায় না। না আমাদের দেশে, না অন্য দেশে।

রাজা-রাজড়ারা থাকুন বা না থাকুন কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে গল্প-কাহিনীর কিন্তু ঘাটতি নেই।

সেকালে জার্মানীতে সব চাইতে নামকরা রাজ্য ছিল প্রাশিয়া। প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক। অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী তিনি। যেমন যুদ্ধ বিদ্যায়, তেমনি কূটনীতিতে, যেমন শিক্ষা দীক্ষায়, তেমন শাসন পরিচালনায়—সকল ক্ষেত্রেই অদ্বিতীয় পুরুষ। শুধুমাত্র প্রাশিয়ার রাজা এই পরিচয় তাঁর মনঃপূত হয়নি—অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য লোপ করে তিনি চেয়েছিলেন মধ্য ইয়োরোপে জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করতে। তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধও হয়েছিল—কিন্তু সে সব অন্য কথা, ইতিহাসের কথা।

পট্‌স্‌ডাম শহরে গড়ে উঠেছে এক বিশাল রাজপ্রাসাদ। ফ্রেডারিকের নিজের তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছে প্রাসাদটি—অপূর্ব পরিচালনা। সূক্ষ্ম কারুকার্য। যে দেখে সেই তাকিয়ে থাকে অবাক বিস্ময়ে। হ্যাঁ রাজপ্রাসাদ বটে। রাজার মনেও অহঙ্কার ধরে না। বিদেশী রাজদূতেরা যখন রাজপ্রাসাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন তখন রাজা লাভ করেন চরম আত্মপ্রসাদ। তাঁর মুখ চোখের চেহারা দেখে মনে হয় বড় বড় যুদ্ধ জয় করেও তিনি যেন অত খুশী হন নি।

সেদিন রাজসভার কাজ শেষ হয়েছে। অতিথি অভ্যাগতরা একে একে বিদায় জানিয়ে চলে গেছেন। দরবার কক্ষ ছেড়ে রাজা এসে দাঁড়ালেন প্রশস্ত বারান্দায় —সামনে অনেকখানি ফাঁকা। চোখের দৃষ্টির সামনে নেই কোনো বাধা। অনেক দূরে আবছা দেখা যায় পাহাড়ের শ্রেণী—পাহাড়ের গা বেয়ে যেখানে সমতল ভূমির শেষ প্রান্ত সেখানে গড়ে উঠেছে শহর পট্‌স্‌ডাম আর তার মধ্যমণি রাজপ্রাসাদ—তারই অদূরে সমান্তরালভাবে বয়ে চলেছে খরস্রোতা নদী। নদীর বুকে পাল-তোলা নৌকা, পাহাড়ের গায়ে ঘুরে বেড়ানো মেঘের টুকরো। অবারিত উন্মুক্ত সমতল ক্ষেত্র। তার বুক চিরে জেগে উঠেছে সবুজের সমারোহ। মাঝে মাঝে রঙিন বাহারে ফুলের বাগান। আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য। রাজা দেখছেন আর দেখছেন—পরিতৃপ্তিতে ভরে উঠছে তাঁর অন্তর।

কিন্তু ওটা কি? হঠাৎ চোখে পড়লো নদীর ধার ঘেঁষে একটা বাড়ী। যতদূর মনে হয় বাড়ীর আঙিনার মাঝখানে একটা চিমনি—তা থেকে বেরিয়ে আসছে কালো ধোঁয়া। রাজা ভাবলেন কি বিশ্রী এই বাড়ীটা, ওটাকে ওখানে সহ্য করা যায় না। সুন্দরের রাজ্যে অসুন্দরের অনধিকার প্রবেশ।

পরদিন সকাল হতে না হতে রাজার হুকুম জারী হলো ভেঙে ফেলতে হবে ঐ বাড়ীটা। রাজার হুকুম তো। কয়েক ঘণ্টাও গেল না—বাড়ীর আর কোন চিহ্নই রইল না।

কিন্তু বাড়ীর যিনি মালিক তিনি সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন। জমির আইনসংগত মালিক তিনি—নিজের চেষ্টায় আর পরিশ্রমে গড়ে তুলেছেন ছোট কারখানা। তার আয় থেকেই গ্রাসাচ্ছাদন হয় পরিবারের

—রাজার খেয়ালের দাম থাকবে আর মেহনতী মানুষের বাঁচবার অধিকার থাকবে না? দেশে আইন রয়েছে। রাজা তো আর আইনের বাইরে নন।

মালিক শুরু করে দিলেন মামলা। তাঁর পক্ষের উকীলরা আইন পুঁথি ঘেঁটে, নজীর উপস্থাপিত করে প্রমাণ করলেন যে, রাজার হুকুম নেহাত বে-আইনী। বিচারক তাদের সঙ্গে একমত হলেন। রায় হলো, রাজাকে এক সপ্তাহের মধ্যে ঠিক আগে যে রকম বাড়ী আর কারখানা ছিল তা রাজার খরচে তৈরি করে দিতে হবে।

রাজার কাছে রায়-এর খবর গেল। কিন্তু একটুও রাগ হলো না তাঁর। বরং খুশীই হলেন—বললেন 'আমার রাজ্যের বিচারপতিরা এত ন্যায়নিষ্ঠ জেনে আমি গর্ববোধ করেছি—আর ভাবছি এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ সত্যিই উজ্জ্বল।'

রাজার আদেশে আবার পুরোনো জায়গায় নতুন বাড়ী মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো।

কয়েক বছর পরের ঘটনা। ইতিমধ্যে রাজ্যের উপর দিয়ে বয়ে গেছে দু'দুটো যুদ্ধের ঝড়-ঝাপটা। তাতে ফ্রেডারিকই জয়ী হয়েছেন—কিন্তু দেশের লোকদের ভোগ করতে হয়েছে চরম দুর্গতি। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে বিপর্যয়।

রাজার কাছে এমনি সময় এলো একটি প্রস্তাব। কারখানার পুরোনো মালিক এখন বেঁচে নেই। তাঁর ছেলের উপর এখন ব্যবসায়ের দায়-দায়িত্ব। কিন্তু মন্দার বাজারে তার ব্যবসায় বন্ধ হবার যোগাড়। তাই রাজার কাছে তাঁর অনুরোধ অনুগ্রহ করে যদি এই বাড়ী আর জমি তিনি কিনে নেন আর তার জন্য তার দাবী সামান্যই, তাহলে তিনি উপকৃত হবেন।

রাজা ইচ্ছে করলেই সামান্য অর্থের বিনিময়ে তখন দখল করতে পারতেন বাড়ী জমি কারখানা—কিন্তু না, তাতে তাঁর বিবেক সায় দিতে পারেনি—তিনি লিখলেন ঃ

"আপনার ব্যবসায়ে ক্ষতির কথা জেনে দুঃখিত হলাম। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে আপনার বাড়ী কিম্বা কারখানা দখল করে নিতে আমি কিছুতেই পারবো না। আমার প্রাসাদের চেয়ে বিন্দুমাত্র কম মূল্যবান নয় আপনার বাড়ী—সুতরাং ওটি বজায় থাকুক অক্ষত দেহে। প্রাশিয়া রাজ্যের অধিবাসীদের এতটুকু ক্ষতি-গ্রস্ত হতে দেখলে আমি বেদনাবোধ করবো—আপনি বিনা দ্বিধায় আমার প্রদত্ত এই সামান্য অর্থ গ্রহণ করুন। নতুন উদ্যমে অর্থ বিনিয়োগ করে আপনার পিতৃপুরুষ যে প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলেছিলেন তাকে বাঁচিয়ে রাখুন—আপনার বাঁচার উপর নির্ভর করবে প্রাশিয়ার বাঁচা।"

রোহ্টাং-এর বন্ধু

[১৮৪ পৃষ্টার শেষাংশ]

—পেয়েছে?

—জী হুজুর!...আর ভয় নেই। দেখ, ঝড় কেমন কমে আসছে ধীরে ধীরে।

সত্যি, ঝড় কমল। ব্রিজ আর সুরথ সিং আবার আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল রাহালার দিকে।

ফেরবার পথে কিছুই দেখলুম না। বললুমও না বিশেষ কিছু। শুধুমাত্র একটি চিন্তাই বারবার ঘিরে ধরল আমায়,—জীবন দিয়েছে যারা, কী দিয়ে তাদের আজ খুশী করবো?

কুমারেশ ঘোষ

কাকাজু

নেপালের এক গাঁয়ে, একটি কুঁড়ে লোক বাস করতো। সারাটা দিন তার কাজ ছিল শুয়ে বসে থাকা। অথচ লোকটা ছিল বেশ চালাক-চতুর।

লোকটির স্ত্রী কিন্তু খুব পরিশ্রমী ছিল। সে খেটে পয়সা উপায় করতো, আর কুঁড়ে লোকটা নির্লজ্জের মতো বসে-বসে খেতো।

সেজন্যে প্রায়ই রাগ করতো তার স্ত্রী। বলতো, তুমি পুরুষ মানুষ, তুমি কোথায় আমাকে খাওয়াবে, তা নয়, তুমি বসে-বসে আমার পয়সায় খাচ্ছো! লজ্জা করে না?

লোকটা চুপ করে শোনে, কোন উত্তর দেয় না।

কিন্তু তার স্ত্রী ক্রমেই বকা-ঝকা করতে থাকে উঠতে-বসতে, তাকে যা-তা বলে অপমানও করে। একদিন আর সহ্য করতে না পেরে লোকটা রেগে বললো, জানি, জানি, আমি কাজ করিনে, কিছু উপায় করিনে, কিন্তু এটুকু জেনো, ইচ্ছে করলে আমি এত টাকা উপায় করতে পারি, যা তুমি সারা জীবনেও কখনো পারবে না।

তার স্ত্রী ভেংচি কেটে বললো, বটে! শুধু মুখে বড়াই!

বটে! বেশ আমি চললাম! —বলেই লোকটা এক কাপড়েই বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে।

খানিকটা পথ এগিয়ে লোকটা দেখলে,জুতোজোড়া খুবই ছিঁড়ে গেছে। মেরামত করা দরকার। নইলে চলা দায়।

অবশ্য একটু পরেই একজন মুচীর দেখা পেল সে। তাকে জুতোজোরা মেরামত করতে দিল। দাম ঠিক হলো এক টাকা।

মুচীটা জুতোজোরা মেরামত করে যখন তার মজুরী চাইলো, তখন লোকটি দূরে একটা দোকান দেখিয়ে বললো, ঐ যে দোকানটা, ওরই দোকানী তোমাকে টাকাটা দিয়ে দেবে। তুমি গিয়ে নিয়ে নাওগে। আমার কাছে ভাঙানি টাকা নেই।

মুচী বললো, ঐ দোকানী আমাকে চেনে না, জানে না সে আমাকে দেবে কেন?

লোকটা বললো, বেশ, এসো আমার সংগে, আমিই চেয়ে দিচ্ছি তোমাকে।

লোকটা মুচীকে নিয়ে দোকানের দিকে চললো এবং দোকানের কাছাকাছি আসতেই সে মুচীকে ফেলে হনহন করে এগিয়ে গেল দোকানটির কাছে। দোকানটা একটা খাবারের দোকান। লোকটা ময়রার কাছ থেকে এক টাকার মিষ্টি কিনে বললো, ঐ যে মুচীটা আসছে, ওর কাছে একটা টাকা আমার পাওনা আছে, ওই তোমাকে টাকাটা দিয়ে দেবে।

মুচীটা দোকানীর সামনে এসে দাঁড়াতেই লোকটা মুচীকে শুনিয়ে দোকানীকে বললো, একটা টাকা দিতে হবে, তাই তো?

দোকানী ভাবলো, লোকটা বুঝি তার মিষ্টির দামের কথা বলছে, তাই বললো, হ্যাঁ, এক টাকা দিতে হবে।

শুনে মুচী ভাবলো, তার মজুরির কথাই বলছে দোকানী। ততক্ষণে ধূর্ত লোকটা মুচী আর ময়রাকে নিজেদের হিসেবপত্র বুঝে নিতে দিয়ে সরে পড়লো সেখান থেকে।

লোকটা মিষ্টির হাঁড়িটা নিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে এসে পড়লো এক বনের ধারে সরু পাহাড়ী নদীর ধারে। নদীতে দু' তিনজন ধোপা কাপড় কাচছিল, আর তাদের বাচ্চা ছেলেমেয়েরা পাশেই খোলা জায়গায় খেলা করছিল। লোকটা সেই খোলা জায়গায় বসে মিষ্টির

হাঁড়িটার মুখ খুলে বাচ্চাদের দেখিয়ে এক-একটি মিষ্টি টপাটপ করে মুখে পুরতে লাগলো।

বেচারী ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা! তারা তার খাওয়া দেখতে লাগলো লোলুপ দৃষ্টিতে। তাদের মুখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো।

শেষে তারা ছুটে গেল তাদের বাবাদের কাছে, বায়না ধরলো মিষ্টি খাবার। বললো, ঐ দ্যাখো, ঐ লোকটি কেমন গপাগপ মিষ্টি খাচ্ছে!

ছেলেমেয়েগুলো এমন আবদার ও বায়না শুরু করলো যে ধোপা ক'জনের পক্ষে কাজ করা অসম্ভব হয়ে উঠলো। কাজেই তারা ঐ ধূর্ত লোকটির কাছে গিয়ে বললো, আমরা পয়সা দিচ্ছি, আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে কিছু মিষ্টি দাও না?

লোকটা বললো, দ্যাখো আমি গরীব মানুষ। কখনো প্রাণ ভরে এসব ভালো মিষ্টি খেতে পাইনি। কাজেই পয়সার জন্যেও দিতে মন চাইছে না। তাছাড়া, এ মিষ্টি তোমরাও পেতে পারো। ঐ রাস্তা দিয়ে সোজা চলে গেলে দেখবে একটা বড়লোকের বিরাট বাড়ি। তিনিই এই মিষ্টি বিতরণ করছেন। তোমরা যাও না সেখানে?

কিন্তু কাপড়গুলো যে মাঠে শুকোতে দিয়েছি! ছেড়ে দিয়ে যাই কী করে? —ধোপারা বললো।

শুনে লোকটা বললো, তা বরং আমি পাহারা দিতে পারি। তবে দেরি করো না। তা হলে আমি চলে যাবো। আর এক কাজ করো। পুরোন আর নতুন কাপড়গুলো আলাদা-আলাদা বাণ্ডিল বেঁধে আমার সামনে রেখে দাও। ওভাবে ছড়িয়ে রেখে যাওয়া ঠিক হবে না।

ধোপারা কথাটা শুনে খুব খুশি হলো। তখনি পুরোন আর নতুন কাপড়-জামার দুটো বাণ্ডিল বেঁধে লোকটাকে একটু বসতে বলে ছুটলো তারা সেই বড়-লোকের বাড়ির সন্ধানে।

ধোপারা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে চোখের আড়ালে যেতেই লোকটা তাড়াতাড়ি দুটো বাণ্ডিল কাঁধে নিয়ে হাঁটা দিলো উল্টো পথে। বেশ কিছু দূর হেঁটে সে একটা গভীর বনের মধ্যে দীঘির ধারে এসে দাঁড়ালো। একটু বিশ্রাম নিয়ে বাণ্ডিল খুলে পুরোন আর নতুন রং-বেরঙের কাপড়-জামাগুলো একটা বড় গাছের ডালে চমৎকার করে ঝুলিয়ে-ঝুলিয়ে রাখলো। পরে একটি মাটির ভাঁড় জোগাড় করে দীঘি থেকে জল ভরে লোকটা ঐ গাছটার চার ধারে ঘুরে ঘুরে তার গোড়ায় জল দিতে লাগলো।

একটু পরেই সেই পথে দেখা দিলো ঘোড়ায় চড়ে এক ধনী ব্যবসায়ী। তিনি গাছের কাছে এসে ঐ লোকটার কাণ্ড দেখে জিগ্যেস করলেন, হ্যাঁ ভাই, তুমি ঐ পুরোন বুড়ো গাছটার গোড়ায় জল দিচ্ছো যে?

শুনে লোকটা জল দিতে দিতেই বললো, আপনার তো চোখ আছে, দেখতে পাচ্ছেন না গাছের ডালে-ডালে কী সব ফলেছে?

কী? জামা কাপড়?

আজ্ঞে হ্যাঁ!

ব্যবসায়ী অবাক হয়ে গেলেন। বনের মধ্যে এসব গাছও আছে! ব্যবসায়ী তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে

দেখতে পাচ্ছেন না গাছের ডালে ডালে কী সব ফলেছে?

বললেন, ভাই, এই গাছটাকে আমার কাছে বিক্রি করো না? এই নাও, আমি তোমাকে হাজার টাকা দিচ্ছি!

ধূর্ত লোকটা ঘাড় নেড়ে বললো, না, এ গাছ আমি কিছুতেই দেবো না।

আচ্ছা, এই নাও দু হাজার টাকা দিচ্ছি!

তখন লোকটা একটু ভেবে বললো, বেশ, দিতে পারি, তবে নতুন জামা-কাপড়গুলো কিন্তু আমি নেবো।

ব্যবসায়ী ভাবলো, গাছটাই যখন আমি কিনে নিচ্ছি, তখন নতুন জামা-কাপড় আবার গজাবে গাছের ডালে। কাজেই নিক না হয় নতুন গুলো—

ধূর্ত লোকটা তখন দু হাজার টাকা একটা থলেতে ভরে নিয়ে, নতুন জামা-কাপড়গুলো গাছের ডাল থেকে নামিয়ে নিলো। তারপর সেগুলো বাণ্ডিল বেঁধে কাঁধে ফেলে ব্যবসায়ীকে বললো, আমি চললাম, আপনি আমার মতো ঘুরে-ঘুরে গাছের গোড়ায় জল ঢালতে থাকুন, যেন মাটি না শুকোয়। দেখবেন একটু বাদেই আবার নতুন জামা-কাপড় গজাচ্ছে!

ব্যবসায়ী লোকটার কথামত ঘুরে-ঘুরে গাছে জল দিতে লাগলেন আর লোকটা সেই ফাঁকে পালাল।

ধূর্ত লোকটা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে একটা বড় সহরে এসে পড়লো। সহরের ভেতরে এ রাস্তা সে রাস্তা দিয়ে চলতে-চলতে হঠাৎ তার নজরে পড়লো রাজপ্রাসাদের একটা বাঁধানো বেদীতে বসে সেখানকার রাজা চার পাঁচ-জন বন্ধুর সঙ্গে ষোলো-কড়ির খেলা খেলছেন। দেখে, লোকটি তাড়াতাড়ি একটা নির্জন জায়গায় গিয়ে বাণ্ডিলটা খুলে দামী নতুন জামা কাপড় বেছে নিয়ে পরে ফেললো। তাকে তখন একজন আমীর বা ওমরাহের মত দেখাতে লাগলো। ঐ পোশাকে সে রাজবাড়ির মধ্যে ঢোকবার সময় প্রহরী বাধা তো দিলোই না, বরং লম্বা একটা সেলাম ঠুকে দিলো।

লোকটি সোজা রাজার সামনে গিয়ে নিজের একটা বড়লোকী পরিচয় দিয়ে বললো, রাজা সাহেব, আমি এই ষোলো-কড়ির খেলা খুব ভাল জানি।

তাই নাকি? আপনার নাম কি?—রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো, আমার নাম কাকাজু।

রাজা হেসে বললেন, বাঃ, বেশ নাম তো? কাকাজু, মানে কাকা, খুড়ো। তা বেশ, কাকাজু, এক হাত খেলা যাক!

কাকাজু তখন রাজা আর তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ষোলো-কড়ির খেলা শুরু করলো এবং দেখা গেল, সত্যিই সে সব টাকা জিতে নিলো তাঁদের কাছ থেকে। তখন রাজা কাকাজুর খুব অনুগত হয়ে পড়লেন এবং পরের খেলায় তিনি দানের কড়ি ফেলবার সময় জিজ্ঞেস করতে লাগলেন—কাকাজু, এবার ক' কড়ি ফেলবো?

কাকাজু তাঁকে বলে দিতে লাগলো।

ইতিমধ্যে ওদিকে হৈ-হৈ পড়ে গেছে।

মুচী আর ময়রা টাকা দেওয়া নেওয়া নিয়ে ঝগড়া করে শেষে বুঝতে পারলো ঐ লোকটা তাদের দু'জনকেই ঠকিয়েছে। তারা চললো তার খোঁজে।

যেতে-যেতে দেখা হলো ধোপাদের সঙ্গে। তারাও তখন মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। পরের জামাকাপড়—! এখন কী হবে। মুচী আর ময়রার কাছে সব শুনে তারাও বললো, চলো যাই, জোচ্চোরটাকে ধরতে হবে। তাকে মেরে ঠাণ্ডা করতে হবে।

তারা গভীর বনের মধ্যে ঢুকে দেখে একজন বেশ গণ্যমান্য লোক ঘোড়া বেঁধে রেখে গাছের গোড়ায় ঘুরে ঘুরে জল দিচ্ছেন। বেচারী ঘেমে নেয়ে উঠেছেন। ধোপারা ব্যবসায়ীর মুখ থেকে আগাগোড়া ব্যাপারটা শুনে হাঁ হয়ে গেল। এতগুলো লোককে ঠকিয়েছে!

চলো যাই, হারামজাদাকে ধরতে হবে।

ক্রমে তারা সেই সহরের রাজপ্রাসাদের সামনে এসে দেখে সেই লোকটা! কিন্তু অবাক হয়ে গেল, পোশাক বদলে রাজার সঙ্গে বসে খেলছে। ধোপারা বললো, ঐ পোশাক তো আমাদের কাছ থেকেই চুরি করা।

...আরো মনোযোগ দিয়ে রাজার সঙ্গে খেলতে লাগল।

কিন্তু ব্যবসায়ী বললেন, ওরকম পোশাক তো আরো থাকতে পারে। রাজার সঙ্গে কি একটা বাজে লোক খেলা করতে পারে? না, না, এ আমরা ভুল দেখছি। মানুষের চেহারা অনেক সময় হুবহু এক হয় শুনেছি।

এদিকে কাকাজুরও লক্ষ্য পড়েছে লোকগুলো খবর পেয়ে তাকে ধরতে এসেছে।

সে তখন ওদিকে নজর না দিয়ে আরো মনোযোগ দিয়ে রাজার সঙ্গে খেলতে লাগলো।

এমন সময় রাজা কড়ির দান ফেলবার সময় জিজ্ঞেস করলেন, কাকাজু, এবার ক'কড়ি ফেলবো?

কাকাজু?

সর্বনাশ। অদূরে ওরা সবাই চমকে উঠলো। উনি তো দেখছি রাজার কাকা। আমরা ওঁকে জোচ্চোর বলে ধরতে গেলে বিপদে পড়তাম। ওঃ, খুব বেঁচে গেছি। চলো চলো, এখান থেকে সরে পড়ি।

তারা তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল রাজপ্রাসাদের সামনে থেকে।

কাকাজু পরে রাজার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে, 'আবার আসবো' বলে বিদায় নিয়ে নিজের গাঁয়ে ফিরলো। বাড়িতে এসে স্ত্রীকে ডেকে বললো, ঘরের মেঝেতে একটা চাদর পাতো।

স্ত্রী তো তার পোশাক-আশাক আর বড়লোকী চেহারা দেখে চমকে উঠলো। তার কথামত ঘরের মেঝেতে চাদর পাততেই লোকটা থলে খুলে ঝনঝন করে সোনা রুপোর বহু মুদ্রা ছড়িয়ে দিলো। বললো, দেখলে তো টাকা উপায় করতে পারি কিনা? পারবে এত টাকা উপায় করতে?

স্ত্রী নিজের গালে হাত দিয়ে অবাক হয়ে বললো, এত টাকা তুমি পেলে কোথায়?

শুনে লোকটা রেগে উঠলো, সে কথায় তোমার দরকার কি?

টুকরো হাসি—একটু হাসো!

—শঙ্করলাল সাহা

ক্লাসে শিক্ষক ইংরাজী গ্রামার পড়াচ্ছেন। একটা ছাত্র গোলমাল করছে বলে তিনি তাকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে রেখেছেন।

শিক্ষক পড়াচ্ছেন—Two nagatives make one affirmative অর্থাৎ দুটো না বোধক বাক্য এক সাথে থাকলে সেটা একটা 'হ্যাঁ বোধক' বাক্য হবে।

এমন সময় ঐ ছাত্রটি জিজ্ঞাসা করল—স্যার, বসব?

শিক্ষক—না।

কিছুক্ষণ পরে ছাত্রটি আবার জিজ্ঞাসা করল—'স্যার, বসব?'

শিক্ষক—না, দাঁড়িয়ে থাক।

ছাত্রটি তৎক্ষণাৎ বসে পড়ল।

শিক্ষক রেগে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি বসলে কেন? আমি ত তোমাকে বসতে বলিনি।

ছাত্রটি বলল—স্যার, Two negatives make one affirmative.

দ্বীপ

শ্রীধর সেনাপতি

অথৈ নীল সমুদ্রের বুকে যেন উজ্জ্বল সবুজ এক মণির মত অবস্থান করছে দ্বীপটি।

ক্ষুদ্র দ্বীপটিকে দৃষ্টিপথে রেখে কখনো কোন জাহাজ আশেপাশের সমুদ্রপথ ব্যবহার করেনি। কোন জাহাজের ধোঁয়া কখনো ভারাক্রান্ত করতে আসেনি এই অক্ষাংশের জলবায়ু, আকাশ। এদিকের জলপথ ছিল অনাবিষ্কৃত।

সমুদ্রের রহস্যময় তলদেশ থেকে ঠেলে তুলে দেওয়া বস্তু জলের ভেতর থেকে কবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, তা কেউ জানে না।

তারপর দিন মাস বৎসর অতিবাহিত হয় যায়। প্রকৃতি বসে থাকে না। নিরলস প্রচেষ্টায় ঐশ্বর্যদানে ভরিয়ে তোলে সেই এক সময়ের রুক্ষ প্রাণহীন ভূখণ্ডটিকে। লতায়-পাতায় ফুলে-ফলে সে সজ্জিত হয়ে ওঠে।

এই নির্জন শান্ত দ্বীপেও একদিন পদচিহ্ন পড়লো। সে পদচিহ্ন মানুষের।

ঋতুচক্র পাক খায়। অতিবাহিত হতে থাকে দিন মাস বৎসর।

এক গ্রীষ্মের সকাল।

দ্বীপের সীমান্তে নারিকেল বীথির ছায়া অতিক্রম করে নরম সোনালী রৌদ্রের মধ্যে এসে দাঁড়ালো সে। হাতে একটি বন্দুক। দীর্ঘ দেহ। মাথা ভর্তি রুক্ষ অবিন্যস্ত চুল। কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফে মুখ ঢাকা। ময়লা ছিন্ন পোশাক পরনে। দুচোখে উজ্জ্বল তীক্ষ্ম দৃষ্টি।

প্রায় নিঃশব্দে, চোরের মতন হালকা পায়ে সে নারিকেলবীথি অতিক্রম করে এসেছে। পদশব্দে আশেপাশে গাছের শাখায় পাতায় বসে-থাকা পাখীর ঝাঁককে সে চঞ্চল করে তোলেনি।

চোখের ওপর থেকে রৌদ্রকে আড়াল করবার জন্যে সে কপালের ওপরে একটা হাত রাখলো, তীক্ষ্ম উজ্জ্বল দৃষ্টি ছাড়িয়ে দিল দূর সমুদ্রের বুক পর্যন্ত। ঘুরে ফিরে তার দৃষ্টি দ্বীপের কিনারায় এসে থামে।

প্রতি ইঞ্চি জমিতে সে কী যেন খুঁজতে থাকে। এগিয়ে চলে পা পা করে।

এবং এক সময়ে, সহসাই অজানা কি এক ভয়ে সে তার দীর্ঘ শরীরটাকে কুঁকড়ে গুটিয়ে নিয়ে সাঁ করে নারিকেলকুঞ্জের অন্তরালে লুকিয়ে ফেলে। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রেরণায় নিজের প্রায় অজ্ঞাতেই কাজটা যেন করে ফেলে সে।

একটি নারিকেল গাছের কান্ডের ওপর শরীর রেখে সে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

কিছু একটা সে লক্ষ্য করেছে। এখানে, একান্ত-ভাবে তার এই দ্বীপে তেমন কিছুর দর্শন পাবার কথা হঠাৎ সে ভাবতে পারে না।

দীর্ঘ সময় ধরে সে সেই বস্তুটার দিকে তাকিয়ে রইলো।

কী ওটা? চেষ্টা করতে লাগলো সে বোঝবার, জানবার।

এতদূর থেকে মনে হচ্ছে, একটা অস্পষ্ট আকার-বিহীন পিন্ড গিরিপৃষ্ঠে পড়ে রয়েছে। কোন প্রাণী, না জড়বস্তু? সমুদ্রের জলে ভেসে এসেছে নাকি?

এই দ্বীপের প্রতি ইঞ্চি জমি সে চেনে। এ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হয়েছে সে—তা সে অনেক দিন! কিন্তু অমন একটা বস্তুর অস্তিত্ব যে ওখানে আগে ছিল, কই সেটা তো সে মনে করতে পারছে না।

অবশ্য দ্বীপের এই দিকটা গত কয়েক দিন হলো সে ঘুরে যায় নি। কিন্তু শেষ যেদিন এসেছিল, সেদিন বস্তুটা যে ও জায়গায় ছিল না, এটা তার বেশ মনে আছে।

এই রকম নানা চিন্তার জট মাথায় নিয়ে পিছনের বনের সবুজ গোলক-ধাঁধার মধ্যে সন্তর্পণে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার তার আবির্ভাব ঘটলো। গিরিপৃষ্ঠে যেখানে সমুদ্রে গিয়ে মিশিছে আর সেই রহস্যজনক বস্তুটি পড়ে রয়েছে তারই একটা দিকে, সেখানকার লতাগুল্মের ঝোপ ভেদ করে সে বেরিয়ে এলো।

এবারেও সেই চতুর সতর্কতা তার চলাফেরায়। পা-পা করে অগ্রসর হতে লাগলো সে বালির ওপর দিয়ে।

একটা উঁচু জায়গায় উঠে বসে সে সন্ধানী দৃষ্টি ফেললো সমুদ্রের নিকটবর্তী গিরিপৃষ্ঠের দিকে, যেখানে সেই রহস্যজনক পিন্ডাকার বস্তুটি পড়ে রয়েছে।

এবার সে স্পষ্ট দেখতে পেল। হ্যাঁ—একটা মানুষের দেহ! কিন্তু জীবিত না মৃত?

অনুমান করে নিল, প্রায় তারই সমবয়সী। ছিন্ন-ভিন্ন পোশাকে আবৃত দেহ। তবু পোশাক দেখে মানুষটিকে জাহাজের বড় অফিসার বলে মনে হয়।

মানুষটি কোন্ দেশের? সমুদ্রে কি কোন জাহাজডুবি হয়েছে?

সহসা মানুষটি পাশ ফিরল। বোঝা গেল মানুষটি জীবিতই। পাশ ফিরেছে ঘুমের ঘোরে।

অস্পষ্ট জড়ানো গলায় মাঝে মাঝেই কী সব বলছিল মানুষটা।

এবার তার মনে হলো, মানুষটা খুবই যেন অসুস্থ। কপালের কাছে কালশিটে পড়েছে, নাকটাও যেন ফুলেছে একটু।

মানুষটার কাছে পড়ে রয়েছে কিছু টিনের খাবার আর একটা জলের বোতল।

সব কিছু সে দ্রুত লক্ষ্য করলো। এবং তার-পরই প্রায় তার অজ্ঞাতে মুখ থেকে বেরিয়ে এলোঃ সুপ্রকাশ—সুপ্রকাশ দত্ত!

কী আশ্চর্য! জাহাজ থেকে কি এই নির্জন দ্বীপে নামিয়ে দিকে গেছে ওকে?

লক্ষণ দেখে সে যেন সবকিছু বুঝতে পারে। গত কয়েক দিন দ্বীপের এই অংশের দিকে সে লক্ষ্য রাখে নি, সেই ফাঁকে কোন জাহাজের বিদ্রোহী নাবিকেরা সেই জাহাজের বড় অফিসার সুপ্রকাশ দত্তকে দ্বীপের এই অংশে নামিয়ে দিয়ে গেছে। এরকম ঘটনা তো হতেই পারে। এই দ্বীপটাও হয়তো তাদের হঠাৎ আবিষ্কার। বিদ্রোহী ক্রুদ্ধ নাবিকেরা সুপ্রকাশ দত্তর প্রতি এই করুণাটুকুই দেখিয়ে গেছে—আহত অবস্থায় তাকে সমুদ্রের জলে ফেলে দেয়নি। জনমানবশূন্য অজানা এই নতুন দ্বীপের অল্প কটা দিনের আহার-পানীয় দিয়ে রেখে গেছে। অতঃপর তার ভাগ্য তাকে কোথায় কী অবস্থায় নিয়ে যাবে, সে চিন্তা তাদের নয়।

তার হেসে উঠতে ইচ্ছা হলো। এ রকমটা যে হতে পারে একদিন, একথা তার কল্পনাতেও ছিল না। অথচ হয়েছে! সুপ্রকাশ দত্ত দীর্ঘ কটা বছর পরে এমন অবস্থায় তার সামনে উপস্থিত যে, সে ইচ্ছা করলেই, হ্যাঁ, শুধু একটু ইচ্ছা করলেই, প্রতিশোধ নিতে পারে।

সুপ্রকাশ শুধু তারই শত্রু নয়—পরাধীন ভারতের সকল মুক্তিকামী মানুষের শত্রু। ইংরেজ শাসকদের পদলেহী জঘন্যতম এক পশু। মৃত্যুই এর একমাত্র শাস্তি!

নিদারুণ ঘৃণায় বারেকের জন্যে তার সারা শরীর শিউরে উঠে। হাতদুটো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে।

এখন, আমি যদি মনে করি, তাহলে এই শয়তানের প্রতিমূর্তিকে চিরদিনের মত বিদায় করে দিতে পারি। পৃথিবীর ভার কিছুটা লাঘব হবে!—দাঁতে দাঁত ঘষে সে অস্ফুটে উচ্চারণ করল, আঃ! ব্যাপারটা ভবেশ যদি দেখে যেতে পারতো—

পাহাড়ের উঁচু জায়গাটা থেকে আগেকার মতই সতর্কতা নিয়ে সে নীচের দিকে নামতে থাকে।

সুপ্রকাশ দত্তর ঘুমন্ত দেহ থেকে সামান্য একটু

তফাতে সে বালির ওপর গিয়ে বসে পড়ে হাতের বন্দুকটা জানুর ওপরে তাড়াতাড়ি স্থাপন করে।

একটা অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ বেরোয় সুপ্রকাশ দত্তর মুখ দিয়ে। মুদ্রিত নেত্রেই বার দুয়েক এপাশ-ওপাশ ফিরে শোয়।

দ্বীপের মানুষটির মুখে কীসের যেন একটা ছায়া পড়ে। তার দৃষ্টি চলে যায় সমুদ্রের নীল জলের ওপর দিয়ে দিগন্ত রেখার দিকে। কিন্তু সমুদ্র বা আকাশ তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। চিন্তার মধ্যে ডুবে যায় সে।...

কিছু সময় এই ভাবে অতিবাহিত হয়ে যায়।

সুপ্রকাশ দত্ত এক সময় চোখ মেলে তাকায়। আচমকা একটা অস্থিরতা জাগে তার সারা শরীর জুড়ে। তারপরেই দ্বীপের মানুষটার ওপরে দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ভয়ে চীৎকার করে ওঠে। স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মত ত্বরিতে উঠে বসে সে।

'কে? কে তুমি!'

'চিনতে পারছো না?'

'হিমাদ্রিশেখর!'—সুপ্রকাশ উচ্চ কণ্ঠে বললো।

দ্বীপের মানুষটির দৃষ্টি সুপ্রকাশের আতঙ্কিত মুখের ওপরে স্থিরভাবে নিবদ্ধ।

সুপ্রকাশ পুনরায় বললো, 'আমি কি স্বপ্ন দেখছি? সেই হিমাদ্রি! আমি যে বাঁচতে চাই! হিমাদ্রিরা আমাকে বেঁচে থাকতে দেবে না। উঃ ভগবান!'

হিমাদ্রি নির্বিকার, তার একটা হাত শুধু নড়ে ওঠে।

আরো ভয় পেল সুপ্রকাশ। এবার কি তাহলে হিমাদ্রি বন্দুক উঁচিয়ে ধরতে চায় তাকে লক্ষ্য করে? করুণ অসহায় গলায় চীৎকার করে ওঠে সুপ্রকাশ।

হিমাদ্রি ঠান্ডা গলায় বললো, 'মিথ্যে ভয় পাচ্ছ! শান্ত হয়ে বসো, সুপ্রকাশ। আমি—আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি।'

চকিত দৃষ্টিতে সুপ্রকাশ দেখে নিল হিমাদ্রিকে। ওকে বিশ্বাস করা যায়? হাত বুলিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে ঢোক গিলে সে বললো, 'মিথ্যে কথা বলার মানুষ আপনি নন। কিন্তু তবু—তবু আমার মনে হচ্ছে...এখন আমাকে আশা দিয়ে পরে নিরাশ করবেন না তো, হিমাদ্রিবাবু? আপনি দেখছি সশস্ত্র! আমার হাতে কিছু নেই। আমি আত্মরক্ষা করতে অক্ষম!'

'থামো!'—হিমাদ্রিশেখর ধমক দিয়ে বললো, 'আমি আগেই বলেছি, আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি। তাছাড়া তুমি যেমন আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো না, তেমনি আমার কাছে তুমি তো একেবারেই বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি নও। তোমার কাছে কোন অস্ত্র নেই?'

'না, হিমাদ্রিবাবু। আপনি বিশ্বাস—'

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে হিমাদ্রিশেখর বলে উঠলো, 'আরে বাবু-টাবু আমি নই। আমি শুধু হিমাদ্রি। আগে আমাকে তো হিমাদ্রি বলেই ডাকতে। আজ হঠাৎ 'বাবু' 'আপনি' করে আমাকে সৌজন্য দেখানোর কোন কারণ ঘটেনি। আর, তোমাকে বিশ্বাসের কথা বলছো? আমি তোমার জামা কাপড়ের ভেতরে কোথাও কোন অস্ত্র লুকোনো আছে কিনা আগে পরীক্ষা করে দেখবো।'

সুপ্রকাশের শরীরে হিমাদ্রি দ্রুত হাতে তল্লাশী চালালো।

'এই মুহূর্তে অন্ততঃ তুমি যে সত্যি কথা বলছো, তার প্রমাণ পেয়ে আমি খুশী হলাম।' হিমাদ্রি বললো, 'এবার তুমি একটু শান্ত হয়ে বসো, সুপ্রকাশ। তারপর বলো শুনি তুমি কিভাবে এই দ্বীপে এসে পড়লে।'

সুপ্রকাশ রাগান্বিত কিন্তু গম্ভীর! বালির ওপরে হঠাৎ সে একটা ঘুষি মারলো। বললো, 'জাহাজ থেকে আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেছে! আমার নীচুতলার কর্মচারী তারা। রাতের আঁধারে নামিয়ে দিয়ে গেছে আমাকে। তারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো। আমার শরীরের ওপরে যে অত্যাচার হয়েছে, তা আশা করি আমাকে দেখে তুমি বুঝতেও পারছো। দু দিন দু রাত ধরে আমি বন্দী হয়ে ছিলাম তাদের হাতে। শেষে তারা ঠিক করলো, তারা নিজেরা আমার প্রাণ হনন করবে না। সমুদ্রের বুকে অজানা কোন এক ছোট দ্বীপে আমাকে নামিয়ে দিয়ে যাবে। দিয়ে গেছে! ছোট বড় কোন জাহাজই এদিককার জলপথ ব্যবহার করে না। অভিশাপ! এখানে আমি না খেয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মারা যাবো। কিন্তু...'

সুপ্রকাশ লোলুপ দৃষ্টিতে কী যেন খুঁজতে লাগলো হিমাদ্রির শরীরে!

'কিন্তু কী?' —হিমাদ্রি শুধালো।

'কিন্তু তোমাকে দেখে আমি সেদিক দিয়ে ভরসা পাচ্ছি। এই দ্বীপে বাস করেও তোমার স্বাস্থ্যের এতটুকুও ঘাটতি দেখা যাচ্ছে না। তোমাকে এখানে না খেয়ে থাকতে হয় না নিশ্চয়ই?'

'এখানে না খেতে পাওয়ার কারণ নেই।' —শান্ত গলায় হিমাদ্রি বললো, 'তুমি তাহলে কোন ইংরেজ কোম্পানীর জাহাজের ক্যাপ্টেন হয়েছিলে?'

সুপ্রকাশ ঘাড় নেড়ে বললো, 'হ্যাঁ। একটা সওদাগরী জাহাজ। নাম—সী বার্ড!'

'জীবনে তাহলে অনেক উন্নতি করে ফেলেছিলে, কেমন?'

'এ্যাঁ?'—সুপ্রকাশ এবার থতমত খেয়ে যায়।

হিমাদ্রি বললো, 'ইংরেজ শাসকদের হাত দিয়ে আন্দামানে সেলুলার জেলে আমাদের পাঠিয়ে দিয়ে তুমি তাহলে নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়েছিলে—এই কথাই বলছি আর কি!'

সুপ্রকাশ ছেলেমানুষের মত ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলো, 'প্রতিশোধ নেবে...প্রতিশোধ!'

তার কান্নায় ভেঙে-পড়া শরীরের দিকে অপলকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো হিমাদ্রি।

'সী বার্ডের নাবিকদের সঙ্গে তুমি কী রকম ব্যবহার করতে, সুপ্রকাশ? তারা সবাই ইংরেজ ছিল না নিশ্চয়ই? আমাদের দেশের লোক কজন ছিল তাদের দলে?'

'সুপ্রকাশ—সুপ্রকাশ দত্ত!'

সুপ্রকাশ নিরুত্তর!

ধমকের সুরে হিমাদ্রি বললো, 'বলো তুমি তাদের কী করেছিলে?'

সুপ্রকাশ গলায় জোর এনে বললো, 'আমি? কিছু করিনি। তাদের বিরুদ্ধে কতকগুলো অভিযোগ ছিল। অভিযোগগুলো গুরুতর। জাহাজের ক্যাপ্টেন আমি। আমার নির্দেশ অমান্য করলে, তুমিই বলো, আমার কর্তব্য কী?'

'সহানুভূতির সঙ্গে নাবিকদের বক্তব্য ক্যাপ্টেনের বিচার-বিবেচনা করে দেখা উচিত।' —শুকনো গলায় হিমাদ্রি বললো, 'শোনো সুপ্রকাশ, অতীতে আমাদের কাছে তুমি একটা জঘন্যতম চরিত্রের মানুষ ছিলে। এখনো তোমাকে ঘৃণা করার কারণ আমার দূর হয়নি। কোন দয়া না দেখিয়ে তোমাকে আমি খুন করতে পারি। কারণ তুমি যা করেছ—তুমি জানো আমাদের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার সেদিন করেছিলে! তোমার জন্যে যাদের দ্বীপান্তর হয়েছে, তাদের দুজন সেলুলার জেল থেকে পালিয়ে গেছে। সেখানকার বন্ধুদের তারা বলে এসেছে, তোমাকে দেখামাত্র তারা তোমায় কুকুরের মতো গুলি করে মারবে।'

'বুঝতে পারছি, সেই দুজনের মধ্যে তুমি একজন নিশ্চয়ই। কিন্তু এখানে তোমাকে ছাড়া তো আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।'

হিমাদ্রি নিষ্করুণ গলায় বললো, 'সে অনেক কথা! শোনো, আমি এতদিন পরেও মনে করি, পৃথিবী তোমার ভারমুক্ত হতে চায়।'

'তোমার মতলব আমি বুঝতে পারছি।' —সুপ্রকাশ চরম হতাশায় ভেঙে পড়ে বললো, 'তুমি এখন আমাকে একটা উদ্বেগ আর শঙ্কার মধ্যে রেখে দিতে চাও। তারপর তোমার ইচ্ছামত তুমি হত্যা করবে আমাকে। না, না, যা করতে চাও, এখুনি করে ফেলো। তোমার হাতে বন্দুক। এই আমি বুক পেতে দিচ্ছি। গুলি করো।'

হিমাদ্রি এবার হেসে উঠে বললো, 'তোমার অনুমান ভুল! আমি তোমার অতীতের অপকীর্তির দুচারটে কথা তোমাকে শুধু মনে করিয়ে দিতে চাইছি। অবশ্য সেসব কথা তুমিও ভুলে যাওনি, আশা করি। ভালো কথা, এটা কত সাল বল তো -

সুপ্রকাশ জবাব দিলে, 'ঊনিশ শ' পঁয়ত্রিশ।'

'ঊনিশ শ' পঁয়ত্রিশ? বত্রিশ সালের জানুয়ারী

মাসে—মাত্র বছর তিনেক আগে মেদিনীপুরের ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করার পরিকল্পনা যখন আমাদের সম্পূর্ণ, তখন তুমি বিপ্লবী দল থেকে সরে পড়লে।'

'কিন্তু আমি তোমাদের ধরিয়ে দিইনি।'

হিমাদ্রি গম্ভীর সুরে বলে যেতে লাগলো, 'শেষদিকে তোমাকেই আমরা সন্দেহ করেছিলাম। তোমার মামাতো ভাই—'

'হ্যাঁ, ভবেশ...!'

'ভবেশ আমাদের বলেছিল, তুমি ইংরেজ কোম্পানীর জাহাজে চাকরী নিতে যাচ্ছ। চাকরী প্রায় পাকা। এ খবরটা তুমি কিন্তু ঘুণাক্ষরেও আমাদের জানতে না দেবার চেষ্টা করেছিলে শেষ পর্যন্ত!'

সুপ্রকাশ অসহায়ভাবে বললো, 'ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে তোমাদের বোমা পিস্তল নিয়ে লড়াই আমার ভাল লাগছিল না। অথচ তোমাদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আমি বুঝতে পারছিলাম তোমাদের পাতা জাল বড় জটিল! তা থেকে হুট্ করে বেরিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন। আমি ক্রমশ নার্ভাস হয়ে পড়ছিলাম। অতএব আমার মত মানুষকে দিয়ে তোমাদের কোন কাজ হতো না। আমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম।'

'তারপর একদিন আমাদের আড্ডার খবর ইংরেজ সরকারের কানে তুলে দিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে তুললে, কেমন?

'না, না বিশ্বাস করো, হিমাদ্রি! আমি পুলিসের হাতে তোমাদের ধরিয়ে দিইনি।'

'কিন্তু আমাদের কাছে গোপন নির্দেশ এসেছিলো, সুপ্রকাশ দত্তকে যেখানে যে অবস্থায় দেখতে পাবে, খুন করবে। যাই হোক, আমাকে তো তুমি এখন এখানে এই অবস্থায় দেখছো। আমাদের গোটা দলটার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়ে গিয়েছিলো, এ খবরও তোমার অজানা নয় নিশ্চয়ই। আমার এখন সেলুলার জেলে ঘানি টানবার কথা। অথচ, আমি এখানে! কী, অবাক হচ্ছো না ভেবে—কী করে এটা সম্ভব হয়?'

সুপ্রকাশ নির্বাক।

হিমাদ্রিশেখর বলে চলল, 'সেলুলার জেলের উঁচু পাঁচিল যে আমাদের আটকে রাখতে পারে নি তা তো দেখতেই পাচ্ছ। হ্যাঁ, আমি আর ভবেশ সেই পাঁচিল টপকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। সাহায্য করেছিলো জেলের প্রহরী ইসাক মিঞা। এই বন্দুকটা আর বেশ কয়েক শ গুলি সে সরবরাহ করেছিলো আমাদের। আর হ্যাঁ, স্থানীয় উপজাতিদের এক সর্দার একটা কাঠের ছোট নৌকো দিয়েছিলো। ভবেশ আর আমি অথৈ সমুদ্রে ভেসে পড়েছিলাম সেটায় চেপে।'

সুপ্রকাশ এতক্ষণ বাদে আবার কথা বলতে পারলো, 'তাহলে ভবেশও এই দ্বীপে আছে?'

'হ্যাঁ...!'

সুপ্রকাশের অনুসন্ধানী দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ে উপকূলভাগের দিকে, যেখানে অশান্ত অগণন তরঙ্গ-শিশু খেলা করছে। সাগর-সমীরে আন্দোলিত নারিকেলবীথির শীর্ষদেশ ছুঁয়ে সে দৃষ্টি পাহাড়ের গায়ে একস্থানে স্থির হয়ে যায়।

কয়েকটা পোড়া কাঠ সেখানে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে।

হিমাদ্রিশেখর তার দৃষ্টি অনুসরণ করে বললো, 'ভবেশ এখানেই আছে। তার আত্মাকে আমি অনুভব করতে পারি এখনো।'

সুপ্রকাশ প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করে, 'কী হয়েছিলো ভবেশের?'

'অসুখ করেছিলো। কী অসুখ, নাম বলতে পারবো না। কঠিন অসুখ! পবিত্রভাবে আমি তার দেহের সৎকার করেছি ওই জায়গায়!'

একটু একটু করে যেন আত্মবিশ্বাস ফিরে আসছে সুপ্রকাশের। কেটে আসছে শরীরের ক্লান্তি ব্যথা বেদনা।

অপেক্ষাকৃত সতেজ গলায় সে বললো, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের তোমরা নিরলস যোদ্ধা। আমি তোমাদের শ্রদ্ধা করি। আমার অতীতের ভুলভ্রান্তি যদি কিছু তোমাদের কাছে ধরা পড়েও থাকে, তবু হিমাদ্রি, একটা কথা বলবো?'

'বলো।'

'ভুল আমাদের সকলেরই হতে পারে।'

হিমাদ্রি চুপ!

সুদূর দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে সুপ্রকাশ বলতে লাগল, 'আমাকে যেখানে যে অবস্থায় দেখতে পাবে, হত্যা করবে—এই তো তোমাদের দলের নির্দেশ? তা সেই নির্দেশ পালন করবার জন্যে তুমি এখনো তৈরী আছো কিনা আমি বুঝতে পারছি না। আমি বেঁচে থাকতে চাই, হিমাদ্রি। দিনের বেলা জাহাজের মাস্তুলের মতন একটা জিনিস তৈরী করে সমুদ্রগামী দূরের কোন জাহাজের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করবো আমি। রাত্রে আগুন জ্বালিয়ে রেখে সঙ্কেত জানাবো। আমি এখানে বরাবরের জন্যে থাকতে চাই না।'

'বৃথা চেষ্টা। সময়ের অপচয় করবে শুধু।

আমি অনেক দিন এই দ্বীপে রয়েছি। তার ভেতরে কোন জাহাজ আমার নজরে পড়েনি। তবে হ্যাঁ! একবার—'

'একবার?'—সুপ্রকাশ উদ্‌গ্রীব হয়ে শুধাল, 'একবার কি?'

'দূরে...বহু দূরে ওই দক্ষিণ দিকে একটা জাহাজের ফিকে একটু ধোঁয়ার রেখা আমি লক্ষ্য করেছিলাম। ব্যস! ওই পর্যন্তই!' —হিমাদ্রির দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

'কোন জাহাজ সমুদ্রের এপথে আসে না বলছো! কিন্তু সী বার্ড তো রাত্রে এদিকেই এসেছিলো।'

'কিন্তু তুমি আমাকে বলেছো চিরাচরিত সমুদ্রপথ থেকে বেরিয়ে তোমার সী বার্ড দুদিন-দুরাত ধরে নতুন পথে ঘোরাফেরা করেছে তোমাকে বন্দী অবস্থায় নিয়ে। তার মানে এপথে সহজে কেউ জাহাজ নিয়ে আসে না! না, সুপ্রকাশ! কোন আশ্চর্য অলৌকিক ঘটনা ছাড়া তুমি এই দ্বীপ ছেড়ে কখনো আর কোথাও যেতে পারবে না।'

'কেন, তোমাদের সেই কাঠের নৌকোটা?' —অসহিষ্ণু গলায় সুপ্রকাশ শুধালো, 'যেটায় চেপে তোমরা এখানে এসে পৌঁছেছিলে, সেটা নেই?'

'আমাদের সেই ছোট্ট নৌকো?' —হিমাদ্রি যেন পুরনো দিনের স্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়, 'ভবেশ তখনো বেঁচে। আমাদের দুজনেরই অসাবধানতায় সেটাকে আমরা হারিয়ে ফেলি। প্রচন্ড এক ঝড়ের মুখে দড়ি ছিঁড়ে অথৈ সমুদ্রের বুকে ভেসে গেছে সেটা!'

'ওঃ! ভগবান!' পারলে যেন নিজের মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলে সুপ্রকাশ, 'হিমাদ্রি! হিমাদ্রি, তুমি বলতে পারো লোকালয় থেকে বহু দূরে এমন একটা দ্বীপে মানুষ কত দিন বেঁচে থাকতে পারে?'

'অতি সুন্দর এই দ্বীপ!' —হিমাদ্রির কণ্ঠস্বর উদাত্ত গম্ভীর, 'এত সুন্দর জায়গা আমি আগে কখনো দেখিনি। এখানে রয়েছে প্রচুর খাবার জিনিস। ফল, মাছ, পাখি, কচ্ছপ! একটা সুন্দর প্রাকৃতিক ঝরনাও রয়েছে এখানে। আর সারা দ্বীপ জুড়ে বিরাজ করছে অখন্ড শান্তি।'

সুপ্রকাশের ভুরু কুঁচকে উঠলো। হিমাদ্রি লক্ষ্য করলো তার চোখের কোলে একটা কুটিল ছায়া।

'যাক্! শয়তানগুলোকে ভাল রকম শিক্ষা দেবার সুযোগ একদিন না একদিন আমি পেতে পারি তাহলে।'

'তার মানে?'

সুপ্রকাশ বললো, 'আমার বিশ্বাস তারা ভেবেছিলো এই দ্বীপে খিদের সময়ে আমি খাবার পাবো না, তেষ্টা পেলে জল মিলবে না আমার। আর, সেটা নিশ্চিত মনে করেই, আমার প্রতি সামান্য একটু দয়া দেখিয়ে গেছে এই টিনের খাবার আর এক বোতল জল রেখে। কোন জাহাজ আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার আগেই আমার প্রাণশক্তি ফুরিয়ে যাবে--চাপা সুরে হলেও তাদের এই রকমের একটা মন্তব্য আমার কানে এসেছিলো। তারপর একযোগে হেসে উঠেছিলো তারা।'

হিমাদ্রি খাবারের টিনগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। সেগুলোর ওপরে বারদুয়েক চোখ বুলিয়ে নিলে।

'সুপ্রকাশ!'

'বলো।'

'এই জিনিসগুলোকে তুমি এখানকার বালির মধ্যে পুঁতে রাখো!'

'তারপর?'

'এগুলো তোমার কোন প্রয়োজনে লাগবে না। তবে, পরে হয়তো কাজে লাগতে পারে।'

সুপ্রকাশ শুধালো, 'এখন তাহলে আমি কি খেয়ে বাঁচব?'

'তোমাকে আমি আমার অতিথিরূপে গ্রহণ করেছি। আমার সঙ্গে চলো।'

'কোথায়?'

'আমার গুহায়। সেখানে খাবার জিনিস অনেক আছে। এসো।'

হিমাদ্রির উদ্দেশ্যটা কী! মাথা চুলকে চিন্তা করতে লাগলো সুপ্রকাশ। সহজে হ্যাঁ বা না বলতে পারে না সে।

অবশেষে একসময়ে ঢোক গিলে সে বললো, 'বেশ, তোমার আতিথ্য আমি নিলাম। তোমার গুহাতেই আমি যাবো।'

কিন্তু মনে মনে সে অবশ্য অন্য প্যাঁচ কষছে।

ব্যাপারটা তার কাছে ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘদিনের নির্জনতা পাগল করে তুলেছে হিমাদ্রিকে। তা না হলে ওর ওই বন্দুকের গুলি বুক পেতে নিতেই হতো। দেখা যাক, বুদ্ধি দিয়ে হিমাদ্রিশেখরকে পরাস্ত করা যায় কিনা।

সমুদ্রতট ধরে হিমাদ্রি এগিয়ে চললো। পাশে সুপ্রকাশ।

দুজনে পাশাপাশি চলেছে। কিন্তু হিমাদ্রির হাতের বন্দুকটি রয়েছে সুপ্রকাশের নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে। সুপ্রকাশ এটা লক্ষ্য না করে পারে না।

যেতে যেতে নানান জিনিসের দিকে সুপ্রকাশের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে হিমাদ্রি, 'ওই দেখ, দ্বীপের কিছু অংশ সমুদ্রের ভেতরে লম্বা হয়ে ঢুকে গেছে। দেখতে পাচ্ছ?'

সুপ্রকাশ উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ।'

'ওখানে বসে টোপ ফেলে বা বর্শা দিয়ে খুব সহজে মাছটাছ শিকার করা যায়।'

'তাই নাকি?'

'শুধু মাছই বা কেন? কচ্ছপও আছে। আর, ওই যে—ওখানে সমুদ্রও দ্বীপের কিছুটা ভেতরে ঢুকে গেছে। তিনদিকে মাটি, একদিকে জল। ইচ্ছে করলে ওখানে জলে গা ডুবিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকা যায় ঘণ্টার পর ঘন্টা।'

'হাঙর আক্রমণ করবে না?'—সভয়ে সুপ্রকাশ তাকায় হিমাদ্রির মুখের দিকে।

'ওই জায়গাটুকুতেই হাঙর ঢোকে না।'

হিমাদ্রির প্রতি সুপ্রকাশের যেন একটু একটু করে সম্ভ্রমবোধ জেগে উঠছে। নিজের প্রয়োজনে মানুষটি একটার পর একটা সুযোগ-সুবিধে নিজেই সৃষ্টি করে নিয়েছে, সে বুঝতে পারে।

নারিকেলকুঞ্জে প্রবেশ করে সুপ্রকাশ বললো, 'আমার এখন মনে হচ্ছে, এই দ্বীপ তোমার কাছে স্বর্গ হয়ে উঠেছে, হিমাদ্রি। এ দ্বীপ আর কখনো তুমি ছেড়ে যেতে পারবে?'

হিমাদ্রি হাসলো। বললো, 'তোমার অনুমান ঠিক নয়, সুপ্রকাশ। দ্বীপটা সুন্দর। একে আমার ভাল লেগেছে—এ কথা অস্বীকারও করছি না। কিন্তু আমি আমার বাঙলা দেশে ফিরে যেতে চাই। আমার দেশের জন্যে ভাল একটা কিছু করতে চাই আমি। আমি এখানে এখন যেমন একটা আলস্যপূর্ণ জীবন যাপন করছি, সেটা আমার সর্বদা মনে হয়, একটা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। যদি ছোট নৌকোটা থাকতো, তাহলে আমি পালিয়ে যেতাম এখান থেকে। দুদিনের ভেতরে আমি সেই নৌকো নিয়ে যে কোন একটা প্রচলিত জাহাজপথে গিয়ে হাজির হয়ে যেতাম।'

'হ্যাঁ।'—হঠাৎ যেন উৎসাহিত হয়ে উঠলো সুপ্রকাশ, 'এ বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে একমত, হিমাদ্রি। দেশে পরিচিত মানুষদের ভেতরে আমিও ফিরে যেতে চাই। যদি একটা নৌকো পাওয়া যেত! কী মন্দ বরাত দেখো। একটা নৌকো ছিলও এখানে। কিন্তু একটু অসাবধানতার জন্যে সেটাকে হারিয়ে ফেললে তোমরা।'

কোন উত্তর দিল না হিমাদ্রি। সমুদ্রতট থেকে ঘুরে একটা বনাঞ্চলের দিকে সুপ্রকাশকে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত করলো শুধু।

সুপ্রকাশ এবার থমকে দাঁড়ায়।

এ কোথায় তাকে নিয়ে যাচ্ছে হিমাদ্রি?

সন্দেহের দোলায় আবার দুলতে থাকে মনটা। অজানা একটা ভয়ে গা ছমছম করে।

অথচ ধীরে ধীরে হিমাদ্রিকে তার ভাল লাগতে সুরু করেছিলো!

'আর একটু এগিয়ে চলো।'—হিমাদ্রি ঠিক আদেশ না অনুরোধ করছে, বুঝতে পারে না সুপ্রকাশ।

তবে সুপ্রকাশ দেখতে পেলো, হিমাদ্রি এখন আর তার পাশে নেই। বন্দুক নিয়ে দুপা পিছু হটে সে তাকে এগিয়ে যাবার কথা বলছে।

'সামনেই একটা পায়েচলা পথ দেখতে পাচ্ছ না? ওই পথটা আমারই পায়ে পায়ে তৈরী হয়েছে। আমার গুহা পর্যন্ত চলে গেছে ওই পথ। এগিয়ে চলো। পাহাড়ের সামান্য একটু ওপরে।'

সুপ্রকাশ হিমাদ্রির নির্দেশ পালন করে। মনে মনে উপলব্ধি করে, হিমাদ্রি এই নির্জন দ্বীপে একাকী বহুদিন ধরে বসবাস করতে করতে পাগল হয়ে যাক্, বা সুস্থই থাকুক, সুপ্রকাশকে সে এখন বন্দুকের নলের মুখে রেখে দিতে চায়। তার প্রতি অবিশ্বাস হিমাদ্রি এখনো তাহলে মনে মনে পোষণ করছে।

'হিমাদ্রি।'—পায়ে-চলা পথ ধরে এগিয়ে যেতে যেতে ঘাড় না ফিরিয়েই সুপ্রকাশ ডাকলো।

'কী বলছো?'

'এ দ্বীপটার আয়তন কত? এতদিন ধরে রয়েছ এখানে। এ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা তোমার নিশ্চয়ই হয়েছে?

'হ্যাঁ, তা হয়েছে বৈকি।'—হিমাদ্রি বললো, 'দৈর্ঘ্যে প্রায় মাইল দুই। এক মাইল প্রস্থে। এখানে তুমি অনাহারে মারা যাবে না, সুপ্রকাশ। যা খেয়ে প্রাণধারণ করা যায়, এমন ফল অনেক আছে এই দ্বীপে।'

সুপ্রকাশের দৃষ্টি নারিকেলকুঞ্জের শীর্ষদেশে ছুটে গেল। ঘুরে এসে পড়লো এককাঁদি কলার ওপরে। 'ওই কলাগাছের ঝোপের ভেতরে অমন কলা অনেক আছে।' —জানালো হিমাদ্রি।

খুশী-খুশী গলায় সুপ্রকাশ বললো, 'তাছাড়া মাছ কচ্ছপ পাখী তো আছেই। সত্যি আমাকে এখানে অনাহারে মরতে হবে না।'

'সমুদ্রের লোনা জলও খেতে হবে না।'—হিমাদ্রি বললো, 'আমার গুহার কাছাকাছি একটা স্বাভাবিক ঝরনা আছে। ভারি মিষ্টি জল!'

'হিমাদ্রি, তুমি মিথ্যে লোভ দেখাচ্ছ না তো আমাকে?

'তার মানে?'

'মানে—তোমার এই অবস্থার জন্যে আমাকেই তোমরা সম্পূর্ণ দায়ী করেছো, শুনলাম। আমাকে দেখামাত্র গুলি করে হত্যা করার নির্দেশ আছে। তাছাড়া, রাজনীতির কথা না ধরলেও প্রতিশোধ নেবার কথাটা এসে যায়।'

'আমি প্রতিশোধ নিতে চাই না।'

'তবে?'

হিমাদ্রি বললো, 'সামনেই আমার গুহা। ঢুকে পড়ো। তুমি এখন আমার অতিথি।'

হিমাদ্রি নির্ঘাত পাগল হয়ে গেছে!—সুপ্রকাশ ভাবে, পাগলদের মেজাজের ঠিকঠিকানা থাকে না কখনো। হিমাদ্রি যে কোন মুহূর্তে আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে পারেই। ওর হাতের ওই বন্দুকটা যদি আমি কোনরকমে হস্তগত করতে পারি, তাহলে ওকে আমিও সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মারবো।

একটা বদ্ধ উন্মাদকে সবসময়ের সঙ্গী হিসেবে পাওয়ার চাইতে এই দ্বীপের নির্জনতাও সুপ্রকাশের কাছে অনেক বেশী আনন্দের।

এতক্ষণে তারা দুজনে দ্বীপের অপর প্রান্তে এসে পৌঁছেছে।

সম্মুখে দিগন্তপ্রসারিত নীল সমুদ্র। দূরে কাছে ভাসমান কোন জাহাজের ধোঁয়ার চিহ্নমাত্র পরিলক্ষিত হয় না।

তটরেখা ঘেঁষে ছোট পাহাড়ের গায়ে একটি গুহা। গুহাটির প্রবেশপথে ভারী এক খন্ড প্রস্তরের সাহায্যে অবরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে।

ভেতরটা বেশ প্রশস্তই। সুপ্রকাশের মনে হলো, চার পাঁচ জন মানুষ একসঙ্গে স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে এখানে।

গুহার ভেতরটা বিশেষ অন্ধকার নয়। একপাশে রয়েছে ছোট একটা অগ্নিকুন্ড। তির্যক রেখায় সূর্যের আলো এসে উঁকি মারছে গুহার ভেতর।

শুষ্ক তৃণ ও লতাগুল্মাদির সংমিশ্রণে রচিত হয়েছে হিমাদ্রিশেখরের সুখশয্যা। তার ওপরে বসে সুপ্রকাশ বেশ আরামই বোধ করলো।

হিমাদ্রি অতিথিসেবার ত্রুটি করলো না।

সুপ্রকাশ পরিতৃপ্ত! তার শরীরের আগেকার গ্লানি এখন যেন প্রায় নেই বললেই চলে। হিমাদ্রির সঙ্গে কথা বলার সময়ে যে চাপা একটা আতঙ্ক তাকে সহজ হতে দিচ্ছিল না, সেটাও এখন যেন অনেক পরিমাণে নিস্তেজ!

প্রায় সহজ সুরে সুপ্রকাশ শুধালো, 'তুমি এখনো আমাকে গুলি করে হত্যা করছো না কেন, হিমাদ্রি? সত্যিই প্রতিশোধ নেবে না? তোমার দয়ার ওপরে আমাকে নির্ভর করে রেখে দিচ্ছ কেন?'

'কারণ', হিমাদ্রিও হাল্কা গলায় জবাব দেয়, 'প্রতিশোধ নেওয়া অর্থহীন, এটা আমি উপলব্ধি করেছি। আরো একটা কারণ আছে। আমি তোমাকে—বাঁচিয়ে রাখতেই চাই।'......

বেঁচেই রইলো সুপ্রকাশ, সেই দ্বীপের বাসিন্দা হয়ে।

পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সময় লাগলো অবশ্য কিছুদিন।

বেঁচে থাকার প্রয়োজনে যা যা করা উচিত, সব কাজই হিমাদ্রি সুপ্রকাশের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিলে।

হিমাদ্রি জানিয়েছে, ভবেশও তাই করতো।

গুহার ভেতরে ওই যে আগুনের কুন্ড, সেটা প্রথমে তৈরি করতে হয়নি। তখন দেশলাই ছিল তাদের কাছে। তারপর আগুনকে বন্দী করে রাখতে হয়েছে ওইভাবে।

তার জন্যে কাঠের প্রয়োজন। একজন কাঠ কাটতে গেছে, অন্যজন গেছে তখন আহারের সন্ধানে।

চলছিলো ওইভাবেই।......

ভবেশ মারা গেল!

দুজনের কাজ তাই এতদিন ধরে একা হিমাদ্রিই করে আসছিলো।

আবার দুজন। তেমনিভাবে কাজ ভাগ হয়ে গেছে দুজনের মধ্যে।

কিন্তু বন্দুকটা হিমাদ্রির নিজস্ব।

বন্দুকের গুলি এখনো কিছু আছে হিমাদ্রির হাতে। ফলমূল, মাছ, কচ্ছপের ডিম-মাংস ইত্যাদি খেতে খেতে যখন অরুচি ধরে যায়, তখনই দুএকটা গুলি খরচ করতে হয় তাকে পাখি শিকারের জন্যে। একাজ একমাত্র হিমাদ্রিই করে। এবং তারপর গুলিসহ বন্দুকটাকে হিমাদ্রি কোথায় কীভাবে যে লুকিয়ে রাখে,

সুপ্রকাশ বুঝতে পারে না। সেই গোপন স্থানটি আবিষ্কার করার জন্যে সুপ্রকাশ বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থকাম হয়েছে।

সুপ্রকাশের ভয়-ভয় ভাব কমে না।

মাস ছয়েক কেটে গেল এইভাবে।

দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা এখনো আগের মতই অস্বস্তিকর।

একদিন সকালে গুহার সামনে পা ছড়িয়ে বসে আছে সুপ্রকাশ। বন্দুক আর দুটো তাজা কার্তুজ নিয়ে হিমাদ্রি গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো।

'সুপ্রকাশ!'

সাড়া না দিয়ে সুপ্রকাশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে হিমাদ্রির মুখের দিকে তাকায়।

হিমাদ্রি বললো, 'আজ আমাদের পাখির মাংস খাবার দিন। পাখি শিকারটা আজ তুমিই করে আনো বরং এই বন্দুকটা দিয়ে।'

সুপ্রকাশ বিস্মিত। হিমাদ্রি যে তার হাতে সরাসরি বন্দুক তুলে দেবে এটা সে স্বপ্নেও ভাবে নি। হাত বাড়িয়ে বন্দুক কার্তুজ গ্রহণ করলো সে। হাত দুটো কেঁপে উঠলো একটু। ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়ালো।

বন্দুকের মধ্যে কার্তুজ ভরে সে স্থির দৃষ্টিতে তাকালো হিমাদ্রির মুখের দিকে।

'কী দেখছো অমন করে?'—হিমাদ্রি শুধালো।

'এইবার!' নিষ্করুণ গলায় সুপ্রকাশ বললো, 'এখন আমি তোমাকে হত্যা করতে পারি। তোমাকে হত্যা করা আমার কর্তব্য। কারণ আমার কাছে এটা এখন পরিষ্কার যে, তুমি সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গিয়েছো। কখন্ আমাকে তুমি খুন করে বসবে, আমি তা জানি না। হ্যাঁ, এটা নিশ্চিত। তোমাকে মরতে হবে।'

সোজা হয়ে দাঁড়ালো হিমাদ্রি। অচঞ্চল দৃষ্টি তার সুপ্রকাশের মুখের ওপর!

'করো গুলি।'—ঠাণ্ডা গলায় সে বললো।

তার দিকে বন্দুক উঁচিয়ে ধরে সুপ্রকাশ। বন্দুকের নলের ওপর দিয়ে নজর পাঠিয়ে নিশানা ঠিক করতে থাকে। তার ঠোঁট-জিভ-গলা শুকিয়ে উঠেছে।

পরমুহূর্তেই তার বন্দুকধরা হাত সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলে। তারপর ক্রন্দন-বিকৃত কণ্ঠে কি যেন বলে উঠে সুপ্রকাশ দৌড়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সারাটা দিন কেটে যায়। কেটে যায় রাত। কিন্তু সুপ্রকাশ গুহায় ফিরে আসে না।

এলো পরদিন সকালে। শুকনো মুখ, চোখ দুটো কোটরে বসে গেছে। যেন অনেক দিন রোগে ভোগা রক্তহীন ফ্যাকাসে চেহারার একটা দুর্বল মানুষ।

বন্দুকটা হিমাদ্রির দিকে বাড়িয়ে ধরে অপরাধীর মত সে বললো, 'আমাকে ক্ষমা করো। আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম।'

এক ঝলক মিষ্টি হাসি ঝরে পড়ে হিমাদ্রির মুখ থেকে। সে ঘাড় নেড়ে বলে, 'না না, ওটা চলবে না। বন্দুক ফেরত দিচ্ছ যে? পাখি কই? কালকে খাবার ইচ্ছে হয়েছিলো, পাইনি। যাও! অন্ততঃ একটা পাখি আমাদের আজ চাই-ই।'

অতঃপর সম্পর্ক ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো উভয়ের মধ্যে। প্রাণ খুলে কথাবার্তা হয় দুজনের মধ্যে।

হিমাদ্রি নীরবে লক্ষ্য করে যায়। ভাবে, সুপ্রকাশের চরিত্রের এই পরিবর্তন ক্ষণস্থায়ী নয়তো! কিংবা কপটতার আশ্রয় নিচ্ছে না তো সুপ্রকাশ? মনে তার দ্বিধা থেকে যায়।

'করো গুলি।'

সুপ্রকাশকে একটু পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ যদি পাওয়া যেতো……

সুযোগ একদিন এসেও গেল। দ্বীপের যেদিকে একদিন সুপ্রকাশকে আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করে-ছিলো হিমাদ্রি, সেদিন তারা সেদিকেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

হঠাৎ হিমাদ্রির দৃষ্টি দূর সমুদ্রবক্ষে এক দৃশ্যের দিকে আকৃষ্ট হয়। ধোঁয়া কিসের? কোন স্টীম শিপ কি?

'সুপ্রকাশ! ওই দেখো!'—হিমাদ্রির গলায় উত্তেজনা সুস্পষ্ট।

'কী?'

'একটা জাহাজ!'

দূরবর্তী ধোঁয়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সুপ্রকাশ। হ্যাঁ, একটা স্টীম শিপই! আর সেটার দূরত্ব এখান থেকে খুব বেশীও নয়। আরো আশ্চর্য—সেটা অগ্রসর হচ্ছে এই দ্বীপটিকে লক্ষ্য করেই!

দ্রুত একটা ঘন বুনো ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে পড়তে পড়তে হিমাদ্রি বললো, 'সুপ্রকাশ, জাহাজটাকে আমি চিনতে পেরেছি। দৃষ্টি আমার খুবই তীক্ষ্ণ। জাহাজের মাথায় দেখছি ইউয়িন জ্যাক্ উড়ছে। ওটা নিশ্চয়ই তোমারই খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেন বুঝতে পারছো না? তোমার সী বার্ডের কোন কোন বিদ্রোহী নাবিক ফিরে গিয়ে কোম্পানীর কাছে আসল ঘটনা গোপন করেনি। তারা যে তোমাকে এমন একটা অপ্রচলিত অজানা সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে জনমানবহীন দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে গেছে, সেটা তোমার মনিবদের কাছে জানিয়ে দিয়েছে। কাজেই তোমারই সন্ধানে আসছে স্টীম শিপ। সুপ্রকাশ, তোমার মুক্তি পাবার লগ্ন এসে গেছে। তুমি আনন্দ করো।'

আনন্দে উত্তেজনায় সুপ্রকাশ হাততালি দিয়ে ওঠে। সোল্লাসে বলে, 'চমৎকার! কিন্তু মুক্তি লগ্নটা শুধু আমারই কেন? তুমিও চলো আমার সঙ্গে। ওঃ, এত-দিন পরে—'

হিমাদ্রির মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন কথা হারিয়ে ফেলে। তারপর সবিস্ময়ে শুধায়, 'কী হলো তোমার, হিমাদ্রি?'

হিমাদ্রি মাথা নেড়ে বলে, 'আমার মুক্তি? জেল থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামীর মুক্তি? মুক্তি ইংরেজ শাসকদের শত্রুর? না, বন্ধু! আমি তোমার ওই ইংরেজ মনিবের জাহাজে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে বন্দী হয়ে যাবো।'

সুপ্রকাশের কাছে ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার হয়। অসহায়ভাবে সে ছটফট করতে থাকে।

'তাইতো! কী হবে?……কী করা যায়, হিমাদ্রি? ওরা এই দ্বীপের ভেতরেও হয়তো তল্লাশী চালাতে পারে।'

'না।'—শান্তগলায় বলে হিমাদ্রি, 'যদি শুধু তোমার সন্ধানেই ওরা এসে থাকে, তাহলে ওরা তা করবে না। তার জন্যে তোমাকে যা করতে হবে শোনো। জাহাজ থেকে বোটে করে এসে ওদের নামতে হবে এখানে। তুমি ওই নারকেল গাছগুলোর কাছে চলে যাও। ওখানে দাঁড়িয়ে তোমার গায়ের জামাটা খুলে ওদের দেখিয়ে নাড়তে থাকো। ওই জায়গাটায় বোট লাগানোর সুবিধে আছে। ওদের এখানে আসতে দাও। আমি কাছাকাছি এক জায়গায় লুকিয়ে থাকছি। তবে এমন জায়গায় থাকবো, যেখান থেকে তোমাদের কথা-বার্তা শুনতে কোন অসুবিধে হবে না আমার। ওরা কী বলে আমি শুনে নিতে চাই। যদি ওরা শুধু তোমার সন্ধানেই এসে থাকে—আমার মনে হয় সেটা হওয়াই সম্ভব, তাহলে তুমি চলে যেও ওদের সঙ্গে। এক মুহূর্ত দেরি না করে চলে যাবে, বুঝলে? এই দ্বীপের অভ্যন্তরে ঢোকার সুযোগ বা সময় ওরা যেন না পায়। কারণ, ঢুকলেই ঘুরতে ঘুরতে আমার গুহা দেখতে পেয়ে যাবে। সন্দেহ জাগবে ওদের মনে। আমি তখন আর নিজেকে রক্ষে করতে পারবো না। সুপ্রকাশ, যা বললাম, করো। তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ কথা, বন্ধু!'

তারপর প্রায় ঘন্টাখানেক সময় কেটে গেছে।

হিমাদ্রির অনুমানই ঠিক।

একটা বোটে চেপে দ্বীপে এসে অবতরণ করলো চার ব্যক্তি। তাদের মধ্যে একজন সুপ্রকাশের পরিচিত। সী বার্ডের নাবিক রিচার্ড স্মিথ।

একজনকে দেখে মনে হয় ইংরেজ নেভাল অফিসার। অপর দুজন পুলিসের লোক। তাদের ভেতরে এক-জনকে বাঙালী বলে সন্দেহ হয় সুপ্রকাশের।

তারা সকলে একযোগে অবাক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সুপ্রকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

সুপ্রকাশ দুপা এগিয়ে গিয়ে বলে, 'গুড ডে, জেন্টলমেন!'

'আমরা একজন সুপ্রকাশ দত্তকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

সুপ্রকাশের অনুমান মিথ্যে নয়—পুলিস ভদ্রলোকটি বাঙালীই।

'ইংরেজ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জাহাজ সী বার্ডের ক্যাপ্টেন দত্ত। তাঁর বিদ্রোহী নাবিকরা তাঁকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দিয়ে গেছে।'

'আমিই ক্যাপ্টেন দত্ত।'—সুপ্রকাশ বললো, 'আপনাদের ধন্যবাদ। আমি ভেবেছিলাম, এরকম একটা কিছু হওয়া সম্ভব। চলুন—সঙ্গে নিয়ে যাবার মত কোন জিনিসপত্র নেই। হ্যালো! রিচার্ড স্মিথ! আমাকে চিনতে পারছো না?'

রিচার্ড স্মিথ অপরাধীর মতই ঘাড় নেড়ে জানায় যে, সে চিনতে পারছে।

নেভাল অফিসার কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করেন, এতদিন ধরে একা এই নির্জন দ্বীপে আপনি কীভাবে কাটালেন, ক্যাপ্টেন দত্ত?'

'সে গল্প পরে শুনবেন, স্যার।'—সুপ্রকাশ ব্যস্ততা দেখিয়ে বললো, 'আমার আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না। চলুন!'

পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করে পুলিস অফিসারটি। পাতা উলটে-উলটে কী যেন সে খোঁজে।

'ক্যাপ্টেন দত্ত!'

'বলুন।'

'এই দ্বীপে আপনার আগে আর কোন মানুষের পদার্পণ ঘটেছিলো কিনা আপনি অনুমান করতে পারেন? অনেকদিন তো একা একা কাটালেন এখানে। তেমন কোন চিহ্ন বা প্রমাণ কোন সময়ের জন্যে আপনার দৃষ্টিতে পড়েনি?

'এ কথা কেন বলছেন, বলুন তো?'—সুপ্রকাশ অবাক হয়ে শুধোয়।

পুলিস অফিসার জবাব দেয়, 'কয়েক বছর আগে আন্দামানের সেলুলার জেল থেকে পালিয়ে দুজন রাজবন্দী একটা ছোট কাঠের নৌকোয় চেপে সরে পড়ে। অনেক অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। কিন্তু তাদের দুজনের কোন হদিসই মেলেনি। সমুদ্রে ডুবে যদি মারা গিয়ে থাকে তাহলে তো কোন কথাই নেই। আর তেমনটা হওয়াই সম্ভব! কিন্তু এমনও তো হতে পারে, হাওয়া আর সমুদ্রের স্রোতের ধাক্কায় ঘুরতে ঘুরতে এমনি একটা অজানা অচেনা দ্বীপে গিয়ে তারা পৌঁছেছে। বিভিন্ন জাহাজ সাধারণতঃ যে পথে চলাচল করে, এ দ্বীপটা দেখা যাচ্ছে সেই প্রচলিত পথ থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে অবস্থান করছে। তাই জিজ্ঞেস করছি, আপনি তেমন কিছু লক্ষ্য করেন নি এখানে?'

হেসে উঠলো সুপ্রকাশ। বললো, 'এখানে এতদিন ধরে আমার সঙ্গী ছিল এই সমুদ্র, কচ্ছপ আর কিছু সামুদ্রিক পাখী। মানুষ? না—চিন্তাই করা যায় না।'

'একজনের নাম ছিল হিমাদ্রিশেখর ঘোষ। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলো তারা।'—পুলিস অফিসার এদিক ওদিকে দৃষ্টি ফেলে যেন আপন মনেই বলতে লাগলো, 'বড় দুর্দান্ত প্রকৃতির ছোকরা ছিল মশাই!'

সুপ্রকাশ সায় দেয়, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমিও তার কথা শুনেছিলাম।'

'সন্ধান পাওয়া গেলে একটা মোটা টাকার পুরস্কার তো ছিলই, তার ওপর চাকরীর উন্নতিও হয়ে যেত চটপট!'

'আহা, তাই নাকি!'—শিস্ দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করলো সুপ্রকাশ, 'কিন্তু, অফিসার, পুরস্কার পাওয়া আমাদের কপালে নেই। ওইসব বদমাস অকৃতজ্ঞ মানুষগুলো কি সে সুযোগ সহজে আমাদের দিতে চায়? তারা সমুদ্রে ডুবেই মারা গেছে! আপনি অভিজ্ঞ লোক। ঠিকই বলেছেন। চলুন, চলুন—আর আমার ভাল লাগছে না এখানে!'......

লক্ষ্যের বাইরে চলে গিয়েছে জাহাজ!

গোপন স্থান থেকে হিমাদ্রি বেরিয়ে এলো।

পাহাড়ের গায়ে যেখানে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে কটা পোড়াকাঠ, ধীর পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল সে। কাছে গিয়ে দাঁড়ালো মাথা নত করে।

দাঁড়িয়েই রইলো।

দীর্ঘ সময় পরে হিমাদ্রি আপন মনেই বলে, 'এক সময়কার সেই লোভী পাপী মানুষটিকে একটা মহৎ কাজ করতে দেখলাম। ভাল লাগলো।...খুব ভাল লাগছে! ভবেশ, তুমিও ওকে ক্ষমা করো!'

মনোজিৎ বসুর

ঘ্যাঙোর ঘ্যাঙ

এক ছিল ব্যাঙ। তার ছিল এক বৌ, আর ছিল চার-পাঁচটা বাচ্চা-কাচ্চা। তাদের নিয়ে সে একটা পুকুরে বাসা বেঁধেছিল।

পুকুরে আর যে-সব জলচর প্রাণী থাকতো, ব্যাঙ ছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান। তাই, সবাই তাকে খুব খাতির করে চলতো, আর শ্রদ্ধা ভক্তিও করতো। সবাই তাকে ডাকতো 'বাবাজী' বলে।

ব্যাঙ-বাবাজীর জ্ঞান-বুদ্ধির কথা শুধু যে জলচর প্রাণীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। স্থলচর প্রাণীরাও তা জানতো। তাই, কোনো বিপদ-আপদ দেখা দিলে তারাও আসতো ব্যাঙ-বাবাজীর কাছে শলা-পরামর্শ করতে।

একবার পৃথিবীতে বড়ো আকাল পড়লো। বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। চাষ-আবাদ বন্ধ। পুকুরের জল গেল শুকিয়ে, নদীর জল গেল নেমে। চারদিকে শুধু মাটি খটখট, জল বিহনে প্রাণ ছটফট। সেই খরায় স্থলচর আর জলচর সকল প্রাণীরই দুঃখের আর অবধি রইলো না। চারদিকে হাহাকার পড়ে গেল।

সবাই ছুটে এলো ব্যাঙ বাবাজীর কাছে।

পুকুরের জল শুকিয়ে যাওয়ায় বাবাজীরও তখন কষ্টের সীমা নেই।

সকলের মুখেই এক কথা : খরায় যে আর প্রাণ বাঁচে না, সবাই মরো-মরো। ও বাবাজী, চুপটি কেন, উপায় কিছু করো।

কদিন থেকেই ব্যাঙ-বাবাজী সেই উপায়ের কথাই ভাবছিল। কিন্তু, ভেবে ভেবেও কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছিল না। ক্রমশই তার রাগ হচ্ছিল সৃষ্টিকর্তা বিধাতার ওপর। এ তাঁর কেমন সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার? বর্ষাকালেও বৃষ্টি নেই! স্বর্গে কোথায় আছেন বসে, এ-দিকে কি দৃষ্টি নেই? অনেক ভেবে-চিন্তে, ব্যাঙ-বাবাজী শেষ পর্যন্ত, স্বর্গধামেই যাওয়া ঠিক করলো। বিধাতার সঙ্গে একবার মুখোমুখি দেখা করা দরকার। বিনা দোষে আজকে তারা পাচ্ছে কেন কষ্ট?—সেই কথাটাই ব্যাঙ-বাবাজী জানতে চাইবে স্পষ্ট।

ব্যাঙ-বাবাজী আর দেরি না করে থপ্ থপ্ করে এগিয়ে চললো। পথে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর এক শেয়ালের সঙ্গে দেখা। সে জিজ্ঞাসা করলো : বাবাজী! অমন করে কোথায় চললে আজ?

বাবাজী জবাব দিলো :

আকাল এলো, আকাল এলো,
তাইতো সবাই দুখী।
যাচ্ছি বাপু, স্বর্গধামে
করতে তোদের সুখী॥
জল না পেলে চলছে না আর,
তাই বিধাতার সাথে
ঠিক করেছি করবো লড়াই
বৃষ্টিটা দেন যাতে॥

শেয়াল বললো : আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে?

ব্যাঙ বললো : ক্ষতি কি! তুমিও চলো আমার সঙ্গে।

কিছু দূর যাবার পর, এক ভালুকের সঙ্গে দেখা। যে-ভালুক একদিন ছিল হৃষ্টপুষ্ট গাঁট্টাগোট্টা, খরায় কষ্ট পেয়ে পেয়ে সে-ও যেন আজ কাঠখোট্টা! সে শেয়ালের সঙ্গে ব্যাঙ-বাবাজীকে উত্তরদিকে যেতে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: বাবাজী গো, বাবাজী! চলেছ কোথায় আজি?

বাবাজী জবাব দিলো:

আকাল এলো, আকাল এলো,
তাইতো সবাই দুখী।
যাচ্ছি আমি স্বর্গধামে
করতে তোদের সুখী॥
জল না পেলে চলছে না আর,
তাই বিধাতার সাথে
ঠিক করেছি করবো লড়াই
বৃষ্টিটা দেন যাতে॥

ভালুক বললো: আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে?

ব্যাঙ বললো: ক্ষতি কি! তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে।

শেয়াল আর ভালুককে সঙ্গে নিয়ে বাবাজী-ব্যাঙ চললো এগিয়ে। যেতে যেতে পথে পড়লো এক নিবিড় বন। সেই বনে অনেক চিতাবাঘ থাকতো। তাদের একজন এলো ছুটে। স্বাস্থ্যবান চিতা আজ শুকিয়ে যেন ধুঁকছে। শেয়াল আর ভালুকের সঙ্গে ব্যাঙ-বাবাজীকে উত্তরদিকে যেতে দেখে সে-ও জিজ্ঞাসা করলো: বাবাজী! বাবাজী! বাবাজী! চলেছ কোথায় আজি?

বাবাজীর মুখে সেই একই জবাব:

আকাল এলো, আকাল এলো,
তাইতো সবাই দুখী।
যাচ্ছি আমি স্বর্গধামে
করতে তাদের সুখী॥
জল না পেলে চলছে না আর,
তাই বিধাতার সাথে
ঠিক করেছি করবো লড়াই
বৃষ্টিটা দেন যাতে॥

চিতাবাঘ বললো: আমি কি তোমার সঙ্গে যেতে পারি?

ব্যাঙ বললো: কেন যাবে না? তুমিও চলো। তুমি গেলে তো ভালোই হয়। থাকলে তুমি সঙ্গে মোদের থাকে না আর ভয়।

শেয়াল, ভালুক আর চিতাবাঘকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাঙ-বাবাজী রওনা হলো। সবাই বেশ জোরে জোরে এগিয়ে চলে, কিন্তু বাবাজী পড়ে পিছিয়ে। শেয়াল, ভালুক আর চিতাবাঘে তখন পালা করে ব্যাঙ-বাবাজীকে পিঠে করে নিয়ে চললো।

এই ভাবে চলতে চলতে তারা গেল পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে। তার পর শুরু হলো তাদের আকাশ-পথে যাত্রা। আকাশ থেকে মহাকাশে। সৃষ্টিকর্তা বিধাতা যে কখন কোথায় থাকেন তার তো আর ঠিক নেই। ব্যাঙ-বাবাজী তাই বুদ্ধি করে মহাকাশের গ্রহ-উপগ্রহে একবার করে দেখে গেল। চন্দ্রলোক ঘুরে দেখলো, তারপর বুধ, শুক্র হয়ে গেল মঙ্গলে। সেখান থেকে গেল বৃহস্পতির রাজ্যে। তারপর একে একে শনি, ইউরেনাস, নেপচুন হয়ে প্লুটোতে। না, বিধাতা-পুরুষ আজ কোনো গ্রহ-উপগ্রহেই আসেননি। তাহলে খোদ স্বর্গধামেই বিরাজ করছেন তিনি।

ব্যাঙ-বাবাজী তখন শেয়াল, ভালুক আর চিতা-বাঘকে সঙ্গে নিয়ে আকাশগঙ্গার পথ ধরলো। সেই পথ সোজা চলে গিয়েছে স্বর্গধামের দিকে। যেতে যেতে অবশেষে তারা একসময় স্বর্গধামের প্রধান ফটকের সামনে গিয়ে হাজির হলো।

প্রকান্ড সেই ফটক। সবাই তাকিয়ে দেখলো, ফটকের দরজা আজ খোলা নেই, ভিতর থেকে বন্ধ। ব্যাঙ-বাবাজী প্রথমে তার লিকলিকে ঠ্যাঙ দিয়ে ধাক্কা মারলো দরজায়। কিন্তু, দরজা তবু খুললো না। বাবাজী পড়লো ভাবনায়। হঠাৎ তার নজরে পড়লো, ফটকের একপাশে বিরাট এক জয়ঢাক বসানো রয়েছে। চিতাবাঘের পিঠে চড়ে ব্যাঙ-বাবাজী তখন সেই জয়ঢাকের উপর লাফিয়ে পড়লো। ঢাক বাজাবার দুটো কাঠি ছিল ঢাকের উপরেই। বাবাজী-ব্যাঙ সেই কাঠি দুটো হাতে নিয়ে জোরে জোরে ঘা দিলো আর হেঁকে বললো:

দ্বারপাল! দ্বারপাল! দ্বার খুলে দাও।
আমরা এসেছি আজ সবারে জানাও॥
পৃথিবীর দুঃখের এনেছি খবর—
খুলে দাও দ্বার তুমি, নাই অবসর॥

জয়ঢাকের আওয়াজে আর ব্যাঙ-বাবাজীর কথায় স্বর্গের মধ্যে তখন হৈ চৈ প'ড়ে গেল। দেবতারা বলাবলি করতে লাগলেন: দেখো, দেখো, স্বর্গদ্বারে কারা যেন সব এসেছে, চেঁচিয়ে কী যেন বলছে, জয়ঢাক বাজাচ্ছে দুম্ দুম্ করে।

কথাটা তখন স্বয়ং বিধাতাপুরুষেরও কানে গেল।

তিনি তখন তাঁর এক দূতকে পাঠিয়ে দিলেন ব্যাপারটা কি একবার দেখে আসতে। দূত তখন ফটকের চোরা-পথে হামাগুড়ি দিয়ে, বাইরে এসে, সব দেখে গেল। তারপর সোজা বিধাতাপুরুষের বৈঠকখানায় গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো : প্রভু! ছোট্ট একটা জানোয়ার, ভারি বিশ্রী চেহারা তার। চোখ দুটো ঠিকরে আছে বাইরে, লিক্‌লিকে চার ঠ্যাঙ্; পিঠময় তার ফোঁড়ার মতো, নাম শুনলাম ব্যাঙ! জয়ঢাকেতে থেকে থেকে সে-ই দিচ্ছে ঘা, ধূর্ত কোনো জন্তু হবে, রাখছি বলে তা।

সব শুনে বিধাতা বললেন : রাজহাঁসকে পাঠিয়ে দাও, সে গিয়ে ওর খবর নিয়ে আসুক।

দূত তখন রাজহাঁসকে ব্যাঙ-বাবাজীর কাছে পাঠিয়ে দিলো।

স্বর্গের রাজহাঁস হেলতে দুলতে ফটকের চোরা-পথ দিয়ে বাইরে এলো। তারপর ব্যাঙকে উদ্দেশ করে বললো :

পুকুরের ব্যাঙ তুই চেঁচাস মিছে,
ঢাক ছেড়ে নেমে পড়্, পড়্ রে নীচে।
পৃথিবীতে ফিরে যা রে, পালা রে পালা,
সাহসটা বড়ো দেখি! ছাড়্ ঝামেলা।
এ তো আর তোর সেই পুকুরটা নয়,
স্বর্গের দ্বারে এলি, পাস নাকি ভয়?
মিছে কেন মার খাবি? পড়্ সরে পড়্,
পৈতৃক প্রাণ বাঁচা, চলে যা রে ঘর॥

ব্যাঙ-বাবাজী সব শুনে মনে মনে বেজায় চটে গেল। মুখে বললো : আচ্ছা! এই কথা? ওরে বোনপো শেয়াল, হাঁ করে দেখছিস কি? হাঁসটা আমাকে যে অপমান করছে, তা বুঝছিস না? দে না, বাপু! একটু মজা দেখিয়ে।

ব্যাঙ-বাবাজীর ইঙ্গিত পেয়ে, শেয়াল তখন ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই রাজহাঁসের ওপর। ব্যস্, এক নিমেষেই রাজহাঁসের দফা শেষ।

বাবাজী আবার জয়ঢাক বাজাতে লাগলো দুম দুম করে। সেই সঙ্গে গলা ছেড়ে বলতে লাগলঃ

দ্বারপাল! দ্বারপাল! দ্বার খুলে দাও।
আমরা এসেছি আজ প্রভুরে জানাও॥
পৃথিবীর দুঃখের এনেছি খবর—
খুলে দাও দ্বার তুমি, নাই অবসর॥

রাজহাঁসের মৃত্যুর খবর পেয়ে, বিধাতাপুরুষ গিয়েছিলেন চটে। তিনি তখন এক শিংওলা ভেড়াকে দিলেন পাঠিয়ে, ব্যাঙ-বাবাজীকে সাজা দিতে। শিংওলা ভেড়া এসে ব্যাঙকে খুব ধমকালো তার ওই চেঁচামেচির জন্য। রাজহাঁসকে মেরে ফেলার জন্যও তাকে খুব বকলো চোখ পাকিয়ে পাকিয়ে। ভেড়া বললো :

ওরে ব্যাঙ! সরু ঠ্যাং! মারি যদি ঢুঁশ্,
পেট ফেটে মরে যাবি। নাই কি তা হুঁশ?
ঢাক ছেড়ে নেমে পড়্, নেমে পড়্ নীচে;
খুলবে না এই দ্বার, চেঁচাসনি মিছে।
ঢুঁশ ঢাশ মার খেয়ে কেন যাবে প্রাণ?
এখনো সময় আছে, দেরে পিট্‌টান॥

ব্যাঙ-বাবাজী আরও রেগে গেল এবার। সে তখন ভালুকের দিকে তাকিয়ে বললো : ভাইপো ভালুক! ভাইপো ভালুক! ভেড়ার বাড়ে বাড়। টেরটা ওকে পাইয়ে দেনা, মট্‌কে দে না ঘাড়।

ইঙ্গিত পেয়েই ভালুক তখন ভেড়ার টুঁটি চেপে ধরলো। ভেড়া আর যায় কোথায়! টুঁ শব্দটি করবার আর জো রইলো না। ভালুকের হাতেই তার প্রাণটা গেল।

খবর গিয়ে পৌঁছুলো বিধাতাপুরুষের কানে।

তিনি এবার তাঁর এক দেহরক্ষীকে ঢাল-তরোয়াল দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন ব্যাঙের কাছে। স্বর্গের শান্তি ভঙ্গ করার অপরাধে ব্যাঙকে এবার সাজা পেতেই হবে। দেহরক্ষীও ফটকের চোরাপথে বেরিয়ে, সোজা গিয়ে হুংকার ছাড়লো ব্যাঙের সামনে :

ওরে, ওরে মন্ডুক! ওরে, দর্দুর!
দূরে যা রে, দূরে যা রে, হট্ দূর দূর।
স্বর্গের দ্বারে এসে মর্ত্যের ব্যাঙ্
জয়ঢাকে কেন তুই মারিস রে ল্যাঙ?
সাহস বেজায়, রাজ-হংসে মারিস!
কেন তুই মোটে কারো ধার না ধারিস!
পৃথিবীর ব্যাঙ হয়ে স্বর্গের মেঝে
তুই করলি রে তারও দফারফা শেষে!
এইবার, আয় তবে পেটটা ফাটাই
যমের দুয়ারে তোকে আজকে পাঠাই॥

ব্যাঙ-বাবাজী কিন্তু ঘাবড়াবার পাত্র নয়। সে তখন বাক্যব্যয় না করে সোজা চিতাবাঘের দিকে তাকালো। চিতাবাঘও চক্ষের নিমেষে ঝাঁপিয়ে পড়লো বিধাতার সেই দেহরক্ষীর ঘাড়ে। ঢাল-তরোয়াল নিয়ে চিতাবাঘের সঙ্গে লড়াই বাধলো দেহরক্ষীর। ক্ষত-বিক্ষত হলেও চিতাবাঘ তাকে ছাড়লো না। লড়াইয়ের এক ফাঁকে, সুযোগ বুঝে, দেহরক্ষীর গলাটা কামড়ে ধরলো চিতা-

বাঘ। ঢাল-তরোয়াল হাত থেকে খসে পড়লো, দেহ-রক্ষীও অক্কা পেলো।

বিধাতাপুরুষ এবার বাধ্য হয়েই ব্যাঙ-বাবাজীর কাছে হার মানলেন।

তাঁর আদেশে স্বর্গদ্বার খুলে গেল।

বাবাজী-ব্যাঙ তখন সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে স্বর্গধামে প্রবেশ করলো। উঃ, তখন তাদের কি খাতির! বিধাতার চর-অনুচর যে যেখানে ছিল, সবাই তখন হাতজোড় করে তাদের স্বাগত জানালো।

ব্যাঙ-বাবাজী তখন, বিধাতাপুরুষের কাছে গিয়ে, খরা-জর্জর পৃথিবীর বাসিন্দাদের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী খুলে বললো। অভিমানের সুরে বললো ঃ

বিধাতাপুরুষ, ওগো! এ কোন্ বিচার?
বর্ষায় খরতাপ, নেই জলধার।
জল নেই, জল নেই, ওগো ভগবান!
জল বিনা আমাদের বাঁচে কিসে প্রাণ?
আকাল পড়েছে আজ পৃথিবীতে, তাই
জল দাও, জল দাও, চাই জল, চাই॥

বিধাতাপুরুষ তখন ডেকে পাঠালেন বরুণদেবকে।

বরুণ এলে, তাঁকে তিনি খুব একচোট ধমকালেন পৃথিবীতে যথাসময়ে বৃষ্টিপাত না করার জন্য। তারপর হুকুম দিলেন ঃ

খরতাপে জর্জর পৃথিবী 'পরে
এক্ষুণি যেন ঠিক বৃষ্টি ঝরে।
বর্ষায় বর্ষণ ঠিক হওয়া চাই
বরুণ! তোমার প্রতি আদেশ জানাই।

বরুণদেব তখনই ছুটলেন মেঘালয়ে। মেঘেরা সব, দল বেঁধে, সেখানে বিশ্রাম করছিল। বরুণ গিয়ে আদেশ দিলেন ঃ ঢের আরাম করেছ তোমরা, আর নয়। বিধাতাপুরুষ চটে গিয়েছেন তোমাদের গাফিলতিতে। এক্ষুণি দল বেঁধে ছুটে যাও, পৃথিবীর আকাশে গিয়ে বৃষ্টি ঝরাও।

বৃষ্টি। বৃষ্টি। বৃষ্টি।

অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামলো পৃথিবীর বুকে। রিমঝিম, ঝর্ঝর্, ঝম্ঝম্ করে বৃষ্টি নামলো। স্থলচর, জলচর সব প্রাণী সেই বৃষ্টিধারায় সানন্দে স্নান করলো। প্রাণ ভরে পান করলো সেই জীবন-সুধা। নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর—সব উঠলো জলে ভরে। তপ্ত মাটির বুক হলো শান্ত, বৃষ্টির জল পেয়ে সরস হয়ে উঠলো পৃথিবীর মাটি। রুক্ষ ধূসর মাটির বুকে পড়ল সবুজের আস্তরণ। কৃষকের মুখে ফুটলো হাসি।

ব্যাঙ-বাবাজী দিন কয়েক, তার সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে, স্বর্গধামেই কাটালো বিধাতাপুরুষের অতিথি হয়ে। তারপর একদিন ফিরে এলো পৃথিবীতে।

ফেরবার আগেই সৃষ্টিকর্তা বিধাতা বললেন ঃ ব্যাঙ-বাবাজী! ভবিষ্যতে তোমার আর কষ্ট করে এখানে আসবার প্রয়োজন নেই। কখনো যদি সময় মতো বৃষ্টি না হয়, তাহলে আকাশের দিকে মুখ তুলে ডাক ছাড়বে—ঘ্যাঙোর ঘ্যাঙ! সে-ডাক শোনা মাত্রই পৃথিবীতে আমি কালো মেঘদের পাঠিয়ে দেব, তারা গিয়ে নামিয়ে দেবে বৃষ্টির ধারা।

সেই থেকে, আজও পৃথিবীতে ব্যাঙেরা যখন আকাশের দিকে মুখ তুলে, ঘ্যাঙোর ঘ্যাঙ করে তখন বৃষ্টি নেমে আসে পৃথিবীর বুকে।*

* ভিয়েৎনামের একটি উপকথার ভিত্তিতে রচিত।

★

॥ এক ॥

চাইবাসা শহর থেকে কিছু দূরে কেওনঝরের রাস্তার ওপরে একটা সুন্দর বাগানবাড়ি। চার পাশে ফাঁকা ঢেউখেলানো মাঠের মাঝখানে নানা রঙের ফুলের সমারোহে চোখ জুড়িয়ে যায়। দেখে মনে হয় মরুভূমির মাঝখানে যেন একটি মরূদ্যান বসানো রয়েছে।

মরুভূমিই বটে। ক্ষয় পাওয়া কাঁকরে ছাওয়া ডাঙ্গার মধ্যে মাটির কোন চিহ্ন নেই। গাছপালা দূরের কথা, সামান্য একটু ঘাসের ছোপও পড়ে নি কোথাও। এরই মধ্যে এমনি চমৎকার বাগান কী করে গড়ে তুললেন সৌরীনবাবু, ভেবে পায় না শমিত।

অমন হাঁ করে দেখছ কী শমিতদা?—মালতীলতার ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বললে প্রমিতা। সৌরীনবাবুর একমাত্র মেয়ে, বয়স উনিশ পেরোয় নি। পাটনাতে হোস্টেলে থেকে এম. এ. পড়ছে।

প্রমিতার দিকে মৃদু হেসে শমিত বললে, দেখছিলাম কাকাবাবুর কীর্তিকলাপ। চার পাশে নেড়া খোয়াই, এর মাঝখানে এমন সুন্দর একখানা বাগান তৈরি করলেন কী করে তিনি! এত গাছপালা, ফুল-ফল—দেখে মনে হয় যেন আরব্যোপন্যাসের দৈত্যের কাজ।

খিল খিল করে হেসে উঠে প্রমিতা বললে, বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও এই কথা বলছ তুমি! একটা বাগান কী করে তৈরি করতে হয় জান না?

—জানব না কেন! কিন্তু এরকম মরুভূমির মত জমি, এক দানা ঘাসও গজায় না এখানে—এর মধ্যে এমন একখানা বাগান গড়ে তোলাটা খুব বিস্ময়কর নয় কী?

—মোটেই না।

শমিত রেগে উঠে বললে, মোটেই না মানে! মাটি নেই, জল নেই—তবু তুমি বলতে চাও এখানে বাগান করাটা বিস্ময়কর নয়!

মুখ টিপে হেসে প্রমিতা বললে, মাটি ও জল নেই কে বললে! এখানে না থাক কাছাকাছিই তো রয়েছে। মাইল দুয়েক দূরেই রোরো নদী। নদীর দু'পাশে ধানক্ষেতের মধ্যে মাটির অভাব নেই। ওখান থেকে প্রায় একশো ট্রাক মাটি আনিয়ে এখানে ঢেলে জমি তৈরি করিয়েছেন বাবা! আর জল তো মাটির নীচেই রয়েছে। এখানকার ডাঙা শুকনো খটখটে, কিন্তু একশো ফুট নীচে পাথরের স্তর জলে টইটম্বুর হয়ে আছে। টিউব ওয়েল বসিয়ে ইলেক্‌ট্রিক্ পাম্প দিয়ে জল বের করে বাগানে ঢালা হয়েছে। তা ছাড়া সার, গাছের চারা ও বীজ— এ সব তো পয়সা খরচ করলে চাইবাসার বাজারেই পাওয়া যায়।

শমিত গম্ভীর মুখে বললে, সব বুঝলাম। কিন্তু বাগানের পরিকল্পনা, দেশী-বিলাতী নানা রকম ফুল-ফলের গাছ ঠিকমত গজিয়ে তোলা, এ সব তো আর শুধু পয়সা খরচ করলেই হয় না।

—না, তা হয় না। এ সব বাবা নিজেই করেছেন।

রংতাবাদের বাগানের হেড মালি অবশ্য সাহায্য করেছে তাঁকে।

—কাকাবাবুর হঠাৎ বাগান করার ঝোঁক হল কেন? বছর খানেক আগেও তো ওঁর ম্যাঙ্গানিজ ও কেওলিনের মাইন্ ছাড়া অন্য কোনও দিকে মন দেবার মত সময় ছিল না। খনি দুটোর কাজকর্ম বুঝি কাকীমাই দেখাশোনা করেন এখন?

—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি জানলে কী করে?

—খনি সম্বন্ধে কাকীমার কথাবার্তা শুনেই আন্দাজ করেছি। আজ সকালে আমি এখানে এসে পৌঁছানো মাত্র তিনি খনির নানা রকম সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন আমার সঙ্গে। তাছাড়া আমাকে দুটো খনিরই দায়িত্ব নেওয়ার জন্য বলেছেন।

শমিতের কথা শুনে স্তম্ভিত হল প্রমিতা। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে শমিতে মুখের পানে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে থেকে সে বললে, আমাদের খনি দুটোর দায়িত্ব মা তোমাকে নিতে বলেছেন! কিন্তু বাবা তো তা চান না। কাল রাত্রেই তিনি মাকে বলছিলেন যে এম-এস্ সি পরীক্ষায় তোমার ফল এত ভাল হয়েছে যে সাধারণ কোন কাজে তোমাকে বেঁধে রাখা উচিত নয়। তিনি চান য়ুনিভার্সিটির রিসার্চ স্কলারশিপ নিয়ে তুমি রিসার্চ করো।

গম্ভীর মুখে শমিত বললে, কিন্তু কাকীমা তো স্পষ্ট বললেন আমাকে খনি দুটোতে গিয়ে কাজ করতে।

নিঃশব্দে কয়েক সেকেন্ড শমিতের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রমিতা বললে, তার তো কোন দরকার ছিল না শমিতদা। বাবা তো সেদিন তোমাকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তোমার বাবা তাঁর ব্যবসার অংশীদার ছিলেন—তোমার বাবা-মা মারা যাওয়ার পর তোমাকে মানুষ করার দায়িত্ব নিয়ে তিনি শুধু তাঁর কর্তব্য করেছেন। তোমার কাছ থেকে কোনও প্রত্যাশা নেই তাঁর মনে—তিনিও চান না যে তুমি নিজেকে তাঁর কাছে কোনও রকম ঋণে আবদ্ধ আছ বলে বোধ কর। কাজেই অনায়াসে তুমি—

প্রমিতার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শমিত বললে, কাকাবাবুর মনে কোনও প্রত্যাশা না থাকলেও আমার কর্তব্য থেকে এক চুলও নড়তে পারব না আমি। কাকাবাবু ও কাকীমার কাছে যে ঋণে আমি ঋণী তা শোধ হবার নয়—আমি শুধু আমার কর্তব্যটুকু করে নিজের বিবেককে পরিষ্কার রাখব। কাকীমা আমাকে কিছু বলার আগেই মনে মনে আমি ঠিক করে রেখেছিলাম, কাকাবাবুর খনি দুটিতেই আমি কাজ করব। কাকাবাবুর খনিতে কাজ করব বলেই তো জিয়োলজি নিয়ে পড়াশুনা করেছিলাম আমি।

এমন সময় বাড়ির বারান্দা থেকে নেমে এলেন প্রমিতার মা। শমিতকে তিনি বললেন, আজই তুমি এসেছ, কাজেই এক্ষুণি কোথাও তোমাকে যেতে বলতে পারি নে আমি। কিন্তু বাবা, কাল ভোর হতেই তোমাকে আমাদের ম্যাঙ্গানিজ মাইনে যেতে হবে। সেখানে নাকি ম্যাঙ্গানিজের শিরাটি সরু হয়ে গিয়ে অদৃশ্য হবার উপক্রম হয়েছে। আরও নীচে গিয়ে ঐ শিরাটিকে পুনরুদ্ধার করা যায় কি না দেখতে হবে।

শমিত বললে, কাল ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার কি কাকীমা? আজই যাচ্ছি আমি।

বলে সে হনহন করে বাড়ির বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল।

॥ দুই ॥

চাইবাসার মাইল পঞ্চাশেক দূরে সৌরীনবাবুর ম্যাঙ্গানিজের খনি। কেওনঝরের রাস্তা ধরে মাইল কুড়ি এগিয়ে গেলে হাট-গামারিয়া। হাট-গামারিয়াতে কেওনঝরের সড়ক থেকে একটি শাখাপথ বেরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গিয়েছে। সেই পথ দিয়ে কিছুটা গেলে বড় বিল। বড় বিলের অদূরে পাশাপাশি অনেকগুলো ম্যাঙ্গানিজের খনি আছে। তাদের মধ্যে একটির মালিক হলেন সৌরীনবাবু।

খনিটির চার পাশে ঘন বন ও উত্তুঙ্গ পাহাড়। বড়ো রাস্তা থেকে কোন হদিসই মেলে না তার। কাঁকরে ছাওয়া একটা পথ বড়ো রাস্তা থেকে বেরিয়ে বনের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে খনিতে গিয়ে পৌঁছেছে। এই পথটিকে খুঁজে না পেলে খনির নাগাল পাওয়া যাবে না।

এই বন শুরু হয়েছে হাট-গামারিয়ার কাছে। শাল, পিয়াশাল, কেঁদ, বহেড়া, শিমুল, পলাশ ও আমলকী গাছের ঘন আবরণ মাটি ও পাথরকে চাপা দিয়ে রেখেছে। বন শুরু হতেই মাটিও হয়ে উঠেছে বন্ধুর। ঢেউ-খেলানো ডাঙ্গার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে গ্র্যানিট পাথর। কিছুদূরে শুরু হয়েছে পাহাড়। ভূগর্ভের কোন এক অদৃশ্য আলোড়ন মাটি ও পাথরের স্তরকে চাপ দিয়ে আকাশের দিকে তুলে ধরেছে। রাস্তাটি পাহাড়কে যথাসম্ভব পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলেও জায়গায় জায়গায় পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠেছে। এক জায়গায় একেবারে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে চড়াও

হয়েছে। এখানে গাড়ি থামিয়ে সূর্যাস্ত দেখল শমিত। ঢেউখেলানো সবুজ বন সুদূর দিগন্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে প্রবল প্রাণের উচ্ছ্বাসে। সবুজ রঙের একটানা এতখানি ব্যাপ্তি আগে কখনো দেখে নি শমিত। সূর্যাস্তের রক্তরঙের সঙ্গে মিশে তা যেন একটা অপার্থিব দীপ্তিকে প্রকাশ করছে। পশ্চিম দিগন্তে বনের নিবিড় সবুজের মধ্যে মুখ গুঁজে সূর্য তার আকাশ ভরা মহিমাকে যেন লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে।

সূর্যাস্তের পর খুব তাড়াতাড়ি অন্ধকার ঘনিয়ে এসে আকাশ ও বনকে একাকার করে দিল। হেড্-লাইটের জোরালো আলো দিয়ে অন্ধকারকে বিশ্লিষ্ট করে এগিয়ে চলে জীপ—ড্রাইভার বার বার এ পথে এসেছে বলে পথ হারায় না, খনির বাংলোতে নিরাপদেই পৌঁছে দেয় সে শমিতকে।

পরদিন সকালে খনি দেখতে গেল শমিত। খনি মানে বড়ো আকারের খাদ—ধাপে ধাপে ষাট ফুট নীচে নেমে গিয়েছে। ওপরে লাল কাঁকরের স্তর—প্রায় পাঁচ ফুট পুরু। তার নিচে ম্যাঙ্গানিজযুক্ত পাথরের স্তর। বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে তাকে ফাটিয়ে চালান দেওয়া হয়। ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ তাতে এত বেশি যে খুব চড়া দরে বিকোয় তা আমেরিকার বাজারে।

খনির টাইম-কীপার সুশান্ত শীল শমিতকে বললে, এতদিন দিব্যি কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম—ভাল ভাল পাথর ফাটিয়ে দিনে একশো টন করে মাল চালান দিয়েছি। কিন্তু এখন মাল পাওয়াই যাচ্ছে না। নীচের দিকে ম্যাঙ্গানিজের বদলে শুধু লোহার পাথর পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তাতে লোহার পরিমাণ এত নগণ্য যে কোন লোহার কারখানাই তাকে কাজে লাগাতে পারবে না।

শমিত বললে, নীচের দিকে যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন খাদটাকে বাড়ালেই তো হয়।

মাথা চুলকে সুশান্ত বললে, কোন্ দিকে যে বাড়াব তা তো বুঝতেই পারছি নে। কর্তাবাবু নানা জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি ও ড্রিলিং করে ঠিক করেছিলেন কোন্ দিকে খাদটাকে বাড়াবেন। কিন্তু তিনি তো কোন নকশা তৈরি করেন নি, খোঁড়াখুঁড়ি ও ড্রিলিংয়ের ফলাফলও লিখে রাখেন নি কোথাও।

শমিত অবাক হয়ে বললে, আশ্চর্য ব্যাপার তো ! কোন রেকর্ড রাখেন নি কাকাবাবু, কোন নকশাও তৈরি করেন নি।

—না। খনি সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার তিনি গোপন রাখতেন। তিনি ও মুকু ছাড়া কেউই কিছু জানে না এ বিষয়ে।

—মুকু কে ?

—মুকু এই মাইনের মেট। রীতিমত জনপ্রিয় স্নেহ কর্তাবাবুর। নাই দিয়ে তাকে এমনি মাথায় তুলেছেন তিনি যে সে মানছেই না আমাদের কথা। তার জন্য মাইনের ডিসিপ্লিন বজায় রাখা শক্ত হয়ে উঠেছে।

সঙ্গে সঙ্গে কঠোর হয়ে উঠল শমিতের মুখের ভাব। গম্ভীর গলায় সে বললে, কোথায় মুকু—এক্ষুণি ডেকে আনুন আমার কাছে।

মুখ কাঁচুমাচু করে সুশান্ত বললে, মুকু যে কোথায় আছে তা-তো বলতে পারব না। মাসখানেক আগে দেশে যাবার নাম করে সে যে কোথায় গিয়েছে কেউ জানে না। ওর খোঁজে নানা জায়গায় লোক পাঠিয়েছিলাম আমি, কিন্তু কোথাও ওর সন্ধান মেলে নি।

খোঁজ করার আর দরকার নেই কোন।—উত্তেজিত-কণ্ঠে বললে শমিত।—ফিরে আসামাত্র ওকে কাজ থেকে বরখাস্ত করবেন, এই আমার হুকুম। চান তো লিখে দিচ্ছি ওর বরখাস্তের নোটিস।

সুশান্ত মৃদু হেসে বললে, আপনার বরখাস্তের নোটিস কী আর খাটানো যাবে ওর ওপর। কর্তাবাবুর মত গিন্নীমাও স্নেহ করেন ওকে, প্রশ্রয়ও কম দেন না।

—ঠিক আছে, মুকুকে নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই কোন। ওর জন্য অপেক্ষা না করে নতুন করে পরীক্ষা করব আমি খাদটাকে।

বলে শমিত খাদের নীচে নেমে গেল। ম্যাঙ্গানিজ-যুক্ত খনিজ সাইলোমিলেন কালো ও ভারি পাথরের আকারে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করছে লালচে ল্যাটে-রাইটের সঙ্গে। প্রায় পঞ্চাশ ফুট নীচে সাইলোমিলেন অদৃশ্য, ল্যাটেরাইটের লালচে বাদামী রঙের মধ্যে কালো রঙের ছোপ পড়েনি কোথাও। ভালো করে পরীক্ষা করে শমিত বুঝল যে আরও নীচে গিয়ে লাভ নেই—খাদটাকে গভীরতর করে সাইলোমিলেনের নতুন কোন স্তরের নাগাল পাওয়া যাবে না। খনিটাকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় হল খাদটাকে প্রসারিত করা। কিন্তু সাইলোমিলেন ল্যাটেরাইটের সঙ্গে এমনি অন্তরঙ্গভাবে মিশে আছে যে খাদটিকে কোন্ দিকে প্রসারিত করলে সাইলোমিলেন পাওয়া যাবে তা বোঝা যাচ্ছে না। অতএব খাদের চারপাশে কয়েকটা গহ্বর খনন করে সাইলোমিলেনের স্তরটি কোন্ দিকে বিস্তৃত হয়েছে তা নির্ণয় করা দরকার।

শমিতের ইচ্ছেমত খনির ফোরম্যান রামাধার সিং জনা দুয়েক ওঁরাও মজুর লাগিয়ে দিল গর্ত খোঁড়ার কাজে।

সপ্তাহখানেকের মধ্যে খাদের চারপাশে চারটা গহ্বর খোঁড়া হল কিন্তু একটিতেও সাইলোমিলেনের স্তরের সন্ধান মিলল না। শমিত শঙ্কিত বোধ করল। খাদের নীচের দিকে বা চারপাশে কোথাও বুঝি প্রসারিত হয়নি সাইলোমিলেনের স্তর—খাদের সীমার মধ্যেই সীমাবন্ধ থেকে খনিটিকে বুঝি অন্তিম দশায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

সে খনির দায়িত্ব নেওয়ামাত্রই তাকে বন্ধ করে দিতে হবে ভেবে মন খারাপ হয়ে যায় শমিতের। বাংলোতে বসে প্রতিমাকে চিঠি লিখল সে। বিনা ভূমিকায় সোজা-সুজি খনির বিষয়েই লিখল সেঃ

ম্যাঙ্গানিজের খনিটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারছি না। ম্যাঙ্গানিজের স্তরের নাগাল মিলছে না। একটা খনির পরমায়ু যে এত ক্ষণিক—তা এখানে আসার আগে ভাবি নি কখনো। খুব সম্ভব এখানকার পাট গুটিয়ে ফেলে শিগগিরই কেওবিনের খনির দিকে যেতে হবে আমাকে।

প্রমিতাকে চিঠি লেখা শেষ করার আগেই শমিত প্রমিতার চিঠি পেল। চিঠিটা অন্যান্য ডাকের সঙ্গে মাইনের কন্ট্রাক্টারের ট্রাকে করে এল। প্রমিতা লিখেছেঃ

এই চিঠি পাওয়ামাত্র আমাদের হাট্-গামারিয়ার কেওলিন মাইনে চলে এস। মা ও আমি ওখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। একটুও দেরি কোরো না কিন্তু—ব্যাপারটা খুবেই জরুরী।

প্রমিতার চিঠি পড়েই শমিত ড্রাইভারকে ডেকে জীপ তৈরি করতে বলল এবং নিজেও তৈরী হয়ে নিল।

শমিত চলে যাচ্ছে খবর পেয়েই ছুটে এল সুশান্ত।

হঠাৎ চলে যাচ্ছেন কেন স্যার?—উৎসুকস্বরে প্রশ্ন করে সুশান্ত।

শমিত জবাব দিল, হাট্-গামারিয়ার কেওলিন মাইনে যাচ্ছি—কাকীমা ডেকে পাঠিয়েছেন কী একটা জরুরী দরকার পড়েছে।

—আবার ফিরবেন তো?

—ফিরে আর করব কী? আপনাদের খনির আয়ু তো শেষ হয়ে গিয়েছে।

তাহলে আমাদের কী হবে?—ব্যাকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করে সুশান্ত।

শমিত বললে, আপনাদের একটা ব্যবস্থা কাকীমা করবেন নিশ্চয়ই। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে জানাব আপনাকে।

॥ তিন ॥

হাট্-গামারিয়া থেকে একটু দূরে সৌরীনবাবুর কেওলিনের খনি। এটাও একটা খাদ। মাটির পাতলা আবরণের নীচেই সাদা কেওলিন বা চীনেমাটির স্তর। গহ্বর খুব গভীর নয়। মাটির নীচে প্রায় ত্রিশ ফুট খুঁড়তেই জল বেরিয়ে পড়েছে। খাদের নীচের দিকটা পুরোপুরি জলে ভর্তি। নীচের দিকে খননের কাজ চালাতে হলে এই জল পাম্প করে ফেলা দরকার। কিন্তু যে পাম্পটি খনিতে আছে তার জল শোষণের ক্ষমতা খুব বেশি নয়। খাদের ভেতরকার জলের তোড়কে শুষে খাদটাকে শুকনো রাখার ক্ষমতা তার নেই। কাজেই নীচের দিকে নজর না দিয়ে খাদটাকে প্রসারিত করা হচ্ছে। মাটির নীচে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে কেও-লিনের স্তর—ইচ্ছেমত খনিটাকে বাড়াতে কোন অসুবিধে নেই।

খনিটাকে দেখে স্বস্তিবোধ করে শমিত। ম্যাঙ্গা-নিজের খনির মত এই খনির আয়ু ক্ষণিক নয়। অনেক-খানি জমি ইজারা নেওয়া আছে, কাজেই বহু বছর ধরে এখানে কাজ চালানো যাবে। কিন্তু ম্যাঙ্গানিজের খনিতে যারা কাজ করছে, তাদের সকলকে এখানে ভর্তি করা সম্ভব নয়। তাদের জন্য অন্য কোন উপায় দেখতে হবে।

কেওলিনের খনির ফোরম্যান দৌলৎরাম বললে, মাঈজী আপনাকে বাংলোতে আসতে বললেন তাড়া-তাড়ি—খাদান না হয় পরে দেখবেন।

শমিত বললে, কী ব্যাপার—কাকীমা হঠাৎ এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন কেন?

—তা তো জানি সে স্যার। দিদিমণিকে নিয়ে তিনি বাংলোর ড্রইং রুমে বসে আছেন। তাঁদের সঙ্গে মুকুও রয়েছে।

মুকুও রয়েছে!—মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল শমিতের।

হ্যাঁ স্যার—দৌলৎরাম বললে,—সে-ই কী যেন একটা জিনিস নিয়ে এসেছে।

ম্যাঙ্গানিজের খনির বাংলোর তুলনায় কেওলিনের খনির বাংলোটি অনেক বড়ো। তার সামনে চমৎকার একটি ফুলের বাগান আছে। শমিত বাংলোর ড্রইং রুমে ঢুকতেই সোচ্ছ্বাসে কলরব করে উঠল প্রমিতা, এই যে শমিতদা, অনেক দিন বাঁচবে তুমি। এইমাত্র তোমার কথাই হচ্ছিল।

শমিত প্রমিতার মা অমিতার দিকে তাকিয়ে বললে, কী ব্যাপার কাকীমা?

অমিতা উত্তেজিত স্বরে জবাব দিলেন, মুকু খুব দামী একটি জিনিস খুঁজে পেয়েছে। জিনিসটা যদি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, বরাত খুলে যাবে আমাদের।

অমিতার সামনে কার্পেটের ওপরে উবু হয়ে বসেছিল মুকু। খুব বলিষ্ঠ গড়নের আদিবাসী যুবক। শমিত তার দিকে তাকাতেই মিটমিটিয়ে হাসে সে।

মুকুর হাসি দেখে গা জ্বলে যায় শমিতের। মুখ গম্ভীর করে সে বললে, ছুটি না নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে মুকু? খনির নিয়ম-কানুন কিছুই মানছ না তুমি।

আড় চোখে অমিতার দিকে তাকিয়ে মুকু বললে, ছুটি তো নিই নি দাদাবাবু—মাকে বলে আমি কেওনঝরের বনেজঙ্গলে ঘোরাঘুরি করছিলাম। আমাদের ম্যাঙ্গানিজের মাইন্ শিগ্গিরই বন্ধ করে দিতে হবে কিনা, তাই নতুন মিনারেলের খোঁজ করছিলাম।

চোখ বড়ো বড়ো করে মুকুর মুখের পানে তাকিয়ে শমিত বললে, তুমি জানলে কী করে যে ম্যাঙ্গানিজের মাইন্ বন্ধ করে দিতে হবে?

—কর্তাবাবুর কাছ থেকেই জেনেছি। মাইনের চারপাশে যে প্রস্পেক্টিং করিয়েছিলেন তিনি, তার তত্ত্বাবধান তো আমিই করতাম। দাদাবাবু, তোমার মত পড়াশুনা না করলেও আমার জিয়োলজির জ্ঞান তোমার চেয়ে কম নয়। কর্তাবাবু যে সব পিটিং ও ড্রিলিং করিয়েছিলেন তা থেকে আমি স্পষ্ট বুঝেছিলাম যে খনির এলাকার বাইরে ম্যাঙ্গানিজের স্তরটি উধাও হয়ে গিয়েছে।

—কিন্তু সুশান্তবাবু যে বললেন কাকাবাবু খনিটাকে বাড়াবার কথা ভাবছিলেন। প্রস্পেক্টিং করে তিনি নাকি ঠিকও করে ফেলেছিলেন কোন্ দিকে খনিটাকে বাড়াবেন—এ সম্বন্ধে তোমাকে নাকি সব কিছু ভালো করে বুঝিয়েও দিয়েছিলেন।

মুকু মৃদু হেসে বললে, তা দিয়েছিলেন। খনির পশ্চিম দিকে প্রায় ষাট সত্তর ফুট নীচে একটা ম্যাঙ্গানিজের স্তরের সন্ধান মিলেছিল। কর্তাবাবু সেখানে একটা নতুন খাদ করবেন ভেবেছিলেন। খনির ব্যাপারে তাঁর গরজ থাকলে এতদিনে হয়তো এই নতুন খাদ খোঁড়া শুরু হয়ে যেত। কিন্তু হঠাৎ তাঁর কী হয়েছে কে জানে, মাইন্ নিয়ে আর মাথাই ঘামাচ্ছেন না তিনি। কর্তাবাবু যখন মাইন্গুলো সম্বন্ধে ভাবছেন না, তখন আমাদের বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী স্থির করতে হবে কী করা উচিত। ম্যাঙ্গানিজের খনির পশ্চিম দিকে নতুন করে খাদ শুরু করাটা উচিত হবে কিনা তা বিবেচনা করে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে তাতে শুধু লোকসানই হবে আমাদের। ষাট সত্তর ফুট পর্যন্ত মাটি ও পাথর খুঁড়তেই লাখ লাখ টাকা খরচ হবে। তারপর ম্যাঙ্গানিজের যে স্তরটি পাওয়া যাবে তার আয়তন যে কতখানি হবে তার কিছুই জানি নে আমরা। এহেন অবস্থায় ম্যাঙ্গানিজের মায়া ছেড়ে দিয়ে অন্য জিনিসের খোঁজ নেওয়াই উচিত।

প্রমিতা ধৈর্য হারিয়ে বলে উঠল, সেই অন্য জিনিস তুমি পেয়েই গিয়েছ মুকুভাই—দেখিয়ে দাও না তোমার দাদাবাবুকে।

এই যে দেখাচ্ছি।—বলে মুকু একটা ছোট থলি খুলে কার্পেটের ওপরে পাশাপাশি কয়েকটি কালো দানাওয়ালা ভারী পাথর সাজিয়ে রাখল।

এক টুকরো পাথর চোখের সামনে তুলে ধরতেই চমকে উঠল শমিত। ক্রোমাইট্—ক্রোমিয়াম নামক ধাতুর আকর। রীতিমত দামী ও প্রয়োজনীয় জিনিস। ক্রোমাইটের একটি খনির মালিক হওয়া মানেই কোটিপতি হওয়া।

...পাশাপাশি কয়েকটি কালো দানাওয়ালা ভারী পাথর...

কোথায় পেলে এ জিনিস?—রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করে শমিত।

মুখ টিপে হেসে মুকু জবাব দিল, যেখানেই পাই না কেন, নিয়ে যেতে পারি তোমাকে সেখানে—অবশ্য যেতে যদি চাও তুমি।

—নিশ্চয়ই যেতে চাই। চলো না, এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে শমিতের পিঠ চাপড়ে মুকু বললে, শাবাশ, এই তো চাই। কিন্তু এক্ষুণি বেরুতে চাইলেই কী বেরুনো যায় দাদাবাবু! আয়োজন করতে হবে—তাঁবু, খাবার-দাবার, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদির যোগাড়যন্ত্র করতে হবে।

প্রমিতা বললে, রীতিমত এক্স্‌পিডিশনের ব্যবস্থা করতে হবে শমিতদা। খুব দুর্গম জায়গা কিনা। আচ্ছা মুকুভাই, তুমি বলছ জায়গাটা তোমার শ্বশুরবাড়ির কাছে—তাহলে তা এত দুর্গম হয় কী করে!

মুকু মুচকি হেসে বললে, জায়গাটা আমার শ্বশুর-বাড়ির কাছে বলে সুগম হবে তার কী কথা আছে দিদিমণি!

অমিতা বললেন, এক কথায় যেতে রাজী হচ্ছ বাবা, কিন্তু ভেবে দেখ জায়গাটা কী রকম দুর্গম। মুকু বলছিল, খাড়া উৎরাই বেয়ে একটানা দু হাজার ফুট নেমে প্রায় বিশ মাইল হাঁটতে হবে খুব গভীর বনের মধ্য দিয়ে। সিংহ ছাড়া সবরকম বুনো জন্তুই আছে ওখানে।

মুখ নীচু করে মৃদু হেসে শমিত বললে, তাতে কিছু এসে যায় না কাকীমা—আপনার আশীর্বাদে আমি ঠিক চলে যাব ওখানে—উৎরাই ও বন পেরিয়ে অনায়াসে পৌঁছে যাব আমাদের গন্তব্য স্থলে।

আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে শমিতদা।—ফস করে বলে উঠল প্রমিতা।

তুই যাবি!—চমকে উঠে বললেন অমিতা।—তোর কী মাথা খারাপ হয়েছে খুকু!

গম্ভীর মুখে প্রমিতা বললে, মাথা খারাপ হবে কেন! শমিতদা যদি যায় তো আমিও যাব। আমাদের স্বার্থে ওকে তো বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না।

অমিতা ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, আমি তো ওকে যেতে দিতে চাই নে খুকু—ও তো নিজে থেকেই—

অমিতার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শমিত বললে, হ্যাঁ কাকীমা, আমি নিজে থেকেই যেতে চাইছি। এ রকম এ্যাড্‌ভেঞ্চারের সুযোগ তো জীবনে সচরাচর আসে না।

মুকু বললে, শুধু তো এ্যাড্‌ভেঞ্চার নয় দাদাবাবু, ম্যাঙগানিজের খনির বদলে নতুন খনি গড়ে তোলার জরুরী প্রয়োজনও রয়েছে। ম্যাঙগানিজের খনি বন্ধ হয়ে গেলে ওখানকার লোকগুলো যে সব পথে বসবে ভাই।

শমিত বললে, মুকু ঠিকই বলেছে কাকীমা—যত শিগ্‌গির সম্ভব নতুন একটা খনি আমাদের গড়ে তুলতেই হবে।

প্রমিতা ব্যাকুল স্বরে বললে, আমাকেও তোমাদের সঙ্গে নাও শমিতদা।

মুকু বললে, সে হয় না দিদিভাই। তুমি বুঝতে পারছ না কী রকম দুর্গম সে জায়গা!

এর পর আর কোন কথা বললে না প্রমিতা।

॥ চার ॥

অমিতা বললেন, রসদ একটু বেশি করে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই ভাল। বলা তো যায় না, কোনও কারণে হয়তো বেশী সময় লেগে যেতে পারে তোমাদের। তোমার কাকাবাবু এ ধরনের অভিযানে যখন বেরোতেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত রসদ সঙ্গে নিতেন।

মুকু বললে, ঠিক বলেছেন মা। এ ধরনের এক্স্‌-পিডিশনে রসদ নিতে কখনোই কার্পণ্য করা উচিত নয়। ঘাটগাঁও থেকে আমার শ্বশুরবাড়ির গ্রাম রেব্‌না-পলাশপালে পৌঁছতে দিন দুই লাগলেও সেখান থেকে দইতারি পাহাড় ডিঙিয়ে ভীমটাঙ্গোরে গিয়ে পৌঁছতে কত সময় লাগবে কে জানে। দূরত্বের হিসেবে সাত দিন লাগা উচিত, কিন্তু দুর্গমতার দরুন সাতষট্টি দিন লেগে যাওয়াও আশ্চর্য নয়। কাজেই যথেষ্ট পরিমাণে রসদ সঙ্গে নেওয়া দরকার।

শমিত মুকুর মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, ক্রোমাইটের নমুনাগুলো তুমি নিজে সংগ্রহ করে আনোনি মুকুভাই?

মুকু ঝাঁজালো স্বরে বললে, আমি কী কখনো বলেছি যে ক্রোমাইটের নমুনাগুলো আমি নিজে সংগ্রহ করে এনেছি!

ভুরু কুঁচকে মুকুর দিকে তাকিয়ে শমিত বললে, ওগুলো তাহলে আনল কে?

—এনেছে রেব্‌না-পলাশপালের একজন মুণ্ডা কাঠুরে—নাম তার তুরাম। মাঝে মাঝে সে দলবলে ভীমটাঙ্গোরে যায় কাঠ কাটতে। আমরা ওকেও নিয়ে যাব আমাদের সঙ্গে।

অমিতা বললেন, শুধু ওকে কেন, আরও লোকজন

নিয়ে যেও তোমাদের সঙ্গে। শমিত তোমার কাকাবাবুর বন্দুকটা নিয়ে যাচ্ছ তো তোমার সঙ্গে?

শমিত জবাব দিল, হ্যাঁ কাকীমা।

মুকু বললে, আমরাও আমাদের তীর-ধনুক নিয়ে যাব মা।

সপ্তাহখানেকের মধ্যে অভিযানের আয়োজন সম্পূর্ণ হল। তারপর যাত্রার পালা। ট্রেলারে জিনিসপত্র বোঝাই করে জীপে করে রওনা হল শমিত ও মুকু। প্রমিতা ও অমিতা স্টেশন ওয়াগনে করে তাদের অনুসরণ করলেন। তাঁরা তাদের ঘাটগাঁও পর্যন্ত এগিয়ে দেবেন।

ঘাটগাঁও পেঁছিতে সন্ধ্যা হল। সেখানকার সরকারী বিশ্রামগৃহে রাত কাটাল সকলে। পরদিন সকালে পায়ে হেঁটে রওনা হল শমিত ও মুকু রেবুনা-পলাশপালের দিকে। ঘন বনের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে এগিয়ে গিয়েছে সরু পথের রেখা। এই পথে হেঁটে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। জিনিসপত্র সব মাথায় করে বয়ে নিয়ে চলে দশজন মজুর। মুকু লোক মারফত খবর দিয়ে রেবুনা-পলাশপাল থেকে আনিয়ে রেখেছিল তাদের।

শমিতকে বিদায় দিতে অমিতার চোখ সজল হয়ে উঠেছিল। ধরাগলায় তিনি বললেন, খুব সাবধানে থেকো বাবা, সাবধানে পথ চলো।

প্রমিতা বললে, চিঠি লিখবে তো শমিতদা?

শমিত হেসে বললে, চিঠি যে লিখব ডাকে দেব কোথায়!

আমার শ্বশুরবাড়ির গাঁ রেবুনা-পলাশপালেই আছে ডাকঘর।—সগর্বে বললে মুকু।—মেল্-রানার কায়রা সপ্তাহে একদিন করে সেখান থেকে ডাক নিয়ে ঘাটগাঁও হয়ে আনন্দপুরের বড় ডাকঘরে যায়।

গলার স্বর নামিয়ে প্রমিতা বললে, সপ্তাহে একখানা করে চিঠি লিখবে কিন্তু আমাকে শমিতদা।

শালবনের মধ্য দিয়ে সোজা পশ্চিমদিকে এগিয়ে চলে শমিত ও মুকু। শালগাছগুলি এমনি ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে তাদের ফাঁকে ফাঁকে অন্য কোন গাছ মাথা তুলতে পারে নি। কয়েক রকম বুনো লতা শাল-গাছগুলো বেষ্টন করে উঠেছে। খুব সাবধানে পা ফেলে পথ চলতে থাকে শমিত—পথ ও তার পা-দুটো ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব যেন সে টের পাচ্ছে না।

চড়াই শেষ হতে সন্ধ্যা হল। পাহাড়ের মাথায় শালবন ও বুনো ঘাসে ছাওয়া ঢেউখেলানো উপত্যকার মধ্য দিয়ে একটা পাহাড়ী নদী বয়ে যাচ্ছে। মুকুকে প্রশ্ন করতে সে বললে যে নদীর নাম কুশাই।

কুশাই নদীর ধারে নরম মখমলের মত ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে শমিত বললে, আজ আর নয়—রাতটা এখানেই কাটানো যাক মুকুভাই।

মুকুরও তাই ইচ্ছে। তার নির্দেশমত বাহকরা মাল-পত্র সব নামিয়ে রেখে চারপাশে শুকনো কাঠ জড়ো করতে থাকে।

শমিত প্রশ্ন করলে, এত কাঠ জড়ো করছে কেন ওরা মুকুভাই? রান্না করতে এত কাঠ লাগবে নাকি?

মুকু জবাব দিল, রান্না করতে নয়, জন্তুজানোয়ার-দের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে লাগবে। আগুনের গণ্ডীর মধ্যে রাত কাটাবো আমরা।

চারপাশে বৃত্তের আকারে আগুন জ্বালিয়ে রান্নার আয়োজন করে মুকু। খাওয়া-দাওয়া সেরে পথচলার শ্রান্তিতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হল শমিত।

পরদিন সকালে উঠে আবার যাত্রা শুরু করল শমিত ও মুকু। সারাদিন একটানা পথ চলে সেদিন সন্ধ্যাবেলায় রেবুনা-পলাশপাল থেকে মাইল দশেক দূরে একটি মুণ্ডাদের গ্রামে গিয়ে পেঁছিল তারা। গ্রামের মোড়লকে চিনত মুকু। তার অতিথি হয়ে তারা রাত কাটাল সেখানে। রেবুনা-পলাশপালে গিয়ে পেঁছিল তারা পরদিন বেলা দুপুরে।

ঘন বনের মধ্যে অবস্থিত হলেও রেবুনা-পলাশপাল গ্রামটা আয়তনে বেশ বড়। গ্রামের অধিবাসীরা সকলেই মুণ্ডা ও কোল। আদিবাসীদের গ্রামের বিশেষত্ব হল এই যে ঘরবাড়িগুলো একেবারে ঘেঁষাঘেঁষি করে তৈরি করা হয় নি। গাঁয়ের লোকেরা পাশাপাশি থাকলেও অপরিচ্ছন্নভাবে কাছাকাছি হয় নি।

গ্রামের পাশে একটি মাঠের মধ্যে তাঁবু খাটাবার উদ্যোগ করে মুকু। শমিত তাকে বললে, তাঁবু খাটাবার দরকার কী মুকুভাই—চলো কাল সকালেই দইতারির ওপরে গিয়ে উঠি।

মুকু বললে, সে কী করে হবে দাদাবাবু! তুরাম তার সঙ্গীদের নিয়ে গন্ধমাদন পাহাড়ে গিয়েছে তসরের গুটি কুড়োতে। তারা ফিরে না এলে তো আর যেতে পারি নে আমরা—কারণ ওরাই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

পাশাপাশি কাবুলপাল ও শোলদারিগুলো খাটালেও মুকু নিজে গিয়ে উঠল তার শ্বশুরবাড়িতে। মাল-বাহকদের মধ্যে দুজনকে অবশ্য শমিতের সঙ্গে থাকতে বললে সে।

কাবুলপালের সামনের বারান্দায় ক্যাম্প চেয়ার পেতে বসে শমিত তার চারদিকে দৃষ্টিপাত করে স্থানীয় ভূগোলের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করে। তার হাতে এ অঞ্চলের মানচিত্র এবং কম্পাস। কম্পাস দিয়ে দিক নির্ণয় করে মানচিত্রটাকে সামনের ক্যাম্প টেবিলের ওপরে বসাল শমিত। তারপর মানচিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে দইতারি পাহাড়কে নিল চিনে।

দক্ষিণ দিকে দইতারি পাহাড় পূব থেকে পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছে। রেব্‌না-পলাশপাল থেকে পাহাড়-টির দূরত্ব তেমন কিছু নয়, কিন্তু পশ্চিমদিকে এতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে যে সুদূর দিগন্তের নীলরঙের মধ্যে উধাও হয়েছে তা। পূব দিকে আরও দক্ষিণের একটি পাহাড়ের সঙ্গে মিলেছে দইতারি। রেব্‌না-পলাশপাল থেকে এই পাহাড়টি দৃশ্যমান নয়।

তুরাম তার সঙ্গীদের নিয়ে ফিরল দিন দুই বাদে। তুরামকে নিয়ে শমিতের কাছে এসে মুকু বললে, এবারে আমরা রওনা হতে পারব দাদাবাবু। তুরাম আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

শমিত হেসে ফেলে বললে, পথই নেই, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে কী!

মুখের ভাব কঠোর করে তুরাম বললে, পথ নেই কে বললে আপনাকে?

—কেউ বলে নি, এই ম্যাপ দেখে আমি নিজেই বলছি। ম্যাপের মধ্যে পথের কোন চিহ্নই নেই।

—নকশার মধ্যে চিহ্ন না থাক, পথ আছে। হরিণ ও বুনো শুয়োরদের পায়ে পায়ে তা তৈরি হয়েছে।

॥ পাঁচ ॥

তুরাম ও তার তিনজন সঙ্গী আগেভাগে চলল, তাদের অনুসরণ করে এগিয়ে যায় শমিত, মুকু ও মালবাহকের দল। সংকীর্ণ পথে পাশাপাশি দুজনও পারে না হাঁটতে। কাজেই লাইন বেঁধে চলতে হয় তাদের। রেব্‌না-পলাশপালের দক্ষিণে অল্প অল্প করে ক্রমশঃ উঁচু হয়ে উঠেছে দইতারি পাহাড়। হঠাৎ উত্তুঙ্গ হয়ে ওঠে নি, কাজেই চড়তে খুব অসুবিধে হয় না। চড়াইয়ের এমন নরম মেজাজ অপ্রত্যাশিত ছিল শমিতের কাছে। কারণ মানচিত্রের মধ্যে দইতারির শিখরের উচ্চতা দেওয়া আছে তিন হাজার ফুট। এতখানি উঁচু অথচ হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে নি। ধীরে ধীরে অনেকখানি দূরত্ব ধরে আত্মপ্রকাশ করেছে—রেব্‌না-পলাশপাল থেকেই তার সূত্রপাত। রেব্‌না-পলাশপালের উচ্চতা দেড় হাজার ফুট। এখান থেকে দইতারির শিখর পর্যন্ত দূরত্ব পাঁচ মাইল। রেব্‌না-পলাশপাল থেকে দইতারির শিখরের উচ্চতার তফাৎ হচ্ছে দেড় হাজার ফুট। দেড় হাজার ফুট উচ্চতা পাঁচ মাইল জুড়ে ছড়িয়ে থেকে চড়াইয়ের চড়া মেজাজকে কোথাও প্রকট করে তোলে নি।

ধীরে সুস্থে দইতারির শিখর পর্যন্ত এল শমিত। কেমন অনায়াসে তিন হাজার ফুট উচ্চতা লঙ্ঘন করেছে ভেবে মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে যাচ্ছে শমিত, এমন সময় দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে তার মনের খুশির ভাবটা হঠাৎ হোঁচট খেল। দক্ষিণ দিকে খাড়া হয়ে অন্ততঃপক্ষে দু হাজার ফুট নেমে গিয়েছে একটানা উৎরাই। দইতারির বিপুল উত্তুঙ্গতা এই অতলস্পর্শী উৎরাইয়ের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। উৎরাইয়ের গায়ে ও নীচে ঘন বনের আচ্ছাদন। দইতারি পাহাড়ের দক্ষিণে মাইল পাঁচেক দূরে আর একটি পাহাড় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তুরাম বললে যে তার নাম মহাগিরি। দই-তারির মত মহাগিরিও পূব থেকে পশ্চিম দিকে প্রসারিত হয়েছে। দুটি পাহাড় পূব দিকে গিয়ে মিলেছে। দুটি পাহাড়ের এই মিলন ক্ষেত্রের নাম রায়-ঘাটি। দইতারি, মহাগিরি ও রায়ঘাটি খাড়াভাবে নেমেছে ঘন বনে আচ্ছন্ন উপত্যকার মধ্যে। উপত্যকার গাছপালার ঠাসবুনানির সবুজ রঙ এত উঁচু থেকে নীলাভ বলে বোধ হচ্ছে।

থমকে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে শমিত। নীচের বনে ছাওয়া উপত্যকার মধ্যে যেন চৌম্বকশক্তি লুকানো রয়েছে। তার দৃষ্টিকে তা দুর্বারভাবে আকর্ষণ করে।

ঐ উপত্যকার মধ্যে পথের কোন চিহ্ন নেই, নেই কোন লোকালয়। ওখানে কোথায় ভীমটাঙ্গোর তুরাম ছাড়া কেউ জানে না। সে তাদের কী করে নিয়ে যাবে সেখানে কে জানে!

তুরাম বলল, দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন, এগিয়ে চলুন।

শমিত মৃদু হেসে বললে, এগিয়ে যাব কোথায়? বল তো তলিয়ে যেতে পারি।

গম্ভীর মুখে তুরাম বললে, ঠাট্টা নয়, খুব সাবধানে পা ফেলে চলবেন—নইলে সত্যিই তলিয়ে যাবেন। এখানে পা পিছলে পড়ে গেলে কেউ পারবে না আপনাকে বাঁচাতে।

এর পর আর কোন কথা না বলে তুরামকে অনুসরণ করে পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে থাকে শমিত। শমিতের

পেছনে পেছনে আসে মুকু ও মালবাহকের দল।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্বন্ধে এতদিন পুঁথিগত জ্ঞান ছিল তার—খাড়া উৎরাই বেয়ে নামতে নামতে তার সংগে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় হল। তার দুর্বার আকর্ষণ তাকে নীচের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়—প্রতি পদে তার বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেকে সোজা রাখতে হয়। অসতর্ক পদক্ষেপ মানেই পদস্খলন এবং অতলস্পর্শী গহ্বরের মধ্যে পতন।

উৎরাইটা এমনি খাড়াভাবে নেমে গেছে যে খাড়া হয়ে দাঁড়াতেই পারে না শমিত। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামবার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হল সে। তার-পর বসে পড়ে হামাগুড়ি দিতে থাকে।

আর সকলের অবস্থা শমিতের মত সংগীন না হলেও তুরাম ছাড়া সকলেরই কষ্ট হচ্ছিল হাঁটতে। বন ও পাহাড়ের মধ্যে তারা মানুষ হলেও এমন খাড়া পাহাড়কে পুরোপুরি সহ্য করতে পারছিল না কেউ।

পাহাড়ের গায়ে শাল, পিয়াশাল ও কেঁদ গাছ ছাড়া ছিল বুনো ঘাস ও অর্কিডের প্রাচুর্য। ঘাসের আচ্ছাদনে চাপা পড়েছিল পাহাড়ের গা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা পাথরগুলো। ঘাসের আবরণ ভেদ করে নীচের দিকে দৃষ্টি চলছিল না, কাজেই শমিত বুঝতে পারছিল না কোথায় পা রাখছে সে।

সারাদিনের চেষ্টায় দেড় হাজার ফুট নামল শমিত তার দলবল নিয়ে। বলা বাহুল্য শমিতের অক্ষমতার জন্যই দলের অগ্রগতির এমনি নৈরাশ্যজনক হয়েছিল। মুকু বিরক্তি চাপতে না পেরে বললে, এমনি শামুকের গতিতে যদি এগোও, কোনদিনই পারবে না পৌঁছতে ভীমটাংগোরে।

শমিত লজ্জিতভাবে বললে, কী করব বল—এমন খাড়া পাহাড় বেয়ে কখনো তো নামি নি আমি।

মুকুর মুখের ওপরে অগ্নিদৃষ্টি হেনে তুরাম বললে, তুমিও এমন কিছু জোরে চলছ না। তোমার দাদা-বাবুর চলা যদি শামুকের মত হয়, তোমার চলা কচ্ছপের মত।

মুখ লাল করে মুকু বললে, ভাল হবে না বলছি তুরাম। যত বড় মুখ নয়—

শমিত বাধা দিয়ে বললে, আহা ঝগড়া করছ কেন তোমরা? পথে বেরিয়ে কী ঝগড়া করতে আছে! শোন ভাই তুরাম, সত্যিই ভারি ক্লান্ত আমি—আজ আর এক পাও এগোতে পারব না।

তুরাম বললে, কিন্তু মুশকিল হয়েছে কী জান, মুশকিল হয়েছে এই যে পাহাড়ের ঢালের গায়ে আস্তানা নেওয়া অসম্ভব ব্যাপার। এখানে দাঁড়ানোই যায় না, শুয়ে বিশ্রাম করবে কী করে!

বিপন্নের মত মুখভংগী করে শমিত বললে, তা হলে উপায়?

উপায় পাহাড়ের গায়ে গুহার মধ্যে আস্তানা নেওয়া।—তুরাম জবাব দিল।—কাছেই আছে একটা গুহা।

বাঘের গুহা নয় তো!—ভয়ে ভয়ে বলে শমিত।

তাচ্ছিল্যের সংগে তুরাম বলে, হলেই বা কী! গুহার সামনে এমনি জোরদার আগুন জ্বালিয়ে রাখব যে বাঘ, ভালুক বা হাতি কিছুই সাহস পাবে না কাছে ঘেঁষতে।

অদূরে কোয়ার্টজাইট পাথরের ফাটলের ফাঁকে একটি গহ্বর দেখা যাচ্ছিল। তার দিকে দৃষ্টিপাত করে শমিত বললে, ঐ গর্তটাকে গুহা বলছ তুমি! ওর মধ্যে কী আমাদের একজনও পারবে থাকতে!

—বাইরের থেকে গর্তের মত দেখালেও ভেতরে অনেক জায়গা আছে। আমাদের সকলেরই ওর মধ্যে জায়গা হয়ে যাবে অনায়াসে।

বলে তুরাম হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল গহ্বরটির মধ্যে। তাকে অনুসরণ করে শমিতও ঢুকে পড়ল তার মধ্যে।

গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে শমিত বুঝতে পারল যে কোন জানোয়ারের আস্তানার মধ্যে ঢুকে পড়েছে ওরা। একটা বোঁটকা গন্ধ এল তার নাকে। এ ধরনের গন্ধ সে চিড়িয়াখানায় বাঘ, সিংহ, চিতাবাঘ বা হায়েনার খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে পেয়েছে। তুরাম যে রকম ব্যস্ত সমস্ত হয়ে গুহার মুখের কাছে কাঠ জড়ো করতে লাগল তা থেকে সে বুঝল যে তার অনুমান মিথ্যা নয়।

গুহার প্রবেশপথ জুড়ে আগুন জ্বলে। এ আগুন হিংস্রতম পশুকেও ঠেকিয়ে রাখবে। আগুনের দিকে চেয়ে গুণ গুণ করে গাইতে থাকে শমিত।

খাওয়া দাওয়া সেরে সকলে যখন শোবার আয়োজন করছে, তখন প্রমিতাকে চিঠি লিখতে বসল শমিত। মুকু তা লক্ষ্য করে বললে, চিঠি যে লিখছ, ডাকে দেবে কী করে?

শমিত বললে, সে তুমিই জান। তুমিই তো বলে-ছিলে যে সপ্তাহে একদিন করে রেবুনা-পলাশপাল থেকে ডাক নিয়ে যায় একজন মেল-রানার।

—সে না হয় বলেছিলাম। কিন্তু তোমার চিঠি

নিয়ে রেব্না-পলাশপালে যাবে কে শুনি?

—ভয় নেই, তোমাকে যেতে হবে না। তুরামের সঙ্গীদের মধ্যে কেউ একজন যাবে না হয় চিঠি ডাকে দিতে।

তুরাম বললে, নিশ্চয়ই যাবে। আমার সাথীদের মধ্যে যে কেউ পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে রেব্না-পলাশপালে গিয়ে তোমার চিঠি দিয়ে ফিরে আসতে পারবে।

সে না হয় এখান থেকে পারবে, কিন্তু ভীমটাঙ্গোরে গিয়ে কী করবে শুনি?—শ্লেষমাখানো স্বরে বললে মুকু।

তুরাম বললে, ভীমটাঙ্গোর থেকে ঢেংকানলের দিকে যাবে। ওদিকে মরুয়াবিলে একটা ডাকঘর আছে। ওদিকটাতে বন অবশ্য আরও গভীর, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। বুনো জন্তুদের ভয় করি না আমরা।

মুকু এর পর আর কোন কথা বললে না।

॥ ছয় ॥

পরদিন বেলা দুপুরে দইতারি পাহাড়ের নীচে এসে নামল শমিত তার দলবল নিয়ে। নীচে নামতেই গভীর বনের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল তারা। শমিতের মনে হল যেন বনের সমুদ্রের মধ্যে তারা ডুবে গিয়েছে। মাথা তুলে স্তম্ভিত হল দইতারির বিপুল উচ্চতা দেখে। এত উঁচু থেকে নীচে নেমে এসেছে ভাবতে মাথার ভেতরে তার ঝিম ধরে যায়।

কত উঁচু থেকে নেমে এসেছি!—সোচ্ছ্বাসে বলে ওঠে শমিত—পাহাড় তো নয়, যেন স্বর্গের সিঁড়ি।

তুরাম বললে, এত উঁচু ও দুর্গম বলেই দইতারি নাম দেওয়া হয়েছে এ পাহাড়ের। দইতারি মানে দৈত্যদের শত্রু। দৈত্য-দানবদের ঠেকিয়ে রেখেছে এ পাহাড়।

দৈত্য-দানবরা কোথায় থাকে তুরাম ভাই?—শমিত প্রশ্ন করলে।—পাহাড়ের নীচে না ওপরে?

তুরাম জবাব দিল, নাম যারা দিয়েছিল তারা থাকত পাহাড়ের ওপরে। তাদের ধারণা ছিল দৈত্যরা বুঝি পাহাড়ের নীচে বনের মধ্যে থাকে। কিন্তু আমি তা মনে করি না। আমার মতে মানুষেরাই দৈত্য-দানব। এই জঙ্গল থেকে মানুষদের তফাতে রাখার জন্যই দইতারি পাহাড় সৃষ্টি করেছিলেন দেবতারা।

—তুমি তা হলে বলতে চাও যে এই বনের মধ্যে দেবতারা বুনো জন্তু জানোয়ারদের সঙ্গে বাস করতেন?

—হ্যাঁ। বুনো জন্তু-জানোয়াররা হিংস্র হলেও মানুষের মত পাজী হয় না কখনো।

বনের গাছপালার ঠাস বুনানির মধ্যে পথের কোন চিহ্ন নেই। শমিত তুরামকে বললে, তুমি যে বলেছিলে বুনো শুয়োর ও হরিণদের পায়ে পায়ে বনের মধ্যে পথ তৈরি হয়েছে, কোথায় সেই পথ?

তুরাম গম্ভীর মুখে বললে, সে পথ তোমাদের চোখে পড়বে না। মানুষের পায়ে চলা পথ ও বুনো জানোয়ারদের পায়ে চলা পথে পার্থক্য আছে। আমার পেছনে পেছনে এস তোমরা, আমি তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।

বনের মধ্যে বড় বড় শাল, পিয়াশাল, আসান, কুম্ভি, বহেরা, আমলকি, হরতকি ও ধও গাছ দেখতে পেল শমিত। আসান গাছে পাতা নেই, কিন্তু তাকে বেষ্টন করে ওঠা কুরচি লতা-পাতায় ও ফুলে ভরে আছে। কুরচি ফুলের রঙ সাদা। আরও অনেক রকম বুনো লতা দেখা গেল। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে চোখে পড়ার মত হল মুচুকুন্দ ও বনপান।

সূর্য মাথার ওপরে উঠলেও বনের গাছপালা তাকে ঠেকিয়ে রাখে। রোদের একটা রেখাও তাদের ভেদ করে মাটিকে ছুঁতে পারে নি। নিবিড় ছায়ার মধ্যে স্যাঁৎসেঁতে ভাব আছে—হাঁটতে একটু শীত শীত করে।

মাইল কয়ক পর একটি পাহাড়ী নালার ওপরে এক ঝলক রোদ দেখতে পেল শমিত। নালার ওপর দিয়ে বনটা চিরে দুভাগ হয়ে গিয়েছে—বনের ভেতরকার এই ফাটলের ফাঁক দিয়ে রোদ নেমে এসে বনের সবুজের ওপরে সোনালী রঙের রেখা এসেছে। নালা বরাবর এক ফালি নীল আকাশও দেখা যাচ্ছে।

নালাতে জল নেই। তুরাম বললে, বৃষ্টি হলে নালা বেয়ে জলের ঢল নামে।

সেই জল নেমে গেলে পর নালার খাত আবার শুকনো খটখটে হয়ে ওঠে। নালার ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল তুরাম। তার সামনে একটা মস্ত বড় সাপ—লম্বায় সাত আট ফুটের কম হবে না। সাপটি নালা থেকে উঠে আসছিল, তুরামকে দেখে থেমে গিয়ে প্রকাণ্ড ফণা তুলে দাঁড়াল।

শমিতের কানের কাছে মুখ এনে মুকু চাপা কাঁপা গলায় বললে, শঙ্খচূড় সাপ! তুরামের আর রক্ষা নেই!

চাপা উত্তেজিত গলায় শমিত বললে, ওকে মেরে ফেল তুরাম।

তুরাম কিছু বলে না। নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে সাপটির দিকে চেয়ে থাকে সে শুধু এক দৃষ্টিতে। তার চোখের দৃষ্টিতে বোধ হয় জাদু ছিল। খানিকক্ষণ বাদে সাপটি নেতিয়ে পড়ল তার পায়ের কাছে। তারপর আস্তে আস্তে পাশের বুনো হলুদ গাছের ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

সাপটি চলে যেতে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। শমিত বললে, ওকে মারলে না কেন তুরাম ভাই?

তুরাম বললে, ওকে মারলে যে আমি মরতাম দাদাবাবু।

হতবুদ্ধির মত তুরামের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শমিত বললে, ওকে মারলে তুমি মরতে! তুমি কী হেঁয়ালি করছ তুরাম ভাই!

—হেঁয়ালি নয়, সত্যি কথাই বলছি। সাপ মারতে হলে তার জোড়সুদ্ধ মারা উচিত। শুধু একটিকে মারলে অন্যটি প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসবেই। ঐ শঙ্খচূড় সাপটাকে আমি মেরে ফেললে ওর জোড়, মানে সাপিনীটা নিশ্চয়ই মারত আমাকে।

—সাপিনীটা তোমাকে চিনত কী করে তুরাম ভাই?

—সাপের গায়ে আমার আঘাত সাপিনীর গায়ে গিয়েও বাজত। সাপটাকে কে মেরেছে সে বুঝে নিত—আমি যেখানেই থাকি না কেন, সেখানে গিয়ে সে আমাকে মেরে ফেলত।

কম্পাস দিয়ে দিক নির্ণয় করে শমিত দেখল তুরাম সোজা পশ্চিম দিকে হাঁটছে। ঘন বনের মধ্যে সে দিক ঠিক রাখছে কী করে ভেবে পায় না শমিত। দিক নির্ণয় করার ক্ষমতাটা বোধ হয় তার সহজাত। মূর্তিমান কম্পাস যেন সে।

কিছু দূর এগিয়ে যাবার পর এক পাল হরিণের দেখা পেল তারা। তারা যেদিকে যাচ্ছিল, সেই দিকেই হাঁটছিল হরিণের দল। ওদের দেখে খুশি হয়ে উঠে তুরাম বললে, ভালই হল, খানিকটা পথ ওদের পেছনে পেছনে যেতে পারব আমরা।

শমিত বললে, ওরাও ভীমটাঙ্গোর যাচ্ছে নাকি?

—না, তা নয়। তবে ওরা যেদিকে যাচ্ছে, সেদিকেই ভীমটাঙ্গোর।

—ওরা কোথায় যাচ্ছে তা তুমি জানলে কী করে?

—ওদের গতিবিধি আমার জানা আছে দাদাবাবু। ওদের পেছনে পেছনে ঘোরাঘুরি করেই তো এখানকার বনকে চিনেছি, ওদের পায়ে চলা পথকে আবিষ্কার করেছি।

—কোথায় যাচ্ছে ওরা তুরাম ভাই?

—এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে একটা ঝর্ণা আছে, সেখানে জল খেতে যাচ্ছে ওরা।

হরিণের দল ওদের দেখতে পেলেও ভয় পায় না। তুরাম বা তার সঙ্গীরা বোধ হয় এখানে কখনো হরিণ শিকার করে নি—কোন শিকারীর দলেরও পা পড়ে নি বোধ হয় এই বনের মধ্যে, কাজেই মানুষের হিংস্রতার সঙ্গে ওদের পরিচয় হয় নি—মানুষকে ওরা ভয় করতে শেখে নি।

হরিণের দল মাইল কয়েক সোজা পশ্চিম দিকে গিয়ে হঠাৎ দিক পরিবর্তন করল। তুরাম বললে, আমরা সোজাই চলব—ওদের পেছনে পেছনে যাবার দরকার নেই আর।

শমিত বললে, ওরা দিক বদলালো কেন তুরাম ভাই? তুমি না বলেছিলে ঝর্ণাটা ভীমটাঙ্গোরের দিকেই রয়েছে!

তুরাম বললে, ওরা একটু ঘুরে যাবে সেখানে।

—ঘুরে যাবে কেন? সোজা পথে ওদের ভয় পাবার মত কিছু রয়েছে নাকি?

তা আমি কী জানি।—তুরাম ঈষৎ রাগতঃ স্বরে বললে।

খানিকটা এগিয়ে যাবার পর তুরাম হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, আজ আর যাব না দাদাবাবু, তোমাদের তাঁবুগুলো খাটিয়ে নাও—এখানেই আজ রাত কাটাব আমরা।

শমিতের হাতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মুকু বললে, বেলা তিনটেও বাজে নি এখনো, এরি মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়লে!

তুরাম ঝাঁজালো স্বরে বললে, ক্লান্ত আমি হই নি, হয়েছ তোমরা। দেখছ না, দাদাবাবু কী রকম হাঁফাচ্ছে।

শমিত বললে, আমি কোথায় হাঁফাচ্ছি তুরাম ভাই! আমি তো এতটুকুও ক্লান্ত হই নি।

—না হলেও হতে কতক্ষণ! না দাদাবাবু, একসঙ্গে বেশি পরিশ্রম করা চলবে না তোমার। আজকের মত এখানেই থেকে যাও। মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে আছ কেন মুকু, তাঁবুগুলো খাটিয়ে ফেল না চটপট। তারপর দাদাবাবুর জন্য চায়ের জোগাড় কর।

আপন মনে গজর গজর করতে তাঁবু খাটাবার আয়োজন করে মুকু।

শমিত ভেবে পেল না তুরামের হঠাৎ এখানে থাকার ঝোঁক চাপল কেন। বন এখানে গভীরতর, গাছপালাগুলোও খুব ঘন সন্নিবিষ্ট। তাঁবু খাটাতে রীতিমত

হিমসিম খেতে হয় মুকুকে।

খানিকক্ষণ বাদে শমিতের খেয়াল হল যে বনের মধ্যে হঠাৎ একটা নৈঃশব্দ নেমে এসেছে। চলতে চলতে এতক্ষণ পাখির ডাক শুনছিল, হঠাৎ তারা নীরব হয়ে পড়েছে।

এখানে পাখি ডাকছে না কেন তুরাম ভাই?—শমিত প্রশ্ন করল।

শমিতের প্রশ্ন শুনে একটু চমকে উঠল তুরাম। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে, পাখিদের মর্জিমেজাজ আমি ঠিক বুঝি নে দাদাবাবু, ওরা কেন ডাকছে না সে আমি বলতে পারব না।

তুরামের মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে শমিত বললে, আমার কী মনে হচ্ছে জানো তুরাম ভাই? আমার মনে হচ্ছে—

শমিতের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তুরাম বললে, তোমার কী মনে হচ্ছে তা আমি জানি দাদাবাবু—মুখ ফুটে তা বলার দরকার নেই কোন। তোমাদের কোন ভয় নেই, চারপাশে ভালো করে আগুন জ্বালিয়ে দেব, যাতে কোন বুনো জানোয়ার ধারেকাছেও ঘেঁষতে না পারে।

॥ সাত ॥

অনেক রাত্রে শমিতের হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে তাকাতেই তাঁবুর বাইরের জমাট বাঁধা আঁধার তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভেতরে লণ্ঠনের ক্ষীণ আলো এই অন্ধকারকে যেন নিবিড়তর করে তুলেছে। ঘুমোতে যাবার আগে চারপাশে যে আগুন জ্বলতে দেখেছে, তার স্ফুলিঙ্গমাত্রও তার চোখে পড়ল না। আগুন বোধ হয় নিভে গিয়েছে অনেকক্ষণ। তুরামের রাত জেগে পাহারা দেবার কথা ছিল—সে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে থাকলে নিশ্চয়ই আগুনটাকে জ্বালিয়ে রাখত।

টর্চ হাতে করে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল শমিত। বাইরে বনের গাছপালাগুলি সব আঁধারে ডুবে গেছে। দুপাশে দইতারি ও মহাগিরি পাহাড়, উপরে আকাশ ও নীচে মাটি সব একাকার হয়ে গিয়েছে। শমিতের মনে হল সে নিজেও যেন হারিয়ে গেছে এই অন্ধকারের মধ্যে। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে তারার আলো জ্বলছে। কিন্তু আঁধারের জমাট বাঁধা কালিমার মধ্যে বিন্দুমাত্রও আঁচড় কাটতে পারছে না তা।

তুরাম কোথায় দেখবার জন্য টর্চের আলো জ্বালল শমিত। সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় ধমক দিয়ে উঠল তুরাম, আলো জ্বালছ কেন, নিভিয়ে দাও।

আলো নিভিয়ে দেব!—শমিত অবাক হয়ে বললে।—আলো তো নিভিয়ে দেওয়ার কথা নয় তুরাম ভাই। সারারাত আগুন জ্বালিয়ে তোমার পাহারা দেওয়ার কথা ছিল।

দোহাই তোমাকে, এখন একটু চুপ করে থাক।—চাপা তর্জনের সঙ্গে বললে তুরাম।

—চুপ করে থাকব! কিন্তু কেন?

—কেন জানতে চাও? তা হলে এস আমার কাছে। পা টিপে টিপে এস, যাতে কোন শব্দ না হয়।

তুরামের গলার স্বরে এমনি একটা গাম্ভীর্য ফুটে উঠেছিল যে তার আদেশ না মেনে পারল না শমিত। পা টিপে টিপেই এগিয়ে গেল সে। তুরামের পাশে এসে দাঁড়াতেই তুরাম তাকে ফিসফিসিয়ে বললে, চেয়ে দেখ সামনের দিকে।

সামনের দিকে তাকিয়ে প্রথমে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না শমিত। তারপর হঠাৎ এক জোড়া আগুনের গোলা তার নজরে এল। অন্ধকারকে খুবলে নিয়ে কে যেন তাদের বসিয়ে রেখেছে। স্থির, নিশ্চল, কিন্তু প্রচণ্ড তাদের আকর্ষণী শক্তি। নির্নিমেষে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাদের দিকে চেয়ে থাকে শমিত।

বাঘের চোখ।—ফিস্‌ফিসিয়ে বললে তুরাম।

আমার বন্দুকটা নিয়ে আসব তুরাম ভাই?—অস্ফুট স্বরে বললে শমিত।

—না, কোন দরকার নেই। যা করবার আমিই করছি—তুমি শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক।

হঠাৎ সচল হয়ে ওঠে আগুনের গোলা দুটি। তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে খট্ করে একটা শব্দ হল এবং প্রচণ্ড আর্তনাদে কেঁপে উঠল চারদিক। নিমেষের মধ্যে বনের মধ্যে একটা আলোড়ন শুরু হল। গাছপালার সঙ্গে অন্ধকার নড়ে চড়ে—একটা আবর্ত—যেন ঘুরপাক খেতে থাকে আর্তনাদের সঙ্গে তাল রেখে।

পেয়েছি, ওকে আমি পেয়েছি!—সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল তুরাম।

কাকে পেয়েছ তুরামভাই?—শমিত প্রশ্ন করলে।

—ঐ বাঘটাকে। আমার বিষ মাখানো তীর ওর বুকের মধ্যে গিয়ে বিঁধেছে। জানো দাদাবাবু, ও আমার ছেলেকে খেয়েছিল গেল সনে।

বাঘের আর্তনাদ শুনে তাঁবু থেকে ছুটে বেরিয়ে এল মুকু এবং আর সকলে।

কী হয়েছে?—ব্যগ্র স্বরে প্রশ্ন করে মুকু।

তুরাম বললে, কী হয়েছে শুনে বুঝতে পারছ না? চোখে না দেখলে যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, দিনের আলো ফুটে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

আগুন নিভিয়ে দিয়েছ কেন?—রূঢ় স্বরে প্রশ্ন করে মুকু।

—আগুন না নেভালে কী আর ও কাছে আসত!

শমিত বললে, বাঘটাকে মারবার জন্যই বুঝি এখানে আজ রাত্রে আমাদের থাকতে বাধ্য করেছ তুমি?

তুরাম বললে, ঠিক ধরেছ তুমি দাদাবাবু। সত্যি মুকু, দাদাবাবুর তোমার ভারি বুদ্ধি!

বিকেলে আমরা যখন এখানে এসে পৌঁছলাম, বাঘটা তখন এখানেই ছিল—তাই না তুরামভাই?

—ছিল বইকি। ছিল বলেই পাখিরা ডাকছিল না, হরিণের পাল এ জায়গাটাকে তফাতে রেখে ঘুর পথে যাচ্ছিল ঝর্ণার দিকে।

ইতিমধ্যে স্তিমিত হয়ে আসে বাঘের আর্তনাদ, আলোড়নও বন্ধ হয়ে যায়।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তুরাম বললে, যাক্, হয়ে গেছে ওর! এত বড় বাঘ, দু মিনিটেই শেষ হয়ে গেল। তীরের মধ্যে রীতিমত গোখরো সাপের বিষ মাখিয়ে রেখেছিলাম। সকাল হলেই চামড়াটাকে ছাড়িয়ে—তোমাকে উপহার দেব দাদাবাবু।

—আমাকে উপহার দেবে কেন! তুমি মেরেছ, তুমিই নিয়ে নাও ওর চামড়া।

—না দাদাবাবু, ওর চামড়া তোমাকেই নিতে হবে। আমার ছেলের ভারি ইচ্ছে ছিল বাঘটাকে মেরে তার চামড়াটা সে নেবে। কিন্তু বাঘটাকে মারতে গিয়ে সে নিজেই তার কাছে মারা পড়ল। আমার ছেলে আজ নেই, কাজেই চামড়াটা তোমাকেই নিতে হবে। জানো দাদাবাবু, আমার ছেলে তোমার বয়সীই ছিল।

বলতে বলতে ধরে আসে তুরামের গলার স্বর।

॥ আট ॥

হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্তি লাগে শমিতের। বনটাকেও একঘেঁয়ে মনে হতে থাকে তার। শাল, পিয়াশাল, আসান, হরতকী, আমলকী, বহেরা ও ধও গাছ ছাড়া মাঝে মাঝে মহুয়া ও জামগাছ চোখে পড়ছে। একই ধরনের গাছ-পালা। লতাগুলোও সব একই রকমের। কুরচি, বন-পান ও মুচুকুন্দ—বড় বড় গাছকে বেষ্টন করে গোটা বনকে ছেয়ে ফেলছে। মাঝে মাঝে বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে চিহোড় লতা। তার পাতা আকারে এত বড়ো যে দেখে তাক লেগে যায়। পাতার এমন বাহার অন্য কোন গাছ বা লতায় দেখে নি শমিত।

একঘেঁয়ে একই ধরনের গাছপালা ও লতা একটানা ছ দিন ধরে দেখল শমিত। সপ্তম দিনে সে তুরামকে বললে, আজও যদি একই ধরনের গাছপালা দেখি, ফিরে যাব।

তুরাম হেসে ফেলে বললে, ফিরে যাওয়ার পথেও তো এই সব গাছপালাই দেখবে দাদাবাবু।

চোখ বেঁধে চলব তাহলে।—শমিত বললে। —আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে যেতে পারবে তো তুরাম ভাই?

—হাত ধরে কেন, কাঁধে করে নিয়ে যাব তোমাকে। তবে তার কোন দরকার হবে না। আজই নতুন কিছু দেখতে পাবে।

মাইল কয়েক হাঁটার পর সত্যিই নতুন কিছু দেখতে পেল শমিত। গাছপালা ও লতাপাতার মধ্যে হঠাৎ এক বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখা গেল।

তুরাম মুচকি হেসে বললে, দেখছ তো, গোটা বনটাই কী রকম বদলে গেল! এ কয়দিন ধরে যে সব গাছ-পালা দেখছিলে, সেগুলো সব উধাও হয়ে পুরোপুরি নতুন ধরনের গাছপালা দেখা দিয়েছে। বলতে পার, কেন এমন হয়েছে?

চিন্তিত মুখে শমিত বললে, বোধ হয় মাটির মধ্যে হঠাৎ একটা পরিবর্তন এসে গিয়েছে।

মুকু উত্তেজিত স্বরে বললে, দেখছ দাদাবাবু এখানে মাটির রঙ কী রকম গাঢ় বাদামী?

মাটির ওপরে ঝুঁকে পড়ে শমিত দেখল যে মুকু ঠিকই বলেছে। এ পর্যন্ত মাটিতে বাদামী রঙের ছোপ পড়লেও তার রঙ ছিল হলুদ ও ধূসরে মেশানো। এখানে বাদামী রঙের প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে। জায়গায় জায়গায় রক্তবর্ণের ছোপও পড়েছে।

শমিত বললে, এখানকার মাটিতে লোহার পরিমাণ অতিমাত্রায় বেড়ে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

তুরাম মিটিমিটি হাসতে হাসতে বললে, শুধু কী লোহা, অন্য জিনিসও আছে। ভালো করে খুঁজে দেখ দাদাবাবু।

দেখব বই কি, খুঁজে দেখবার জন্যই এসেছি এখানে। তুরামের মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে

শমিত।—এখন বলো তো তুরাম ভাই, এই জায়গাটির নাম কী।

—আমি আর বলব কী, তুমিই তো বুঝতে পেরে গেছ। মুকু, আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছি, চটপট তাঁবুগুলো খাটিয়ে ফেল এখানে।

—এখান থেকেই নিয়ে গিয়েছিলে তুমি ক্রোমাইটের নমুনাগুলো?

—হ্যাঁ। যেখান থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম, সে জায়গাটা কাল তোমাদের দেখিয়ে দেব। আজ তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রাম করে নাও।

এক খাবলা মাটি তুলে নিয়ে শমিত বললে, বুঝলে তুরাম ও মুকুভাই, এই মাটির মধ্যে লোহার সঙ্গে ক্রোমিয়াম মিশে আছে। ক্রোমিয়ামের পাশাপাশি নিকেল এবং কোবাল্টও থাকতে পারে। এই সব ধাতু হয় তো শাল, পিয়াশাল ইত্যাদি গাছের পক্ষে বিষাক্ত, তাই তারা এখান থেকে অদৃশ্য হয়েছে।

তুরাম বললে, তারা অদৃশ্য হলেও নতুন ধরনের সব গাছপালা দেখা দিয়েছে। ওদের পক্ষে কী বিষাক্ত নয় এই সব ধাতু?

—বোধ হয় না। হয় তো এই সব ধাতু ওদের পক্ষে অমৃত। হয় তো মাটির মধ্যে এই সব ধাতুর স্বাদ পেয়েই বেড়ে উঠেছে ওরা।

পরদিন সকালে শমিত মুকু, তুরাম ও তুরামের সংগীদের নিয়ে ক্রোমাইটের খোঁজে বেরোলো। বনের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে শমিত বললে, এখানে ঠিক কোন্ জায়গাটিকে ভীমটাঙ্গোর বলে তুরাম ভাই?

তা ঠিক জানি নে দাদাবাবু। —তুরাম জবাব দিল। —বোধ হয় এখানকার এই গোটা বনকেই ভীমটাঙ্গোর বলা হয়।

—কারা এই নাম দিয়েছে জানো তুরাম ভাই?

—তাও জানি নে। আমার বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকে চলে আসছে এই নাম।

তুরাম শমিতকে একটি পাহাড়ী নালার ধারে নিয়ে গেল। লালচে বাদামী রঙের মাটির স্তরকে বিশ্লিষ্ট করে নালাটি একটি কালো রঙের ক্রোমাইটের শিরাকে উদ্‌ঘাটিত করেছে।

শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই ক্রোমাইট দেখালে আমাকে তুরাম ভাই!—তুরামের হাত দুটি চেপে ধরে সোচ্ছ্বাসে বলে উঠল শমিত।

তুরাম বললে, আমি আর কতটুকু দেখাতে পারছি। যতটুকু দেখাচ্ছি আমি, তার চেয়ে অনেক বেশি খুঁজে বের করতে হবে তোমাকে।

—নিশ্চয়ই খুঁজে বের করব, কিন্তু তার জন্য তোমাদের সাহায্য চাই।

নালার মধ্যে উদ্‌ঘাটিত ক্রোমাইটের শিরাটিকে মাপজোক করল শমিত। কোন্ দিকে তা প্রসারিত হয়েছে নির্ণয় করল সে তার কম্পাসের সাহায্যে। তার-পর খোঁড়াখুঁড়ির পালা। মুকু, তুরাম ও তাদের লোক-জনদের বললে সে বনের নানা জায়গায় গর্ত খুঁড়তে। তার নির্দেশমত সকলেই মহোৎসাহে গর্ত খুঁড়তে শুরু করল। অনেকগুলো গর্তের মধ্যেই ক্রোমাইট বেরিয়ে পড়ল। ক্রোমাইটের শিরাটি তার শাখা-উপশাখাসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিরাজ করছে। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ক্রোমাইটের একটা বিপুল ভাণ্ডারের আভাস পেল সে।

ভীমটাঙ্গোরের ক্রোমাইটের খবর দিতে গিয়ে সে প্রমিতাকে লিখল ঃ

আমার মনে হচ্ছে এই ভীমটাঙ্গোরের বনে লক্ষ লক্ষ টন ক্রোমাইট মজুদ আছে। বনময় ছড়িয়ে আছে ক্রোমাইটের শিরা-উপশিরা। ক্রোমাইটের সংগে আর একটা জিনিস আবিষ্কার করছি আমি। জিনিসটা হচ্ছে হলুদ রঙে ছোপানো লালচে বাদামী রঙের এক ধরনের মাটি। ক্রোমাইটের সংগে থাকলেও ক্রোমাইটের শিরার সীমা ছাপিয়ে গেছে। আমি অনুমান করছি এই মাটির মধ্যে নিকেল ও ও কোবাল্ট রয়েছে। নমুনা নিয়ে যাচ্ছি—কেমিক্যাল এ্যানালিসিস করে নিকেল ও কোবাল্টের পরিমাণ নির্ণয় করব। আমার অনুমান যদি সত্য হয়, এই মাটিটাকে নিকেলের আকর হিসেবে খনন করা যাবে এবং তা ক্রোমাইটের তুলনায় বহুগুণ মূল্যবান হবে।

নিকেল যে আছে, তার একটা পরোক্ষ প্রমাণ আমি পেয়ে গিয়েছি। এখানকার বনে বড়ো আকারের গাছ নেই বিশেষ। চারপাশে একটানা শালবন, অথচ এখানে একটিও শাল গাছ নেই। প্রথমে আমি ভেবে-ছিলাম বুঝি মাটিতে ক্রোমিয়াম থাকার দরুন শালগাছ জন্মাতে পারে নি। কিন্তু পরে একটা বই পড়ে জেনেছি যে ক্রোমিয়াম তেমন বিষাক্ত পদার্থ নয়—মাটির গুণ নষ্ট করার ক্ষমতা তার নেই। মাটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনার ক্ষমতা নিকেল, কোবাল্ট, আর্সেনিক প্রভৃতি ধাতুর আছে। মাটির মধ্যে তারা মিশে থাকলে অনেক রকম গাছ জন্মাতেই পারে না। এ অঞ্চলে আর্সেনিকের অস্তিত্বের সম্ভাবনা নেই.

কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে নিকেল ও কোবাল্ট এখানকার মাটির সঙ্গে মিশে থেকে বনের রূপান্তর ঘটিয়েছে। বোধ হয় মাটির মধ্যে নিকেল ও কোবাল্টের প্রাচুর্য শালগাছকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করেছে।

শালগাছ না থাকলেও অবশ্য কোংরা নামে এক ধরনের গাছ আছে ভীমটাঙ্গোরের বনে। আর আছে নানা রকম ছোট ছোট গাছ ও লতার ঝোপ। মাটিকে তারা ছেয়ে ফেলেছে। নিকেল ও কোবাল্ট বোধ হয় তাদের পক্ষে বিষাক্ত নয়। এই সব ঝোপের আড়ালে ময়ূর ও বনমোরগ বাসা বেঁধেছে। শালবনে ওরা থাকে না, এখানে ওরা ছাড়া কেউই নেই।

এখানকার বনের সীমানাকে আমি মানচিত্রবদ্ধ করেছি। কারণ এই বনের সীমানাই হচ্ছে ক্রোমাইটের সীমানা—নিকেল, কোবাল্ট যদি থাকে তাও এই বনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

আমার এখানকার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। ফেরার উদ্যোগ করছি। দিন পনেরোর মধ্যে ঘাটগাঁও পৌঁছে যাব। গাড়ি নিয়ে সময়মত তুমি ওখানে আসছ তো?

॥ নয় ॥

আবার সেই শালবন। কিন্তু এবারে আর তেমন একঘেয়ে লাগছিল না শমিতের। ভীমটাঙ্গোরে ক্রোমাইটের নতুন ভাণ্ডার আবিষ্কারের আনন্দে মন তার কানায় কানায় ভরে উঠেছে। ক্রোমাইটের সঙ্গে নিকেল ও কোবাল্টের অস্তিত্বের সম্ভাবনাতেও সে রোমাঞ্চিত বোধ করছে। মনের খুশি তার চলায় এনে দিয়েছে নতুন বেগ। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল না একটুও।

বনের মধ্যে ইচ্ছেমত জোরে হাঁটা যায় না বলে মাঝে মাঝে অধৈর্য বোধ করছিল। খুব তাড়াতাড়ি ঘাটগাঁও পৌঁছতে চায় সে। এখানকার সব কথা প্রমিতাকে বলবার জন্য মন তার অস্থির হয়ে উঠেছে। চিঠি অবশ্য লিখেছে, সে চিঠি তুরামের একজন সঙ্গী মরুয়াবিলে গিয়ে ডাকে দিয়ে এসেছে। কিন্তু তা সে কবে পাবে কে জানে। তা ছাড়া চিঠি লিখে মন ভরে না। মুখোমুখী সব কথা না বলা পর্যন্ত তৃপ্তি নেই।

তার অস্থিরতা লক্ষ্য করে মুচ্কি হেসে তুরাম বললে, অমন তড়িঘড়ি করে হাঁটলে কী হবে দাদাবাবু—যেখানে আমরা পাহাড়ে চড়ব, সেখানে সাত দিনের আগে পারবে না পৌঁছতে।

শমিত বললে, কিন্তু দইতারি পাহাড় তো পাশেই রয়েছে। এখানে চড়লেই তো হয়।

—এখানে চড়লে পাহাড়ের ওপর দিয়ে হাঁটতে হবে রেব্না-পলাশপালে পৌঁছবার জন্য। সে তুমি পারবে না দাদাবাবু।

দইতারি পাহাড়কে বাঁ পাশে রেখে হাঁটে সবাই। পাহাড়ের গায়ে বনের আচ্ছাদন। দেখে মনে হচ্ছে যেন সবুজ চাদর মুড়ি দেওয়া প্রকাণ্ড একটা মেঘ মাটিতে নেমে এসে বাঁধা পড়ে গেছে। দূরে পাহাড়ের রঙ নীল। যেখানে ওরা পাহাড়ে চড়বে, সে জায়গাটা অস্পষ্ট নীল রেখায় প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

সাত দিন বাদে পাহাড়ের ঠিক নীচে তাঁবু খাটাল ওরা। এখান থেকে পাহাড়ে চড়া শুরু করতে হবে। একটানা দু হাজার ফুট চড়াই বেয়ে ওঠার দুঃসহ পরিশ্রমের কথা ভেবে এখানে পুরো একদিন বিশ্রাম করার পরামর্শ দিল তুরাম।

তখনও ভোরের আলো ভালো করে ফোটে নি, তুরামকে অনুসরণ করে পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল সকলে। পাহাড়ের গা ফুঁড়ে বেরিয়ে থাকা পাথরের ফাটলে পা রেখে অতি সন্তর্পণে উঠতে থাকে শমিত। পাথরের গায়ে শুধু পায়ের ওপরে নির্ভর করে দাঁড়ানো সম্ভব নয়, কাজেই মাঝে মাঝে গাছপালা লতাপাতা আঁকড়ে ধরে শরীরের ভারসাম্য ঠিক রাখতে হয়। গাছপালাগুলো পাহাড়ের গা ফুঁড়ে পাথরের পাঁজাকে বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন হাজার হাজার তীর পাহাড়কে বিঁধে ফেলেছে—যেন ভীষ্মের শরশয্যা।

খানিকটা ওঠার পর হঠাৎ ভেসে যাওয়া একটা মেঘের টুকরো সকলকে ভিজিয়ে দিল। ভেজা জামাকাপড় শরীরে ভারি হয়ে লটকে থাকে। একটা অস্বস্তিজনক অবস্থা। শমিত তুরামকে বললে, ভেজা জামাকাপড় নিয়ে উঠতে পারব না তুরাম ভাই—একটু দাঁড়িয়ে শুকিয়ে নিতে হবে এগুলো।

তুরাম বললে, এখানে তো দাঁড়াতে পারবে না দাদাবাবু, আর একটু ওপরে যেতে হবে। এস, আমার হাত ধরে চল।

বলে শমিতের ডান হাতটি চেপে ধরে তুরাম। তারপর ধীরে ধীরে তাকে একটা উঁচু কোয়ার্টজাইট্ পাথর পার করাল সে অতি সাবধানে। এই পাথরটির মাথায় খানিকটা জায়গা ছিল দাঁড়াবাব মত। তাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তুরাম বললে, যতক্ষণ খুশি দাঁড়াও এখানে।

বেশিক্ষণ দাঁড়াবার দরকার অবশ্য হল না। পূব-দিকে বনের ওপরে তখন সূর্য উঠেছে। তার তাপ না থাকলেও দক্ষিণ দিক থেকে হাওয়া বইছিল, শমিতের ভেজা পোষাক শুকিয়ে গেল দেখতে দেখতে।

শমিত খুশি হয়ে বললে, এবারে আমি উঠব তুরাম ভাই—দেখো, কী রকম অনায়াসে তোমার সাহায্য ছাড়াই উঠে যাই আমি।

এখানে পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য ফাটল রয়েছে। পাথরগুলিও ফেটে চৌচির হয়েছে। ফাটলগুলোতে পা রেখে তরতরিয়ে উঠতে থাকে শমিত—তুরামের সঙ্গে প্রায় সমান তালে খাড়া হয়ে হাঁটে পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে।

শাবাশ ভাই!—তুরাম সোচ্ছ্বাসে বলে উঠল। —তোমার এখানকার পাহাড়-চড়া দেখে সবাই তারিফ করবে, ভাববে তুমি বুঝি সত্যিকারের পাহাড়ী একজন।

বেলা পড়ে আসতে তুরাম বললে, আর একটু বাদেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে, রাতটা এখানেই কাটানো যাক। ঐ যে সেই গুহাটা—নামবার সময় আমরা ওখানেই রাত কাটিয়েছিলাম।

তুরাম দেখিয়ে দেওয়ার আগেই গুহাটিকে দেখে-ছিল শমিত। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি গুহার মধ্যে ঢুকে পড়তে ইচ্ছে হল না তার। পড়ন্ত রোদে তখন গোটা পাহাড়টা ঝলমল করছে। গাছপালার সবুজ রঙ রোদের ছোঁয়ায় সোনালী হয়ে উঠে বাতাসে কাঁপতে শুরু করে। নিশ্চল পাহাড়ের মধ্যে যেন একটা বেগের আবেশ এসে যায়। উপর থেকে নীচু পর্যন্ত দইতারি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সবুজ ও সোনালী রঙের স্রোত বইতে থাকে।

হঠাৎ নীচের দিকে নজর পড়তে চমকে উঠল শমিত। খাড়া অতলস্পর্শী খাদের নীচে ময়দান। সবুজ ঘাসে ছাওয়া ময়দানের মাঝখানে স্বচ্ছ নীলার মত নীল রঙের জলে ভরা পুকুর—পুকুরের ধারে অনেকগুলো বুনো কলাগাছ। ময়দানের মধ্যে কী যেন সব নড়াচড়া করে বেড়াচ্ছে—কালো পাথরের ঢিবির মত তাদের আকার। হঠাৎ তার মনে হল, ওগুলো হাতি। দল বেঁধে ঐ ময়দানের মধ্যে চরে বেড়াচ্ছে।

মুকুভাই তুরামভাই, দেখেছ, ঐ ময়দানের মধ্যে হাতি চরে বেড়াচ্ছে দল বেঁধে!—উত্তেজিত স্বরে বলে ওঠে শমিত।

তুরাম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, দেখেছি বই কী,

......টাল সামলাতে না পেরে পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে......

অনেকবারই দেখেছি। কিন্তু তুমি অত ঝুঁকে পোড়ো না—এখানটা ভীষণ খাড়া।

—বাধা দিয়ো না তুরাম ভাই, আমাকে ভালো করে দেখতে দাও। এক সঙ্গে এত হাতি আগে কখনো দেখি নি আমি।

বলে ঝুঁকে পড়ে ভালো করে দেখার চেষ্টা করে শমিত। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ পাথরের ওপরে তার পা পিছলে যায় এবং টাল সামলাতে না পেরে পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে সে পড়ে যেতে থাকে নীচের অতলস্পর্শী গহ্বরের দিকে।

একটা তীব্র আর্তনাদ পাহাড়ের গায়ে প্রতিহত হয়ে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। তুরাম ঝুঁকে পড়ে দেখল, ময়দানের ওপরে ছোট একটা সরলরেখার মত

প্রসারিত হল শমিতের দেহখানা! সঙ্গে সঙ্গে হাতিরা তাকে ঘিরে ফেলে। হাতিদের ভিড়ের মধ্যে আর তাকে দেখা যায় না।

মুকু হাউমাউ করে চিৎকার করে উঠল, এ কী হল তুরাম! দাদাবাবু যে এই ভয়ানক খাড়াই বরাবর একেবারে নীচে গিয়ে পড়েছে।

হাতিদের আস্তানায় গিয়ে পড়েছে। —চোখদুটি বিস্তারিত করে বললে তুরাম। —কে কে যাবে আমার সঙ্গে, চল শিগ্‌গির—দাদাবাবুকে নিয়ে আসি ওখান থেকে।

তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে তুরাম!—তুরামের সঙ্গীদের মধ্যে একজন তার মুখের ওপরে তীব্র দৃষ্টি হেনে বললে। অত নীচে পড়ে গিয়ে কী কেউ বেঁচে থাকতে পারে! বেঁচে থাকলেও ঐ হাতিগুলো কী আর ওকে বেঁচে থাকতে দেবে। তা ছাড়া ঐ হাতির আস্তানাটা হল গিয়ে অপদেবতার ঠাঁই। ওখানে যাওয়ার কথা ভাবাও পাপ।

বাজে কথা রাখ।—তুরাম ধমক দিয়ে উঠল। যে যে যাবে, চলে এস এক্ষুণি আমার সঙ্গে।

আমরা কেউই যাব না। —প্রায় সমস্বরে বলে উঠল তুরামের সঙ্গীরা। —অপদেবতার ঠাঁইতে গিয়ে কেউ আমরা পাপের ভাগী হতে চাই না।

তোমরাও কী কেউ যাবে না? —তুরাম সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মুকু ও মালবাহকদের মুখের দিকে তাকাল। —মুকু, দাদাবাবু তোমার মনিব—তোমার উচিত আমার সঙ্গে যাওয়া।

মুকু মূক। মালবাহকরাও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

না ওরা কেউই যাবে না। —ওদের সকলের হয়ে জবাব দিল মুকুর সঙ্গীরা।

ঠিক আছে, আমি একলাই যাব।

বলে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দ্রুত পদক্ষেপে নামতে থাকে তুরাম।

ঐ অপদেবতার ঠাঁই থেকে যদি তুমি বেঁচে ফের, তোমাকে একঘরে হতে হবে।—তুরামের সঙ্গীদের মধ্যে একজন চিৎকার করে বললে।

তুরাম তার কথার কোন জবাব দিল না। চোখের নিমেষে নীচের খাদের দিকে নেমে গেল সে পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে। কিছুক্ষণ বাদে আর তাকে দেখা গেল না।

॥ দশ ॥

ঘাটগাঁওয়ের সরকারী বিশ্রামগৃহের সামনের বাগানে বসেছিল প্রমিতা। ভীমটাঙ্গোর থেকে লেখা শমিতের চিঠি পেয়ে সে এসেছে এখানে। তার সঙ্গে এসেছেন অমিতা ও সৌরীনবাবু। নতুন খনি গড়ে তোলার ব্যাপারে সৌরীনবাবুর উৎসাহ না থাকলেও শমিতের এই অভিযান তাঁর মনকে আকৃষ্ট করেছে। ক্রোমাইটের ভাণ্ডার সম্বন্ধে কোন আগ্রহ নেই তাঁর, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা সম্পর্কে কৌতূহল আছে। শমিত নতুন নতুন কী সব তত্ত্ব ও তথ্য আহরণ করে এনেছে তা জানার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন তিনি। প্রমিতা বা অমিতা তাঁকে আসতে বলেন নি, নিজে থেকেই এসেছেন তিনি।

প্রমিতা একটা নিমগাছের নীচে ঘাসের ওপরে বসে ছিল। সামনে সড়কের ওপারে এক সারি শাল গাছ, তারপর বাঁশবন। ঐ বাঁশবনের মধ্য দিয়ে পায়ে চলা যে পথটির সূত্রপাত, সেই পথ বন-পাহাড় পেরিয়ে চলে গিয়েছে রেব্‌না-পলাশপালের দিকে। পথটি এখান থেকে দেখা যায় না—দৃষ্টি জুড়ে থাকে শুধু বনের ঘন সবুজ আচ্ছাদন।

বাঁশবনটি হঠাৎ নড়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে প্রমিতার বুকের ভেতরটাতেও দোলা লাগে। শমিতের তো এত তাড়াতাড়ি এসে পৌঁছবার কথা নয়!

বাঁশবনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মুকু ও মালবাহী মজুরের দল। তাদের মধ্যে শমিতকে দেখতে পেল না প্রমিতা। সে দলছাড়া হয়ে গেল কেন ভেবে পায় না।

মুখ নীচু করে প্রমিতার সামনে এসে দাঁড়াল মুকু। তার মুখের ভাব দেখে আশঙ্কায় কেঁপে উঠল প্রমিতার বুক। রুদ্ধশ্বাসে সে বললে, শমিতদা কোথায় মুকু-ভাই?

মুকু কোন জবাব না দিয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

চুপ করে আছ, বল কোথায় আছে শমিতদা?—ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে প্রমিতা।

ঠিক কোথায় আছে বলতে পারব না। —কাঁপা গলায় জবাব দিল মুকু—দইতারি পাহাড়ের গায়ে পা পিছলে একটা খাদের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। কোথায় পড়েছে দেখতে পাই নি অবশ্য—খাদের তলাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না—শুনেছি ওটা হাতির আস্তানা।

প্রমিতার মনে হল তার চারপাশে যেন যথেষ্ট পরিমাণ বাতাস নেই—নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল তার। টলতে টলতে মাটির ওপরে পড়ে যাচ্ছিল সে। ইতিমধ্যে ডাকবাংলো থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন অমিতা ও

সৌরীনবাবু। প্রমিতার নেতিয়ে পড়া দেহটাকে শক্ত করে চেপে ধরে সৌরীনবাবু তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন মুকুর মুখের পানে। তারপর স্থির গম্ভীর গলায় বললেন, বল কী হয়েছে?

মুখ কাচুমাচু করে মুকু বললে, একটা এ্যাক্সিডেন্ট্ হয়েছে কর্তাবাবু। পা পিছলে একটা খাদের মধ্যে পড়ে গিয়েছে দাদাবাবু।

খাদের মধ্যে পড়ে গিয়েছে! —বিস্ফারিত চোখে তাকালেন সৌরীনবাবু। —ওকে উদ্ধার করার কোন চেষ্টা করেছিলে কী?

ওটা যে অপদেবতার ঠাঁই হুজুর! —মুকু কাতর স্বরে বললে। —ওখানে হাতিরা বসবাস করে। ওখানে যাওয়া মানে অপদেবতা ও হাতিদের খপ্পরে পড়া।

ওকে উদ্ধারের কোন চেষ্টা তুমি কর নি তা হলে! চাপা কঠোর স্বরে বললেন সৌরীনবাবু। —তোমাকে বিশ্বাসী ও কর্তব্যপরায়ণ বলে জেনে এসেছি এত কাল —তুমি যে এমন কাপুরুষ তা আমার জানা ছিল না। ওকে ওখানে ফেলে রেখে চলে আসতে লজ্জা করল না তোমার!

কাঁদো কাঁদো হয়ে মুকু বললে, তুরাম, মানে আমাদের গাইড্, সে নেমে গিয়েছে খাদের মধ্যে। অপদেবতাকে ও ভয় পায় না—একঘরে হওয়ার ভয়ও ওর নেই। দাদাবাবু বেঁচে থাকলে ওকে নিয়ে আসবে বলেছে।

—একঘরে হওয়ার ভয়! একঘরে হওয়ার প্রশ্ন উঠছে কোত্থেকে?

—ঐ অপদেবতার ঠাঁইতে যে যাবে, আমাদের সমাজের লোকেরা তাকে একঘরে করে দেবে। আমাদের গাঁয়ের পুরুত বলছিল—

—থামলে কেন, বল কী বলছিল তোমাদের গাঁয়ের পুরুত?

একটু ইতস্ততঃ করে মুকু বললে, বলছিল যে দাদাবাবুকে অপদেবতারা টেনে নিয়েছে—ওকে যে উদ্ধার করার চেষ্টা করবে, অপদেবতারা তাকেও টেনে নেবে।

আগুনের মত ঝলসে উঠল সৌরীনবাবুর চোখ দুটি। মুকুর একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে বললেন, চল, তোমাদের অপদেবতাদের সঙ্গে মোকাবিলা করে আসি। শমিতকে যদি উদ্ধার করতে না পারি, ঐ অপদেবতাদের ঠাঁইতেই তোমাকে ঠাঁই নিতে হবে জেন।

অমিতা বললেন, ও কী বলছ তুমি!

—ঠিকই বলেছি, আমার কাছে কাপুরুষতার কোন ক্ষমা নেই।

সৌরীনবাবুর বুকে মাথা রেখে প্রমিতা বললে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব বাবা।

প্রমিতার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে সৌরীনবাবু বললে, যাবে বই কি মা, তোমার মাও যাবেন। আমরা সকলে মিলে উদ্ধার করে নিয়ে আসব শমিতকে।

॥ এগারো ॥

দুরন্ত চড়াই, গভীর বন, কিছুই যেন বাধা নয়। পথের দুর্গমতাও যেন টের পাচ্ছে না প্রমিতা। কী একটা দুর্বার শক্তি তাকে টেনে নিয়ে এসেছে। রেবুনা-পলাশপালে যখন তারা পৌঁছাল, তখন গভীর রাত। এত রাতে আর এগোনো যাবে না শুনে অস্থির হয়ে উঠল প্রমিতা। সৌরীনবাবুকে সে বললে, এখানে রাত কাটালে যে অনেক দেরি হয়ে যাবে বাবা!

সৌরীনবাবু বললেন, তা জানি মা, কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যে ঐ ভয়ঙ্কর খাদের খাড়াই বেয়ে নামতেও তো পারব না আমরা।

মুকু হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, ঐ যে তুরাম আসছে—ওর কাছেই দাদাবাবুর খবর জানতে পারব আমরা।

মশালের আলোয় তুরামের বিষণ্ণ গম্ভীর মুখখানা দেখতে পেল প্রমিতা। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁপে উঠল তার বুকের ভেতরটা—সৌরীনবাবুকে জড়িয়ে ধরে অস্ফুট কণ্ঠে সে বললে, দেখছ বাবা, কী রকম করে তাকিয়ে আছে লোকটা! তবে কী... তবে কী...

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে সৌরীনবাবু বললে, চুপ কর্ মা, কান্নার অনেক সময় পাবি। এখন শোন্ লোকটা কী বলছে।

তুরামের হাতে ছিল একটা খাকী রঙের ক্যানভাসের থলি। শমিতের নিত্য সঙ্গী ছিল এই থলিটা। যখনি কোন ভূতাত্ত্বিক পরিক্রমায় বেরিয়েছে, তখনি থলিটি সঙ্গে নিয়েছে সে। এই থলিতে রাখ্‌ত সে তার কম্পাস, নোট বই, পাথর পরীক্ষা করার আতস কাচ এবং পাথর ও খনিজের নমুনা। থলিটা সৌরীনবাবুর হাতে দিয়ে তুরাম বললে, এই থলিটা ছাড়া আর কিছুই পাই নি।

শমিতকে খুঁজে পাও নি? —ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন সৌরীনবাবু।

—না। দাদাবাবু যেখানে পড়েছিল, সে জায়গাটা একটা ময়দানের মত। মাঝখানে একটা পুকুর। অজস্র বুনো কলাগাছ জায়গাটাকে ছেয়ে ফেলেছে। এই থলিটা একটা কলাগাছের নীচে পেয়েছি। ওখানেই বোধহয় পড়েছিল দাদাবাবু।

—কিন্তু কোথায় গেল ও?

—নিজে থেকে যাবার ক্ষমতা কী আর ছিল ওর! প্রায় এক হাজার ফুট নীচে পড়েছিল সে। আমার মনে হয় হাতিরা ওর দেহটাকে সরিয়ে ফেলেছে।

—দেহটাকে সরিয়ে ফেলেছে! তুমি কী মনে কর—

—হ্যাঁ হুজুর; আমার মনে হয় দাদাবাবু আর বেঁচে নেই। হাতিরা ওর মৃতদেহটাকে সরিয়ে ফেলেছে। কোথায় সরিয়ে ফেলেছে তা অবশ্য জানি না। আমি খোঁজার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু হাতিরা আমাদের বাধা দিয়েছিল।

সৌরীনবাবু তুরামের একটি হাত চেপে ধরে বললেন, চল, আমরা সকলে মিলে গিয়ে খুঁজি। এতগুলো লোককে একসঙ্গে দেখলে বাধা দিতে সাহস পাবে না ওরা।

মাথা নেড়ে তুরাম বললে, না হুজুর, তাতে কোন লাভ হবে না। একসঙ্গে এত লোককে দেখলে বরঞ্চ ক্ষেপে গিয়ে আক্রমণ করতে আসবে। হাতিরা খুব গোপন জায়গায় তাদের মৃতদেহ লুকিয়ে রাখে। সে জায়গা খুঁজে পাওয়ার সাধ্য মানুষের নেই। দুনিয়ার কোথাও কেউ সে জায়গা খুঁজে পেয়েছে বলে শুনি নি।

মুকু বললে, সে জায়গা কেউ খুঁজে পেলে সে বড়-লোক হয়ে যেত হুজুর। একসঙ্গে এতগুলো হাতির দাঁত পেয়ে যেত যে—অনায়াসে কোটিপতি হতে পারত সে।

না না, এ হতে পারে না। —প্রমিতা অবরুদ্ধ স্বরে বললে। —শমিতদা বেঁচে নেই এ কিছুতেই হতে পারে না। চল বাবা, আমরা যাই ঐ হাতির আস্তানায়।

প্রমিতার কাছে এগিয়ে এসে তুরাম বললে, কোন লাভ নেই দিদিমণি—কেন মিছিমিছি নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করবে তোমরা!

প্রমিতা আর কিছু বলে না। সৌরীনবাবুর বুকে মুখ রেখে নিঃশব্দে কেঁদে চলে সে শুধু।

॥ বারো ॥

শমিতের ভীমটাঙ্গোর অভিযানের বিবরণ পড়ে-ছিলাম আমি একটি ভূতত্ত্ব-বিষয়ক সাময়িকপত্রে। শমিতের দিনলিপি অবলম্বন করে বিবরণটি লিখেছিল প্রমিতা মিত্র।

বিবরণটি পড়ে আমার আগ্রহ হল ভীমটাঙ্গোরে যাবার। ক্রোমাইটের ভান্ডার বা নিকেলের সম্ভাবনা আমাকে আকৃষ্ট করে নি, আমাকে কৌতূহলী করে তুলেছিল সেখানকার উদ্ভিদের সমাবেশ। মাটির ওপরে গাছপালা মাটির নীচে লুকোনো খনিজসম্পদকে কী-ভাবে ব্যক্ত করে তুলেছে স্বচক্ষে তা দেখে আসতে ইচ্ছে হল আমার।

শমিতের অভিযানের বৃত্তান্তের মধ্যে পথের বর্ণনাও ছিল। সেই পথ অনুসরণ করে একদিন বিকেলে রেবুনা-পলাশপালে গিয়ে পেঁছিলাম।

রেবুনা-পলাশপালে পেঁছে ভীমটাঙ্গোরে যাবার জন্য পথপ্রদর্শক খুঁজছি, এমন সময় আলাপ হয়ে গেল আমার প্রমিতা মিত্রের সঙ্গে। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়ে সে একটি মাটির কুঁড়েঘরে থাকে।

আমাকে তার ঘরে নিয়ে প্রমিতা চা খাওয়ালো এবং শমিতের সংগ্রহ করা ক্রোমাইট ও নিকেলযুক্ত মাটির নমুনা দেখালো। ভীমটাঙ্গোরে যাবার জন্য আমি পথ-প্রদর্শক খুঁজছি জেনে সে বললে, পথপ্রদর্শক বোধহয় আমি ঠিক করে দিতে পারব।

বলে সে ঘরের এক কোণে বসে থাকা একজন আদিবাসী বৃদ্ধকে উদ্দেশ্য করে বললে, তুরাম ভাই, ইনি ভীমটাঙ্গোরে যেতে চান। পারবে তুমি এঁকে নিয়ে যেতে?

আমি!—কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে প্রমিতার মুখের দিকে চেয়ে থেকে তুরাম বললে, তুমি তো জান দিদি-মণি, তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাই নে আমি। যদি বল, আর কাউকে ঠিক করে দিতে পারি এঁর সঙ্গে যাবার জন্য।

আর কতদিন আমাকে আগলে রাখবে তুরাম ভাই? —ম্লান হেসে বললে প্রমিতা।

যতদিন বেঁচে আছি।—অবরুদ্ধ স্বরে তুরাম বললে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আমি তা হলে উঠি মিস্ মিত্র।

প্রমিতা বললে, তুমি এঁকে এঁর তাঁবু পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এস তুরাম ভাই।

প্রমিতার ঘর থেকে বেরিয়ে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে হেঁটে আমি তুরামকে প্রশ্ন করলাম, তোমার দিদিমণি একা একা এই বনের মধ্যে পড়ে আছেন কেন তুরাম?

আমার প্রশ্ন শুনে তীক্ষ্মদৃষ্টিতে তাকাল তুরাম আমার মুখের দিকে। তারপর বললে, শমিত রায়ের ব্যাপারটা শুনেছেন তো?

—শুনি নি, পড়েছি। তোমার দিদিমণি শমিত রায়ের ভীমটাঙ্গোর অভিযানের বৃত্তান্ত লিখে একটা পত্রিকায় ছাপিয়েছেন, সেটা পড়ে মোটামুটি সব জেনেছি।

তুরাম বললে, দিদিমণির ইচ্ছেমত অনেকবার পাহাড়ের নীচে হাতিদের আস্তানায় নেমেছি, কিন্তু অনেক খুঁজেও শমিতদাদাবাবুর সন্ধান পাই নি। হাতিরা ওর দেহটাকে যে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে কে জানে! শেষপর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে দিদিমণি আর আমাকে ওখানে পাঠায় নি, কিন্তু মনে মনে সে আশা করেছে শমিতদাদাবাবু বুঝি নিজেই ফিরে আসবে। তাই সে এই স্কুলে কাজ নিয়ে এখানে থাকতে শুরু করেছে। সকালে কয়েকঘণ্টা স্কুলে কাটে ওর—তারপর সারাদিন ঘরের সামনের বারান্দায় চুপচাপ বসে থাকে দইতারি পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে।

এর পর আর কোন কথা বললাম না আমি। দূরে আঁধারে ঢাকা দইতারি পাহাড় যেন রহস্যময়। প্রমিতা কী সত্যিই আশা করে যে পাহাড়ের গোপন আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসবে শমিত! এক শিক্ষিত মেয়ের মনেও কী দানা বাঁধতে পারে যুক্তিহীন বিশ্বাস?

পরমুহূর্তে আমার মনে হল তুরাম বোধহয় ভুল করেছে। হয়তো প্রমিতা ঐ দইতারি পাহাড়ের মধ্যেই শমিতের সান্নিধ্য পেয়েছে—পাহাড়কে কাছে পেয়ে কাছে পাচ্ছে শমিতকে। তাই সে থাকতে চায় এই পাহাড়ের কাছাকাছি, কোথাও চায় না যেতে এই পাহাড় ছেড়ে।

• সংবাদ-বিচিত্রা •

পোকা থেকে গাছ?

আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে। 'গুটিপোকা' তোমরা নিশ্চয়ই জান, যা থেকে রঙবেরঙের প্রজাপতি বের হয়। চীন, তিব্বত, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতে এই গুটিপোকা থেকে এক রকম গাছ হয়। তাই সাধারণের চোখে 'পোকা থেকে গাছ'! আসলে ব্যাপারটা কিন্তু আলাদা। 'ছত্রাক' অর্থাৎ ব্যাঙের ছাতা তোমরা সবাই জান। এই গাছগুলো অনেকটা ঐ 'ছত্রাক' জাতের। এখন এই ছত্রাকের খুব ক্ষুদ্র বীজাণু পোকার দেহে প্রবেশ করে এবং সেখানে নিজের জায়গাটা বেশ ভালো ভাবে দখল করে। তারপর বীজাণুটা পোকার দেহ থেকে মাংস ও রস শোষণ করতে থাকে এবং ক্রমে পোকার সমগ্র দেহটা ছত্রাকের অংশে ভর্তি হয়ে যায়। ফলে গ্রীষ্মকালে পোকা যখন মরে যায় তখন খাদ্যাভাবে ছত্রাকও সেই পথ অনুসরণ করে। সেই সময় ছত্রাকের পাশে এক বা একাধিক সরু ডাঁটি মৃত পোকার মুখের মধ্যে দিয়ে গজায়। এবার বুঝলে তো পোকা থেকে গাছের রহস্য!

—বেতাল ভট্ট বিক্রম

সবুজ মন

॥ পূর্ব বাংলার কবিতা ॥

রেজাউল হক আল্‌কাদরী

ছোট্ট খুকী খেলছে একা নাইকো সাথী তার,
দুঃখে সে তার চোখটি মোছে, মনটি কেমন ভার,
কাঠের পুতুল মেয়েটি তার গেছে শ্বশুর-বাড়ী
অনেক দূরে নদীর ওপার, ভাবনা ভীষণ তারই।
মিছেমিছি মাটি-কাদায় গড়ছে নতুন ঘর,
ভাবছে বসে ছেলেমেয়ে সব হয়েছে পর।
তাইতো এবার বুড়ি সেজে চললো জামাই-বাড়ী,
হাতে নিয়ে মণ্ডা-মিঠাই, কুল্‌সী পিঠার হাঁড়ি।
পথ চলতে ভাবনা তাকে পেল ভীষণভাবে—
চিড়ে-মুড়ি নাইকো সাথে নাত্‌নীরা কি খাবে?
এমনি ভাবে চুপটি করে ভাবছে খুকু কত,
কান্না ভরা ঝাপসা চোখে দুঃখ শত শত।
ছোট্ট খুকুর সবুজ মনে জাগছে অনেক কথা,
রঙিন রঙিন স্বপ্ন অনেক ভাঙছে নীরবতা॥

মেষ ও মিঠু সংবাদ

নচিকেতা ভরদ্বাজ

বাহা বাহা ও কালো মেষ
বল না ভাই তোমার কাছে
কত পশম আছে?
হ্যাঁ গো মিঠু, অনেক আছে, অনেক—অফুরান!
অনেক পশম আছে আমার কাছে ঃ
আপাততঃ পুরো পুরো তিনটি থলে ভরা ঃ
একটি আমার প্রভুর জন্য,
গিন্নী মায়ের জন্য একটি রয়েছে ভাগ করা।
কিন্তু ঐ যে চিৎকারে ভ্যাঁ করা
বোকা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে
বাঁকা গলির ঘরে
একটু পশম নেই যে আমার কাছে
রাখিনি ওর তরে।
কিন্তু তোমার জন্য আমি রেখেছি যে
একটি থলে ভরে।

[এডওয়ার্ড লিয়রের কবিতার অনুসরণে]

কর্ণফুলী

॥ পূর্ব বাংলার কবিতা ॥

শামসুল করিম কয়েস

কর্ণফুলী কর্ণফুলী
তোমায় আমি কেমনে ভুলি
বলো!
তিরতিরিয়ে কলকলিয়ে
নূতন আশার হাতছানিতে
সাগর পানে চলো।

তোমায় দেখে মুগ্ধ হলেম
গভীর জলে মুক্তো পেলেম
মিষ্টিজলে সাঁতার কেটে
ভাবনা এলোমেলো।

কর্ণফুলী কর্ণফুলী
জোয়ার এলে যাও গো ফুলি
তোমায় দেখে চলে এলেম
চক্ষু ছলোছলো।

কর্ণফুলী কর্ণফুলী
তুমি আমার রঙিন তুলি
তোমায় দিয়ে আঁকতে গিয়ে
কি জানি কখন্ সহসা মোর
নিশি যে ভোর হলো।

দুষ্টু

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

হৈ চৈ করে যারা তারা নাকি দুষ্টু
অতএব সে কাজটি নিতান্ত মন্দ ঃ
বকাবকি ঝকাঝকি, চেঁচামেচি, গোলমাল
লাফালাফি মাতামাতি সব কর বন্ধ।

ও কথা কইতে নেই, ওদিকে চাইতে নেই
ও মুখো হয়ো না বাপু, ও কাজটি করো না,
বাঁচলে বাপের নামঃ তুমি তো লক্ষ্মী ছেলে
দৌড়ঝাঁপ করে আহা অকালেই মরো না।

আরো নানা ভালো কথা আনিয়ে ও বানিয়ে
কত ভাবে ছেলেদের ভালো করে রাখতে
জীবনের সুখটাই বুজে গেছে বালুতে,
এখন অন্য ওঝা হয় বুঝি ডাকতে!

ভালোর পালের মাঝে তাই আজ খুঁজছি,
কালো মুখ আলো করা দু' একটি দুষ্টু,
মরা ডালে ফোটা তাজা কুঁড়ির মতন
হঠাৎ দেখলে, যারা মন করে তুষ্টু।

শুনে শুনে গোপাল ও সুবোধের গল্প
পচে গেছে দুই কান, ভোঁতা হয়ে গেছে সব
কতদিন ডানপিটে দামাল যে দেখি নাই,
শুনি নাই বলবান কলিজার কলরব!

ভালো থাক্ তাকে তোলা, ভেঙে যাক শান্তি,
বেপরোয়া কণ্ঠের শুরু হোক সোরগোল
রাখাল, গোপাল থাক্—ইন্দ্রজিতেরা কই?
তারাই আসুক নিয়ে ঘুম ভাঙা ডামাডোল।

কতো দূরের পথ

করুণাময় বসু

বল্ না মাগো, পেরিয়ে এলাম
কতো দূরের পথ,
কোথায় গেল বামুন পাড়ায়
মনসাতলার রথ?

বুকের ভিতর কেমন করে,
চোখ যে জলে ভরে,
আর কি ফিরে যাব না কো
গাঁয়ের কুঁড়ে ঘরে?

কোথায় গেল হলুদ বরণ
প্রজাপতির পাখা—
শিশির ভেজা ঘাসের বনে
ছবির মতো আঁকা?

এমন দিনে মনের ভিতর
পিছন দিকে টান,
বাজায় বাউল একতারাতে
আগমনীর গান।

আমের বনে এমন দিনে
দুষ্টু হাওয়ার খেলা,
আকাশ ভরা মেঘের গায়ে
কতো রঙের মেলা।

কিচ্ছু ভালো লাগে না মা,
সত্যি করে বল্,
অমন করে তাকাস কেন,
দুচোখ ভরা জল।

আবোলতাবোল নয়

প্রদীপকুমার চট্টোপাধ্যায়

হুঁকো মুখো হ্যাংলা
বাড়ি তার বাংলা।
মার খেয়ে ঠ্যাংটা ত
করেছে যে ল্যাংড়া॥
তার মামা লালুভুলু
ঘরে বসে দেয় উলু।
তার ছেলে ছোট বুলু
আছে পড়ে হনলুলু॥

একদিন রাত্রে
ট্রেনেতে চাপতে,
পড়ে গেল সোজা সে
ট্রেনের তলায়,
খেল মার দমাদম
এবং আলুর দম,
এসে গেল সোজা সে
কদমতলায়।

তিন সত্যি !

অতীন মজুমদার

[১]

পটল নামটা মন্দ কি আর,
কদর আছে পটল ভাজার।
চোখ দুটিও সবার সেরা
হয় যদি তা' পটল চেরা!
কিন্তু পটল তুলতে ভয়,
কথাটা ত' মিথ্যে নয়!

[২]

বক দাঁড়িয়ে পুকুর পারে
চুপটি করে দেখছি তারে।
নিজে থেকে বক দেখলে দোষ ত' নেই,
গরম হয় মাথা বক অন্যে দেখালেই!

[৩]

বললে সে এক টেকো,—
আমার তেলের এক শিশিতেই
চুল গজাবে দেখো!
শুধাই হেসে তাকে,—
মেখে নিজের টাকে
দেখাও দেখি এক শিশিতে
কেমন চুল গজায়?
বললে টেকো,—ময়রা কি আর
নিজের মিষ্টি খায়!

ল্যাংচা-পটা

তমাল চট্টোপাধ্যায়

মেদ মাংসে পাক্কা দুমন বপুখানি বেশ
স্যুটে বুটে মোটকা পটা পরিপাটি কেশ।
বন্ধুটি তার ল্যাংচা ঘোষাল, ইঞ্চি বিশেক ছাতি
সত্যি বটে দেখতে যেন স্যামসনেরই নাতি।

নাচিয়ে ভুঁড়ি কষিয়ে তুড়ি বললে পটা—শোন্
হাসতে পারি বাইশ মিনিট—এক্ষুণি তুই গোন্।
সর্দি লেগে হ্যাঁচ্চো' করে হঠাৎ যদি হাঁচি
সেন্সরকে ডাকতে হবে চালিয়ে দিতে কাঁচি।
ঘুমিয়ে গেলে নাকটা আমার এতই জোরে ডাকে
ঠক্ঠকিয়ে কাঁপে সবাই, স্মরণ করে মাকে।
আর যদি রাগ মাথায় চাপে, কেউ থাকে না কাছে
প্রাণের ভয়ে পিট্টান দেয় আছাড় মারি পাছে।

তুচ্ছ এসব, আসল কথা বলছি তোকে এই—
খিদে ছাড়া আমার পেটে বাজে কিছুই নেই।
এক এক সময় তাইতো মনে সাধটি জাগে বেশ
দেশের যত খাবার আছে একাই করি শেষ।
জানি তাতে অন্য সবাই হবে আমার বাম
তবু ভাল, বাঁচলে নিজে, থাকবে বাপের নাম।
তাইতো যখন খেতে থাকি ঘন্টা ছ'য়েক বসে'
'আর খাস্না' কেউ বলে তো, লাগাই চাঁটা কষে।

যাক সে কথা; দুঃখ শুধু তোকে দেখেই হয়,
ক্ষীণজীবী তুই, বাঁচবি ক'দিন, এইটুকু যা ভয়।
বিদেশ থেকে কেউ এসে আজ দেখলে তোকে চেয়ে
ভাববে ঠিক দুর্ভিক্ষেই দেশটা গেছে ছেয়ে।

মুচ্কি হেসে ল্যাংচা বলে—ভাবনা তাতে কি রে!
কারণটা সে বুঝবে—যখন দেখবে তোকে ফিরে।

আশ্বিন

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

কে বাজালো আলোর বাঁশি
মন মাতানো সুরে
কে ছড়ালো ফুলের হাসি
মাটির ভুবন জুড়ে?
শিশির দিয়ে আলপনা কে
আঁকলো ঘাসের বুকে
খুশীর পরশ ছড়িয়ে দিলো
সবার চোখে-মুখে?

হালকা হাওয়ায় কে ভাসালো
শুভ্র মেঘের ভেলা
আকাশ-বাতাস-মাটিতে আজ
খেলছে কে এই খেলা?
কার আবাহন-শঙ্খ বাজায়
পল্লী-বালা যত?
আশ্বিনে আজ ভরা শরৎ,
তাই আয়োজন এত॥

আনারপুরের তামাক

—ধীরেন বল

নতুন তামাক সাজিয়ে নিলাম আনারপুরী,
আয় হারাধন, আয় না এখন গল্প জুড়ি!
সহর থেকে এই ত জহর আনলো কিনে,
অনেক ঘুরে এনেছে ঠিক জিনিস চিনে।
ও তারাদাস, কোথা যাস তুই? কিসের তাড়া?
আয় দুটো টান টেনেই যা না, একটু দাঁড়া!
ব্যস্ত নাকি? আজ বুঝি তোর জামাই এলো?
আমায় বলো কি কাজ বাকি,—চলেই গেলো?
হেই কালাচাঁদ কী তোর ফ্যাসাদ? শোন্ না হেথা,
এই বোশেখে লাগিয়ে দেনা ছেলের বে'থা।
শোন্ না বাপু, কোন্নগরেই করবি পাকা,
যেমন মেয়ে, দান যৌতুক, তেমনি টাকা!
চললি বুঝি? না হয় দুটান টেনেই যা' না,
তারপরে ঘোর চরকিবাজী—নেইকো মানা।

তালুকদার না? ভালুক মেরে ফিরলে বুঝি?
তোমার কাছে ঢের শিকারের গল্প পুঁজি,—
তামাক টানো, গল্প বলো বেশ রসিয়ে,
তিনটা ভালুক মারলে বুঝি এইটা নিয়ে!
শুনলো নাকো, আচ্ছা যাক ও'—ফিরবে পুনঃ;
বন-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরেই হচ্ছে বুনো!
ডেকেছিলাম বসতে শুধু মিনিট কতো,
তামাক খেয়ে চলেই যেতো রোজের মতো।
আবার কে যায়? হাবার পিসে? শুনছো কথা?
খাবার তরেই ডাকছি রে ভাই,—নয় অযথা!
দুর্ দুর্ সব যাক চলে যাক জাহান্নমে,
আনারপুরের তামাক এনেই গেলাম দমে!
কেউ খেলো না, কেউ এলো না খেয়াল-খুশী,
ইচ্ছে করে চিতিয়ে ফেলে চালাই ঘুষি!

টানবি তামাক, বকবি ত সেই এলেমেলো,
এদিকে মোর তামাক বুঝি পুড়েই গেলো!!

নীল সায়রের অতল জলে

সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের সাতাশে জুন তারিখে আমেরিকার বিশিষ্ট পত্রিকা 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড-এ একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হল : 'স্কোটিয়া জাহাজের উপর সাগর-দানবের আক্রমণ'

জাহাজটি লিভারপুল থেকে নিউইয়র্ক আসছিল। হঠাৎ একটি সাগর-দানব তাকে আক্রমণ করে। জাহাজের একটা দিকে বিরাট ক্ষত দেখা যায়। সৌভাগ্যবশত জাহাজটি জলমগ্ন হয়নি, এবং কোনো রকমে তাকে বন্দরে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। যে নাবিকেরা জাহাজে ছিল, তাদের চাক্ষুষ বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সাগর-দানব আকৃতিতে প্রায় তিনশ ফুট লম্বা। চোখ দুটিতে ছিল আগুনের হলকা।

এই থেকেই সুরু। তারপর চলল সাগর-দানবের অপ্রতিহত ধ্বংসলীলা। আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ সাগরে এক বছরের মধ্যে দু'শ জাহাজ ডুবে গেল। দু-একজন নাবিক যারা মৃত্যুর বিভীষিকা থেকে কোনো রকমে বেঁচে এল, তাদের কাছে শোনা গেল, একই সাগর-দানবের একই কীর্তি।

এর প্রতিকার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমেরিকা সরকার একটি বিরাট যুদ্ধ-জাহাজ তৈরি করলেন। নাম তার 'এব্রাহাম লিংকন'। তাদের নাবিক ও কাপ্তেন দানবের সঙ্গে মোকাবিলা করবেন। মানুষের মনে একই সঙ্গে আশা আর নিরাশার দোলা। ঠিক এই সময় ফরাসী বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক পিয়ার এরোঁনা এ বিষয়ে

আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন। সমুদ্রের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয়। তিনি সাগ্রহে 'এব্রাহাম লিঙ্কন' জাহাজে পর্যবেক্ষক রূপে যাত্রী হতে রাজী হলেন। আর তাঁর সঙ্গে চললেন তাঁরই অনুচর টেরে।

জাহাজের কাপ্তেন ফ্যারাগুট সাদর আহ্বান জানালেন অধ্যাপককে। হাজার হাজার লোক জাহাজ-ঘাটে জমায়েত হয়েছেন। তাদের গগনবিদারী হর্ষধ্বনির মাঝখানে জাহাজ যাত্রা সুরু করল।

নির্মল মেঘমুক্ত আকাশ। সমুদ্র নিস্তরঙ্গ। কাপ্তেন ফ্যারাগুট কৃতসংকল্প—সাগর-দানবের কবল থেকে তিনি মানুষকে রক্ষা করবেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, যে নাবিক সবার আগে দানবকে দেখবে, তাকে তিনি পনেরো হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন। তাঁর বড় ভরসা নেডল্যাণ্ডের উপর। নেডল্যাণ্ড পৃথিবীর সেরা হার্পুনিষ্ট। হার্পুন দিয়ে সে শত শত তিমি মাছ ঘায়েল করেছে। শরীরে তার অমিত শক্তি। সে কখনো লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয়নি।

আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছল। তারপর বিষুবরেখা পেরিয়ে চীনের সমুদ্রে। জ্যোৎস্নালোকিত আকাশ। মাঝে মাঝে সাদা মেঘের ভেলা। অধ্যাপক এরোঁন, তাঁর সঙ্গী টেরে এবং নেডল্যাণ্ড ডেকে বসে গল্প করছেন। হঠাৎ নেডল্যাণ্ড পাগলের মতো চীৎকার করে উঠল, "ঐ আসছে।" জাহাজের প্রত্যেকে সেই শব্দ শুনে সচকিত হয়ে উঠল।

দূরে একটি দানব তীব্রগতিতে ছুটে আসছে। দুটি বিরাট চোখে আগুনের দীপ্তি। কাপ্তেন আদেশ দিলেন, "সকলে চুপ কর। আমরা দানবের বিপরীত দিকে জাহাজ চালাব।"

কিন্তু এড়াবার পথ নেই। কী বিপুল তার বেগ! দানব জাহাজটির প্রায় কাছে এসে পড়েছে। কাপ্তেন গোলন্দাজদের প্রতি আদেশ দিলেন কামান দাগতে।

আর তার পর মুহূর্তেই কামানের গর্জন শোনা গেল। চারদিকে শুধু রুদ্রদীপ্তি আর গগনবিদারী শব্দ। ধোঁয়ায় সব কিছুই ঢাকা। কিন্তু কই, দানবের তো কোনো কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কামানের গোলায় যার ক্ষতি হয়নি, হার্পুনে তার কী হবে? কিন্তু তবুও নেডল্যাণ্ডের হাতে দীর্ঘ হার্পুনটি ঝলসে উঠল। দানব এবার তীব্রগতিতে জাহাজটির উপর এসে আক্রমণ করল। জাহাজটি একদিকে হেলে পড়ল। আর বুঝি রক্ষা নেই!

অধ্যাপক সমুদ্রবক্ষে ছিটকে পড়লেন। সাহায্যের জন্যে তিনি আকুল আহ্বান জানালেন। কিন্তু চারদিকে মত্ত জলরাশি। তিনি ডুবে যাচ্ছেন। চারদিকে মৃত্যুর বিভীষিকা। হঠাৎ দেবদূতের কণ্ঠ শোনা গেল, "আপনি এই কাঠটা ধরে থাকুন।" না, দেবদূত নয়। তাঁরই সঙ্গী টেরে।

"জাহাজটি কী ডুবে গেছে?" প্রশ্ন করলেন অধ্যাপক।

"ঠিক বলতে পারি না। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না।"

দুজনে কাষ্ঠখণ্ডটি আঁকড়ে ধরে আছেন। মাঝে মাঝে তাঁরা চীৎকার করে বলছেন, "রক্ষা কর, রক্ষা কর।"

একটা যেন সাড়া পাওয়া গেল। অধ্যাপক আর পারছেন না। তাঁর হাত ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে এসেছে। হঠাৎ দুটি সবল হাতে তাঁকে ধরে ফেললে নেডল্যাণ্ড। সে অত্যন্ত শান্তকণ্ঠে বললে, "অধ্যাপক, ভয় করবেন না। পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ান।" না, রসিকতা নয়। তাঁরা তিনজনই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। পায়ে শক্তমতো কী ঠেকল। মাটি নয়, লোহার পাত। পরীক্ষা করে দেখা হল। অনেকটা তাঁরা হেঁটে গেলেন। তাঁরা দানবের গায়ের উপরই হাঁটছেন। অধ্যাপক ভালো করে পরীক্ষা করে বললেন, "এটা দানব নয়। এ একটা সাবমেরিন। ডুবো জাহাজ।"

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল টেরে আর নেডল্যাণ্ড।

অধ্যাপক একটু হেসে বললেন, "সাবমেরিন হচ্ছে এমন একটি জাহাজ যা জলের নীচে থাকতে পারে।"

এতোদিনে সমস্যার সমাধান হল। যে সাগর-দানব শত শত জাহাজ ধ্বংস করেছে সেও একটা জাহাজ মাত্র।

হঠাৎ সাবমেরিনটি নড়ে উঠল। তাঁরা তিনজন উপরকার রেলিং ধরে রইলেন। শুধু ভয়, আরও গভীর জলে না টেনে নিয়ে যায়। সৌভাগ্যবশত সাব-মেরিনটি আরও অতলে তলিয়ে গেল না।

কিন্তু ঘণ্টার পর ঘন্টা তো আর অমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। সাবমেরিনটি জলের তলায় চলে যেতে পারে যে কোনো সময়। তাছাড়া কারা সাবমেরিনে থাকে, কেনই বা তারা মানুষের শত্রু, এবং কেনই বা তারা শত শত জাহাজ ধ্বংস করে যাচ্ছে, সে সম্বন্ধেও কৌতূহল তো কম নয়।

রাত্রি কেটে গেল। প্রভাতসূর্য দেখা দিল। সাব-মেরিনটিও এবার ডুবতে সুরু করল। মৃত্যু আসন্ন। নেডল্যাণ্ড পাগলের মতো হাত-পা ছুড়তে লাগল।

হঠাৎ থেমে গেল সাবমেরিনটি। দরজা দিয়ে একটি লোক বেরিয়ে এল। তিনজন অপরিচিত লোক দেখে সে চীৎকার করে আবার ভিতরে ঢুকে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পাঁচজন লোক বেরিয়ে এল। তাদের হাতে পিস্তল। নেডল্যান্ডের শত্রুর হাতে পড়ার এতোটুকু ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তারা নিরস্ত্র। সারারাত জলে থেকে শ্রান্ত, অবসন্ন। অধ্যাপকও তাকে বাধা দিতে নিষেধ করলেন।

তাঁরা তিনজন ধীরে ধীরে লোহদ্বারপথে সাবমেরিনে প্রবেশ করলেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। চারদিকে নিঃসীম অন্ধকার। সিঁড়ি দিয়ে নামবার পর একটি সবল হাত তিনজনকে একসঙ্গে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিল।

সেখানেও অন্ধকার। টেরে জিজ্ঞাসা করল, "এরা কারা বলে মনে হয়?"

নেডল্যান্ড দৃঢ়তার সঙ্গে বললে, "এরা সব জলদস্যু। কিন্তু আমাকে অত সহজে কাবু করা যাবে না।"

অন্ধকারে সে হাতড়াতে লাগল। হাতে তার ছুরি। আধঘণ্টা এমনিভাবে চলল। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে তাঁদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। দরজা খুলে দুজন লোক ঢুকল। তাদের মাথায় শুশুকের চামড়ার টুপি, আর পায়ে সীলমাছের চামড়ার জুতো। তাদের একজন দীর্ঘকায়। তাঁকে দেখলেই মনে সম্ভ্রম জাগে। মনে হল, ইনিই সম্ভবত সাবমেরিনের অধিনায়ক। অধ্যাপক প্রথমে ফরাসী ভাষায়, এবং পরে ইংরেজীতে নিজের এবং সঙ্গীদের পরিচয় দিলেন। কিন্তু দীর্ঘকায় ব্যক্তি কোনো কথাই বললেন না। শুধু অপলক দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

নেডল্যান্ড দীর্ঘকায় ব্যক্তির সঙ্গীকে হঠাৎ আক্রমণ করল। তখন দীর্ঘকায় ব্যক্তি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ইংরেজীতে বললেন, "ওকে ছেড়ে দিন। আপনারা আতিথেয়তার অপমান করছেন।"

নেডল্যান্ডের হাত শিথিল হয়ে এল। দীর্ঘকায় ব্যক্তি তখন বললেন, "আপনারা আমার শত্রু। কী কারণে আপনারা আমার জাহাজের উপর আক্রমণ করেছেন?"

অধ্যাপক উত্তর দিলেন, "আমাদের কোনো অপরাধ নেই। আমরা মনে করেছিলাম, আমরা সাগর-দানবের সঙ্গে লড়াই করছি। তাই আমাদের কাপ্তেন গুলি-গোলা ছুঁড়েছেন।"

দীর্ঘকায় ব্যক্তির কণ্ঠে উত্তাপ, "আপনাদের আমি আমার জাহাজের বাইরে রেখে আসব। আপনারা জলে ডুবে যাবেন।"

অধ্যাপক বললেন, "এ কাজ একমাত্র অসভ্য লোকেরই পক্ষেই সম্ভব।"

"আমি আপনাদের মতো সভ্য মানুষ নই। আমি যখন এই সাবমেরিনটি তৈরি করেছিলাম, তখন আমাকে সরকারী কর্তৃপক্ষ বললেন, আমরা আপনার সাবমেরিনের গোপন তথ্যটি জানতে চাই। আমি কিছু বলিনি। কারণ তারা তাহলে শত শত সাবমেরিন তৈরি করে তাদের শত্রু-জাহাজগুলি ধ্বংস করে ফেলত। এই অপরাধের জন্যে তারা আমাকে বন্দী করে রাখল, আমার স্ত্রী ও সন্তানদের না খেতে দিয়ে তিলে তিলে হত্যা করল। আমি একদিন সবার অলক্ষ্যে পালিয়ে গেলাম। সে দিন থেকে আমি আপনাদের—তথাকথিত সভ্যমানুষের শত্রু।" কাপ্তেনের মুখ রাগে আর ঘৃণায় বিকৃত হয়ে উঠেছে।

তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে তিনি বললেন, "অধ্যাপক এরোঁনা, আমি আপনি বা আপনার এই দুই বন্ধুকে হত্যা করব না। সমুদ্র সম্পর্কিত আপনার গবেষণার বই আমি পড়েছি, এবং মুগ্ধ হয়েছি। আমি আপনাকে আমার জাহাজের সব কিছুই দেখাবো।"

অধ্যাপকের মুখ আনন্দে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল। "আপনাকে কী নামে সম্বোধন করব?" শুধালেন অধ্যাপক।

"আমার নাম কাপ্তেন নিমো, আর আমার সাবমেরিনের নাম নটিলাস। আপনারা ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। আসুন, আমরা প্রাতরাশ খেয়ে নি।"

কাপ্তেন নিমোকে তাঁরা অনুসরণ করলেন। খাবার ঘরটি সুসজ্জিত। চারপাশে সুন্দর ছবি। বাসনপত্র ঝকঝক করছে। সকলে বসলেন। অধ্যাপক একটু কৌতূহলের সঙ্গে খাদ্যদ্রব্যের দিকে তাকাতে কাপ্তেন নিমো বললেন, "আপনাদের দ্বিধার কোনো কারণ নেই। সামুদ্রিক খাদ্য পৃথিবীর খাদ্যের চেয়ে অনেক বেশী পুষ্টিকর। ঐ থালায় রয়েছে শুশুকের মেটে। এখানকার চিনি উত্তর সাগরের শ্যাওলা দিয়ে তৈরী। দুধ হল তিমি মাছের। আর ঐ মাংসটা অক্টোপাসের।"

নেডল্যান্ড ও টেরের মুখে একটু ভয়ের আভাস। কিন্তু খাওয়া সুরু হতেই আর ভয়ের চিহ্ন রইল না।

খাবার পর কাপ্তেন নিমো তাঁদের নিয়ে গেলেন লাইব্রেরীতে। প্রচুর বই আর প্রচুর আরামের ব্যবস্থা। তার পাশের ঘরে সামুদ্রিক প্রাণী ও গাছপালার

মিউজিয়াম। অধ্যাপকের চোখে-মুখে অপূর্ব বিস্ময় আর অপার আনন্দ।

কাপ্তেন নিমো বললেন, "আমি নিজের হাতে এ সব সংগ্রহ করেছি। আমি পৃথিবীর সবকটা সমুদ্রে হানা দিয়েছি।"

তারপর কিছু কিছু যন্ত্রপাতির দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বললেন, "এই সব যন্ত্র দিয়ে আমি জাহাজের গতি ও দিক নির্ণয় করতে পারি। এই যন্ত্রটা দিয়ে বুঝতে পারি আমরা কোন্ অঞ্চলে আছি।"

তারপর সবাই গেলেন ইঞ্জিনঘরে। সেখানে বিদ্যুৎ তৈরীরও কারখানা রয়েছে।

টেরে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, "আপনি গোপনে কোথায় এতো বড় জিনিসটা তৈরি করলেন?"

নিমো উত্তরে বললেন, "একটি নির্জন দ্বীপে আমি ও আমার কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচর মিলে এটা তৈরি করেছি। প্রত্যেকটি জিনিস পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে এনেছি। আর খরচ পড়েছে কয়েক কোটি টাকা।

তার পরের দিন। নিমো অধ্যাপক, টেরে, এবং নেডল্যান্ডকে ডেকে বললেন, "আমরা বর্তমানে জাপানের কাছে।"

এই বলে তিনি একটি আলো জ্বাললেন। আর সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের প্রায় এক মাইল দূরবর্তী স্থান আলোকিত হয়ে উঠল। হাজার হাজার সামুদ্রিক মাছ, হাঙর, অক্টোপাস আর নাম না জানা প্রাণী। অধ্যাপকের দেখে দেখে আর আশ মেটে না।

নিমো বললেন, "আজ আমার সঙ্গে চলুন। কিছু শিকারের প্রয়োজন। আমি এমন বন্দুক আবিষ্কার করেছি যা সমুদ্রের জলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।"

প্রাতরাশ শেষ করেই তাঁরা ডুবুরীর পোশাক পরে নিলেন। যাতে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের অসুবিধা না হয়, তাই অক্সিজেনের যন্ত্র নাকে মুখে লাগিয়ে নেয়া হল। প্রথমে এই অদ্ভুত ভারী পোশাক পরে অধ্যাপক এক পাও এগোতে পারছিলেন না। নিমো তাঁকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চললেন। নটিলাস থেকে সার্চলাইট ফেলা হল। এবার চারদিক দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল। সমুদ্র থেকে বহু মাইল নীচে মাটির বুকে তাঁরা হাঁটছেন। চারপাশে নানা রঙের গাছ আর ফুলের সমারোহ। সহসা একটা বিরাট মাকড়সা অধ্যাপককে আক্রমণ করল। নিমো তাঁর বন্দুকের বাঁট দিয়ে তাকে আঘাত করতেই সে ধড়ফড় করে মারা গেল।

নিমো তাঁর বন্দুক দিয়ে একটা বিরাট শুশুক মেরে ফেললেন। বেশ কয়েকদিন মাংস খাওয়া যাবে। কিছুক্ষণ বাদে সোঁ সোঁ শব্দ শোনা গেল। নিমো, তাঁর তিন সঙ্গীকে নিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়লেন। অধ্যাপক দেখেন, আশেপাশে প্রায় বিশ পঁচিশটা হাঙর ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের বিরাট হাঁ আর দাঁতের বহর দেখে সকলেরই আত্মারাম খাঁচাছাড়া। সৌভাগ্যবশত হাঙরগুলো অন্য দিকে চলে গেল। নটিলাসে ফিরে গিয়ে অধ্যাপক হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

কয়েক দিন বাদে নিমো এসে বললেন, "আমরা এখন ভারত মহাসাগরে। সিংহল খুবই কাছে। যদি আপনারা ইচ্ছে করেন, তাহলে মুক্তো তোলা দেখতে পারেন। তবে একটা অসুবিধে—এখানে বড় বেশী হাঙরের উৎপাত।"

অধ্যাপকের উৎসাহে একটু ভাঁটা পড়ল। তবে কৌতূহলও যে একেবারে নেই তাও নয়। আবার ডুবুরীর পোশাক পরে তাঁরা সমুদ্রের নীচে এসে পৌঁছলেন। চারদিকে শুধু শামুকের মতো শুক্তি। আর তারই মধ্যে লুকিয়ে আছে কোটি কোটি টাকার মুক্তো। অধ্যাপকের একটু লোভ হল। হাত বাড়াতেই নিমো তার হাত সরিয়ে নিলেন। পৃথিবীতে এইসব দামী পাথরের অনেক দাম। কিন্তু তাঁর কাছে এগুলি ভাঙা কাঁচের মতো মূল্যহীন। দূরে একজন ভারতীয় ডুবুরীর পোশাক পরে শুক্তি সংগ্রহ করছে। হঠাৎ সে ভয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। একটা বিরাট হাঙর তাকে আক্রমণ করতে আসছে। তার ল্যাজের ঝাপটায় মানুষটা যেন মরেই গেল। নিমো তাঁর তলোয়ার নিয়ে হাঙরটাকে আঘাত করলেন। হাঙর এবার তার শিকার ছেড়ে নিমোর দিকে এগিয়ে এল।

নেডল্যান্ড দেখল, নিমোর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সে তার বিরাট হার্পুন ছুঁড়ে হাঙরটিকে বিদ্ধ করল। হাঙরের মৃত্যু হল। এবার ভারতীয় লোকটির দিকে এগিয়ে গেলেন নিমো। ভয়ে বেচারা অজ্ঞান হয়ে গেছে। নিমো তাকে একটু চাঙা করে দুহাত উজার করে মুক্তো ঢেলে দিলেন। লোকটির মুখ ঢাকা। কিন্তু নিশ্চয়ই তাতে কৃতজ্ঞতার ঝিলিক ছিল।

নটিলাসে ফিরে এলেন চারজন। নিমো স্বভাবতই উচ্ছ্বাসহীন। কিন্তু নেডল্যান্ড তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছে। তার দিকে একবার তাকিয়ে তিনি বললেন, "ধন্যবাদ।" আর একটি কথাও না বলে তিনি তাঁর কেবিনে প্রবেশ করলেন।

দিনের পর দিন আবার অনির্দিষ্ট যাত্রা। অধ্যাপক

ও টেরে উভয়েই বৈজ্ঞানিক। সুতরাং তাঁদের এটা সুবর্ণ-সুযোগ। কিন্তু নেডল্যাণ্ডের আর ভালো লাগছে না। পালাতে পারলে সে বাঁচে। তাই তার মনে একটুও শান্তি নেই।
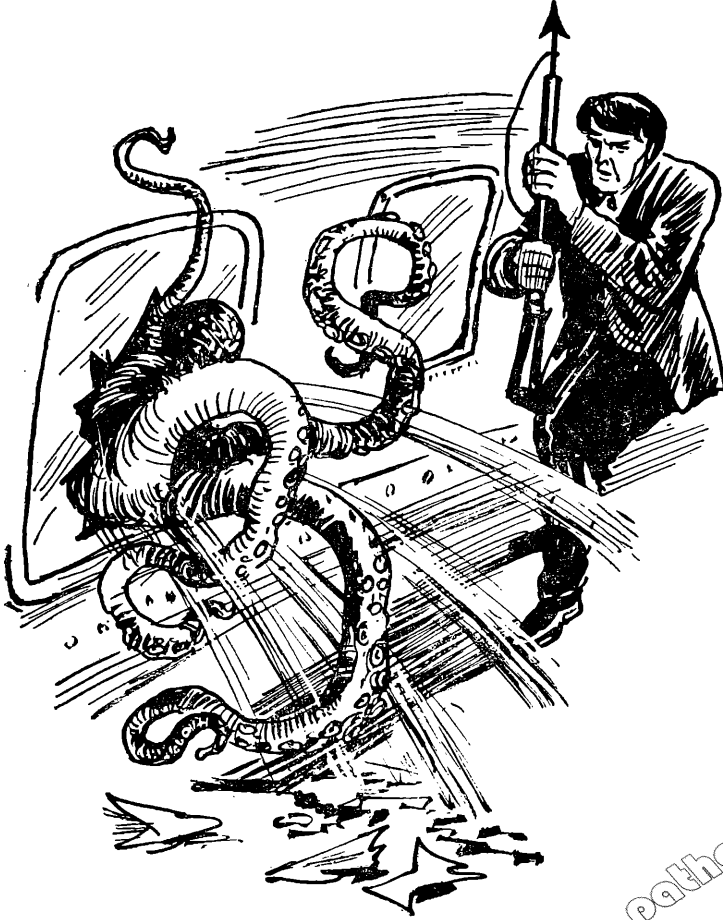
একটা বিরাট অক্টোপাস জানালা ভেঙে...

জাহাজ এখন লোহিত সাগরে। নিমো একান্তে অধ্যাপককে বললেন, "কাল আমরা ভূমধ্যসাগরে পেঁাছব। কিন্তু সুয়েজ প্রণালী দিয়ে নয়। কারণ সেখান দিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে বিপজ্জনক।"

"তাহলে একদিনে আপনি কেমন করে অতদূরে পেঁাছবেন? আফ্রিকা ঘুরে যেতে হলে তো বেশ কিছুদিন লাগবে।" অধ্যাপক বললেন।

নিমো উত্তর দিলেন, "সুয়েজখালের মাটির নীচ দিয়ে যাব। আমি একটা সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করেছি। একবার লক্ষ্য করেছিলাম, লোহিত ও ভূমধ্যসাগরে একই রকম মাছ পাওয়া যাচ্ছে। আমি সুয়েজের কাছে অনেকগুলো মাছ ধরে তাদের গায়ে তামার আংটা পরিয়ে দিয়ে সমুদ্রে ছুঁড়ে দিলাম। কয়েক মাস বাদে সিরিয়ায় গিয়ে দেখি সেই আংটা আঁটা মাছ। তারপর ঠিক সুড়ঙ্গটা খুঁজে পেলাম।"

নিমো স্বয়ং ইঞ্জিনের চাকায় হাত লাগালেন। সুয়েজের মাটির তলা দিয়ে নটিলাস চলল। নিরাপদেই ভূমধ্যসাগরে পেঁাছন গেল। নেডল্যাণ্ড অধ্যাপককে ডেকে বললে, "এবার আমরা ইয়োরোপের খুব কাছে। এখন পালানোর চেষ্টা করা উচিত।"

অধ্যাপক তাতে রাজী নন। যতই আরামে তাঁরা থাকুন না কেন, তাঁরা তো বন্দী। কিন্তু মুক্তির চেয়েও তাঁর কাছে অনেক বেশী মূল্যবান সমুদ্রের তলার জীবন। অনেক কিছু তিনি শিখেছেন। নতুন বই লিখতে শুরু করেছেন। কথাটা ঐখানেই চাপা পড়ল। কিন্তু নেডল্যাণ্ডের মনে অসন্তোষ ক্রমশই ধূমায়িত হয়ে উঠতে থাকে।

আবার যাত্রা হল শুরু। নটিলাস গিয়ে পেঁাছল একটা নির্জন মৃত আগ্নেয়গিরির কাছে। অধ্যাপককে বললেন নিমো, "এই-খানেই আমার পোতাশ্রয়। মাঝে মাঝে নটিলাসের জন্যে রসদ জোগাতে হয়। তাই কয়লা আর সোডিয়াম আমি এখান থেকেই সংগ্রহ করি।"

রসদ সংগ্রহ করে নটিলাস চলল কুমেরু অঞ্চলে। সেখানে শুধুই সাদা বরফের পাহাড়ের রাজ্য। কিন্তু নিমোর কী অদ্ভুত ক্ষমতা। পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে তিনি ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে চললেন। আবার কোথাও পাহাড় কেটে বেরিয়ে গেলেন। আর সেখানে শুধুই শীত। শীতে হাত-পা জমে যাচ্ছে।

কিন্তু নটিলাসের ক্ষমতারও একটা সীমা আছে। এবারে নিমো গিয়ে পড়েছেন কুমেরুর ঠিক মাঝখানে। চার পাশে বরফের পাহাড়ের দুর্ভেদ্য বেড়া। নিমো ঠিক করলেন পাহাড়ের তলা দিয়ে যাওয়া হবে। তাই

হল। কিন্তু নটিলাসের ভিতরে হাওয়া আর অক্সিজেন যেন ক্রমশই ফুরিয়ে আসছে। যাত্রী ও নাবিকদের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু নিমোর অনুচরদের এতোটুকু অনুযোগ নেই। তারা সর্বদাই কর্মতৎপর।

দুর্ভাগ্যের মাত্রা বেড়ে গেল। একটা বিরাট পাহাড় ভেঙে নটিলাসের উপর আটকে আছে। পথ তাই তার অবরুদ্ধ। নিমো অধ্যাপক, টেরে এবং নেডল্যান্ডকে অনুরোধ জানালেন, "আমাদের প্রত্যেককে দিনরাত গাঁইতি আর শাবল দিয়ে পাহাড় কাটতে হবে।"

তাতে কারুর কোনো আপত্তি নেই। সকলে কাজে হাত লাগিয়েছে। কিন্তু অধ্যাপকের মনে নিরাশার দোলা। সমাজ সংসার থেকে বহু দূরে এখানে মরতে হবে। নটিলাসের ভিতরকার হাওয়া প্রায় নিঃশেষিত।

এবারে নিমোর শেষ চেষ্টা। অনবরত জল গরম করে বরফের পাহাড়ের দেয়ালে ঢালা হতে লাগল। তাতেই কাজ হল। বরফ ধীরে ধীরে গলল। নটিলাস সমুদ্রের বুকে আবার ফিরে এল। আবার দিনের আলো আর আকাশের নীলিমা দেখা দিল। হাওয়া আর অক্সিজেন পেতেই সকলে অনেকদিন বাদে প্রাণ খুলে নিঃশ্বাস ফেললেন।

যে অধ্যাপক এতোদিন নিমোর প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ, তিনিও যেন নিমোর সম্বন্ধে একটু সন্দিহান। লোকটা বোধহয় পাগল। না হলে এতোগুলো জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে কেন?

নটিলাস এসে পড়েছে এমন এক জায়গায় যেখানে শুধুই অক্টোপাসের রাজ্য। শত শত অক্টোপাস তাদের সুবিপুল দাঁড়া নিয়ে নটিলাসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

নিমোর মুখ একটু গম্ভীর। একটা বিরাট অক্টো-পাস নটিলাসের জানলা ভেঙে ঢুকে পড়ছে। এবার লড়াই-এর জন্যে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ নেডল্যান্ডের। হার্পুন নিয়ে সে এগিয়ে এল। নিমো সকলের সামনে। হাতে তাঁর কুড়ুল। বন্দুক চলবে না। কারণ অক্টো-পাসের মাংস এতো নরম যে বন্দুকের গুলিতে তার মৃত্যু হবে না। নিমো অক্টোপাসটির একটা দাঁড়ে কোপ লাগালেন। কিন্তু আর একটা দাঁড়া দিয়ে অক্টোপাস একজন নাবিককে ধরে নিয়ে গেল। তার করুণ আর্তনাদ শোনার পর আর তাকে দেখা গেল না। নিমো দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু একটা অক্টোপাসের একটা মাত্র দাঁড়া কাটতে না কাটতেই আর একটা অক্টোপাস আক্রমণ করছে। নাবিকেরা প্রবল বিক্রমে শুধু কোপ দিয়েই চলেছে। চারদিকে রক্তগঙ্গা। চোখেও ভালো দেখা যাচ্ছে না। আর যখনই কোনো অক্টোপাস পালাচ্ছে, তখনই সে স্বভাব অনুযায়ী কিছুটা নীল কালির মতো জিনিস ছড়িয়ে যাচ্ছে।

নেডল্যান্ডের হার্পুন ক্রমাগত এক একটা অক্টো-পাসকে বিদ্ধ করছে। অক্টোপাসের চোখের উপরই তার দৃষ্টি। অন্ধ করে দিতে পারলে আর ভয় নেই। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ শেষ হল। সকলেই শ্রান্ত, ক্লান্ত। কিন্তু নিমো যেন একটু বেশী ম্লান। তাঁর একজন অনেক-দিনের সঙ্গীকে তিনি চিরকালের জন্যে হারিয়েছে।

নটিলাসের যাত্রা আবার আরম্ভ হল। কয়েক-দিন বাদে লক্ষ্য করা গেল, একটা যুদ্ধ-জাহাজ আসছে। আর যুদ্ধ-জাহাজ দেখলেই নিমোর মাথায় রক্ত চড়ে যায়। তখন তাঁর মুখ থমথম করে। কেউ তাঁর সঙ্গে কথা কইতে ভয় পায়। অধ্যাপকের চোখের সামনেই কয়েকটা যুদ্ধ-জাহাজ নিমো বিনা দ্বিধায় ডুবিয়ে দিয়েছেন। অধ্যাপক অনেকটা বন্ধুর মতো। তাই প্রত্যেক বারেই তিনি নিষেধ করেছিলেন।

কিন্তু নিমোর সুস্পষ্ট উত্তর, "আমি যুদ্ধবাজদের শত্রু। যারা মানুষ মারার ব্যবসা করে, তাদের ব্যবসা আমি বন্ধ করে দেব।"

তাই যুদ্ধ-জাহাজটি দেখেই নিমোর মুখ আবার থমথমে। যুদ্ধ-জাহাজ নটিলাসকে দেখেই কামানের গোলাবর্ষণ সুরু করল। নেডল্যান্ড তার হাতের রুমাল উড়িয়ে বুঝিয়ে দিতে চাইল, নটিলাসের তিনজন যাত্রী সভ্য মানুষ। তারা সমাজ সংসারে ফিরে যেতে চায়, সুস্থ জীবন যাপন করতে চায়। যুদ্ধ-জাহাজটিই তাদের রক্ষা করতে পারে।

উৎসাহের প্রাবল্যে নেডল্যান্ড দেখতে পায়নি, ঠিক তার পিছনেই পিস্তল হাতে নিমো। পিস্তলের বাঁট দিয়ে আঘাত করতেই নেডল্যান্ড মাটিতে পড়ে গেল। গর্জন করে উঠলেন নিমো, "যুদ্ধ-জাহাজের ব্যবস্থা করেই তোমার ব্যবস্থা করব।"

এই বলেই নিমো চলে গেলেন। যুদ্ধ-জাহাজের উদ্দেশ্যে পাগলের মতো চীৎকার করে বলে উঠলেন, "যতো গুলিগোলা আছে তোদের ছুঁড়ে যা। তারপর আমার পালা।"

নিমোর আদেশে অধ্যাপক, টেরে এবং নেডল্যান্ড তাঁদের কামরায় ফিরে এলেন। নিমো তাঁদের পিছনে। সুস্পষ্টভাবে বললেন তিনি, "নটিলাসে একবার এলে আর ফিরে যেতে পারা যায় না। আমার ডুবোজাহাজের গোপন তথ্য পৃথিবীতে আমি প্রকাশ হতে দেব না।"

অধ্যাপক নিমোর হাতদুটি ধরে আকুতি জানালেন, “আপনি যুদ্ধ-জাহাজটি ডুবিয়ে দিয়ে শত শত জীবন নষ্ট করবেন না।”

নিমোর কণ্ঠে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির আভাস— “আমার বাবা, মা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের যারা হত্যা করেছে, তাদের আমি ক্ষমা করব না।”

নটিলাস গভীর জলে ডুব দিল। বিদ্যুৎ গতিতে এবার যুদ্ধ-জাহাজের মাঝখানটা ঢুঁ মেরে ফুটো করে দিল। জাহাজটা ডুবছে। চারদিকে অসহায় যাত্রীদের অন্তিম আর্তনাদ। মাস্তুলের উপর ভর করে কয়েকজন ভেসে রইল। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? আস্তে আস্তে সকলে ডুবে গেল। জাহাজটির একটু চিহ্নমাত্র রইল না।

তারপর আট দশ দিন কেটে গেছে। তার মধ্যে নিমোকে একবারও দেখা গেল না। নেডল্যান্ড দেখল, নটিলাস তীরভূমির খুবই কাছে। একসময়ে সে নিমোর কাছ থেকেই শিখেছিল, কী যন্ত্রের সাহায্যে নটিলাসকে জলের উপর ভাসানো যায়।

রাত্রেই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে হবে। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে নেডল্যান্ড ইঞ্জিনঘরে ঢুকে পাইলটের মুখ বন্ধ করবে। তারপর নটিলাসকে জলের উপরে তুলে ছোট্ট নৌকোয় করে তিনজনে ডাঙায় উঠবে। তারপর মুক্তি।

সময় আর কাটতে চায় না। অধ্যাপক ও টেরে কিছু খাবার আর কয়েকটা জলের বোতল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছেন। কিন্তু কোথায় নেডল্যান্ড নটিলাসকে তুলেছে? চারদিকে প্রবল জলোচ্ছ্বাস। সেখানে নৌকো দূরে থাক, সাধারণ জাহাজ পর্যন্ত টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে। নটিলাস মনে হল যেন ডুবে যাচ্ছে। আর সেই ঘন অন্ধকারে মত্তসাগরে ছোট্ট নৌকোয় পাড়ি দিলেন অধ্যাপক, টেরে আর নেডল্যান্ড। ভাগ্য তখন তাঁদের পক্ষে। তাঁরা বহু ঝড়-ঝাপটার পর ডাঙায় এসে পেঁছলেন। পেঁছবার একটু আগে নৌকোটাও ডুবল। সংজ্ঞাহীন অধ্যাপককে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল নেডল্যান্ড।

এখনও অধ্যাপকের মনে প্রশ্ন, নটিলাস কী বেঁচে আছে? নিমো কী এখনও সমুদ্রের নীচে তাঁর সেই পুঞ্জীভূত ক্রোধ, আর অশান্তির জ্বালা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? তাঁর প্রতিহিংসার স্পৃহা কী মিটেছে? কিন্তু কোনোদিনই এর উত্তর মিলবে না।

টুকরো হাসি—একটু হাসো!

—রাম চট্টখুণ্ডী

॥ এক ॥

খোকা—বাবা, তুমি তো আমায় উপদেশ দিয়েছিলেঃ কোন দিন কারো দলে ভিড়বে না। দলে ভিড়লেই মনে আসে নানা কুমতলব—আর তাতেই হয় সর্বনাশ।

বাবা—হ্যাঁ, সে কথা তো তোমায় বহুবার বলেছি এবং এখনও বলছি।

খোকা—সেই জন্যেই তো আমাদের ক্লাসের সব ছেলেরা যখন দল বেঁধে প্রমোশন নিয়ে ওপর ক্লাসে চলে গেলো, আমি তখন তাদের দলে ভিড়িনি।

॥ দুই ॥

একটি ছেলেকে পড়াবার জন্যে রোজই বিকালে তার বাড়ী যেতে হয় আমাকে। প্রায় এক বছর পড়াচ্ছি ছেলেটিকে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাকে কোন দিন “হোম টাস্ক” করাতে পারিনি। সেদিন ছেলেটি ‘ফুটবল ফাইন্যাল’ খেলা দেখতে যাবে বলে ছুটি চাইলো। তাকে বললাম, ‘তুমি আজ যেমন খেলাটি দেখবে, ঠিক তেমনি একটি বর্ণনা লিখে যদি পরের দিন আমায় দেখাতে পার তবে ছুটি দিতে পারি।’ ছেলেটি সাগ্রহে রাজী হল। আমিও তাকে ছুটি দিলাম। পরের দিন যথারীতি পড়াতে গিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি, ‘ফুটবল খেলার বিবরণ লিখেছ?’ ছেলেটি উত্তর দিলো, ‘হ্যাঁ লিখেছি।’ ছেলেটির কাছ থেকে কাজ আদায় করবার এক নয়া পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পেরে খুবই আনন্দিত হলাম। কিন্তু একি! খাতা দেখে একেবারে থ! খাতায় দেখি, শুধু একটি লাইন লেখাঃ টিম আসে নাই—তাই খেলা হয় নাই।
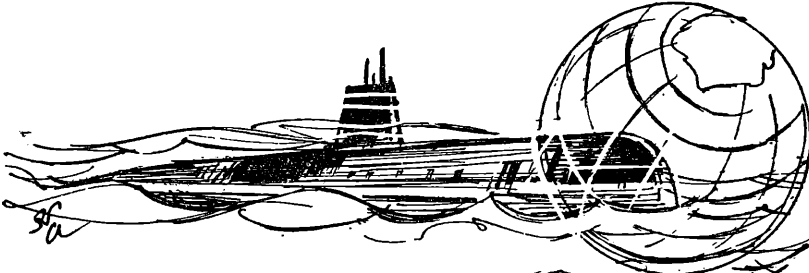
অধীরকুমার রাহা

সব সাগরেই গেছে মানুষ। যেতে পারে নি শুধু উত্তর মেরু সাগরে।

প্রায় পুরোটা বরফ ঢাকা এ সাগর। মাইলের পর মাইল শুধু বরফ আর বরফ। কোনও কালেই তা গলে না। গ্রীষ্মে পাড়ের দিকে টুকরো টুকরো ভাঙে কিছু কিছু। পাহাড়ের মত বিরাট বরফের চাঁই ভাসতে থাকে উত্তর সাগরে, গ্রীনল্যান্ড আইসল্যান্ডের কুলে, কানাডার উত্তরে, পুবে সাইবেরিয়া আলাস্কার তীরে তীরে!

কংক্রীটের মত অমিতশক্তিধর এই ভাসমান বরফ-স্তূপ। যেন বিরাট এক একটি পাহাড়। ধাক্কায় চুরমার হবে পুরু ইস্পাতে গড়া বড় বড় রণতরীও।

এই ভাসমান ভয়াল, ভয়ঙ্কর বরফস্তূপ এড়িয়ে উত্তর মেরু সাগরের দিকে যাওয়াই বিপজ্জনক। যদিও বা কোনও মতে যাওয়া গেল, রয়েছে চিরকালের বরফ ঢাকা মেরুস্তর। এ বরফস্তর ডিঙিয়ে কোনও জাহাজেরই সাধ্য নেই গ্রীনল্যান্ড হয়ে পুবে আলাস্কায় যাওয়া।

যদি যেত, মিলত তা হলে আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে যাবার সব চেয়ে শর্টকার্ট পথ।

জলের উপরে চলা সাধারণ জাহাজ পার হতে পারে না, এ সাগর, পারে হয়ত ডুবো জাহাজ। মাছের মত গভীর জলের তল দিয়েও যা চলতে পারে!

মেরুর মাঝে মাঝে রয়েছে বরফমুক্ত পলিনিয়া, বরফ ঘেরা টলমল করা জলের হ্রদ। এ থেকে অনুমান করা গিয়েছিল মেরুর কঠিন বরফস্তরের তলে রয়েছে। জল যার মধ্য দিয়ে মেরু সাগর পার হবে সাবমেরিন।

দু একজন দুঃসাহসী সাবমেরিন চালক চেষ্টা করে-ছিলেন বরফস্তরের তল দিয়ে মেরু সাগর পার হবেন।

এ পথে বাধা ছিল অনেক। সব চেয়ে বড় বাধা সাবমেরিন নিজেই। নামে ডুবো জাহাজ হলেও পুরো ডুবে থাকার ক্ষমতা নেই সাধারণ সাবমেরিনের। মাঝে মাঝেই তাদের ভেসে উঠতে হয় বাতাস নেবার জন্য, বাতাস টানার নল ওঠানোর জন্য। মেরু সাগরে কঠিন বরফস্তর ভেদ করে এমনি উপরে ওঠা অসম্ভব।

দুঃসাহসী মেরুতল অভিযাত্রীদের ভরসা ছিল পলিনিয়াগুলি। মাঝে মাঝে পলিনিয়াতে ভেসে উঠে যদি পার হওয়া যায় মেরু সাগর।

পলিনিয়ার পরিচয়ও অজানা। কোথায় কোথায় পলিনিয়া রয়েছে তাও অজানা। মেরুতল অভিযাত্রীরা শেষ পর্যন্ত তাই হার মানলেন।

মেরুতল অভিযানের জন্য চাই এমন সাবমেরিন এক নাগাড়ে দিনের পর দিন যা চলতে পারবে সম্পূর্ণ ডুবে ডুবে। একবারও দরকার হবে না জলের উপরে উঠবার।

এমনি এক সাবমেরিনের গল্প-কাহিনী লিখে-ছিলেন জুল ভার্ন। তার গল্পের নায়ক ক্যাপ্টেন নিমোর ডুবো জাহাজ নটিলাস, ডুবে ডুবে ঘুরেছে সারা পৃথিবীর সব সাগর।

ঠিক যেমনটি কল্পনা করেছিলেন জুল ভার্ন, তেমনি ডুবো জাহাজও শেষে বার করল মানুষ। সম্পূর্ণ জলের তলে ডুবে, দিনের পর দিন চলতে পারে এ জাহাজ। একবারও উঠতে হয় না জলের উপর।

এ সাবমেরিন চলে পরমাণু শক্তিতে।

সাধারণ সাবমেরিনের সঙ্গে পার্থক্য এর আকাশ-পাতাল। অন্য সাবমেরিনে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করে থাকে মানুষ। যন্ত্রপাতি জুড়ে রয়েছে গোটা সাব-মেরিনটা। নড়াচড়ার পথ নেই যেন কারও।

তুলনায় পরমাণু-চালিত সাবমেরিন রাজপুরী।

লম্বা ৩২০ ফিট ফুটবল মাঠের সমান। চওড়া ২৮ ফিট। অন্য সাবমেরিনের তিন-চার গুণ বড়সড়। লোক ধরে একশ ষোল জন।

তাদের থাকবার ব্যবস্থাও রাজকীয়। ডানলোপিলোর গদি মোড়া বাঙ্ক প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা। যা কোনও সাবমেরিনেই থাকে না। প্রকান্ড ডাইনিং রুম, লাইব্রেরী, বিশ্রামের জায়গা, সিনেমা হল, যন্ত্রপাতি সারাবার কারখানা, ডার্ক রুম, ডাইংক্লিনিং, লেবরেটরী।

জলের তলে সম্পূর্ণ ডুবলে বাইরে থেকে বাতাস নেবার উপায় নেই। এ সাবমেরিনে তাই অক্সিজেন উৎপাদন ও শোধনযন্ত্র বসানো। আছে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। ঠান্ডা গরম যে দেশে যে সাগর তলেই চলুক, ভিতরের তাপমাত্রা থাকে ৬৮ থেকে ৭২ ডিগ্রী। গেঞ্জি গায়েও যাওয়া চলে সাবমেরিনের ভিতরে।

এরও নাম দেওয়া হয়েছিল নটিলাস।

॥ দুই ॥

নটিলাসকে নিয়ে যেতে হবে মেরু সাগরের বরফ তলে উত্তর মেরু পার হয়ে প্রশান্ত মহাসাগর।

খুব গোপনে। ঘুণাক্ষরেও অন্য কোনও দেশ জানতে না পারে যেন এ অভিযানের কথা।

জুল ভার্নের কল্পনার সেই সাবমেরিন পেয়েও তাই কমান্ডার অ্যান্ডারসন নিশ্চিন্ত নন! সত্যিই কি সফল হবে এ অভিযান?

উত্তর মেরু সাগর। অজানা, অজ্ঞাত, দুর্লঙ্ঘ্য নির্মম তার উপরিভাগ। সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত তেমনি তার বরফতলের জগৎ।

কেউ কোনও দিন এখানে আসে নি। যুদ্ধের সময় শত্রুর তাড়া খেয়ে মাঝে মাঝে জার্মান ইউবোটগুলি ঢুকত এর বরফ তলে—তবে দু-তিন মাইলের বেশী দূরে নয়। যুদ্ধের পরে যারা ঢুঁ মেরেছেন, তারাও কুড়ি পঁচিশ মাইলের বেশী এগোতে পারেন নি!

অ্যান্ডারসন কি পারবেন আঠারো শ মাইলের এই বরফস্তর পার হতে?

বরফতলের এই মেরু সাগর সম্বন্ধে মানুষ কিছুই জানে না। বরফস্তর কত পুরু? তার তলের সমুদ্র কত গভীর? সেখান দিয়ে বরাবর যেতে পারবে কি সাবমেরিন পূব দিকে বেরিং সাগর পর্যন্ত? আর বরফতল দিয়েও কি চলে মারাত্মক আইসবার্গ?

কিছু কিছু তথ্য মিলল রুশদের পুঁথিপত্র থেকে। আর কিছু জানলেন, এর আগে যাঁরা মেরুতলে অভিযান চালিয়েছিলেন তাঁদের কাহিনী পড়ে। এবার অ্যান্ডারসন বুঝতে পারলেন, মেরুর চিরস্থায়ী বরফতলে ঢোকা যাবে গ্রীনল্যান্ড আর স্পিটস্ বার্জেনের মধ্যকার গভীর সমুদ্রের দিক দিয়ে।

বাঘা বাঘা অ্যাডমিরালদের কাছে তিনি বললেন প্ল্যানটা। অবিশ্বাসে মাথা নাড়েন অনেকেই।

অসম্ভব। ঐ আঠারো শ মাইল বরফতল পার হওয়া কি সহজ কথা? জলের তলে রয়েছে কত ডুবো পাহাড়, পলিমাটির ঢিপি। ধাক্কা লেগে ধ্বংসে হবে ঐ কোটি কোটি টাকা দামের মহামূল্যবান পরমাণু সাবমেরিন!

মিথ্যে আশা। এ অভিযান সফল হবে না।

দমলেন না কমান্ডার অ্যান্ডারসন। সংগ্রহ করতে লাগলেন উত্তর মেরু অঞ্চলের মানচিত্র।

সেই সঙ্গে চলল অভিযানের মূল সমস্যাগুলির সমাধান বার করবার চেষ্টা।

জলের গভীরতা মাপবার জন্য আবিষ্কৃত হয়েছিল যে যন্ত্র, তাই সাবমেরিনের উপর উল্টো মুখো বসিয়ে ডঃ লিঁয় চেষ্টা করছিলেন সাবমেরিনের উপরের বরফস্তরের দূরত্ব নির্ণয় করার। এর আগের কয়েকটি বরফতল অভিযানে গেছেন তিনি এ যন্ত্র পরীক্ষা করতে।

লিঁয়কে অভিযানে টানলেন অ্যান্ডারসন। তিনি পাঁচটি ইনভারটেড ফ্যাদোমিটার বসালেন নটিলাসে।

এই সঙ্গে নেওয়া হল একজন মেরু বিশেষজ্ঞকেও।

উত্তর মেরু সাগর। প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ বাধার শেষ সীমান্ত। সৃষ্টির আদি থেকে বরফস্তরে ঢাকা এ বিপুল জলরাশি। কি ভাবে আক্রমণ করা যাবে রহস্যময়ী পাতালপুরীর সে অজানা অতল।

পরামর্শে বসলেন অ্যান্ডারসন, নটিলাসের দুজন নেভিগেটর বিল ল্যালর ও ম্যাকওয়েথি, ডঃ লিঁয় আর লেস কলিন। ইনি 'ট্রিগার' নামে সাবমেরিনটির কমান্ডার। এটিও যাবে বরফস্তরের বাহির পর্যন্ত সাহায্য করতে।

স্থির হল, প্রথমে আকাশ থেকে দেখে নিতে হবে মেরু অঞ্চলের অবস্থা।

বেসামরিক পোশাকে গোপনে পাঁচজনে গেলেন গ্রীনল্যান্ডের বিমানঘাঁটিতে।

কনকনে ঠান্ডা। রুক্ষ, উঁচু-নিচু অসমান বরফ স্তরে ঢাকা, মাইলের পর মাইল শূন্য বরফ প্রান্তর।

কোথাও টুকরো টুকরো বরফ আলগা আলগা ভাসছে। কোথাও কঠিন বরফস্তর। খুব নিচু দিয়ে বিমানে উড়তে উড়তে কমান্ডার অ্যান্ডারসন আশ্চর্য হয়ে ভাবেনঃ এই বরফের মরুভূমিতেও শেলজ চালিয়ে শিকার করে মানুষ বাস করে!

যুগ যুগ ধরে প্রকৃতির চ্যালেঞ্জকে উপেক্ষা করে বেঁচে আছে অমর মানুষ। পারবেন না তিনি—সেই মানুষের মহাজীবনের অংশীদার হয়ে প্রকৃতির আর এক চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে?

ভাল করে তিনি দেখে নেন মেরুদেশ। মুভিচিত্র নেন অজস্র!

॥ তিন ॥

বিমান পর্যবেক্ষণ থেকে ফিরে এসে শুরু হল নটিলাসে অভিযানের উপযোগী যন্ত্রপাতি বসানো।

কমান্ডার অ্যান্ডারসন নিজে অভিজ্ঞ সাবমেরিন চালক। জানতেন, যতই উত্তর অক্ষাংশের দিকে এগিয়ে চলে সাবমেরিন, ততই তার দুই কম্পাস—চুম্বক কম্পাস ও জাইরো কম্পাস সঠিক দিক নির্ণয়ের ক্ষমতা যেন হারিয়ে ফেলে। মেরু অঞ্চলে যাঁরা অভিযান চালিয়েছিলেন, তাঁদের লেখা কাহিনী পড়ে বুঝতে পারলেন, উত্তর মেরুতে পৌঁছাতে চুম্বক কম্পাস একেবারে অকেজো। চাই এমন জাইরো কম্পাস, যার কাঁটা উত্তর অক্ষাংশের শেষ প্রান্তে এসেও স্থির থাকবে। মেরু বিন্দুর নিশানা দেবে নির্ভুল।

তিনি শুনেছিলেন, একটি কোম্পানী মার্ক-১৯ নামে এমনি ধরনের এক জাইরো কম্পাস বার করেছে। নটিলাসে সেটি বসানোর ব্যবস্থা করলেন তিনি।

এর পর ভাবতে হল আর একটি বিপদ সম্ভাবনার কথা। বরফ তলে গিয়ে যদি বিকল হয় নটিলাস? উদ্ধার পাবে কি করে যাত্রীরা? এ অবস্থার জন্য নটিলাসে ছিল কুড়ি-পঁচিশটি টর্পেডো। টর্পেডো ছুড়ে বরফস্তর ভেদ করে উপরে ভেসে উঠতে পারবে নটিলাস। তখন মেরু সাগরের বরফস্তরের উপর দিয়ে যদি ফিরে আসতে হয় যাত্রীদের, দরকার হবে মেরু অঞ্চলের প্রচন্ড শীতের উপযোগী পোশাক ও জুতো-জামা। প্রচুর পরিমাণে এগুলি সংগ্রহ করা হল নটিলাসে।

সব আয়োজন শেষ হলে নিউ ইংলন্ড (কেনেটিকাট) বন্দর থেকে প্রথমে রওনা হল 'ট্রিগার'। পিছু পিছু 'নটিলাস'।

নটিলাস যখন মেরুর বরফতলে যাবে, ট্রিগার অপেক্ষা করবে বরফস্তরের বাইরে। দরকার হলে সাহায্যে এগিয়ে যাবে।

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৫৭। নটিলাস ও ট্রিগার এসে পৌঁছায় গ্রীনল্যান্ড ও স্পিটবার্জেনের কাছের উত্তর মেরুর বরফস্তরের কাছে।

সামনে দেখা যায় সেই অন্তহীন বরফ প্রান্তর। বর্ণহীন, দিকচিহ্নহীন, পথহীন রুক্ষ বরফ প্রান্তর—দুর্গম পথের দুরন্ত যাত্রী মানুষ যেখানে রেখে গেছে অন্তহীন ত্যাগ তিতিক্ষা সাহস শৌর্যের রোমাঞ্চ কাহিনী।......রস, প্যারি, আমুণ্ডসেন, কুক......মনে পড়ে সেই সব মৃত্যুঞ্জয়ী মেরু অভিযাত্রীদের নাম, দুর্গম, হিমেল হাওয়ার এই বরফস্তরের মাঝ দিয়ে যাঁরা পৌঁছাতে চেয়েছিলেন উত্তর মেরুতে।

তাঁরা গিয়েছিলেন বরফের উপর দিয়ে, অ্যান্ডারসন যাবেন বরফের তল দিয়ে।......সম্পূর্ণ অভিনব! এ অভিযাত্রা!

ডঃ লিঁয় (বামে) ও কমান্ডার অ্যান্ডারসন যন্ত্রপাতি পরীক্ষায় রত

জলের তলে ডুব দিলে নটিলাসের প্রতিটি কর্মী যেন উৎকণ্ঠিত আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকে। কোন রহস্য লুকানো আছে এই অজানা সাগর তলে?

সত্যিই এক বিচিত্র দৃশ্য বরফতলে। পেরিস্কোপে দেখা যায় মাথার উপর যেন সাদা মেঘের ভেলা ভেসে বেড়াচ্ছে। বরফস্তর ভেদ করে নিচে ক্ষীণ সূর্যালোক এসে পড়ছে। সমুদ্রের জল তাই ঘন কালো নয়। ধূসর বর্ণ। চলতে চলতে পেরিস্কোপে দেখা গেল আরও এক অদ্ভুত দৃশ্য। এবড়োখেবড়ো শিরদাঁড়া ওঠা বরফ তল থেকে কোথাও কোথাও বেরিয়েছে বটের ঝুরির মত লম্বা লম্বা বরফ শাখা। বরফস্তর কোথাও

কোথাও ষাট ফিট নিচে নেমেছে। এদের এড়াতে জলের অনেক নিচ দিয়ে চলতে হচ্ছে নটিলাসকে।

নিঃশব্দে বরফতল দিয়ে চলেছে অভিযাত্রীরা। প্রত্যেকে রুটিন মাফিক যে যার কাজে ব্যস্ত।

হঠাৎ যন্ত্র জানিয়ে দেয় সামনে পলিনিয়া।

কমান্ডার অ্যান্ডারসন আদেশ দিলেন নটিলাসকে উপরে ওঠাতে। পরীক্ষা করতে হবে এ অঞ্চলটা।

পেরিস্কোপে চোখ লাগিয়ে বসেছিলেন অ্যান্ডারসন। হঠাৎ প্রচন্ড ঝাঁকুনি। সঙ্গে সঙ্গে পেরিস্কোপে আঁধার-বন্যা!

ফ্লাড নেগেটিভ! সন্ত্রস্ত হয়ে হাঁকেন অ্যান্ডারসন।

বয়ান্সি কনট্রোলের ট্যাঙ্কগুলি মুহূর্তে জলে ভর্তি হয়ে ওঠে। নটিলাস নিচে নেমে আসে।

পলিনিয়ায় ভাসন্ত এক বরফ-পাহাড়ে ধাক্কা লেগে নষ্ট হয়েছে দুটি পেরিস্কোপই।

দুটি অকেজো পেরিস্কোপ নিয়ে আর এগোনো চলে না। নটিলাস ফিরে এল বরফস্তরের বাইরে।

মেরুতে তখন উঠেছে তুষার ঝড়। চোখ অন্ধ করে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায় বুঝি মানুষকে। তারই মাঝে বারো ঘণ্টা লড়ে দুজন দক্ষ কারিগর সারিয়ে ফেললেন পেরিস্কোপ দুটি।

অ্যান্ডারসন হিসাব করে দেখলেন, হাতে যে সময় আছে তাতে ৫।৬ দিনের মধ্যেই পৌঁছাতে পারবেন ৬৬০ মাইল দূরের উত্তর মেরুতে।

॥ চার ॥

অ্যান্ডারসন আবার চললেন উত্তর মেরুর পথে।

ঘণ্টায় পনেরো থেকে বিশ নট। দেখতে দেখতে এসে যায় ৮৩ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ।......৮৪ ডিগ্রী......৮৫ ডিগ্রী......৮৬ ডিগ্রী!

আর চার ডিগ্রী উত্তরে যেতে পারলেই মেরু বিন্দু।

সহসা খবর আসে কনট্রোল রুম থেকে, দুটি জাইরো কম্পাসই বিকল। ফিউজ পুড়ে গেছে। নতুন ফিউজ লাগিয়ে কম্পাস চালু করতে লাগবে ৫/৬ ঘন্টা।

বেশ, ততক্ষণে চলুক কম্পাস চুম্বকে। জানালেন কমান্ডার।

কয়েক ঘণ্টা কাটে। জাইরো কম্পাস ঠিক হয় না। এত উত্তরে হবে কিনা সন্দেহ। চুম্বক কম্পাসের কাঁটা ঘুরছে পাগলের মত দিক বিদিক। এর সাহায্যে এগিয়ে চললে হয়ত ঘুরতে হবে মেরু বিন্দুর চারিদিকে। সে ঘূর্ণির গোলকধাঁধা কেটে বেরিয়ে এলেও হয়ত গিয়ে পড়তে হবে কানাগলির পথে—যেখানে থেকে বের হওয়া চলবে না বরফমুক্ত সাগরে।

মেরু বিন্দুর ১৮০ মাইলের মধ্যে ওঁরা পৌঁছেছিলেন এবার। ফিরে এলেন সেখান থেকেই।

আবার পরামর্শ চলে মেরু অভিযানের কর্তাদের মধ্যে।

অজানা মেরু সাগর প্রায় পরাজয় স্বীকার করেছে। বরফতলের পাঁচশো মাইল পর্যন্ত ঢুকেছে মানুষ। জেনেছে সাগর তলের পরিচয়। ব্যর্থ হয়েছে বটে এ যাত্রা নটিলাস, তবু জেনেছে পথের সন্ধান। পরের বারে সে নিশ্চয়ই জয় করবে পুরো সাগরতল!

অভিযানের কর্তারা সব শুনলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হল কর্মপন্থা।

এবার নটিলাস অভিযান চালাবে পূব দিক থেকে। প্রশান্ত মহাসাগরের দিক দিয়ে।......

আমূল সংস্কার হতে লাগল নটিলাসের নতুন অভিযানের প্রস্তুতিতে। বরফস্তর ফুঁড়ে বার হবার জন্য কোনিং টাওয়ারের মাথায় বসানো হল পুরু ইস্পাতের বর্ম। বসানো হল নতুন ধরনের সব যন্ত্র। আরও ভালভাবে বরফস্তর আর সমুদ্রতলের দূরত্ব মাপা যাবে এতে।

বসানো হল সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি যন্ত্র। ইনারসিয়াল নেভিগেশন সিসটেম, বাইরের জগতের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না রেখে জলের তলে আপনা থেকেই ঠিক মত চলতে পারবে এতে নটিলাস। দেওয়া হল আরও উন্নত ধরনের জাইরো কম্পাস। মেরুর কাছে এসেও নাকি দিকভ্রান্ত হবে না।

এর পর রটিয়ে দেওয়া হল পরমাণু সাবমেরিন নটিলাস চলেছে পানামা খাল দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে, যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করতে।

২৫শে এপ্রিল ১৯৫৮। পানামার দিকে রওনা হল নটিলাস।

পথে বের হতে না হতেই বিপত্তি। স্টিম কনডেনসারে লিক দেখা দিয়েছে। কয়েক মিনিট পর এঞ্জিন ঘরে ধোঁয়া দেখা দেয়।

জলের তল দিয়ে চলছিল নটিলাস। উঠে এল উপরে। আগুন নেবাতে গিয়ে কয়েকজন নাবিক সংজ্ঞাহীন হল। চার ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিভল।

কমান্ডার অ্যান্ডারসন আশ্বস্ত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্থির করে ফেললেন, এর পরই যে বন্দর আসবে সেখান থেকে কিনে নেবেন গ্যাস মাস্ক। বরফতলে

যদি আগুন লাগে তখন ঐ গ্যাস মুখোশগুলি কাজ দেবে!

আগুন যদি বা নিভল কনডেনসারের লিক বন্ধ হতে চায় না। এই ফুটো কনডেনসার নিয়ে বরফতলে? সম্ভব নয়। উচিত নয়। নানা ভাবে চেষ্টা চলে লিক বন্ধ করার।

সিয়েটেল বন্দরের কাছে পৌঁছে কমাণ্ডার অ্যাণ্ডারসন কিনলেন ৭০ কোয়ার্ট র‍্যাডিয়েটরের তেল। ঢাললেন কনডেনসারে। লিক বন্ধ হল।

॥ পাঁচ ॥

সিয়েটেল থেকেই রওনা হতে হবে আলাস্কায়। তারপর বেরিং প্রণালী দিয়ে মেরু সাগরের বরফতলে!

মেরুর উপরে বরফের অবস্থা এখন কেমন?

শীতের সময় সাইবেরিয়া পর্যন্ত এগিয়ে আসে মেরুর বরফস্তর। গ্রীষ্মের সময় মেরু প্রান্তের বরফ গলতে শুরু করে। বড় বড় বরফের পাহাড় ছুটতে থাকে মেরু প্রান্তরের সাগরে!

কমাণ্ডার অ্যাণ্ডারসন ডঃ লিঁয়কে সঙ্গে নিয়ে দেখে এলেন বেরিং প্রণালী অঞ্চলে বরফের অবস্থা।

আবার এগিয়ে চলে নটিলাস মেরু অভিযানে।

চারদিন পর আসে বেরিং সাগরে। আলাস্কা ও সোবিয়েত সাইবেরিয়ার মাঝে এ সাগর। বেরিং প্রণালীর মুখে রয়েছে মার্কিনের খাস দখলের দ্বীপ সেন্ট লরেন্স। কমাণ্ডার অ্যাণ্ডারসন স্থির করেছিলেন দ্বীপের পশ্চিম দিকের পথ ধরে যাবেন। সমুদ্র এখানে অগভীর। বরফও সরে যায় আগে আগে।

কেন জানি সেদিন ভারি সুন্দর আকাশ! মেঘহীন। সমুদ্র শান্ত। দূরে দেখা যায় বরফ ঢাকা সাইবেরিয়ার তটভূমি। বহু দূরের পাহাড় চূড়া!

উত্তর মুখো বেরিং প্রণালীর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ক্রমশঃ যন্ত্রে ধরা পড়ে, জলের উপর বড় বড় বরফ খণ্ড ভাসছে। জলের গভীরতাও কমে আসছে।

নটিলাস জলের উপরে আসে। পেরিস্কোপে দেখা যায়, দূরে ভাসমান অতিকায় বরফস্তূপ সূর্যকে আড়াল করে রেখেছে। অসংখ্য অগণন!

এ পথে এগোন যাবে না বেরিং সাগরের দিকে। সেন্টলরেন্স দ্বীপের পূব দিকের পথ ধরলেন তাঁরা।

বেরিং প্রণালী পার হয়ে চুকচি সাগরে পড়ে নটিলাস।

এখানে ভাসমান বরফ স্তূপ যেন আরও বেশী। অগভীর সমুদ্র। অতিকায় বরফখণ্ডগুলির তল দিয়ে যাওয়া বিপদের। জলের উপরে উঠে সন্তর্পণে বরফস্তূপের পাশ কাটিয়ে চলতে থাকে নটিলাস।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলা। কমাণ্ডার অ্যাণ্ডারসন ভাবতে থাকেন, কখন এই ভাঙ্গাচোরা বরফের মেলা শেষ হয়ে দেখা দেবে মেরুর কঠিন বরফেরস্তর। ডুব দিতে পারবেন তিনি বরফতলে!

সামনে ঐ বুঝি দেখা যায় মেরুর কঠিন বরফস্তর!

ডুব দিয়ে এগিয়ে চলে নটিলাস। সিয়েটেল থেকে রওনা হবার পর আট দিন কেটে গেছে।

সোনার যন্ত্র বরফস্তরের দূরত্বের রেখা-লিপি লিখে চলেছে ক্রমাগত। সহসা কেবিনে আসে নেভিগেটর বিল ল্যালরের কণ্ঠস্বর!

কমাণ্ডার! একবার কনট্রোলরুমে আসবেন কি?

ছুটে যান অ্যাণ্ডারসন! পেরিস্কোপে, যন্ত্রের লিপিতে দেখতে পান উল্টানো পাহাড়ের মত বিরাট বরফস্তূপ—ষাট ফিট পর্যন্ত নিচে নেবে এসেছে। তার মাত্র আট ফিট নিচ দিয়ে চলেছে নটিলাস!

নটিলাস আরও নিচে নেবে আসে। সমুদ্রতল থেকে ২৫ ফিট উপরে। বরফ পর্যন্ত ক্রমেই আরও নিচে নেবে আসছে। সাগরের গভীরতাও কমছে!

তীব্র উত্তেজনায় সোনার লিপির উপরে চোখ মেলে সবাই। এক এক সময় ঝুলন্ত বরফ চূড়া নটিলাসের মাত্র পাঁচ ফিট উপরে। ধাক্কা খাবার ভয়ে অজ্ঞাতসারেই অনেকে মাথা নিচু করে!

একি মেরুস্তরের বরফ? না, না গলা বরফের অংশ? ক্রমেই এর দৈর্ঘ্য বাড়ছে, জলের গভীরতা কমছে! ঝুঁকি নিয়ে সামনে এগোন আর উচিত হবে না।

ফিরে এলেন পার্ল হারবারে। দেখতে হবে মেরুর বরফ সবটা গলেছে কি না? গললে তবেই আবার এগিয়ে যাওয়া!

বিমানে আবার আর একজনকে পাঠান হল চুকচি সাগরে বরফের অবস্থা দেখতে।

আবার চলতে থাকে অভিযানের আয়োজন। বসানো হল ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন। যাতে টেলিভিশন স্ক্রীনে দেখা যায় মাথার উপরে বরফের ছবি।

জুলাই ২৩, ১৯৫৮। চুকচি সাগর থেকে ফেরবার ঠিক এক মাস পর আবার রওনা হয় নটিলাস।

এবারও সেই মিথ্যা কাহিনী রটান হল। মেরু অঞ্চলে পরমাণু এঞ্জিনের পরীক্ষা চালাতে চলেছে নটিলাস!

॥ ছয় ॥

৫৭১, বিরাট কোনিং টাওয়ারে পাঁচতলা সমান লম্বা সংখ্যাগুলি মুছে দেওয়া হয়েছে। কেউ বুঝতে পারবে না কোন্ দেশী সাবমেরিন!

সেন্ট লরেন্স আর সাইবেরিয়ার মাঝ দিয়েই নটিলাস যাবে এবার বেরিং প্রণালীতে। বিমান পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, অঞ্চলটা বরফ মুক্ত!

চুকচি সাগরে পড়তেই ভীত হলেন কমান্ডার! আবার ভাসন্ত বরফ-পাহাড়। কোন কোনটি ৪০ ফিট খাড়া। নিচে নিশ্চয়ই ১২০ ফিট!

তবু জলের তলে যায় নটিলাস। খুঁজতে থাকে, চিরস্থায়ী বরফস্তরের প্রান্তভাগ। যার তল দিয়ে ঢুকবেন মেরুর বরফ তলে!......

অগভীর চুকচি সাগরে পথ রোধ করে খন্ড খন্ড বরফ-পাহাড়!

হঠাৎ দেখা দেয় বৃষ্টি! মেরু অঞ্চলে বৃষ্টি! অভাবনীয়। ভীত হন কমান্ডার। এ অঘটন অশুভ লক্ষণের দিশারী। এবারও ব্যর্থ হবেন বুঝি!

ঢু মারতে মারতে এগিয়ে চলে নটিলাস আলাস্কার দিকে। মনে পড়ে আলাস্কার কাছে পয়েন্ট বারো নামে সমুদ্র তলে একটি গভীর উপত্যকা আছে! এখান থেকে হয়ত ঢোকা যাবে মেরু সাগরের চিরন্তন বরফ তলে! চললেন সেই দিকে।

সোনার যন্ত্রের লিপিতে জলের গভীরতা বাড়ছে। মন থেকে কে যেন বললঃ এই পথ! ঢুকে পড়! ঢুকে পড়!

পেরিস্কোপে শেষ বারের মত দেখলেন উপরের পৃথিবীতে। নটিলাসের ঘড়িতে গ্রীনউইচের সময়। সেখানে তাই রাতের পালা। সমুদ্রের উপরে পর্যন্ত সুন্দর আলো ঝলমল প্রভাত। এক দিকে ভোরের চাঁদ

॥ অভিযাত্রীরা কবে কোথায় ছিলেন ॥

জুলাই ২২ঃ হাওয়াই [১] ● জুলাই ২৬ঃ বেরিং সাগর [২] ● জুলাই ২৭ঃ অগভীর সাগরতল [৩] ● জুলাই ২৯ঃ ফেয়ারওয়ে রক [৪] ● জুলাই ২৯ঃ জুলাই মাসের গভীরতম অবতরণস্থল [৫] ● আগস্ট ১ঃ আর্কটিক বেসিনের মুখ [৬] ● আগস্ট ১ঃ ১৫৫০ দ্রাঘিমাংশ (পশ্চিমে) [৭] ● আগস্ট ২ঃ ৭৬·২২ উত্তর অক্ষাংশ [৮] ● আগস্ট ২ঃ মেরুর পথ [৯] ● আগস্ট ৩ঃ ৮৭ ডিগ্রী উত্তরে (যেখান থেকে প্রথমবার নটিলাস ফিরে আসে) [১০] ● আগস্ট ৩ঃ মেরুতল [১১] ● আগস্ট ৫ঃ প্রথম সফল অভিযানশেষে জলের উপরে [১২] ● আগস্ট ৬ঃ আলাস্কায় [১৩] ● আগস্ট ৭ঃ উত্তরমুখো [১৪] ● আগস্ট ১২ঃ ইংল্যান্ড [১৫]

সামনের বরফের অবস্থা কেমন? বেতারে জিজ্ঞাসা করেন কমান্ডার অ্যান্ডারসন।

পার্ল হারবার থেকে উত্তর আসে, খুব খারাপ। কুয়াশায় ঢাকা। বিমান চালকেরা কিছু দেখতে পাচ্ছে না। নিজেরা যা পারেন করুন।

গভীর সমুদ্রতলের সন্ধানে তখন চলে চুকচি সাগরের প্রান্তে প্রান্তে ঘোরা!

আর এক দিকে নবীন সূর্য।

সমস্ত সোনার যন্ত্রগুলি চালু করা হল! ফ্যাদোমিটারে দেখতে থাকেন কমান্ডার অ্যান্ডারসন রুদ্ধশ্বাসে নিচের সমুদ্র উপত্যকার গভীরতা!

॥ সাত ॥

১লা আগস্ট। সকাল ৫-৫২ মিনিট। ১৫৫তম মেরিডিয়ান।

বাঁ দিক ধরে পূবমুখো চালান। নেভিগেটরকে নির্দেশ দেন কমান্ডার!

মেরুর চিরস্থায়ী বরফতলে ঢুকেছে নটিলাস। ১০৯৮ মাইল উত্তরে উত্তর মেরু। তারও ৮০০ মাইল ছাড়িয়ে গ্রীনল্যান্ড স্পীট বার্জেন—যেখান দিয়ে বের হবে নটিলাস। অবশ্য যদি সে সফল হয়!

উত্তেজনায় ঘুম নেই কারও চোখে। টেলিভিশনে দেখা যায় অদ্ভুত দৃশ্য। যেন উল্টানো বরফ-পাহাড় ঝুলছে। কখনও কখনও নেবেছে ১০০/১২৫ ফিট লম্বা ঝুরি!

সমুদ্রের তলদেশেও বিচিত্র সব পাহাড়পর্বত! কোথায়ও কোথায়ও চাঁদের ভূদৃশ্যের মত বিরাট বিরাট জ্বালামুখ!

দেখতে দেখতে আসে ৮৩ ডিগ্রী ২০ মিনিট অক্ষাংশ। চিরস্থায়ী বরফস্তরের কেন্দ্র বিন্দু এখানে।

পেরিস্কোপে দেখা যায়, বিষুব অঞ্চলের মত এখানকার জলেও যেন ঝিকিমিকি ফস্‌ফরাস জ্বলছে। অদ্ভুত ব্যাপার!

৮৪ ডিগ্রী...উত্তেজনায় কাঁপেন অ্যান্ডারসন। এই সেই অঞ্চল যেখানে শুরু হয় কম্পাসের দিশাহারা ঘূর্ণি! পথ ভুলে মেরুর চার দিকে চরকিপাক খাবার পালা!

চুম্বক কম্পাস বিগড়াল। মাস্টার জাইরো কম্পাসও বিগড়াতে চলেছে। সর্বনাশ! কঠোর স্বরে আদেশ দেন কমান্ডার—এগিয়ে চল উত্তর মুখো—ইনারসিয়াল নেভিগেটরের নির্দেশ মেনে! উত্তর মেরুতে পেঁৗছালেই এ যন্ত্র তা জানিয়ে দেবে!

৮৭ ডিগ্রী! আরও উৎকর্ণ কয়েক ঘণ্টা! উত্তর মেরু আর সিকি মাইল দূরে!

ডিসটেনস্ ইনডিকেটরে চোখ রেখে কাউন্ট ডাউন শুরু করেন কমান্ডার অ্যান্ডারসন। তাঁকে ঘিরে জড়ো হয়েছে উদ্‌গ্রীব একদল নাবিক। মাইক্রোফোনে সকলে শুনছে কমান্ডারের কণ্ঠস্বর...১০...৮...৬...৪ ...৩...২...১...০!

উত্তর মেরু। ৯০ ডিগ্রী।

১৯৪৫ সাল। ৩রা আগস্ট।

উত্তর মেরুর তলে জড়ো হয়েছে ১১৬ জন মানুষ! অভাবনীয় ঘটনা ঘটল আজ পৃথিবীর ইতিহাসে!

ছোট্ট তিন শব্দের বার্তা তৈরি করেছেন অ্যান্ডারসন। বরফ-স্তর থেকে বেরিয়ে জানাবেন সে গোপন বার্তা!

৪ঠা আগস্ট। সকাল সাতটা। মেরু বিন্দু থেকে ২৪০ মাইল দূরে এসেছে নটিলাস। মাস্টার জাইরো এবার ঠিক মত চলছে।

বিকালে নটিলাস পেঁৗছাল বরফস্তরের সেই অংশে যেখান থেকে ১৯৫৭ সালে সে ফিরে এসেছে।

পরিচিত পথে এসে আশ্বস্ত হলেন কমান্ডার অ্যান্ডারসন!

সহসা চমকে ওঠেন! আগের চার্টের সঙ্গে মিলছে না সোনার ফ্যাদোমিটারের লিপি। থার্মোমিটারেও দেখা যাচ্ছে না জলের তাপমাত্রা বাড়ছে না, কমছে!

চমকে ওঠেন। তবে কি পশ্চিম মুখো না গিয়ে নটিলাস চলেছে সাইবেরিয়ার দিকে। তাই সমুদ্র শীতলতর!

মিনিটের পর মিনিট কাটে সন্দেহের দোলায়! ভুল পথে চলেছে নটিলাস। ফিরবার আদেশ দেবেন?

পেরিস্কোপে ছুটে যান! সাগর তরঙ্গ দুলছে উপরে। তবে কি নটিলাস বরফ স্তর পেরিয়ে এসেছে?

সমুদ্র এখানে বরফমুক্ত। শুধু মাঝে মাঝে দেখা যায় এক এক খণ্ড বরফস্তূপ। মেরুর বরফস্তরের ভাঙা বরফের টুকরো। তার একটিতে পরম আয়াসে শুয়ে আছে একটি সীল। নটিলাসকে দেখে ভয় পায় না একটুও। যেন নিত্যই দেখছে মেরুর বরফ-তল থেকে এমনি সাবমেরিন বেরিয়ে আসতে।

নেভিগেটর সূর্য দেখে দিক নির্ণয় করতে ব্যস্ত। জানাল গ্রীনল্যান্ডের উত্তর-পূব দিক এটা।

মেরুর বরফ স্তরে ঢুকবার মাত্র ৯৬ ঘণ্টা পরে আটলান্টিকে পড়েছে নটিলাস।

নটিলাসের রেডিও ম্যান ক্রমাগত চেষ্টা করে চলেছে মেরু অঞ্চলের বেতার বার্তা পাঠানোর অসুবিধা উপেক্ষা করে বেতার যোগাযোগের। এক সময় ধরা দেয় জাপানের একটি বেতার ঘাঁটি।

গোপন বার্তা আছে। 'নটিলাস নাইনটি নর্থ'।

পরের দিনই বিশ্বের মানুষ জানল, নটিলাসের মেরু জয়ের কাহিনী।

রুণুর স্বপ্ন

আশা দেবী

মাঠে জল জমেছে। দূর্বা-ঘাসের ওপর দিয়ে গলা কাচের মত জলের রেখা বয়ে চলেছে পাশের নালার দিকে। কদম গাছ তলায় জল থৈ-থৈ। ফুলে ফুলে

সকাল থেকেই বিষ্টি পড়ছে রিমঝিম করে। আকাশটা মেঘলা। গাছের পাতার থেকে টুপটুপ করে জল পড়ছে। আকাশে চাতকের একটানা কান্না শোনা যাচ্ছে—সবটা মিলে পুরো বর্ষার আবহাওয়া।

জানালার ধারে রুণু দাঁড়িয়ে। চারদিকে জল জমেছে। মা এসে বললেনঃ আজ তুমি স্কুলে যেতে পারবে না রুণু।

কেন মা ?—ব্যস্ত হয়ে রুণু বললো।

ঃ না এত জল বিষ্টি—এর মধ্যে ভিজে স্কুলে গেলে তোমার জ্বর আসবে।

ঃ মা শনিবার আমাদের স্কুলে প্রাইজ ডিষ্টিবিউসন হবে। আমাকে উদ্বোধন সঙ্গীত গাইতে হবে, বড়দি বলেছেন। প্রাইজ পাব ভালো গাইলে। যেতে দাও মা রিহারসেলে নইলে ওরা আমায় বাদ দিয়ে দেবে।

মা রাগ করে বললেনঃ দিগগে। নিমোনিয়া বাধাবি হতছাড়া মেয়ে। এত জল বিষ্টি। চারদিকে এত জল জমেছে। এর মধ্যে লোকে স্কুলে যায়?

ঃ সবাই যাচ্ছে মা। তুমি আমায় যেতে দাও। আর কটা দিন পরেই তো ফাংসান। দিদিরা বলেছেন, যদি কেউ রিহারসেলে অ্যাবসেন্ট হয়, তাকে ওঁরা বাদ দিয়ে দেবেন। যেতে দাও মা লক্ষ্মীটি। গান হয়ে গেলেই আমি তক্ষুণি চলে আসব।

অগত্যা মা বললেনঃ যাও কিন্তু একটুও দেরী করো না। তোমার শরীর ভালো নেই। তার ওপর এই বিষ্টি এর মধ্যে যদি ভেজো নিশ্চয়ই অসুখে পড়বে তা হলে।

ঢাকা গাছটার দিকে তাকালো রুণু। এপাশে খানিকটা জঙ্গল থেকে ভিজে হাওয়ায় কেয়ার গন্ধ আসছিল। সব মিলে রুণুর মনে হলো চারদিকের পৃথিবীটা সুরেলা হয়ে উঠেছে। ছেলেবেলা থেকেই সে গান পাগল। বাবা খুব ভালো গাইয়ে ছিলেন, অল্প বয়সেই তাকে তালিম দিয়েছিলেন। তারপর হঠাৎ বাবা চলে গেলেন। কে আর শেখাবে? নিজেই সে যতটুকু পারে চর্চা করে, গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে তুলে নেয়। তাদের গানে টীচার মীরাদি বলেন,ঃ স্কুলে এই মেয়ের গলাই সব চেয়ে ভালো।

শরীরটা ঠাণ্ডা লেগে ভার ভার—তবু বিষ্টি. হাওয়া, কেয়ার গন্ধ। অদ্ভুত লাগছিল রণুর। চলতে চলতে সে নিজের মনে গুণ গুণ করতে লাগলোঃ এসো—এসো—শ্যামছায়াঘন দিন। দূরের থেকে অর্গানের আওয়াজ আর কোরাসে অনেক গলা শুনতে পাওয়া গেল। গান আরম্ভ হয়ে গেছে। স্কুলে দ্রুত পায়ে চলতে লাগলো রুণু, তারপর চলার ধৈর্য আর রইলো না সে ছুটতে আরম্ভ করলো।

এত দেরী করে এলে?—মীরাদি বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

ঃ মীরাদি, বড্ড বিষ্টি, আমার শরীরও ভালো নেই, তাই মা আসতে দিতে চাইছিলেন না।

ঃ শরীর ভালো নেই, তবে না এলেই পারতে। এত কষ্ট করে তোমার আসার কিছু দরকার ছিল না। আমরা তোমার জায়গায় অন্য মেয়ে নিতাম।

রুণু একবার বেত গাছের মত কেঁপে উঠে সজল

চোখে মীরাদির দিকে চাইলোঃ আমি খুব ভালো আছি মীরাদি, আমি গান গাইতে পারবো। আমায় বাদ দেবেন না।

যাও, সুরু করো ওদের সঙ্গে।—মীরাদি বললে।

গান শেষ হলে বাইরেও আবার দ্বিগুণ জোরে বিষ্টি নামলো। রুণুর মন আজ আনন্দে যেন ময়ূরের মতো পেখম মেলে দিয়েছে। তার গানই সব চেয়ে ভালো হয়েছে। মীরাদি বলেছেন সেই হয়তো গানের প্রাইজটা পাবে। তার যেমন গলা তেমনি সুর বোধ। রুণু আনন্দে আত্মহারা হয়ে আছে। আজ বাবা বেঁচে থাকলে কী খুশিই হতেন।

সবার সঙ্গেই ছাতা আছে। কারুর বা গাড়ী এসেছে নিতে। কারুর বাড়ী থেকে চাকরের হাতে ছাতা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। ওরা সবাই একে একে চলে গেল। কেউ রুণুকে জিজ্ঞেসও করলো না সে ওদের সঙ্গে যাবে কিনা।

এমনিই হয়ে থাকে রুণুর বাবা থাকলে সব অন্য-রকম হতো। একটি ভাই আর বিধবা মা। অনেক কষ্ট করে মা ছেলে মেয়েদের পড়াছেন। বাবার স্বপ্ন ছিল মেয়ে আর ছেলেকে মনের মতো করে বড় করে তুলবেন, কিন্তু হঠাৎ একটা ট্রেন দুর্ঘটনায় তিনি চলে গেলেন। মা যে ওদের জন্যে কত করেছেন, রুণু তো তা দেখতেই পায়। তারা ভাই বোন লেখা পড়ায় ভালো স্কুল থেকে ফ্রি পায়। নইলে মার পক্ষে ওদের পড়ানো সম্ভব হতো না।

ওদের একটার ওপর দুটো জামা জোটে না তো ছাতা। একটা ছোট ছাতা ছিল, গত বছর ভেঙ্গে গেছে। এখনও মা আর একটা কিনে দিতে পারেন নি। বিষ্টিটা থামছে না কাজেই স্কুলের বারান্দার থাম ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রুণু দেখতে লাগলো কেউ বা চাকরের ছাতার তলায় ছপ্ ছপ্ করে জল ছেটাতে ছেটাতে, খেলা করতে করতে চলেছে। কেউ নানা রঙ-বেরঙের ছাতা খুলে ঘোরাতে ঘোরাতে স্কুলের মাঠ পার হয়ে গেল, কেউ বা ভোঁ করে কালো রঙের ফিয়াট গাড়ী চড়ে চলে যাচ্ছে।

স্কুলের বারান্দার একটা থামে হেলান দিয়ে রুণু ভাবতে লাগলো যদি আজ তার বাবা বেঁচে থাকতেন তাহলে তাদেরও চাকর আসতো ছাতা নিয়ে। ভাই ছোট, সে কি করে আসবে আর ছাতা তো নেই-ই। কাজেই রুণু আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। জল একটু থামলেই সে বাড়ী যাবে।

তুমি বাড়ী গেলে না?—বড়দি করিডোর দিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন রুণুকে। তিনি স্কুলের কোয়াটার্সেই থাকেন। ভয়ে সিঁটিয়ে গেল রুণু। রাশভারি বড়দিকে দেখলেই যেন আতংক হয় তার। যেন ভারি একটা অপরাধ করে ফেলেছে, এমনিভাবে একেবারে কাঁচুমাঁচু হয়ে গিয়ে বললে,ঃ আমার তো ছাতা নেই বড়দি, তাই দাঁড়িয়ে আছি বিষ্টিটা একটু ধরলেই যাব।

হুম্।—একটা শব্দ করে গম্ভীর মুখে বড়দি বললেন,ঃ কি রকম যে সব গার্ডিয়ান—বিনা ছাতায় তোমায় আসতে দিলেন এর ভেতরে?

বড়দিকে কী বলা যায় যে তাদের ছাতা নেই। তাহলে হয়তো আরো রাগ করবেন। কাজেই বড়দির চটির আওয়াজ একটু দূরে সরে যেতেই রুণু জলের মধ্যেই নেমে পড়লো বাড়ী যাবার জন্যে।

তারপর অনেকটা রাস্তা। রাস্তায় আরো জল। ছেঁড়া ভিজে জুতোটা সাধ্য মতো বাঁচাবার জন্য রুণু সেটা হাতে তুলে নিলো। জামাটা সপ সপ করছে। বাতাসে শীত ধরে যাচ্ছে। চুলগুলো একেবারে ভিজে গেল। সেই কদম গাছ তলা দিয়ে কেয়াবনের পাশ দিয়ে রায় বাবুদের বাগান পার হয়ে বিনিদের আম বাগানের ভেতর দিয়ে সাটকাট করে ভিজে কাকের মত রুণু বাড়ীতে এসে পেঁীছোলো।

মা চিৎকার করে উঠলেন, কতবার বারণ করে-ছিলাম যাস নে, যাস নে, কিছুতেই কানে গেল না। একেবারে ভিজে পান্তা হয়ে এলি? জামা ছাড়, মাথা মোছ ঘসে ঘসে। মাথায় জল বসে জ্বর আসবে।

এক মুখ প্রসন্ন ঝলমলে হাসি নিয়ে রুণু বললেঃ মা আমার গান, সবাই বলছে, সব চেয়ে ভালো হচ্ছে। মীরাদি বলেছেন প্রাইজটা আমিই পাব, মা তুমি গান শুনতে যাবে না? দীপুকেও নিয়ে যেয়ো। যাবে তো?

ঃ দেখা যাবে—সে তো শনিবার দুদিন দেরি আছে। তখনকার কথা তখন হবে।

রাতে রুণুর গায়ে হাত পড়তেই মা চমকে উঠলেন, গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। জ্বর আগেই এসেছিল, পাছে মা জানতে পারেন সেই ভয়ে সে দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছিল। শেষে আর পারলো না। সারারাত ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকতে লাগলোঃ মা আমার গান কিন্তু সবচেয়ে ভালো হয়েছে—এই দ্যাখো প্রাইজ। মা তুমি কেন গেলে না গান শুনতে দীপুকে নিয়ে? মা আমায় যেতে দাও—মা—মাগো।

[শেষাংশ ২৪৯ পৃষ্ঠার নীচে]

জীমূতবাহনের গল্প

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বেতাল কহিল মহারাজ!

ভারতবর্ষের উত্তর সীমায়, হিমালয় নামে অতি প্রসিদ্ধ পর্বত আছে। তাহার প্রস্থদেশে পুষ্পপুর নামে, পরম রমণীয় নগর ছিল। গন্ধর্বরাজ জীমূতকেতু ঐ নগরে রাজত্ব করিতেন। তিনি পুত্রকামনা করিয়া বহুকাল, কল্পবৃক্ষের আরাধনা করিয়াছিলেন। কল্পবৃক্ষ প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিলে, রাজা জীমূতকেতুর এক পুত্র জন্মিল। তিনি পুত্রের নাম জীমূতবাহন রাখিলেন। জীমূতবাহন স্বভাবতঃ, সাতিশয় ধর্মশীল, দয়াবান ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; এবং স্বল্প পরিশ্রমে, স্বল্পকালমধ্যে, সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী ও শাস্ত্রবিদ্যায় বিশারদ হইয়া উঠিলেন।

কিয়ৎকাল পরে রাজা জীমূতকেতু, পুনরায় কল্পবৃক্ষকে প্রসন্ন করিয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন, আমার প্রজারা সর্বপ্রকার সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হউক। কল্পবৃক্ষের বরদান দ্বারা, তদীয় প্রজাবর্গ সর্বপ্রকার সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হইল, এবং ঐশ্বর্যমদে মত্ত হইয়া রাজাকেও তৃণজ্ঞান করিতে লাগিল। ফলতঃ, অল্পকাল মধ্যে রাজা ও প্রজা বলিয়া, কোনও অংশে, কোনও বিশেষ প্রভেদ রহিল না। তখন জীমূতকেতুর জ্ঞাতিবর্গ গোপনে পরামর্শ করিল, ইহারা পিতা পুত্রে অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া দিবানিশি কেবল ধর্মচিন্তায় কালযাপন করিতেছে; রাজ্যের দিকে ক্ষণমাত্রও দৃষ্টিপাত করে না। প্রজাসকল উচ্ছৃঙ্খল হইতে লাগিল। অতএব, ইহাদের উভয়কে রাজ্যচ্যুত করিয়া, যাহাতে উপযুক্তরূপ রাজ্যশাসন হয়, এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। অনন্তর, বহুতর সৈন্য সংগ্রহপূর্বক তাহারা রাজপুরীর চতুর্দিক নিরুদ্ধ করিল।

এই ব্যাপার দেখিয়া যুবরাজ জীমূতবাহন পিতার নিকট নিবেদন করিলেন, মহারাজ! জ্ঞাতিবর্গ একবাক্য হইয়া, আমাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিবার অভিসন্ধিতে এই উদ্যোগ করিয়াছে। আপনার আজ্ঞা পাইলে, রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া বিপক্ষ পক্ষের সৈন্যক্ষয় ও সমুচিত দণ্ডবিধান করি।

জীমূতকেতু কহিলেন, এই ক্ষণভঙ্গুর পাঞ্চভৌতিক দেহ অতি-অকিঞ্চিৎকর; বিনশ্বর রাজপদের নিমিত্ত, বহুসংখ্যক জীবের প্রাণহিংসা করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে। ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির, আত্মীয়গণের কুমন্ত্রণায়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, পশ্চাৎ অনেক অনুতাপ করিয়াছিলেন। অতএব রাজপদ পরিত্যাগ করিয়া কোনও নিভৃতস্থানে গিয়া প্রশান্ত মনে, দেবতার আরাধনা করা ভাল। এইরূপ সংকল্প করিয়া পিতাপুত্রে নগর হইতে বহির্গত হইলেন; এবং মলয় পর্বতে গিয়া, তদীয় অধিত্যকায় কুটীর নির্মাণপূর্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এক ঋষিকুমারের সহিত, রাজকুমারের অতিশয় বন্ধুত্ব জন্মিল। একদিন, দুই বন্ধুতে একত্র হইয়া ভ্রমণার্থে নির্গত হইলেন। অনতিদূরে কাত্যায়নীর মন্দির ছিল; শ্রবণমনোহর বীণাশব্দ শ্রবণগোচর করিয়া, তাঁহারা, কৌতুকাবিষ্টচিত্তে সত্বর গমনে, তথায় উপস্থিত হইয়া, দেখিলেন, এক পরম সুন্দরী কন্যা, বীণানুগত স্তুতিগর্ভ গীত দ্বারা কাত্যায়নীর উপাসনা করিতেছে। উভয়ে একতানমনা হইয়া শ্রবণ ও দর্শন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, সেই কন্যা, জীমূতবাহনকে নয়নগোচর করিয়া, মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ, এবং স্বীয় সহচরী দ্বারা তাঁহার নাম, ধাম, ব্যবসায় প্রভৃতির পরিচয় গ্রহণপূর্বক প্রস্থান করিল।

অনন্তর, তাহার সহচরী, তদীয় নির্দেশক্রমে, তাহার মাতার নিকট পূর্বাপর সমস্ত নিবেদন করিলে, তিনি স্বীয় পতি রাজা মলয়কেতুর নিকটে কন্যার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। মলয়কেতু আপন পুত্র মিত্রাবসুকে কহিলেন, তোমার ভগিনী বিবাহযোগ্যা হইয়াছে; আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে; উপযুক্ত পাত্রের অন্বেষণ করা আবশ্যক। শুনিলাম, গন্ধর্বাধিপতি রাজা জীমূতকেতু, রাজ্যাধিকার পরিহারপূর্বক, নিজ পুত্র জীমূতবাহন মাত্র সমভিব্যাহারে, মলয়াচলে অবস্থিতি করিতেছেন। আমার অভিপ্রায় জীমূতবাহনকে কন্যাদান করি। তুমি, রাজা জীমূতকেতুর নিকটে গিয়া, আমার এই অভিপ্রায় তাঁহার গোচর কর। মিত্রাবসু, পিতার আদেশ অনুসারে, জীমূতকেতুর সমীপে

উপস্থিত হইয়া, সবিশেষ সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন; এবং জীমূতবাহনকে, মিত্রাবসুর সমভিব্যাহারে, মলয়কেতুর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। মলয়কেতু, শুভলগ্নে, স্বীয় কন্যা মলয়বতীর বিবাহকার্য সম্পন্ন করিলেন। বর ও কন্যা, পরম সুখে, কালযাপন করিতে লাগিলেন।

একদিন, জীমূতবাহন ও মিত্রাবসু, উভয়ে, মলয় মহীধরের পরিসরে, পরিভ্রমণবাসনায়, বাসস্থান হইতে বহির্গত হইলেন। ভূধরের উত্তর ভাগে উপস্থিত হইয়া, দূর হইতে এক শ্বেতবর্ণ বস্তুরাশি নয়নগোচর করিয়া, জীমূতবাহন মিত্রাবসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

বয়স্য! গন্ডশৈলের ন্যায়, ধবলবর্ণ, রাশিকৃত কি বস্তু দৃষ্ট হইতেছে। মিত্রাবসু কহিলেন, মিত্র! পূর্বকালে, গরুড়ের সহিত, নাগগণের নিরন্তর ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে, নাগেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া, সন্ধি প্রার্থনা করিলে, গরুড় কহিলেন, যদি তোমরা, আমার দৈনন্দিন আহারের নিমিত্ত, এক এক নাগ উপহার দিতে পার, তাহা হইলে, আমি তোমাদের প্রার্থনায় সম্মত হই; নতুবা, অবিলম্বে নাগকুল নিঃশেষ করিব। নিরুপায় নাগেরা, তাহাতেই সম্মত হইল। তদবধি, প্রতিদিন এক এক নাগ, পাতাল হইতে আসিয়া, ঐস্থানে উপস্থিত থাকে; গরুড়, মধ্যাহ্নকালে আসিয়া, ভক্ষণ করেন। এইরূপে, ভক্ষিত নাগগণের অস্থি দ্বারা, ঐ পর্বতাকার ধবলরাশি প্রস্তুত হইয়াছে।

শ্রবণমাত্র, জীমূতবাহনের অন্তঃকরণ কারুণ্যরস্যে পরিপূর্ণ হইল। তখন তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, মধ্যাহ্নকাল আগতপ্রায়, অবশ্যই এক নাগ, গরুড়ের আহারার্থে, পর্যায়ক্রমে, উপস্থিত হইবেক; আমি, আপন প্রাণ দিয়া, তাহার প্রাণরক্ষা করিব। অনন্তর, কৌশলক্রমে শ্যালককে বিদায় করিয়া, ক্রমে ক্রমে অস্থিরাশির নিকটবর্তী হইয়া, জীমূতবাহন রোদনশব্দ শ্রবণ করিলেন; এবং সত্বর গমনে, রোদনস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক বৃদ্ধা নাগী, শিরে করাঘাতপূর্বক হাহাকার ও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। দেখিয়া, একান্ত শোকাক্রান্ত হইয়া তিনি কাতর বচনে নাগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! তুমি কি নিমিত্তে রোদন করিতেছ। সে গরুড় বৃত্তান্তের বর্ণন করিয়া কহিল, অদ্য আমার পুত্র শঙ্খচূড়ের বার; ক্ষণকাল পরেই গরুড় আসিয়া, আহারার্থে তাহার প্রাণ সংহার করিবেক। আমার দ্বিতীয় পুত্র নাই। আমি, সেই দুঃখে দুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছি। জীমূতবাহন কহিলেন, মা। আর রোদন করিও না; আমি, আপন প্রাণ দিয়া, তোমার পুত্রের প্রাণরক্ষা করিব। নাগী কহিল, বৎস! তুমি, কি কারণে, পরের জন্যে প্রাণত্যাগ করিবে। আর, পরের পুত্রের প্রাণ দিয়া, আপন পুত্রের প্রাণরক্ষা করিলে, আমারও ঘোরতর অধর্ম ও যারপর নাই অপযশ হইবেক।

এইরূপে উভয়ের কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে শঙ্খচূড়ও তথায় উপস্থিত হইল; এবং জীমূতবাহনের অভিসন্ধি শুনিয়া, তাঁহার পরিচয় গ্রহণপূর্বক, বিশেষজ্ঞ হইয়া কহিল, মহারাজ! আপনি অন্যায় আজ্ঞা করিতেছেন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমার মত কত শক্ত ব্যক্তি সংসারে জন্মিতেছে ও মরিতেছে কিন্তু, আপনকার ন্যায় ধর্মাত্মা দয়ালু সংসারে সর্বদা জন্মগ্রহণ করেন না। অতএব, আমার পরিবর্তে

আপনকার প্রাণত্যাগ করা, কোনও ক্রমে, উচিত নহে। আপনি জীবিত থাকিলে, লক্ষ লক্ষ লোকের মহোপকার হইবেক। আমি জীবিত থাকিয়া, কোনও কালে, কাহারও কোনও উপকার করিতে পারিব না। সাদৃশ ব্যক্তির জীবন-মরণ দুই তুল্য।

জীমূতবাহন কহিলেন, শুন শঙ্খচূড়! প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আপন প্রাণ দিয়া, তোমার প্রাণরক্ষা করিব। আমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; ক্ষত্রিয়েরা প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অপেক্ষা, প্রাণত্যাগ অতি লঘু ও সহজ জ্ঞান করেন। বিশেষতঃ প্রাণস্নেহে প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইলে, নরকগামী হইতে হয়। অতএব, যখন স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছি, তখন অবশ্যই প্রাণ দিয়া, তোমার প্রাণরক্ষা করিব; তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর। এইরূপ বলিয়া, তিনি শঙ্খচূড়কে বিদায় করিলেন; এবং তদীয় প্রতিশীর্ষ হইয়া, গরুড়ের আগমন প্রতীক্ষায়, নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট রহিলেন। শঙ্খচূড়, জীমূতবাহনের নির্বন্ধলঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া, বিষণ্ণ মনে, বিরস বদনে, মলয়াচলবাসিনী কাত্যায়নীর সম্মুখে উপস্থিত হইল; এবং একাগ্রচিত্ত হইয়া, জীবনদাতা জীমূতবাহনের জীবনরক্ষণের উপায় প্রার্থনা করিতে লাগিল।

নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে, গরুড় আসিয়া, চঞ্চুপুট দ্বারা জীমূতবাহন গ্রহণপূর্বক, নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়া, মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, জীমূতবাহনের দক্ষিণ বাহুস্থিত নামাঙ্কিত মণিময় কেয়ূর শোণিতলিপ্ত হইয়া, মলয়বতীর সম্মুখে পতিত হইল। মলয়বতী, নামাক্ষর-পরিচয় দ্বারা, প্রিয়তমের প্রাণাত্যয় স্থির করিয়া, শিরে করাঘাতপূর্বক, ভূতলে পতিত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, কেয়ূর দর্শনে সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া, হাহাকার করিতে লাগিলেন। রাজা মলয়কেতু, চতুর্দিকে বহুসংখ্যক লোক প্রেরিত করিয়া, পরিশেষে স্বয়ং, পুত্র সহিত জীমূতবাহনের অন্বেষণে নির্গত হইলেন। শঙ্খচূড়, কাত্যায়নীর আলয় হইতে রাজপরিবারের কোলাহল শ্রবণ করিয়া সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা, জীমূতবাহনের অমঙ্গল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে পূর্বস্থানে উপস্থিত হইল; এবং গরুড়কে সম্বোধন করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, অহে বিহঙ্গরাজ! তুমি শঙ্খচূড়-ভ্রমে, রাজা জীমূতবাহনকে লইয়া গিয়াছ; উনি তোমার ভক্ষ্য নহেন। আমার নাম
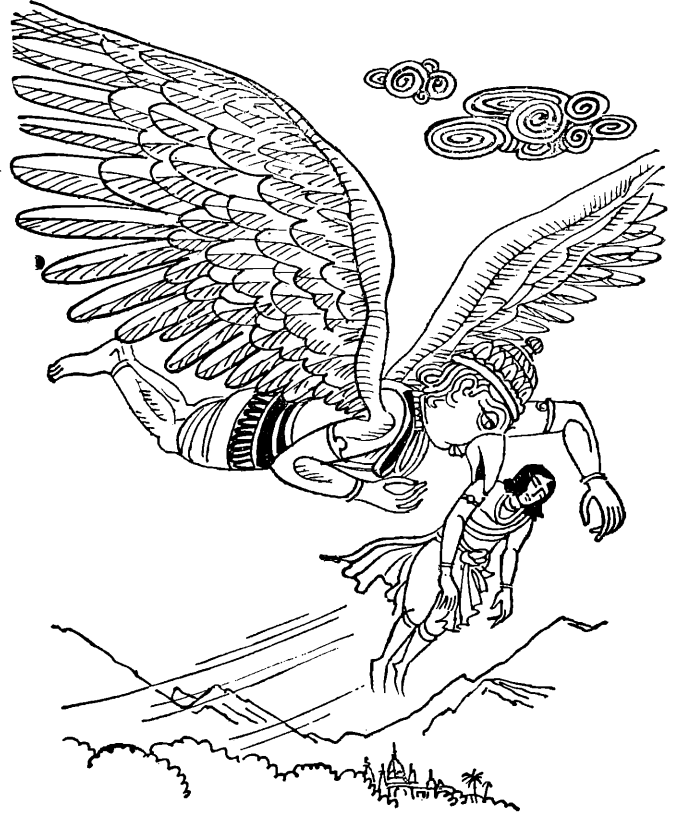
শঙ্খচূড়; অদ্য আমার বার। তুমি, তাঁহারে পরিত্যাগ করিয়া, আমায় ভক্ষণ কর; নতুবা, তোমায় সাতিশয় অধর্মগ্রস্ত হইতে হইবেক।

গরুড় শুনিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইলেন; এবং মৃতকল্প জীমূতবাহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে মহাপুরুষ! তুমি কে, কি নিমিত্তে প্রাণদানে উদ্যত হইয়াছ। জীমূতবাহন আত্মপরিচয়প্রদানপূর্বক, কহিলেন, অদ্য বা অব্দশতান্তে, অবশ্যই মৃত্যু ঘটিবেক। যে ব্যক্তি, ক্ষণবিধ্বংসী তুচ্ছ শরীরের বিনিয়োগ দ্বারা, পরোপকার করিয়া দিগন্তব্যাপিনী ও আকল্পকালস্থায়িনী কীর্তি উপার্জন করে, তাহারই এই সংসারে জন্মগ্রহণ সার্থক; নতুবা, স্বোদরপরায়ণ কাক, কুক্কুর, শৃগাল প্রভৃতি হইতে বিশেষ কি, এই বিবেচনায় আমি আত্মপ্রাণব্যয় দ্বারা, শঙ্খচূড়ের প্রাণরক্ষা করিতে আসিয়াছি। গরুড় শুনিয়া, যারপর নাই, সন্তুষ্ট হইলেন, এবং জীমূতবাহনকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিয়া কহিলেন, জগতে জীব মাত্রেই স্ব-স্ব প্রাণরক্ষায় যত্নবান। কিন্তু আপন প্রাণ দিয়া, পরের প্রাণরক্ষা করে, এরূপ ব্যক্তি অতি বিরল, যাহা হউক, আমি তোমার দয়া ও সাহস দর্শনে অতিশয়

সন্তুষ্ট হইয়াছি; বর প্রার্থনা কর।

জীমূতবাহন কহিলেন, খগেশ্বর! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, এই বর দাও, তুমি অতঃপর আর নাগহিংসা করিবে না; এবং দীর্ঘকাল ভক্ষণ করিয়া, যে অসংখ্য নাগের প্রাণসংহার করিয়াছ, তাহাদেরও জীবনদান কর, গরুড়, তথাস্তু বলিয়া, তৎক্ষণাৎ পাতাল হইতে অমৃত আহরণপূর্বক, অস্থিস্তূপের উপর সেচন করিয়া, মৃত নাগগণের জীবনদান করিলেন; এবং জীমূতবাহনকে কহিলেন, রাজকুমার! আমার প্রসাদে, তোমাদের অপহৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার হইবেক, এইরূপে বরপ্রদান করিয়া, গরুড় অন্তর্হিত হইলে, শঙ্খচূড়ও জীমূতবাহনের বহুবিধ স্তুতি করিয়া, বিদায় লইয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

জীমূতবাহন, এইরূপ বরলাভে চরিতার্থ হইয়া, পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন; এবং লোক দ্বারা, শ্বশুরালয়ে স্বীয় মঙ্গলসংবাদ পাঠাইয়া দিলেন, তাঁহাদের রাজ্যাপহারক জ্ঞাতিবর্গ, বরপ্রদান বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, রাজা জীমূতকেতুর শরণাগত হইল; এবং স্তুতি ও বিনতি দ্বারা প্রসন্ন করিয়া, তাঁহাকে রাজপদে পুনঃস্থাপিত করিল।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! জীমূতবাহন ও শঙ্খচূড়, এ উভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির অধিক ভদ্রতাপ্রকাশ হইল। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, শঙ্খচূড়ের। বেতাল কহিল, কি প্রকারে। রাজা কহিলেন, শঙ্খচূড়, জীমূতবাহনের প্রাণদান বিষয়ে, প্রথমতঃ কোনও মতে সম্মত হয় নাই; পরিশেষে; সম্মত হইয়াও, কাত্যায়নীর নিকটে গিয়া, উপকারকের মঙ্গলপ্রার্থনা করিতে লাগিল; এবং পুনরায় আসিয়া, প্রাণদানে উদ্যত হইয়া, জীমূতবাহনের প্রাণরক্ষা করিল। বেতাল কহিল, যে ব্যক্তি পরার্থে প্রাণদান করিল, তাহার ভদ্রতা অধিক বলিয়া গণ্য হইল না কেন। রাজা কহিলেন, জীমূতবাহন ক্ষত্রিয় জাতি; ক্ষত্রিয়েরা প্রাণত্যাগ অতি অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করে। অতএব, এই জীবনদান, জীমূতবাহনের পক্ষে, তাদৃশ দুষ্কর নহে।

[**বেতাল-পঞ্চবিংশতি** থেকে]

রুণুর স্বপ্ন

[২৪৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সকাল বেলায় চারটে টাকা ধার করে মা ডাক্তার ডেকে আনলেন। পরশু গান, যদি যেতে পারে রুণু। ওর কত স্বপ্ন সহরের সব গণ্যমান্য মানুষের সামনে গান গাইবে। প্রাইজ পাবে।

ডাক্তার এলেন। মা তাঁর হাত ধরে বললেনঃ বাবা শচীন, পরশু বিকেলে ওকে গান গাইতে হবে। আজ যেমন করে পার ওর জ্বরটা ছাড়িয়ে দাও।

ঃ কিছু ভয় নেই। ঠান্ডা গেলে সর্দি জ্বর আমি ইন্‌জেকসন দিয়ে যাচ্ছি। কালই জ্বর ছেড়ে যাবে।

সারাদিন গভীর উৎকণ্ঠায় কাটলো। সত্যিই ডাক্তারের ইন্‌জেকসনে পরের দিনে দুপুরেই রুণুর জ্বর ছেড়ে গেল, এক লাফে বিছানায় উঠে বসলো সে।

ঃ মা আমি তাহলে কাল যাব তো?

ঃ পারবি গাইতে?

ঃ ঠিক পারব মা। তুমি দেখো, গানের প্রাইজ আমি পাবই। দীপুকে নিয়ে তুমি যাবে তো?

মা হেসে বললেনঃ আচ্ছা যাব যাব।

মা রুণুকে সাদা ফ্রক লাল ফিতে বেঁধে সাজিয়ে সঙ্গে নিয়ে চললেন। দীপুও চলল।

রুণু দৌড়ে এগিয়ে চললো আগে। শরীরে জ্বরের দুর্বলতা, কিন্তু কিছুই টের পাচ্ছিল না সে। উদ্বোধন সঙ্গীতের সুরটা তার বুক ভরে বাজছে। আর কী সুন্দর আজকের দিনটা। আকাশের রঙ কী নীল!

স্কুলের মাঠে বিরাট প্যান্ডাল। এখন লোকে লোকারণ্য। মান্যগণ্যেরা সবাই বসেছেন ডেইসের ওপর। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সভাপতি। রুণু ছুটে ভেতরে গেল। সভাপতির গলায় মালা দেওয়া হলো। এবার ওর পালা। উদ্বোধন সঙ্গীত তো ও-ই গাইবে।

কিন্তু কই ওকে তো কেউ ডাকছে না। হঠাৎ চমকে উঠলো রুণু। উদ্বোধন সঙ্গীত ধরেছে ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে—ক্লাস নাইনের লীনা। কী কড়া গলা—গোড়াতেই সে বেসুরো করে ফেললো। ম্যাজিস্ট্রেটের পাশে বসে আছেন বড়দি—এক একবার হাসি হাসি মুখে চাইছেন লীনার দিকে—আর একবার তার বাবার দিকে।

মীরাদি রুণুর পাশে এসে বললেনঃ কী করব, এত বাজে গায়, অথচ লীনাই উদ্বোধন সঙ্গীত গাইবে বড়দি বললেন। দুঃখ করো না তুমি আর একদিন—

রুণু সরে গিয়ে একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। কান্নায় তার শরীর কাঁপছিল, মনে হচ্ছিল আবার তার জ্বর আসবে। খুঁটিতে হেলান দিয়ে না থাকলে সে হয়তো মাটিতেই পড়ে যেতো। চোখের সামনে তার সব মুছে আসছিল তখন।

বাংলার সম্মান রক্ষার জন্য আমরা মৃত্যুবরণ করছি…

মনোরঞ্জন ঘোষ

ষাট-বাষট্টি বছর আগেকার কথা। বাংলা দেশের একটি গ্রামে হানা দেওয়া শুরু করল একটা রয়াল বেঙ্গল টাইগার। গ্রামবাসীরা ভীষণ ভীত হয়ে পড়ল। সন্ধ্যের পর কেউ আর ঘরের বার হতে পারে না। বাঘটা প্রায়ই গ্রামের মধ্যে ঢুকে গরীব চাষীদের গরু-বাছুর টেনে নিয়ে যায়। চাষীর হালের বলদ বাঘে খাওয়া মানেই চাষীর না খেয়ে মরার সম্ভাবনা। তারা কান্নাকাটি শুরু করে দিল। কে তাদের বাঘের অত্যাচার থেকে বাঁচাবে?

তাদের এই দুর্দশা এক যুবককে খুবই ব্যথিত করে তুলল। সেই সময় তিনি তাঁর মামার বাড়ি কুষ্টিয়ার কাছে ওই কয়া গ্রামে এসেছিলেন। তিনি কলকাতার সরকারী চাকুরে হলেও তাঁর বাল্যকাল যেখানে কেটেছিল সেই গ্রামকে ভুলতে পারেন নি, ভুলতে পারেন নি গ্রামের মানুষদের। তাই তিনি গ্রামের লোকদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার সংকল্প করলেন। কিন্তু তাঁর নিজের কোন বন্দুক না থাকায় শুধু একটা ভোজালি নিয়েই বাঘের সংগে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হলেন।

অন্য কেউ এভাবে বাঘের সংগে মোকাবিলা করতে গেলে পাগলামি বলে মনে করে সবাই তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করত। কিন্তু এই যুবকটিকে গাঁয়ের লোকেরা ভাল করেই চিনত। তাঁর কাছে অসম্ভব বলে কিছু ছিল না। যুবকটির মনে অসীম সাহস, দেহে অদ্ভুত শক্তি, হৃদয়ে প্রবল পরাচিকীর্ষা। তার পরিচয় গ্রামবাসীরা বহুবার পেয়েছিল। বর্ষার দুরন্ত গড়াই নদী তিনি সাঁতরে পারাপার করতেন, চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়তেন স্টেশন থেকে মাইল খানেক দূরে বাড়ির কাছে, পথে পরিত্যক্ত কলেরা রোগীর সেবা নিঃশঙ্কচিত্তে করতেন।

যা হোক, এই বীর যুবক যতীন্দ্রনাথের বাঘ মারার সংকল্পে গ্রামবাসীরা নিশ্চিন্ত হলো। তাঁকে তারা তাদের ত্রাণকর্তা বলেই মনে করে।

যতীন্দ্রনাথের এক মামাতো ভাইয়ের বন্দুক ছিল। তিনি যতীন্দ্রনাথকে বাঘ শিকারে সাহায্য করার জন্য বন্দুকটা নিয়ে তাঁর সংগী হলেন। কিন্তু ফল হলো বিপরীত। বন্দুকের গুলিতে বাঘটিকে তিনি বধ করতে পারলেন না, শুধু আহতই করলেন। আহত বাঘ যেমন মারাত্মক প্রতিহিংসা-পরায়ণ, তেমনি সাক্ষাৎ যমের মতোই ভয়ংকর। এ ক্ষেত্রেও তাই হলো। যতীন্দ্রনাথ জংগলের যেদিকে ছিলেন, গুলি খেয়ে বাঘটা সেদিকে ছুটে এসে তাঁকে আক্রমণ করল।

যতীন্দ্রনাথ কোনদিনই পিছু হটবার পাত্র নন। তিনিও অসীম বিক্রমে বাঘের গলা বাঁ বগলে চেপে

ধরলেন এবং তার মাথায় ভোজালি দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন। বাঘ যেমন তাঁকে কামড়াবার চেষ্টা করে, তিনিও তেমনি বাঘকে জড়িয়ে ধরে বার বার ভোজালি মারতে থাকেন। জড়াজড়ি করতে করতে বাঘকে নিয়ে তিনি এক সময় মাটিতে পড়ে গেলেন। দুজনের সমানে লুটোপুটি চলে মাটির উপর। বাঘ তাঁর দুই হাঁটুতে কামড় বসাল, নখে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলল সর্বাঙ্গ। কিন্তু পশুর শক্তি শেষ পর্যন্ত হার মানল মানুষের শক্তির কাছে। নিজের দেহের আঘাত অগ্রাহ্য করে হিংস্র ভয়ংকর বাঘকে তিনি এক সময়ে মাটিতে চেপে ধরে ভোজালিটা তার বুকে বসিয়ে দিলেন। সেই আঘাতেই বাঘ শেষ হয়ে গেল। আর সেদিন থেকে পরিচিত মহলে যুবকের নাম হলো **বাঘা যতীন।**

শুধু একটা বাঘ মারাই বাঘা যতীনের জীবনের সবচেয়ে বড় কীর্তি নয়। তাঁর সিংহের সঙ্গে সংগ্রাম হচ্ছে অবিস্মরণীয়। এ সিংহ বনের নয়, ব্রিটিশ সিংহ—আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের রাজা। এই ব্রিটিশ সিংহকে সম্মুখ সমরে পরাজিত করে দেশকে স্বাধীন করার সঙ্কল্প তিনি করেছিলেন। কোটি কোটি ভারতবাসীর দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য নির্ভয়ে এগিয়ে এসে আত্মদান করেছিলেন তিনি।

তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব পর্যন্ত শ্রদ্ধাভরে বলেছিলেন—"...I have a great admiration for him. He was the only Bengalee, who died fighting from a trench." (তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রগাঢ়। তিনিই একমাত্র বাঙালী যিনি ট্রেঞ্চ থেকে যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যু বরণ করেছেন।)

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমায় কয়া গ্রামে মাতুলালয়ে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়।

তাঁর পৈতৃক বাসস্থান ছিল যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার রিসখালি গ্রামে। মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় তিনি মামার বাড়িতেই মানুষ হয়েছিলেন।

১৮৯৮ সালে কৃষ্ণনগরের এ. ভি. স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। খেলাধুলায় তিনি ছিলেন স্কুলের সেরা ছেলে। ছেলেবেলায় মামার বাড়ি থাকতেই ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক ছোঁড়া ইত্যাদি শিখে নেন।

তাঁর স্কুল-জীবনেই একদিন এক বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল যেটি তাঁর অসীম সাহসেরই দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তিনি স্কুলে যাচ্ছেন, এমন সময় কৃষ্ণনগরের উকিল বারাণসী রায়ের গাড়ির ঘোড়া হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে পথের দুধারের সবাইকে সন্ত্রস্ত করে তুলল। সহিস-কোচয়ানদের পর্যন্ত সেই ক্ষ্যাপা ঘোড়ার সামনে যেতে সাহস হলো না। ব্যাপারটা দেখে যতীন্দ্রনাথ ছুটে এলেন। ঘোড়ার সামনে লাফিয়ে পড়ে তার ঘাড়ের চুল চেপে ধরলেন। দুরন্ত ক্ষ্যাপা ঘোড়া বাগ মানল। স্বস্তির-নিশ্বাস ফেলে বাঁচল পথচারীরা।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে যতীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসে শোভাবাজারে তাঁর মেজমামার বাসায় থেকে সেন্ট্রাল কলেজে এফ. এ. পড়তে আরম্ভ করলেন। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই তাঁর নিজের পায়ে দাঁড়াবার ইচ্ছা। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা না দিয়ে শর্টহ্যান্ড ও টাইপরাইটিং শিখলেন তিনি। এই সময় কলকাতার ক্ষেত্র গুহের কুস্তির আখড়ায় ভর্তি হয়ে তিনি কুস্তিও শিখেছিলেন।

তখনকার দিনে সন্ধ্যার পর কলকাতার পথঘাটে বের হওয়া নিরাপদ ছিল না। মাতাল গোরা-সৈন্য ও বদমাইস ফিরিঙ্গীরা প্রায়ই নিরীহ পথচারীদের উপর অত্যাচার করত। এই অন্যায় আচরণ যতীন্দ্রনাথের কাছে অসহ্য বোধ হলো। তিনি নিপীড়িত নির্যাতিত দেশবাসীর পক্ষ নিয়ে বদমাইসদের 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ' করে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া শুরু করলেন। বাঙালী শুধু মার খেতে জানে না, মার দিতেও জানে—এই সত্য তিনি বাস্তবে প্রমাণ করলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই ভাল শর্টহ্যান্ড ও টাইপরাইটিং শিখে তিনি এক ইংরাজ সওদাগরী অফিসে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে এক চাকরি লাভ করলেন। কিছুদিন বাদেই মজঃফরপুরে ব্যারিস্টার কেনেডি সাহেবের স্টেনোগ্রাফারের কাজ পেলেন তিনি মাসিক আশী টাকা মাইনেতে। এই কেনেডিরই স্ত্রী ও কন্যা দুর্ভাগ্যক্রমে ক্ষুদিরামের বোমায় মারা যান।

কেনেডি সাহেবের এ কাজও যতীন্দ্রনাথকে বেশি দিন করতে হয় নি। আরও ভাল মাইনের সরকারী চাকরি পেয়ে তিনি কলকাতায় চলে এলেন। বেঙ্গল গভর্নমেন্টের এই স্টেনোগ্রাফারের চাকরিতে তাঁকে কলকাতা ও দার্জিলিং দু জায়গাতেই যাতায়াত করতে হতো।

দেশের প্রতি যতীন্দ্রনাথের ভালবাসায় কোন ভেজাল ছিল না। তার ফলে সরকারী কাজে থাকার সময় কুড়ি বছর বয়সেই তিনি গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দিলেন—দেশকে সশস্ত্র সংগ্রাম দ্বারা স্বাধীন করার জন্য।

ইংরাজ কেরানী ক্লাইভ যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, ইংরাজ সরকারের আর দুটি দেশী কেরানী—যতীন মুখার্জী ও রাসবিহারী বোস—তার ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন।

অফিসের কাজের সময় ছাড়া সকাল-সন্ধ্যা যতীন্দ্রনাথ দেশের যুবকদের সংগঠিত করার কাজে লিপ্ত থাকতেন। গীতার মন্ত্রে তাদের দীক্ষিত ও শিক্ষিত করতেন। দেশের মুক্তির জন্য সংগ্রামে প্রাণ দিতে তাদের অনুপ্রাণিত করতেন। তরুণদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তিনি, তাদের সকলের ছিলেন 'যতীনদা' বা 'বড়দা'।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর স্বদেশী আন্দোলন যখন শুরু হলো, তখন বাংলার যুবকদের আদর্শ হলেন শিবাজী, যিনি মুষ্টিমেয় অনুচর নিয়ে জীবনপণ সংগ্রামে নেমেছিলেন মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। শিবাজীর মতোই গেরিলা-যুদ্ধে শক্তিশালী ইংরাজ সরকারকে নাস্তানাবুদ করার সঙ্কল্প নিলেন বাংলার বিপ্লবীরা। বাংলা দেশে শিবাজী-উৎসব শুরু হলো। রবীন্দ্রনাথ এই সময়েই লিখেছিলেন শিবাজীর উপর তাঁর বিখ্যাত কবিতাটি। মারাঠার সঙ্গে মিলিত হয়ে

'জয়তু শিবাজী' ধ্বনি তুলল বাঙালীরা। মহারাষ্ট্রের উগ্রপন্থী নেতা বালগঙ্গাধর তিলক বাংলা পরিভ্রমণ করে গেলেন।

এই সময়ে কলেজ স্ট্রীট-হ্যারিসন রোডের কাছে এক থিয়েটারে শিবাজী-উৎসব উপলক্ষে এক কোষমুক্ত তরবারিতে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার অনুষ্ঠান হয়েছিল। পুলিশের ভয়ে অনেকেই এই সভায় উপস্থিত হতে সাহস করেননি। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ নির্ভয়ে নিঃসংকোচে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, স্বাধীনতার জন্য শক্তি আরাধনার প্রয়োজন। বাঙালীদের কর্তব্য তরবারি ধারণ করা।

যতীন্দ্রনাথের ভেতর ধর্মভাব ছিল প্রবল। তিনি বিখ্যাত সন্ন্যাসী ভোলানন্দ গিরির কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। গুরু তাঁকে এক মন্ত্রপূত রুদ্রাক্ষ দিয়েছিলেন, যেটি তিনি সর্বদা গলায় পরে থাকতেন। হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় যখন তিনি ধরা পড়ে জেলে গেলেন, তখন জেলার ওই রুদ্রাক্ষ খুলে তাঁকে সেলে বন্দী করার আদেশ দেন।

যতীন্দ্রনাথ দৃঢ়স্বরে সিপাই-সান্ত্রীদের বললেন, খবরদার! প্রাণ থাকতে এই রুদ্রাক্ষ আমি খুলব না। জোর করে কেউ খোলাতেও পারবে না। আমায় যে স্পর্শ করবে, তাকে আমি আছড়ে মেরে ফেলব।

ভয়ে কেউ তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করতে সাহস করল না।

তাঁকে যখন বন্দী করে লালবাজার লক-আপে রাখা হয়, তখন এক মজার ব্যাপার ঘটেছিল।

এক ইংরাজ পুলিশ অফিসারের বোধহয় বাঘা যতীনকে একটু ব্যঙ্গ করার সাধ হয়েছিল, তাই যতীন্দ্রনাথকে সে বলল, আমি শুনেছি তুমি একটা বাঘ মেরেছিলে। কিন্তু আমার মনে হয় সেটা বাঘ নয়, বেড়াল।

জবাবে বাঘা যতীন গম্ভীরভাবে শুধু বললেন, হুঁ, তা বটে! তবে মনে রেখ, আমি তোমাদের চারজনের সমান।

এই কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পুলিশ অফিসারটির একটুও দেরি হয়নি। কারণ সে জানত, কিছুকাল আগে চারটে গোরা সৈন্যকে বাঘা যতীন মেরে ঠান্ডা করে দিয়েছিলেন।

সে সময় যতীন্দ্রনাথ সরকারী কাজে দার্জিলিং যাচ্ছিলেন। শিলিগুড়ি স্টেশনে এক তৃষ্ণার্ত সহযাত্রী জল চাওয়ায় তিনি ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মের কলের দিকে যান কাঁচের গ্লাস হাতে। তখন প্ল্যাটফর্মে চারটে গোরা মিলিটারীম্যান ছিল। মজা দেখার জন্য তারা অকারণে বাঘা যতীনকে ধাক্কা মেরে তাঁর হাতের গ্লাসটা ভেঙে দিল।

দুর্বল বাঙালীরা তখন সাহেবদের এ ধরনের অত্যাচার মুখ বুঁজে সহ্য করতে অভ্যস্থ ছিল। কিন্তু বাঘা যতীন ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া। অত্যাচার নীরবে সহ্য করা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তিনি ফুঁসে উঠে প্রতিবাদ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে গোরা চারজন তাঁকে একসঙ্গে আক্রমণ করল।

যতীন্দ্রনাথ এক পা-ও পিছু হটলেন না। দু-হাতে বজ্রের মতো ঘুসি বর্ষণ করে একাই সৈনিকপুঙ্গবদের কিছুক্ষণের মধ্যেই প্ল্যাটফর্মে শুইয়ে দিলেন। স্টেশন-সুদ্ধ লোক তাঁর শক্তি, সাহস ও বীরত্ব দেখে যুগপৎ বিস্ময়ে ও আনন্দে আত্মহারা। সংবাদপত্রে ঘটনাটি প্রকাশিত হলে সারা দেশে হৈ হৈ পড়ে গেল। আর সাহেব সৈন্যরা মার খেয়ে বাঘা যতীনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতে কোর্টে দৌড়াল।

কিন্তু বেঙ্গল গভর্নমেন্টের সেক্রেটারী মিঃ হুইলার যতীন্দ্রনাথকে খুব ভালবাসতেন তাঁর কর্মদক্ষতা ও স্পষ্ট-বাদিতার জন্য। সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি মিলিটারীদের দিয়ে এই মামলা প্রত্যাহার করিয়ে নিলেন। মিলিটারী অফিসারদের বললেন, একজন যুবক খালি হাতে চারজন মিলিটারীকে মার দিয়েছে, আর তারা মার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে কোর্টে দৌড়চ্ছে,—এর চেয়ে লজ্জাকর আর কিছু হতে পারে না। বিন্দুমাত্র আত্মমর্যাদা জ্ঞান থাকলে এ নিয়ে আর এগুনো উচিত নয়।

যতীন্দ্রনাথ যখন বাঘ মারতে গিয়ে আহত হয়ে ছ মাস শয্যাশায়ী ছিলেন, তখন তাঁকে চাকরী থেকে বরখাস্ত না করে ছুটি মঞ্জুর করেছিলেন এই হুইলার সাহেবই।

যতীন্দ্রনাথ যে দুঁদে সিভিলিয়ান এই হুইলার সাহেবের প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন, তার পিছনেও কারণ ছিল। প্রথম দিনই তাঁর স্পষ্টবাদিতা ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন হুইলার সাহেব। তাঁর ব্যক্তিগত স্টেনোগ্রাফার হিসাবে ভারতীয় কাউকে নিয়োগ করতে গোড়ায় তিনি মোটেই ইচ্ছুক ছিলেন না।

চাকরির জন্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে যতীন্দ্রনাথ নিঃশঙ্কচিত্তে সাহেবকে সোজাসুজি বললেন, আপনি কাজের লোক চান, না নিজের দেশের লোককে পোষণ করতে চান? কাজের লোক চাইলে আমায় চাকরি দিতে পারেন।

চাকরিপ্রার্থীর এ ধরনের কথা শুনে হুইলার সাহেব তো অবাক। তিনি দেখলেন, অধ্যাপক অ্যাটকিনসনের জোর সুপারিশপত্র যুবকটির আছে। অধ্যাপক লিখেছেন, এমন সাহস, বীরত্ব ও সত্যবাদিতা তিনি আর কারও মধ্যে দেখেননি।

অ্যাটকিনসন কিভাবে যতীন্দ্রনাথের এই পরিচয় পান, সে-ও আর এক ঘটনা।

সেবার কলকাতার পথে এক স্বদেশী শোভাযাত্রা বেরিয়েছে। ফিরিঙ্গীরা সে শোভাযাত্রা আক্রমণ করল। বাড়ির দোতলা থেকে গরম জল ঢেলে দেওয়া হলো শোভাযাত্রীদের উপর। অধ্যাপক অ্যাটকিনসনের ভাই টমও ছিল সেই হামলাকারীদের মধ্যে। সে বন্দুক নিয়ে আক্রমণ করল শোভাযাত্রীদের। দুরন্ত রাগে রুখে দাঁড়ালেন বাঘা যতীন এবং টমের বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে তাই দিয়েই উত্তম-মধ্যম দিলেন টমকে। তারপর সোজা অধ্যাপক অ্যাটকিনসনের কাছে গিয়ে তাঁর ভাইকে প্রহারের কথা জানিয়ে এলেন। যতীন্দ্রনাথের এই নির্ভীক আচরণে মুগ্ধ হলেন অধ্যাপক অ্যাটকিনসন। বলা বাহুল্য, ইংরাজ মাত্রই খারাপ নয়, কিছু কিছু ইংরাজের মধ্যে তখন গুণগ্রাহিতার অভাব ছিল না।

ক্ষুদিরামের বোমা নিক্ষেপের ঘটনা আগেই বলা হয়েছে। তারপরেই বাংলার বিপ্লবীরা সকলে প্রায় ধরা পড়ে যান। ইংরাজ সরকার মনে করল, আলিপুর বোমার মামলার

আসামীদের সাজা দিয়ে দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে তারা বাংলার বিপ্লব-আন্দোলনকে ধ্বংস করতে সক্ষম হবে। কিন্তু তাদের এ ধারণা যে কতখানি ভুল, তা প্রমাণ করলেন বাঘা যতীন। বিপ্লব-আন্দোলনের দীপশিখা তিনি অনির্বাণ রাখলেন। যতীন্দ্রনাথ যে বিপ্লবীদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, পুলিশ তা জানত না। ফলে যখন অন্য সকলে একে একে ধরা পড়ে গেলেন, তখনও তিনি ধরা পড়েন নি। তিনি তখন বাংলার বিপ্লবীদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে শুরু করেছেন।

আলিপুর বোমার মামলায় বিপ্লবীদের সাজা দেবার জন্য সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস ও গোয়েন্দা শামসুল আলম তখন অতিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে উঠেছে। এদের উপযুক্ত সাজা দেবার সংকল্প করলেন বিপ্লবীরা।

১৯০৯ সালের দশই ফেব্রুয়ারি আলিপুরে আদালতের মধ্যেই বিপ্লবী চারু বোস সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে গুলি করে মারলেন। চারু বোসের ডান হাতটা ছিল পঙ্গু। কিন্তু পঙ্গুতার জন্য দেশের সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করতে তিনি পিছিয়ে রইলেন না। ডান হাতের কব্জিতে পিস্তল বেঁধে নিয়ে বাঁ হাতে ঘোড়া টিপলেন। ইংরাজ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে ফাঁসি দিল।

কুখ্যাত শামসুল বন্দী বিপ্লবীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করত। তার সম্বন্ধে 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় ব্যঙ্গ করে লেখা হয়ঃ—

"ব্রিটিশের শ্যাম তুমি, স্বদেশীর শূল,
(তোমার) কবে ভিটেয়ে চরবে ঘুঘু,
চোখে দেখবে সর্ষে ফুল?"

এবার এই শামসুলকে সর্ষে ফুল দেখাবার ব্যবস্থা করলেন বাঘা যতীন।

১৯১০ সালের চব্বিশে জানুয়ারি। এবার হাইকোর্ট। সকালে কোর্ট বসার সময় সেখানে লোক গিজগিজ করছে। আশুতোষ বিশ্বাসকে হত্যা করার পর সরকার খুব সাবধানতা অবলম্বন করেছে। বাইরের লোকদের দেহতল্লাসী করার পর তবেই কোর্টের ভেতর ঢুকতে দেওয়া হয়। তল্লাসকারীদের চোখ এড়িয়ে তরুণ বিপ্লবী বীরেন দত্ত-গুপ্ত রিভলভার নিয়ে কোর্ট-বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করলেন। তারপর এক ফাঁকে সকলের চোখের সামনেই শামসুলকে গুলি করলেন। সারা কোর্টে হৈ হৈ পড়ে গেল। বীরেন ভীতসন্ত্রস্ত জনতার মধ্যে দিয়ে কোর্ট-বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে আসতেই বাইরের অশ্বারোহী পুলিশরা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করল। বীরেন ঘুরে দাঁড়িয়ে যে সার্জেন্টটি তাঁর কাছে এসে পড়েছিল তার মাথা লক্ষ্য করে গুলি করলেন। কিন্তু ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে থাকায় গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল, এবং একটুর জন্য বেঁচে গেল সার্জেন্ট। গুলি তার মাথার টুপিটা উড়িয়ে দিল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় এক সার্জেন্টের ঘোড়া চার্জ করে বীরেনকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। দেশী পাহারাওয়ালারা ছুটে এসে মাথার পাগড়ি খুলে বীরেনকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল।

বন্দী বীরেনকে গোয়েন্দা বিভাগের হেড-কোয়ার্টার্সে নিয়ে গিয়ে দেশী-বিলেতী বড় বড় অফিসাররা নানাভাবে জেরা করতে শুরু করে। কে তাঁকে পাঠিয়েছেন? রিভলভার কে দিয়েছে? দলের নেতারা তো সব বন্দী, তাহলে

দু-হাতে বজ্রের মতো ঘুসি বর্ষণ করে একাই......

এখন কে নেতা হয়েছে? কথা বের করার জন্য তাঁকে পীড়ন করা হয়, প্রলোভন দেখান হয়। কিন্তু তাতে সফল না হয়ে পুলিশ শেষে এক চালাকি করল। তারা নিজেদের প্রেস থেকে বিপ্লবীদের গোপন সংবাদপত্র যুগান্তরের নকল কপি ছাপল। বহু মিথ্যা কথা ও বীরেনের নিন্দা ছাপা হল তাতে। অল্পবয়স্ক বীরেন পুলিশের চালাকী বুঝতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন বিপ্লবীরা তাঁকে আর বিশ্বাস করেন না। দারুণ অভিমান বশে তিনি পুলিশের কাছে দলের নেতার নাম করে বসলেন। গোয়েন্দারা বীরেনের স্বীকারোক্তির ফলে এই প্রথম টের পেল যে, সে সময় বাংলার বিপ্লবীদের নেতা হচ্ছেন সরকারের বিশ্বস্ত কর্মচারী যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী।

বীরেন অচিরেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে প্রায়শ্চিত্ত করলেন ফাঁসিমঞ্চে নিজের জীবন দিয়ে।

বীরেন যখন ধরা পড়ে, তখন দুর্ধর্ষ বিপ্লবী বাঘা যতীন চোখের জল ফেলেছিলেন। তিনি যেমন বজ্রের মতো কঠোর ছিলেন, তেমনি ছিলেন কুসুমের মতো কোমল। শত্রুকে বধ করতে তিনি দ্বিধা করতেন না, আবার অনুগামীদের নিজের প্রাণের চেয়ে ভালবাসতেন। বীরেন পুলিশের কাছে তাঁর নাম বলে দেওয়ায় অনেকে বীরেনের নিন্দা করেছিল। কিন্ত সেজন্য নেতা যতীন্দ্রনাথ মোটেই বীরেনের উপর অসন্তুষ্ট হননি। তিনি বুঝেছিলেন, অল্পবয়সী বালক পুলিশের চালাকি ধরতে পারেনি। বীরেনের বীরত্বের তিনি প্রশংসা করতেন এবং নিজের কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ করেছিলেন তাঁর শিষ্য শহীদ বীরেনের নামেই।

শামসুল আলম হত্যার পর নেতা যতীন্দ্রনাথ ও আরও প্রায় পঞ্চাশ জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে গভর্নমেন্ট ১৯১০ সালের মার্চ মাসে 'হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা' নামে খুব বড় রকমের এক মোকর্দমা শুরু করে। এই বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ভারত-সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা, হত্যার সহযোগিতা, ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ ইত্যাদি। হাইকোর্টের সেসনে বিচার না হওয়া পর্যন্ত যতীন্দ্রনাথ ও আর সকলকে এক বছরেরও বেশি জেল-হাজতের নির্জন সেলে বন্দী থাকতে হয়েছিল।

১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা হতে যতীন্দ্রনাথ মুক্তিলাভ করলেন। এই ষড়যন্ত্র মামলার সময়ে তাঁর সরকারী চাকরিটা চলে যায়। সেক্রেটারিয়েটের ইংরাজ অফিসাররা ততদিনে বুঝেছে, কী সাংঘাতিক লোককে তারা সরকারী চাকরি দিয়েছিল যে তলে তলে সরকারকেই ধ্বংস করতে চায়!

ষড়যন্ত্র মামলা হতে মুক্তি পেয়ে যতীন্দ্রনাথ এবার স্বাধীন ব্যবসা শুরু করলেন। তিনি নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও যশোর জেলাবোর্ডের কনট্রাক্টারি শুরু করেন। জে. জে. রেলওয়ের ঠিকাদার হন। এই কাজ উপলক্ষে তাঁকে ওই তিনটি জেলার সব জায়গায় ও কলকাতায় যাতায়াত করতে হতো।

ইংরাজ সরকার কিন্তু বুঝতে পারে, যতীন্দ্রনাথের ব্যবসায়ী রূপটা বাহ্যিক, আসল রূপ হচ্ছে বিপ্লবী নেতা। তাই তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য পুলিশ তাঁর পিছনে গুপ্তচর লাগিয়ে রাখে। কিন্তু তাঁকে অনুসরণ করা গুপ্তচরদের সাধ্যাতীত। কারণ তিনি সাইকেলে যশোর জেলার ঝিনাইদহ থেকে নদীয়া জেলার মেহেরপুর হয়ে মুর্শিদাবাদ একদিনে চলে যেতে পারতেন। কোন গোয়েন্দার পক্ষে একদিনে তাঁর মতো পঁচাত্তর মাইল সাইকেল চালানো কল্পনারও বাইরে। তাছাড়া তিনি ফুল-স্পীডে ধাবমান মেল-ট্রেন থেকে ওঠা-নামা করতে পারতেন। আত্মগোপনকালে দার্জিলিং মেলের যেসব ছোট স্টেশনে স্টপেজ নেই, সেই সব স্টেশন থেকে উনি অবলীলাক্রমে ওঠা-নামা করতেন। আলৌকিক তাঁর কীর্তিকলাপ! রূপকথার নায়কের মতোই বিস্ময়কর।

বাঘা যতীন যে সময় বাংলার বিপ্লবীদলের নেতা, সে সময় বিপ্লবীরা এক অসাধ্য সাধন করেন। সেটা হল বিদেশী অস্ত্রশস্ত্র ব্যবসায়ী রডা কোম্পানীর অস্ত্র-অপহরণ! নেপালে গভর্নমেন্ট সে সময় রডা কোম্পানীর মারফত সৈন্যবাহিনীর জন্যে অস্ত্র আমদানী করছিল। বিপ্লবী অনুকূল মুখার্জী মতলব করে কৌশলে ষোল বছর বয়সের হাবুল নামে একটি ছেলেকে রডা কোম্পানীর চাকরিতে ঢুকিয়ে দেন। হাবুলের কাজ হল জাহাজঘাট থেকে মাল খালাস করা এবং তা কোম্পানীর গুদামে নিয়ে আসা। হাবুল একদিন গরুর গাড়ি করে মাল (পঞ্চাশটি পিস্তল ও ছেচল্লিশ হাজার কার্তুজের বাক্স) নিয়ে সোজা মলঙ্গা লেনে বিপ্লবীদের আস্তানায় চলে এল। বাঘা যতীন, অনুকূল মুখার্জী, বিপিন গাঙ্গুলি প্রভৃতি বিপ্লবীরা বৃষ্টির মধ্যে তাড়াতাড়ি সব মাল সরিয়ে ফেললেন।

এদিকে সন্ধ্যার মধ্যে মাল গুদামে না পৌঁছানোয় রডা কোম্পানীতে হৈ হৈ পড়ে গেছে। পুলিশ গাড়োয়ানকে গ্রেপ্তার করল। তার কাছ থেকে সন্ধান নিয়ে সারা কলকাতা তোলপাড় করে তুলল হাবুলের খোঁজে। সন্দেহভাজন বিপ্লবীরা সব বন্দী হলেন। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে হাবুল রংপুরে পালায়। তারপর সেখান থেকে সে যে কোথায় গেল, কেউ আর খুঁজে পেল না। এমন কি দলের বিপ্লবীরাও না। নিজেকে চিরতরে বিলুপ্ত করে ছেলেটি দধীচির মতো বাংলার বিপ্লবীদের হাতে বজ্র তুলে দিয়ে গেল।

রডা কোম্পানীর এই পিস্তল বাংলার বিভিন্ন জেলার বিপ্লবীদের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া হলো অত্যাচারী ইংরাজদের হত্যা করার জন্য।

ইতিমধ্যে এমন একটি ব্যাপার ঘটে গেল যার জন্য বাঘা যতীনকে পুলিশ বিশেষভাবে খোঁজা শুরু করল।

একদিন পাথুরেঘাটার এক গুপ্ত আড্ডায় রডা কোম্পানী হতে অপহৃত অস্ত্র ও দলের অর্থ বিভিন্ন জেলার শাখাগুলির মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে ভাগ করা হচ্ছিল। এমন সময় নীরদ হালদার নামে এক গোয়েন্দা হঠাৎ সেখানে এসে পড়ে। সে যতীন্দ্রনাথকে দেখেই চিনতে পেরে বলে উঠল— ইউ আর হিয়ার!

সেই ঘরে বাঘা যতীনের পাশেই ছিল তাঁর প্রিয় শিষ্য চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী। এই বীর বালকের সঙ্গে সব সময় গুলিভরা রিভলভার থাকত। কর্ণের যেমন ছিল সহজাত কবচ-কুণ্ডল, চিত্তপ্রিয়ের তেমনি রিভলভার-গুলি। আর সে ছিল অর্জুনের মতই সব্যসাচী, অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী। বিপ্লবীরা বলত যে চিত্তপ্রিয় ছুটন্ত কুকুরের পায়েও গুলি করতে পারত লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে।

আই. বি. পুলিশ ইন্সপেক্টার সুরেশ মুখার্জী বাংলার বিপ্লবীদের ধরার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন এবং যাঁদের ধরতেন তাঁদের উপর নির্যাতন করতেন।

বিপ্লবী-নেতা বাঘা যতীন চিতোর-রাণার মতোই এক-দিন পণ করে বসলেন, জলস্পর্শ করব না আর, যদি আজ সন্ধ্যার মধ্যে সুরেশ মুখার্জীর রক্ত আমায় দর্শন করানো না হয়।

হারাবংশী বীরের মতোই গুরুর শপথ রক্ষার জন্য চিত্তপ্রিয় গোপন আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। তার নামে তখন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছে। সে নির্ভয়ে গিয়ে দাঁড়াল গোলদীঘির ধারে। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বড়লাটের ভাষণ দেবার কথা। সুরেশ মুখার্জী তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ব্যস্ত। দুপুরে বাসায় খেতে যাবার জন্য রাস্তায় নেমেই দেখল একটা ছেলে চুপ-চাপ পথে দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা যেন খুব চেনাচেনা লাগছে। তবে কি সেই ছেলেটা? যার ছবি গোপনে গোয়েন্দাদের মধ্যে বিতরিত হয়েছে? কিন্তু সে কি করে এমন প্রকাশ্য স্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে?

সুরেশ মুখার্জী এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, আর ইউ নট চিত্তপ্রিয়?

—ইয়েস আই অ্যাম দি চিত্তপ্রিয়। অবিচলিত কণ্ঠে জবাব দিল।

সুরেশ মুখার্জী ও তার সঙ্গীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরার আগেই চোখের নিমেষে রিভলভার বের করে সে গুলি করল।

সুরেশ মুখার্জী সেখানেই লুটিয়ে পড়ল, আর তার সঙ্গী বনবিহারী মুখার্জী (পরে রায়বাহাদুর ও ডেপুটি কমিশনার হন) ছুটে পালিয়ে গেল। সুরেশ মুখার্জীর আর্দালী সিওপ্রসাদ ছুটে আসছিল ছেলেটাকে ধরার ব্যাপারে মনিবকে সাহায্য করার জন্য। ছেলেটা যে কি দুর্দান্ত তার মনিব জানলেও সে জানত না। তাই আর একটা গুলি খরচ করে চিত্তপ্রিয় তাকেও তার মনিবের কাছেই পাঠিয়ে দিল—পরলোকে।

তারপর নিশ্চিন্তে রিভলভারের নলটায় মৃত সুরেশ মুখার্জীর রক্ত মাখিয়ে নিয়ে গুরু বাঘা যতীনকে দেখিয়ে তাঁর প্রাণরক্ষা করল।

এ হেন গুরুভক্ত চিত্তপ্রিয়ের সামনে একটা সামান্য গোয়েন্দা বাঘা যতীনকে রিভলভার বিপ্লবীদের বন্টন করতে দেখে ফিরে গিয়ে কর্তাদের রিপোর্ট করবে তাতো হয় না। বাঘা যতীন গোয়েন্দা নীরদ হালদারের আকস্মিক আবি-র্ভাবে কিছু বলার বা করার আগেই মুহূর্তের মধ্যে চিত্ত-প্রিয়ের রিভলভার গর্জন করে উঠল।

নীরদ হালদার নিমেষে নীরব হয়েই ভূমিশয্যা নিল। তাকে মৃত মনে করে সেখানেই ফেলে রেখে বিপ্লবীরা তাড়া-তাড়ি স্থান ত্যাগ করল। কিন্তু নীরদ গুলিতে নিহত হয় নি, আহত হয়েছিল। একটু পরে জ্ঞান ফিরে এলে সে কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথচারীদের সাহায্যে থানায় যায়। মরার আগে সে হত্যা-কারী বলে যতীন্দ্রনাথের নাম করে যায়। যতীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করার জন্য পরোয়ানা বের হলো। তিনি আত্ম-গোপন করলেন। পুলিশ কিছুতেই তাঁর সন্ধান পায় না। তিনি সঙ্গীদের বলেন, আর হাতকড়া পরাতে দেব না।

গোয়েন্দাদের সদা সতর্ক দৃষ্টিতে ফাঁকি দিয়ে তিনি রাত্রের অন্ধকারে গোপনে মাঝে মাঝে স্ত্রী, দুই শিশুপুত্র, কন্যা ও দিদিকে দেখে যেতেন।

ইংরাজ তাকে ধরতে না পেরে জেলা বোর্ডগুলিকে নির্দেশ দেয় তাঁর ঠিকাদারী কাজের প্রাপ্য সব টাকা না দিতে। কারণ যতীন্দ্রনাথকে টাকা দিলে সে টাকা বিপ্লবী-দলের কাজে লাগবে।

উপার্জন করে অর্থ এনে যতীন্দ্রনাথ বিপ্লবের কাজে ব্যয় করতেন। এখন সে পথ বন্ধ হওয়ায় দলবল নিয়ে তিনি কয়েকটা দুঃসাহসিক ডাকাতি করেন। তার মধ্যে প্রাগ-পুর ও শিবপুরের ডাকাতি দুটি বিস্ময়কর। জলদস্যুদের মতো নৌকা নিয়ে বিপ্লবীরা ডাকাতি করেন। গ্রামবাসী ও পুলিশ নদীর দুই তীর ধরে তাঁদের অনুসরণ করে; দু পক্ষের মধ্যেই গুলি বিনিময় হয়। শেষ পর্যন্ত অনুসরণ-কারীদের ফাঁকি দিয়ে বিপ্লবীরা পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এর পরে বাঘা যতীন কলকাতার গার্ডেনরীচে ডাকাতি করে দশ হাজার টাকা ও বেলেঘাটায় ডাকাতি করে বাইশ হাজার টাকা সংগ্রহ করলেন। এ দুটিতে প্রধান অংশ নিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় অনুগামী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ওরফে এম. এন. রায় যিনি মেক্সিকো, রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশের বিপ্লবে অংশ নিয়েছিলেন।

কলকাতার ডাকাতিতে বিপ্লবীরা ট্যাক্সি ব্যবহার করে-ছিলেন। গার্ডেনরীচ ও বেলেঘাটা ডাকাতির পরে কলকাতার পুলিস কমিশনার টেগার্টসাহেব উঠে পড়ে লাগেন শহরের বুকে স্বদেশী ডাকাতি বন্ধ করার জন্য। বড় বড় রাস্তায় কিছু দূর অন্তর 'ব্যারিকেড' করা হয়। রেলওয়ে লেভেল-ক্রসিংয়ের মতো 'ড্রপ-গেট' তৈরী হয়। সন্দেহজনক কোন মোটরগাড়ি থামিয়ে যাতে সহজেই তল্লাসী করা যায় তার ব্যবস্থা হলো। কলকাতা শহরে ঢোকার-বেরোবার মুখে মিলিটারী পাহারা বসানো হলো। প্রতি থানায় বিপদজ্ঞাপক সিগন্যাল ও সাইরেন সংযুক্ত হলো। শহরের চেহারা বদলে গেল মুষ্টি-মেয় কয়েকটি দুর্ধর্ষ বিপ্লবীকে ধরার জন্য। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইংরাজ গোয়েন্দারা নাজেহাল হতে লাগল বাংলার বিপ্লবীদের কাছে। পুলিসের সর্ববিধ সতর্কতা সত্ত্বেও দুঃসাহসিক বিপ্লবীরা বুদ্ধির জোরে

পুলিসের নাকের ডগায় সেই বছরের মধ্যে ছটি মোটর ডাকাতি করলেন।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো।

এই যুদ্ধের সুযোগে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য এক বিস্ময়কর পরিকল্পনা যতীন্দ্রনাথ করলেন। যৌবনে যিনি বাঘ মেরে বিখ্যাত হয়েছিলেন, এবার বৃটিশ বাঘকে বধ করার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন। বাঘের সঙ্গে করেছিলেন হাতাহাতি লড়াই, বৃটিশ বাঘের সঙ্গে করবেন গেরিলা-লড়াই।

এই বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁরই মতো এক বাঙালী সরকারী কর্মচারী সারা উত্তর-ভারতে সিপাই-বিদ্রোহের মতো দ্বিতীয় বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে প্রস্তুত হলেন। তিনি হচ্ছেন রাসবিহারী বসু।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যতীন মুখার্জী ও রাসবিহারী বসুর মিলন যেন গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম। রাবণ বধে 'একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর!'

'নন-মার্শাল' কেরানীর জাত বলে ইংরাজ শাসকেরা বরাবর বাঙালীকে অবজ্ঞা করতো। কিন্তু দুই সরকারী কেরানী—যতীন্দ্র ও রাসবিহারী—মিলে কেরানী ক্লাইবের গড়া সাম্রাজ্য প্রায় ধূলিসাৎ করে দিচ্ছিলেন।

যুদ্ধের সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঘা যতীনের অবদান সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে রাসবিহারী বসুর কথাও না বললে কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই আমেরিকা থেকে দুই মারাঠী ও বাঙালী বিপ্লবী—পিংলে ও সত্যেন সেন—একটি বিশেষ গোপন সংবাদ নিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। আমেরিকায় প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা সেখানকার জার্মান রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জার্মানীর সাহায্যের আশ্বাস পেয়েছে। সত্যেন সেন কলকাতায় এসে বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, আর পিংলে কাশী গিয়ে উত্তর ভারতের বিপ্লবীদের সঙ্গে। বাংলায় তখন বিপ্লবীদলের নেতা যতীন্দ্রনাথ। উত্তর-ভারতে নেতা হচ্ছেন রাসবিহারী, তিনি বছর দুয়েক আগে দিল্লীর দরবারের সময় বড়লাট লর্ড মিন্টোর উপর বোমা মেরে আত্মগোপন করে আছেন। কাশীতে বাঘা যতীন ও রাসবিহারী বসু গোপনে পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইংরাজের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা করলেন।

আমেরিকায় কিছু বাঙালী বিপ্লবী যেমন ছিলেন, তেমনি অনেক পাঞ্জাবী বিপ্লবীও ছিলেন। তাঁদের দলের নাম 'গদর পার্টি'। এই দলের অন্যতম নেতা কর্তার সিং দেশে এসে রাসবিহারী বসুকে জানালেন যে পাঞ্জাবীরা ভারতবর্ষে এসে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে আগ্রহী। চার হাজার শিখ ইতিমধ্যে রওনা হয়ে পড়েছেন, আরও বিশ হাজার আসছেন।

১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গদর-পার্টির পাঞ্জাবীরা 'কোসাগাতামারু' নামে এক জাপানী জাহাজ ভাড়া করে ভারতে ফেরার জন্য বজবজে এসে নামলেন। ইংরাজ সরকার তাদের জাহাজ থেকে নামতে বাধা দিল। তাদের উপর গুলি চালায়। বেশ কয়েকজন নিহত হলেন। কিছু বন্দী হন, আর কিছু বিপ্লবী পুলিস ব্যূহ ভেদ করে গোপনে পাঞ্জাবে পালাতে সক্ষম হন।

এই গদর-পার্টির ও অন্যান্য বিপ্লবীদের সহযোগিতায় রাসবিহারী উত্তর ভারতের সমস্ত সেনানিবাসের ভারতীয় সৈন্যদের বৃটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করলেন। এলাহাবাদ, বেনারস, জব্বলপুর, আম্বালা, ফিরোজপুর, রাওয়ালপিণ্ডি, দিল্লী, মীরাট প্রভৃতি কোন সেনানিবাসই বিপ্লবীদের প্রভাবের বাইরে থাকে না। এমনকি ঢাকাতে যে শিখবাহিনী ছিল, তাদের সঙ্গেও লাহোর সেনানিবাসের শিখদের চিঠি নিয়ে অনুকূল চক্রবর্তী নামে এক বিপ্লবী যোগাযোগ করলেন।

এই দ্বিতীয় সিপাই-বিদ্রোহের দিন ধার্য হলো ১৯১৫ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। কিন্তু একজনের বিশ্বাসঘাতকতায় এই অভ্যুত্থানের কথা শেষ মুহূর্তে ইংরাজ জানতে পেরে যায়। বহু বিপ্লবীকে বন্দী করে ফাঁসি দিল। রাসবিহারীকে ধরার জন্য প্রায় লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়। তিনি লাহোর হতে আত্মগোপন করে কলকাতায় চলে এলেন। সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রাইভেট সেক্রেটারী পি. এন. ঠাকুর এই ছদ্ম পরিচয়ে জাপানে পালিয়ে যান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাসবিহারী বসু জাপানের সাহায্যে বন্দী ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে তাঁর নেতৃত্ব সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে তুলে দেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম এক স্বতন্ত্র ইতিহাস।

রাসবিহারী ইংরাজেরই দেশী সৈন্যবাহিনীর দ্বারা ইংরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চেষ্টা করেছিলেন। আর যতীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেন বিপ্লবীদের নিয়ে সৈন্যবাহিনী গঠন করে ইংরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিদেশ থেকে অস্ত্র ও অর্থ আমদানীর পরিকল্পনা করেন। তিনি ইংরাজের শত্রু জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা শুরু করলেন।

বিদেশস্থ জার্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলোচনার জন্য তিনি তাঁর অনুগামীদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে বাটাভিয়ায়, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়কে ব্যাঙ্কককে ও অবনী মুখোপাধ্যায়কে জাপানে প্রেরণ করলেন।

স্থির হলো ম্যাভেরিক নামে এক জাহাজে বাংলার বিপ্লবীদের জন্য ত্রিশ হাজার রাইফেল, প্রতি রাইফেলের জন্য চারশো রাউণ্ড গুলি ও দু লক্ষ টাকা জার্মানী পাঠাবে। ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে ম্যাভেরিক ক্যালিফোর্নিয়া থেকে বের হলো। তাতে পাঁচজন ভারতীয় বিপ্লবী পারসীয় এই পরিচয়ে খালাসীর ছদ্মবেশে থাকে। মাঝ সমুদ্রে গারসেন নামে আর একটি জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র তুলে দেবে 'মার্চেন্ট-শিপ' ম্যাভেরিকে, যাতে কোন জল-পুলিসের বা সৈন্যদের জাহাজ ম্যাভেরিকের আসল উদ্দেশ্য টের না পায়।

বাংলাদেশের তিন জায়গায় ম্যাভেরিকের মাল গোপনে নামাবার ব্যবস্থা হলো—বরিশালের কাছে হাতিয়ায়, সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে ও উড়িষ্যার বালেশ্বরের উপকূলে। হাতিয়ার মাল ডেলিভারী নেবেন নরেন ঘোষ চৌধুরী ও ফণি চক্রবর্তী, বালেশ্বরে যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং, কলকাতার ভার পড়ে বিপিন গাঙ্গুলী ও নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের উপর। বিপ্লবীরা এই অস্ত্র নিয়ে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দখল করে নেবেন। কলকাতার সৈন্যদের সাহায্যের জন্য যাতে ইংরাজ অন্য জায়গা হতে সৈন্য না আনতে পারে, সেজন্য রেলপথের সংযোগ ধ্বংস করা স্থির হয়। ই. আই. রেলের অজয় নদের উপর সেতু ধ্বংস করবেন সতীশ চক্রবর্তী, বি. এন. রেললাইন চক্রধরপুরের কাছে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবেন ভোলানাথ চ্যাটার্জী আর দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে সংযোগ ছিন্নের ভার নিলেন বাঘা যতীন নিজে।

অমর চট্টোপাধ্যায় ও রামচন্দ্র মজুমদারের 'শ্রমজীবী সমবায়' নামক প্রতিষ্ঠানের গুদামে অস্ত্র লুকিয়ে রাখা হবে। হরিকুমার চক্রবর্তীর 'হ্যারী এ্যান্ড সন্স' নামে এক কোম্পানীর মারফত সাঙ্কেতিক লিপিতে এই সব ব্যবস্থা করা হয়।

বাংলার কয়েকজন বিপ্লবী কাঠুরিয়া ও মাঝির ছদ্মবেশে নৌকা নিয়ে সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে চলে গেলেন। কিন্তু সেখানে তাঁরা বৃথাই সমুদ্রের পানে সাগ্রহে চেয়ে প্রতীক্ষা করেন। ম্যাভেরিক এসে পৌঁছায় না। সংবাদ পাওয়া গেল অস্ত্রশস্ত্র লারসেন ঠিক মতো ম্যাভেরিকে পৌঁছে দিতে পারে নি। জুনের শেষে আমেরিকার উপকূলে লারসেন ধরা পড়ে যায় এবং আমেরিকা তার অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করে নেয়।

ম্যাভেরিকে মাল না আসায় বাঘা যতীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হতে অস্ত্র আমদানীতে সচেষ্ট হলেন। শ্যামের জার্মান কনসাল জানালেন যে পাঁচ হাজার রাইফেল ও এক লক্ষ টাকা রায়মঙ্গলে পাঠাচ্ছেন। স্থির হয় এই মাল বালেশ্বরে বাঘা যতীন নিজে ডেলি-ভারী নেবেন। একজন বিপ্লবী শ্যামদেশে চলে যান ব্যবস্থা করতে আর বাঘা যতীন চারজন সাহসী বিশ্বাসী কিশোরকে নিয়ে বালেশ্বরে চলে যান। এই চারটি বীর বালক হচ্ছে চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, নীরেন্দ্র দাসগুপ্ত ও জ্যোতিষ পাল।

দুর্ভাগ্যক্রমে বিপ্লবী অবনী মুখার্জী সিঙ্গাপুরে ধরা পড়ে গেলেন। পুলিস তাঁর ডাইরীতে নীলসেন (Nielsen) বলে এক জার্মানের নাম পায়, যে দুজন চীনা নাবিকের মারফত শ্রমজীবী সমবায়ে একশো ঊনত্রিশটি পিস্তল ও দু হাজার আটশো ত্রিশ রাউন্ড গুলি পাঠাচ্ছিল।

কলকাতার পুলিস সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবী সমবায় ও হ্যারী এ্যান্ড সন্সে খানাতল্লাস করল। তারা সন্ধান পায় বালেশ্বরে ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম নামে হ্যারী এ্যান্ড সন্সের এক শাখা আছে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট তৎক্ষণাৎ এক সশস্ত্র পুলিসবাহিনী নিয়ে বালেশ্বর যাত্রা করল।

কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী চিত্তপ্রিয়ের মুখে শেষ নিঃশ্বাসের...

অবনী মুখার্জীর ডাইরীতে চন্দননগর, কুমিল্লা, ঢাকা, কলকাতার বহু বিপ্লবীর ঠিকানা ছিল। পুলিস তাঁদের অনেককে ধরে ফেলল। আবার অনেকে পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে আত্মগোপন করল। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এক এ্যাংলো ইন্ডিয়ান পাদ্রীর ছদ্মবেশে সি. মার্টিন নাম নিয়ে বাটাভিয়া হয়ে আমেরিকা পালালেন। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় গোয়ায় ধরা পড়লেন। পুলিসের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিনি পুনা জেলে আত্মহত্যা করলেন।

কলকাতার পুলিস ইতিমধ্যে বালেশ্বরে এসে ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম সার্চ করে সন্ধান পেল পাঁচজন বাঙালী এদিকে এসেছে। তারা ময়ূরভঞ্জের কাছাকাছি পাহাড়ে-জঙ্গলে বাঘা যতীনকে খুঁজে বেড়ায়।

ইতিমধ্যে যতীন্দ্রনাথ তখন বালেশ্বর থেকে কুড়ি মাইল দূরে কোপতিপোদা গ্রামের এক ভাঙা পরিত্যক্ত কুটীরে সঙ্গী চারজন বালককে নিয়ে লুকিয়ে আছেন। একদিন গ্রামবাসীরা তাঁদের দেখতে পেয়ে গেল। তারা মনে করল অপরিচিত এই পাঁচজন নিশ্চয়ই ডাকাত। নইলে এখানে এভাবে আস্তানা গেড়ে থাকবে কেন? তারা দল বেঁধে তথাকথিত ডাকাতদের আক্রমণ করল। আত্মরক্ষার জন্য গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিপ্লবীদের লড়াই করতে হয়। কারণ তাঁদের আসল পরিচয় আর লুকিয়ে থাকার উদ্দেশ্যও তো আর গ্রামবাসীদের বলা চলে না। বিপ্লবীদের সঙ্গে সংঘর্ষে একজন গ্রামবাসী মারা গেল। গ্রামবাসীদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য সেই আস্তানা ত্যাগ করে বিপ্লবীরা আরও গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন। এদিকে গ্রামের কয়েকজন লোক থানায় গিয়ে খবর দিল যে পাঁচটা ডাকাত তাদের ওদিককার জঙ্গলে লুকিয়ে আছে। পুলিস সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল এরা সাধারণ ডাকাত নয়। এই পাঁচজন বাঙালী বিপ্লবীকে তারা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

বালেশ্বরের ম্যাজিস্ট্রেট সৈন্যবাহিনী নিয়ে কলকাতার পুলিসের সঙ্গে যোগ দিয়ে সেই জঙ্গলটা চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলার ব্যবস্থা করলেন।

বাঘা যতীন ও তাঁর সঙ্গীরা বুঝেছিলেন যে পুলিসের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ শীঘ্রই হবে, কারণ গ্রামবাসীরা নিশ্চয়ই পুলিসে খবর দেবে। ছেলেরা বাঘা যতীনকে অনুরোধ করে তিনি যাতে তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যান। দল বেঁধে থাকলে সকলের সন্দেহ উদ্রেক করবে, কিন্তু তিনি একা ভিখারী বা কাঠুরিয়া সেজে পুলিস আসার আগেই জঙ্গল থেকে সরে পড়তে সক্ষম হবেন এবং তাঁর যাত্রা নিরাপদ করতে ছেলেরা পুলিসকে যুদ্ধে রত রাখবে।

বলা বাহুল্য এ ধরনের প্রস্তাবে বাঘা যতীন সম্মত হন না। বিপদের মুখে সঙ্গীদের ফেলে পালাবার পাত্র তিনি ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন 'শিরদার তো সর্দার' অর্থাৎ যে নিজের শির সর্বাগ্রে দিতে পারবে সেই সর্দার হবার উপযুক্ত।

যতীন্দ্রনাথ যখন টের পেলেন যে পুলিস তাঁদের ঘিরে ফেলেছে, তখন তাঁরা আমরণ সংগ্রাম করার সংকল্প করলেন। তখনকার দিনের সর্বাধুনিক যুদ্ধ কৌশল 'ট্রেঞ্চ-ফাইটিং' বিপ্লবী বাঘা যতীনের অজানা ছিল না। বুড়ি-বালাম নদীর তীরে তাঁরা ট্রেঞ্চের মতো এক খাদের মধ্যে বসে বিরাট সরকারী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। পুলিস তাঁদের দেখতে পেয়েই দূর পাল্লার রাইফেল থেকে বুলেট বর্ষণ শুরু করল। বিপ্লবীদের কাছে শুধু সেই রডা কোম্পানীর 'মশা'র পিস্তল, রাইফেল-বন্দুক নেই। এই পিস্তলকেই তাঁরা রাইফেলের মত ব্যবহার করেন। সাংঘাতিক সংগ্রাম হয়। মাত্র পাঁচজন একদিকে, অন্যদিকে অসংখ্য সৈন্য। এ যেন পঞ্চ পান্ডবের সঙ্গে বিশাল কুরুবাহিনীর লড়াই। এক সময় গুলি লেগে চিত্তপ্রিয় আহত হয়। মুমূর্ষু শিষ্যের মাথাটি কোলের উপর নিয়ে বীর বিক্রমে বাঘা যতীন লড়াই করে চলেন! নিজেও মারাত্মক আহত হন, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না। যন্ত্রণাকাতর চিত্তপ্রিয় এক ফোঁটা জলের জন্য ছটফট করে। বিপ্লবীদের গুলিও ফুরিয়ে আসে। বাঘা যতীন ভেবেছিলেন শেষ গুলিটা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবেন। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী চিত্তপ্রিয়ের মুখে শেষ নিঃশ্বাসের আগে একবিন্দু জল দেওয়া কর্তব্য। হয়তো তাঁর মনে পড়ে যায়, এই চিত্তপ্রিয়ই একদিন তাঁর জলস্পর্শের শপথ রক্ষা করিয়েছিল। তাই মুমূর্ষুর জলপানের শেষ ইচ্ছা পূরণ করার জন্য তিনি অঙ্গের রক্তমাখা সাদা সার্ট ট্রেঞ্চের বাইরে উড়িয়ে যুদ্ধবিরতির সংকেত জানিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন।

এঁদের বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে টেগার্ট স্বহস্তে জল এনে আহতদের পান করালেন।

তাঁকে বাঘা যতীন বলেন, উই ডাই টু ভিন্ডিকেট অনার অফ বেঙ্গল!

চিত্তপ্রিয় তখুনি মারা গেল। আহত বাঘা যতীনকে বালেশ্বরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানেই তিনি শেষ নিশ্বাস ফেলেন। মনোরঞ্জন ও নীরেনের ফাঁসি হয়। জ্যোতিষ পালকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দন্ড দেওয়া হয় আন্দামানে। সে খাটুনি ও অত্যাচারে পাগল হয়ে যায়।

১৯১৫ সালের নয়ই সেপ্টেম্বর বালেশ্বরের এই যুদ্ধের পরেও অনেকে বিশ্বাস করতেন বাঘা যতীন মরেন নি। তিনি হাসপাতালের বাঙালী ডাক্তারের সহায়তায় পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্য একটি মৃতদেহকে তাঁর লাশ বলে ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছিল। বহু দিন পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু রহস্যাবৃত থাকে, কারণ ঠিক তাঁরই মতন দেখতে এক সাধুকে মধ্যে মধ্যে এখানে-সেখানে দেখতে পাওয়া যেত। তাঁর স্ত্রীও কোনদিন বিধবার বেশ পরেন নি। আমরণ শাখা-সিঁদুর পরতেন, বলতেন, আমার স্বামীর মৃত্যু নেই।

শেষে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিপ্লবী নেতারা স্থির করলেন যে বালেশ্বর সংগ্রামের দিনটিকেই বাঘা যতীনের মৃত্যু দিবস বলে পালন করা হবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক যোদ্ধা, বাংলার বিপ্লব ইতিহাসের বিস্ময় বাঘা যতীন সত্যিই মৃত্যুহীন! দেশ-প্রেমিক বাঙালীর মনের মন্দিরে তিনি চির অমর!

কালের জয়ডঙ্কা বাজে

[৩২ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

পাশেই রয়েছে তরবারিখানা, তার বড় সাধের দশার্ণদেশীয় সর্বোৎকৃষ্ট তরবারি—পিতা অভয়ের কাছ থেকে উপহার পেয়েছিল।

কয়েক মুহূর্ত মধ্যে সে তৈরী হয়ে তরবারি হাতে সংগোপনে বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। অদূরে মহাশ্রেষ্ঠী তিরীট-বৎসের তাঁবু। গা ঢাকা দিয়ে সেদিকে সে এগিয়ে যেতেই সার্থবাহের অস্পষ্ট নীচু কণ্ঠস্বর শোনা গেল—কে?

পরক্ষণে তাঁর বিস্মিত প্রশ্ন—তুমি! তুমি ঘুমোও নি?

তেমনি নীচু গলায় জীবক বললে,—না, ঘুম আসে নি। সন্ধ্যা থেকে কি এক অস্বস্তি বোধ করছি। কিন্তু শিসের শব্দ শুনেছেন?

—হ্যাঁ। আরক্ষিকদেরও দেখা নেই। কোথায় গেল তারা? কিছু সময় আগেও তাদের ঐ গাছতলায় দেখেছিলাম। ঐ দূরে তাকিয়ে দেখ তো, আবছা অন্ধকারে কিছু লোককে জড়ো হতে দেখা যাচ্ছে না?

সচকিত চোখে জীবক তাকায়ঃ হ্যাঁ, তাই তো!

সে বুঝতে পারে, সে-ই শুধু জেগে নেই, জেগে আছেন প্রাজ্ঞ মহাশ্রেষ্ঠী তিরীট-বৎসও।

লোকগুলোর দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে ব্যস্ত-কণ্ঠে সে বললে,—সর্বনাশ! ওরা তৈরী হচ্ছে। শীগ্‌গীর, শীগ্‌গীর শঙ্খধ্বনি করুন, সবাইকে জাগান! ওরা এক্ষুণি আক্রমণ করবে!

তা বুঝতে পারছি।—বললেন তিরীট-বৎস ঃ কিন্তু সকলে জেগে উঠে তৈরী হবার আগেই ওরা যে আক্রমণ করে বসবে! তা ছাড়া এরা কেউই তো অস্ত্র-চালনায় অভিজ্ঞ নয়। ওদের আক্রমণ রোধ করবো কি করে?

সে দায়িত্ব আমি নিচ্ছি!—দৃঢ়কণ্ঠে জীবক বললে ঃ আপনারা আমায় পেছন থেকে সাহায্য করবেন।

তুমি! তুমি বালক! তুমি কি দায়িত্ব নেবে?—তিরীট-বৎস যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

বয়সই সবকিছুর মাপকাঠি নয়, মহাশ্রেষ্ঠী।—জীবকের কণ্ঠে আদেশের সুর ঃ আর দেরী নয়। যা বলছি, অনুগ্রহ করে সেই মতো কাজ করুন।

বলতে বলতে সে মুক্ত তরবারি হাতে দ্রুতপদে এগিয়ে গেল।

অভিজ্ঞ সার্থবাহ জীবনে এত অবাক হননি। মুহূর্ত মধ্যে রাত্রির নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে তাঁর শঙ্খ বেজে উঠলো।

শঙ্খধ্বনি কানে যেতেই দস্যুরা বুঝলো, বণিকেরা তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে। ভীষণ হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে তারা ছুটে এল তাঁবু লক্ষ্য করে। সংখ্যায় তারা চোদ্দ-পনের জন।

ইতিমধ্যে খানচারেক গাড়ি দিয়ে ব্যূহের দ্বারপথ আটকে জীবক উঠে দাঁড়িয়েছে সেই গাড়ির ওপর। হাতে তরবারি। জীবনে এই তার প্রথম আসল অস্ত্র-পরীক্ষা। উত্তেজনায় দেহের সমস্ত পেশী যেন লোহার মতো শক্ত হয়ে উঠেছে।

দ্বারপথে শকটের বেড়া দেখে থমকে দাঁড়ায় দস্যু-দল। জীবকের ওপর নজর পড়তেই অট্টহাস্য করে ছুটে এল দস্যু-দলপতি। তার হাতে প্রকাণ্ড খড়্গ।

দলপতিকে দেখে জীবক ভয়ানক চমকে উঠলোঃ আরক্ষিকজ্যেষ্ঠ! সে-ই দস্যু-দলপতি! রক্ষকই তাহলে ভক্ষক! রাগে ও ঘৃণায় তার চোখ জ্বলে উঠলো। বললে,—ওরে বিশ্বাসঘাতক নরাধম! ব্রাহ্মণ তুই, নরকের কীট? তোর দস্যুগিরি আজ শেষ হবে।

দস্যু-দলপতি তার মাথা লক্ষ্য করে খড়্গ তুলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঝলসে ওঠে জীবকের তরবারি। আর তার পরেই জীবকের তরবারির আঘাতে দলপতির হাতখানা খড়্গসমেত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল দেহ থেকে। তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে পেছনে ছিটকে পড়লো দলপতি।

তার দশা দেখে অন্য দস্যুরা হকচকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা ক্ষণেকের জন্য। তারপরেই চিৎকার করে তারা ছুটে এল। একটা বালকের ভয়ে এত ধন-সম্পদ ছেড়ে তারা পালিয়ে যাবে?

জীবকের সত্যিকার অস্ত্র-পরীক্ষা চলেছে। তের-চোদ্দজনের বিরুদ্ধে সে একা। দস্যুদের মধ্যে তার তরবারি পাক খাচ্ছে। তাদের এলোপাথাড়ি আঘাত প্রতিরোধ করে চন্দ্রালোকে মুহুর্মুহু ঝিলিক দিয়ে উঠছে দশার্ণের তরবারি—বিদ্যুৎ-শিখা যেন।

সার্থবাহ ততক্ষণে দীর্ঘ বর্শা হাতে ছুটে এসেছেন।

...জীবকের তরবারির আঘাতে দলপতির হাতখানা খড়্গসমেত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল...

অন্য বণিকরাও হাতের কাছে যে যা পেয়েছে, তাই নিয়ে ছুটে এসেছে।

পরের ধনসম্পদ লুণ্ঠ করতেই দস্যুরা ওস্তাদ—সাহসে বা অস্ত্র-চালনায় নয়। তারা বোঝে, অবস্থা খুবই সঙ্গিন। এক বালকের হাতেই তাদের কাহিল অবস্থা। জনা সাতেক অল্পবিস্তর আহত হয়েছে। তার মধ্যে তিনজনের আঘাত গুরুতর। এর পর পঞ্চাশ-ষাটজন বণিক ও তাদের ভৃত্যেরা এসে যদি ঘিরে ফেলে, তাহলে আর রক্ষা থাকবে না। সুতরাং তারা একসময় পেছন ফিরে ঊর্ধ্বশ্বাসে অদৃশ্য হয়ে গেল বনের মধ্যে। আহত সঙ্গীদেরও নিয়ে গেল যাবার সময়।

সীমাহীন আনন্দে সার্থবাহ জীবককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সবকিছুই অভাবিত, অভূতপূর্ব। কিন্তু এই অজ্ঞাতকুলশীল কিশোরের সাহস, বীরত্ব ও ত্যাগস্বীকার তাঁর মুখের ভাষা কেড়ে নিয়েছে। অন্য বণিকদেরও সেই অবস্থা। যারা রক্ষক তারাই যেখানে ভক্ষক, সেখানে এই কিশোর না থাকলে তাদের রক্ষা পাওয়ার কোন আশাই ছিল না। ধনপ্রাণ সবই খোয়াতে হতো। সার্থবাহ জীবনে প্রচুর বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। কিন্তু এ জাতীয় অভিজ্ঞতা এই প্রথম।

পরদিন ভোরে আবার যাত্রা শুরু হয়। আর বাইরের রক্ষী-দল নয়। জীবকের নেতৃত্বে বণিক-দের নিয়েই গঠিত হয়েছে রক্ষী-দল।

দিনের পর দিন পথ চলতে চলতে জীবকের বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা ও অন্যের জন্য দরদ-বোধ দেখে সবাই মুগ্ধ বিস্মিত। বহুদর্শী প্রাজ্ঞ মহাশ্রেষ্ঠী যত তাকে দেখছেন, ততই বুঝতে পারছেন, এ ছেলে কখনই সামান্য কিশোর নয়, অনাথ তো নয়ই। কিন্তু এ পর্যন্ত জীবকের কাছ থেকে তিনি শত চেষ্টা সত্ত্বেও তার পরিচয় সম্বন্ধে নতুন কিছু জানতে পারেন নি।

শকটের দীর্ঘ শোভাযাত্রা চলেছে। শকট টেনে নিয়ে চলেছে প্রকাণ্ড সব বলীবর্দ। শোভা-যাত্রার সামনের দিকে সার্থবাহ তিরীট-বৎসের শকট। সার্থবাহ সেদিন জীবককে ডেকে নিয়ে তাঁর পাশে বসালেন। একথা-সেকথার পর জিজ্ঞেস করলেন,—তক্ষশিলায় গিয়ে কোন্ অধ্যাপকের কাছে তুমি চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা করবে, ঠিক করেছ?

ধীরে ধীরে জীবক বললে,—কিছুই ঠিক করিনি। কারো নাম জানি না, কাউকে চিনিও না। সেখানে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে।

অবাক হয়ে সার্থবাহ বললেন,—আশ্চর্য ব্যাপার! খোঁজ-খবর না নিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছ! যাই হোক শোন, তক্ষশিলায় অধ্যাপক আত্রেয় হলেন পৃথিবী-খ্যাত সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। তিনি গন্ধারের রাজবৈদ্যও বটে। কিন্তু তাঁর কাছে তুমি কিভাবে শিক্ষা পাবে?

প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে জীবক জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় তিরীট-বৎসের দিকে। মৃদু হেসে তিরীট-বৎস বললেন,—কিছুই জান না, দেখছি। অধ্যাপক-দের কাছে দুই ধরনের শিষ্য বা ছাত্র শিক্ষা পায়। যে সব শিষ্য গরিব, আচার্যভাগ বা গুরু-দক্ষিণা দেবার যাদের ক্ষমতা নেই, তাদের সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা গুরুকে ও গুরুগৃহের অন্য সবাইকে সন্তুষ্ট করতে হয়, গুরু-গৃহের যাবতীয় কাজকর্ম করতে হয়। সপ্তাহের

নির্দিষ্ট কোন এক রাত্রে গুরু তাদের শিক্ষা দান করেন। এইসব শিষ্যদের বলা হয় ধর্মান্তেবাষিক। এ ছাড়া থাকে আর এক জাতীয় শিষ্য, যারা বিত্তশালী অভি-জাতবংশীয়, প্রথমেই আচার্যভাগ বা গুরুদক্ষিণা দিয়ে তারা চতুষ্পাঠীতে ভর্তি হয়। এদের বলা হয় আচার্য-ভাগদায়ক শিষ্য। এদের শিক্ষার দিকে গুরু স্বভাবতঃই বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। তুমি কি করবে?

দীর্ঘনিশ্বাস চেপে জীবক বললে—আমাকে ধর্মান্তে-বাষিক হতে হবে।

—কিন্তু ধর্মান্তেবাষিক শিষ্য হিসাবে আচার্য আত্রেয় তোমায় গ্রহণ করবেন কিনা সন্দেহ। দূর-দূরান্ত থেকে শত শত শিষ্য আসে তাঁর কাছে শিক্ষা-লাভের জন্য। সে অবস্থায় কি করবে তুমি?

এ প্রশ্নের উত্তর জীবকের জানা নেই। সে চুপ করে থাকে। অজান্তে পড়ে দীর্ঘশ্বাস।

স্নেহ-মমতায় সার্থবাহের মন ভরে ওঠে। জীবকের পিঠে হাত রেখে মমতাভরা কণ্ঠে তিনি বললেন,—হতাশ হয়ো না, বাবা। আমি তো আছি। আচার্যভাগ দিয়ে আমিই তোমায় অধ্যাপক আত্রেয়ের চতুষ্পাঠীতে ভর্তি করার ব্যবস্থা করবো।

সচকিত চোখে জীবক তাকায় সার্থবাহের দিকে, বলে,—না, তা হতে পারে না।

কেন? কেন হতে পারে না?—সার্থবাহ অবাক।

দৃঢ় কণ্ঠে জীবক বলে,—না, কারো দান আমি গ্রহণ করি না।

মুগ্ধ-বিস্মিত মহাশ্রেষ্ঠীর মনে আবার প্রশ্ন জাগেঃ কে এই অসামান্য বালক? এই চারিত্রিক দৃঢ়তা, দান-গ্রহণে এই অসম্মতি ও মর্যাদাবোধ, এ তো সামান্য অনাথ বালকের থাকার কথা নয়!

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে গভীর কণ্ঠে তিনি বললেন,—বাবা, জানি না কার ঘর শূন্য করে তুমি পথে বেরিয়েছ বা কোন্ বর্ণে তোমার জন্ম—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, না বৈশ্য। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করছি, তা অচিন্তনীয়। জীবনে আমি কম মানুষের সংস্পর্শে আসি নি, অভিজ্ঞতাও কম লাভ করিনি। আজ মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, অনেক—অনেক বড় হবে তুমি। সমস্ত ভারতবর্ষ তোমার কীর্তিতে মুখরিত হবে। কিন্তু বাবা, আমার এই কাজকে তুমি দান বলছো কেন? তুমি যা আমাদের জন্যে করেছ বিনা অনুরোধে, তার কৃতজ্ঞতা হিসাবে আমাদের কি কিছুই করণীয় নেই? তুমি না থাকলে আমাদের কি অবস্থা হতো, ভাবতেও শিউরে উঠি। এ উপকারের কোন প্রতিদান নেই, বাবা। এ বৃদ্ধের স্নেহ-মমতার কথা যদি ছেড়েও দাও, কৃতজ্ঞতার যৎসামান্য নিদর্শন হিসাবে আমার এ কাজটুকু তোমায় মেনে নিতেই হবে।

জীবক কথা বলতে পারে না। তুমুল ঝড় চলেছে মনের মধ্যে। অনেকক্ষণ পরে সে ধীরে ধীরে বললে,—বেশ, তাই হোক। যদি কোন দিন পারি, স্বোপা-র্জিত অর্থে আপনার এ ঋণ আমি শোধ করবো।

বেশ তাই হবে।—ক্ষুণ্ণ কণ্ঠ তিরীট-বৎসের।

॥ তিন ॥

পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহ দমন করে রাজগৃহে ফিরতে রাজকুমার অভয়ের প্রায় একমাস লাগলো। ফিরে এসে দেখেন, জীবক চলে গেছে। শোকে দুঃখে অভয় স্তব্ধ-বিমূঢ় হয়ে যান।

প্রধান ভৃত্য জানাল, জীবককে নিবৃত্ত করার জন্য তারা কম চেষ্টা করে নি। কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়। যাবার সময় তিনি বলে গেছেন, বাবাকে বলো, নিজের চেষ্টায় জীবনে যদি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি, তবে দেখা হবে, নয়তো নয়।

তার পর থেকে অভয় মগধের হেন নগর নেই, যেখানে জীবকের খোঁজ করেন নি। কিন্তু সবই নিষ্ফল হয়েছে। কোথায় কোন্ দিকে সে গেছে, কেউ বলতে পারে না। নিশানা-নিদর্শন কিছুই রেখে যায় নি।

শোকে ভেঙে পড়েন অভয়। দিনরাত শুধু চিন্তা আর চিন্তা—জীবকের চিন্তাই কেবল।

বিশাল নির্বান্ধব এই অজানা বিশ্বে একলা নিঃসম্বল সে কোথায় গেল? কোথায় হারিয়ে যাবে, তলিয়ে যাবে, কে জানে!—যতই ভাবেন এ সব কথা, ততই অভয়ের অবস্থা হয় পাগলের মতো। আহার-নিদ্রা প্রায় বন্ধ। কোথাও বেরোন না তিনি। কথা বলাও প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন।

সেদিন সন্ধ্যার পর তিনি ঘরে পায়চারি করছেন, এমন সময় প্রধান ভৃত্য এসে নতমস্তকে দাঁড়ালো দোর-গোড়ায়। প্রভুর অবস্থা তাদের অজানা নেই। কয়েক মুহূর্ত সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু অভয়ের লক্ষ্য নেই তরা দিকে। অন্যমনস্ক গভীর চিন্তাচ্ছন্ন তিনি।

ভৃত্যটি শেষে মৃদু কণ্ঠে বললে,—প্রভু, দেবী শাল-বতী আজই একবার আপনাকে স্মরণ করেছেন?

অভয় একটু থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন,—কে?

তেমনি বিনীত কণ্ঠে ভৃত্য বলে,—রাজনর্তকী দেবী শালবতী আপনাকে আজই একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

কে! শালবতী!—অভয় চমকে উঠলেনঃ তাই তো! শালবতীর কথা তো মনে ছিল না। যুদ্ধ থেকে ফিরে আজ পর্যন্ত তার সঙ্গে দেখাই করিনি। ইস্, বড্ড ভুল হয়ে গেছে! বলো, আমি যাচ্ছি।

কিছু পরে শালবতীর প্রাসাদে পৌঁছে অভয় অবাকঃ কী ব্যাপার! বাড়ি অন্ধকার কেন? এ সময় শালবতীর প্রাসাদ থাকে আলোয় আলোময়, নৃত্যগীতে মুখর। কোথায় তা? নিস্তব্ধ আঁধার বাড়ি কেন নিঝুম হয়ে আছে?

অভয় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হল।

প্রবেশ-পথের মুখে দাঁড়িয়ে আছে শালবতীর প্রধানা দাসী, অভয়কে অভ্যর্থনা জানাল। অভয়ের প্রশ্নের উত্তরে বললো,—মা অসুস্থ। তাই নাচগানের আসর বন্ধ। আপনি চলুন, মা আপনার প্রতীক্ষা করছেন।

অন্দরমহলে শালবতীর সুসজ্জিত কক্ষ। অভয় ঘরে ঢুকতেই, শালবতী শুয়ে ছিলেন উঠে বসলেন।

মানুষের যে এত রূপ থাকতে পারে, শালবতীকে না দেখলে বোধহয় কল্পনা করা যায় না। বিধাতা যেন ত্রিভুবনের অতুল রূপমাধুরীর মধুরতম কণাগুলি দিয়ে আপন খুশিতে তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন অলৌকিক রূপের এই তিলোত্তমা। বয়স কত বলা কঠিন। যৌবনের ভরা নদী সৌন্দর্য-প্রভায় টলমল করছে। মাথার কাজলকালো দীর্ঘ কেশরাশি অগোছাল, পিঠে ছড়িয়ে আছে সহস্র ফণা তুলে। পরনে সাধারণ একখানা শাড়ি। গায়ে কোন অলঙ্কার-আভরণ নেই। দুহাতে শুধু একগাছি করে কঙ্কণ।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে অভয় বললেন,—এ কী! তোমার স্বাস্থ্য এত খারাপ হয়েছে কেন? কি অসুখ? তা-ছাড়া এই বেশ, এই পরিবেশই বা কেন? যেমন বাড়ির অবস্থা, তেমনি তার কর্ত্রীর। কি হয়েছে?

বসুন। শরীর ভাল নেই কিছু দিন।—বীণার তারে যেন অপরূপ সুরের ঝঙ্কার উঠলো, ম্লান হেসে শালবতী বললেনঃ কিন্তু আপনার শরীরেরই বা এ অবস্থা কেন? কি হয়েছে আপনার? পূর্বাঞ্চল থেকে ফিরে শালবতীর কথা তো একবারও মনে পড়ে নি! এ কি শুধু কাজের চাপ, না অন্য কিছু?

বলছি সে কথা।—বসতে বসতে অভয় বললেন, কণ্ঠে উদ্বেগঃ কোন চিকিৎসক দেখিয়েছ কি?

—হ্যাঁ। তাঁরা বলেছেন, শারীরিক অবসাদ থেকে এটা হয়েছে। বেশ কিছুকাল বিশ্রাম নিতে হবে। এবার বলুন, শুনি আপনার কথা।

অভয় নড়ে-চড়ে বসলেন। তারপর বললেন,—আচ্ছা, আমার পুত্র জীবকের কথা কি শুনেছ কখনো?

আ-প-না-র পু-ত্র! জী-ব-ক!—শালবতীর কণ্ঠে নিদারুণ বিস্ময়। টেনে টেনে উচ্চারণ করলেন কথাগুলো।

ব্যস্তকণ্ঠে অভয় বললেন,—না, না, নিজের পুত্র বলতে যা বোঝায়, তা নয়। চোদ্দ-পনের বছর আগে এক ভোর বেলা ওকে আমি আমবাগানের এক বালি-স্তূপের উপর কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। অনিন্দ্যসুন্দর এক সদ্যোজাত শিশু। অনেক চেষ্টা করেও ওর মা-বাবার সন্ধান পাই নি। সেই থেকে আমিই ওকে বুকে করে মানুষ করেছি। একাধারে আমিই ওর বাবা-মা।

তারপর? আশ্চর্য ব্যাপার তো!—শালবতীর কণ্ঠে গভীর কৌতূহল।

ধীরে ধীরে অভয় একের পর এক খুলে বলেন সমস্ত ঘটনা। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে চলেন জীবকের রূপ, স্বাস্থ্য, বিদ্যাবুদ্ধি ও শৌর্যবীর্যের নানা কাহিনী। বলতে বলতে তাঁর গলা ধরে এল। শেষে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বললেন,—সে চলে গেছে। জগতের সবার ওপর তার অভিমান। সবচেয়ে বেশী অভিমান বোধহয় আমার ওপর, নয়তো এভাবে চলে যাবে কেন? অভিমানী সন্তান, একবারও ভাবলে না, সে আমার কি ছিল! জগতে পিতৃ-মাতৃ পরিচয়ই কি সব? কি যে করবো, কিছুই বুঝে পাচ্ছি না, শালবতী। সে কোথায় আছে, কি করছে, একথা যখন ভাবি, তখন কী যে মনের অবস্থা হয়, তা বলে বোঝাতে পারবো না।

অভয় চুপ করে যান। শালবতীও নীরব। অভয়কে সান্ত্বনা দেবার ভাষা বুঝি হারিয়ে ফেলেছেন। রাজ-নর্তকী হলেও তিনি নারী। রাজকুমার অভয়কে ঘিরেই তাঁর যত কিছু সাধ-আহ্লাদ, আশা-আকাঙ্ক্ষা। আর কাউকেই তিনি জীবনে গ্রহণ করেন নি। অভয়ের ব্যথায় তাঁর নারী-হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে। দু চোখে অশ্রু টলটল করছে।

অভয়ের জীবনেও শুধু দুটি মানুষ—জীবক ও শালবতী। এই দুই কেন্দ্রকে অবলম্বন করে আবর্তিত হয়েছে তাঁর জীবনের সব কিছু। তার মধ্যে একটি কেন্দ্র আজ উধাও, আর তার ফলে তাঁর গোটা জীবনই এলোমেলো হয়ে গেছে।

নীরব কক্ষ। শোকবিহ্বল দুটি নরনারী মুখোমুখি বসে থাকেন চুপচাপ।

শেষে একসময় চোখের জল মুছে শালবতী ধীর-কণ্ঠে বললেন,—এখন মনে পড়ছে, অতীতে আপনার কাছে জীবকের কথা দু-একবার শুনেছি। এক শিশু কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, তা-ও শুনেছিলাম। অনেক কাল আগের কথা। তা চোদ্দ-পনের বছর তো হবেই।

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে তিনি আবার বললেন,—কিন্তু কুমার, আপনাকে এরকম বিচলিত হলে তো চলবে না। জীবকের খোঁজ পেতে হলে আমাদের ধীরে-সুস্থে চিন্তা করে উপায় বের করতে হবে। আপনি জ্ঞানী, বীর। আমার মতো সামান্য নারীর আপনাকে উপদেশ দেবার ধৃষ্টতা নেই। এইটুকু শুধু বলতে পারি যে, আপনি মন শক্ত না করলে কোন পথই পাওয়া যাবে না।

অভয় নীরবে বসে আছেন—যেন পাষাণ-মূর্তি। নত চোখের দৃষ্টি কক্ষতলে নিবদ্ধ। সেদিকে তাকিয়ে ব্যথাভরা কণ্ঠে শালবতী আবার বললেন,—দেব, ধৈর্য ধরুন। জীবকের কথা আপনার কাছে যা শুনলাম, তাতে মনে হয়, কোন বিপদ-আপদ তাকে সহজে স্পর্শ করতে পারবে না। আমাদের আজ ভাবা দরকার, কি উদ্দেশ্যে কোথায় সে যেতে পারে। সে বলে গেছে, জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করাই তার লক্ষ্য। তা করতে হলে আরো বিদ্যা তাকে অর্জন করতে হবে। এখন, বিদ্যা-চর্চার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র দুটি—বারাণসী ও তক্ষশিলা। তার মধ্যে তক্ষশিলা সমধিক প্রসিদ্ধ হলেও অনেক দূরের পথ। তাই বারাণসীর চতুষ্পাঠীগুলিতে তার একবার সন্ধান নিলে ভাল হয়।

মুগ্ধ চোখে অভয় তাকিয়ে আছেন শালবতীর দিকে। এবার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন,—ধন্য, ধন্য তোমার বুদ্ধি, শালবতী! ধন্য আমিও যে তোমার মতো নারী পেয়েছি জীবনে। শোকেদুঃখে এমনি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম যে, এসব কথা একবারও মাথায় আসে নি। কালই বারাণসীতে লোক পাঠাব। তক্ষশিলায় পাঠাব কি?

লজ্জারক্ত আনত মুখে শালবতী বললেন,—আপনি আমায় ওভাবে বলবেন না, কুমার। আমার মনে হয়, বারাণসীতে আগে লোক যাক। তক্ষশিলার কথা পরে।

সেদিন রাতে শালবতীর গৃহে আহারাদি সেরে গভীর রাতে অভয় যখন বাড়ি ফিরলেন, তাঁর মন তখন শান্ত স্থির অবিচল।

॥ চার ॥

বণিকদলের সঙ্গে জীবক তক্ষশিলায় পৌঁছে গেছে। এবং তিরীট-বৎসরে আনুকূল্যে আচার্যভাগদায়ক শিষ্য হিসাবে ভর্তিও হয়েছে অধ্যাপক আত্রেয়ের চতুষ্পাঠীতে। ছোটখাট অসুবিধে ছাড়া পথে আর কোন বিপদ ঘটেনি। শুধু পথ ভুল হওয়ায় মরু-কান্তারে তাদের জলকষ্টে ভুগতে হয়েছিল কয়েক দিন।

চতুষ্পাঠীতে ভর্তি হওয়ার পর থেকে বাবার চিন্তা জীবককে যেন পেয়ে বসে। তার অদর্শনে বাবার কি অবস্থা হয়েছে, তা বোঝার মতো বুদ্ধি তার আছে। তাই সে যে তক্ষশিলায় নিরাপদে আছে এবং চতুষ্পাঠীতে ভর্তি হয়ে পড়াশুনো করছে, এই সংবাদটা তাঁকে অবিলম্বে পাঠানোর জন্য সে ছটফট করতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত সে তিরীট-বৎসের শরণাপন্ন হলো। বণিকদল তখন ফিরে যাবার তোড়জোড় করছে। একান্তে গিয়ে সে বললে তিরীট-বৎসকে,—মহাশ্রেষ্ঠী, আপনার কাছে আমি মার্জনা ভিক্ষা করছি। আমি মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিলাম। রাজগৃহে আমার বাবা থাকেন। তাঁকে আমার সংবাদটা দেওয়া দরকার। আপনি কি রাজগৃহে যাবেন?

তিরীট-বৎসের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললেন,—তুমি যে অনাথ নও, তা আমি প্রথম থেকেই বুঝেছিলাম। বেশ, রাজগৃহে গিয়ে তোমার সংবাদ দেবার ব্যবস্থা আমি করবো। কে তোমার বাবা?

—মহারাজ বিম্বিসারের পুত্র রাজকুমার অভয়।

অ্যাঁ! বেসামাল তিরীট-বৎস। এত বড় ধাক্কার জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। বিস্ফারিত চোখে হাঁ করে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন জীবকের দিকে। শেষে ধীরে ধীরে বললেন,—মহারাজ বিম্বিসারের পৌত্র তুমি! তা, এভাবে গোপনে নিঃসম্বল অবস্থায় কেন গৃহত্যাগ করলে? পথের বিপদ-আপদ দুঃখকষ্টই শুধু নয়, শিক্ষালাভের গোটা ব্যাপারটাই তো অনিশ্চিত ছিল। অথচ এ সবের কোন দরকারই ছিল না।

মাথা হেঁট করে জীবক মৃদুকণ্ঠে বললে,—আমার প্রতিজ্ঞা, নিজের চেষ্টায় জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করবো। এতে স্বভাবতঃই বাবার সম্মতি থাকার কথা নয়। তাই শেষ পর্যন্ত এই পথ গ্রহণ করতে হয়েছিল।

মাথা নাড়তে নাড়তে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিরীট-বৎস বললেন,—জানি, বাবা, জানি। পরিষ্কার দেখতে

পাচ্ছি, ভবিষ্যৎ জীবনে কী বিপুল প্রতিষ্ঠা তুমি লাভ করেছ!

তেমনি হেঁট মাথায় জীবক বললে,—দয়া করে বাবাকে বলবেন, তিনি যেন আমার জন্য ব্যস্ত না হন। সুযোগ পেলেই তাঁর কাছে আমি সংবাদ পাঠাব, যেমন বর্তমানে আপনার মাধ্যমে পাঠালাম। তাঁকে আরও বলবেন, তিনি যেন আমার জন্য এখানে কোন লোক না পাঠান বা গন্ধার-রাজের কাছে কোন পত্র না দেন। ওটা কিন্তু আমাদের কারো পক্ষে শুভ হবে না।

বারাণসী থেকে লোক ফিরে এসেছে। অভয়কে তারা জানায়, জীবক বারাণসীতে নেই।

চিন্তিত অভয়। শালবতীর সঙ্গে পরামর্শ করে তক্ষশিলায় লোক পাঠাবার উদ্যোগ-আয়োজন করছেন, এমন সময় বণিকদল নিয়ে তিরীট-বৎস রাজগৃহে পৌঁছলেন, অভয়কে দিলেন জীবকের সংবাদ।

এত বড় আকস্মিক শুভ সংবাদে অভয়ের মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তিরীট-বৎস ও বণিক-দলের রাজসিক আদর-আপ্যায়নে ত্রুটি হলো না।

তিরীট-বৎসের কাছ থেকে অভয় সবিস্তারে শুনলেন জীবকের কাহিনী। তারপর ছুটলেন শাল-বতীর কাছে।

সমস্ত শুনে মৃদু হাসেন শালবতী, বলেন,—যাক, আপনি তাহলে নিশ্চিন্ত এত দিনে!

আর তুমি? তুমিও কি সুখী নও, শালবতী? —উচ্ছ্বাস অভয়ের কণ্ঠে। তাঁর মনে হচ্ছে, জীবকের সংবাদে সমস্ত বিশ্বজগৎই আজ বুঝি আনন্দে মাতোয়ারা।

হ্যাঁ, আমিও।—মৃদু কণ্ঠে বলেন শালবতীঃ আপনার সুখেই আমার সুখ। আপনার দঃখে আমারও দুঃখ। জীবক আপনার পুত্র আপনার স্নেহের ধন, তাই সে আমারও পুত্র আমার স্নেহের ধন।

বলতে বলতে শেষ দিকে তাঁর গলা ধরে এল।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। তক্ষশিলার চতুষ্পাঠীতে জীবক একাগ্র সাধনায় মগ্ন।

জীবকের মেধা, অধ্যবসায় ও আগ্রহ দেখে অধ্যাপক আত্রেয় চমৎকৃত। সুদীর্ঘ অধ্যাপক-জীবনে এমন অদ্ভুত প্রতিভাধর ছাত্র তিনি আর পান নি। অন্যের যা শিখতে সপ্তাহকাল লাগে, জীবক তা শেখে এক দিনে। মনের মতো ছাত্র পেলে শিক্ষকের যে মনের অবস্থা হয়, আত্রেয়েরও তাই। অনির্বচনীয় আনন্দে তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্রের অগাধ জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেন জীবকের কাছে।

গুরুপত্নীর অগাধ স্নেহও পেয়েছে জীবক। তাঁকে সে ভক্তি করে মায়ের মতো। আচার্যের সংসারের নানা কাজ সে করে দেয় আর তা করে এত সুষ্ঠু ও সুন্দর-ভাবে যে, সবাই অবাক হয়—যদিও আচার্যভাগদায়ক ছাত্র হিসাবে এসব তার করার কথা নয়।

অবসর পেলেই সে তক্ষশিলার চারপাশের পাহাড়ে-পর্বতে বনেজঙ্গলে ঘোরে, গাছপালা মাটিপাথর নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় আর দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন করে।

এমনি করে বছরের পর বছর পার হয়।

চিকিৎসা-শাস্ত্রে দুটি বিভাগঃ এক ভেষজ-চিকিৎসা অর্থাৎ ওষুধ দিয়ে রোগ নিরাময় করার চিকিৎসা, দুই শল্য-চিকিৎসা বা অস্ত্র-চিকিৎসা অর্থাৎ অস্ত্রোপচার করে জীবের দেহের রুগ্ন অংশ দূর করার চিকিৎসা। এই দুই বিভাগে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করতে হলে খুব কম করেও চোদ্দ বছর সময় লাগে।

কিন্তু ছয় বৎসর যেতে না যেতেই দেখা গেল, ভেষজ-চিকিৎসায় যা কিছু জ্ঞাতব্য, তার কিছুই আর জীবকের অজানা নেই। বরং প্রচলিত জ্ঞানের বাইরেও সে আপন প্রতিভাবলে জেনেছে ও উদ্ভাবন করেছে অনেক কিছু। শল্য-চিকিৎসার ক্ষেত্রেও তাই। দু-চারটি বিষয় ছাড়া কিছুই তার আর জানতে বাকি নেই। এমন কি শল্য-চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য কয়েকটি সূক্ষ্ম নতুন অস্ত্রও সে উদ্ভাবন করেছে।

আর তার ফলে, বিস্ময়কর ও অবাঞ্ছনীয় হলেও, ধীরে ধীরে আত্রেয়ের মনে দেখা দিয়েছে নিদারুণ এক অভিচিন্তা।

জীবকের মেধা, অধ্যবসায় ও প্রতিভা দেখে আচার্য প্রথম দিকে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ যে অচিন্তনীয়! অসাধ্যসাধক ক্ষণজন্মা ছাত্রের কাণ্ড দেখে তিনি দিশাহারা। আর মনে তাই গুরুতর দুশ্চিন্তা।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের পদ জীবকের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে আছে, এ বিষয়ে আত্রেয়ের আজ আর সন্দেহ নেই। তা থাক। ও নিয়ে তাঁর আর মাথা-ব্যথাও নেই। তিনি আজ আকুল নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে। জীবক যদি তক্ষশিলায় অধ্যাপনা ও চিকিৎসা-বৃত্তি শুরু করে, তাহলে? তাহলে তাঁর রাজবৈদ্যের

পদ যাবে, চিকিৎসক হিসাবে মান, মর্যাদা, উপার্জন কিছুই থাকবে না।

সুতরাং তিনি স্থির করলেন, শল্য-চিকিৎসার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু কিছু বিষয় তিনি জীবককে শেখাবেন না। তার মধ্যে কপালমোচনী বিদ্যা সর্ব-প্রধান। এ বিদ্যা জানা থাকলে, তবেই জীবের করোটি বা মাথার খুলি উন্মুক্ত করা যায়। মস্তিষ্কের রোগে শল্য-চিকিৎসার দরকার হলে অর্থাৎ করোটি খুলতে হলে এ বিদ্যা জানা না থাকলে কিছুই করা যাবে না। এই বিদ্যাকেই তিনি আচার্যমুষ্টি হিসাবে রক্ষা করবেন অর্থাৎ অব্যাখ্যাত রাখবেন জীবকের কাছে।

তীক্ষ্ণধী জীবকের শাণিত দৃষ্টির কাছে আচার্যের এই ভাবান্তর কিন্তু গোপন থাকে না। কিছুকাল যাবৎ সে লক্ষ্য করছে, আচার্য কেমন যেন বিষণ্ণ উন্মনা। শুধু তাই নয়, তার শিক্ষার প্রতিও তিনি উদাসীন, তাকে যেন সবসময় এড়িয়ে চলতে চান।

কেন? কেন? কেন?—জীবক আকাশপাতাল ভাবে। জন্ম-অভাগা সে। নিশ্চয়ই অজ্ঞানে এমন কোন দোষ করেছে, যার জন্যে পিতৃপ্রতিম আচার্য তার প্রতি বিরূপ। কিন্তু কি দোষ কোথায় কবে কিভাবে করলে, দিনরাত ভেবেও সে তার হদিস পায় না. আর তার ফলে নিদারুণ মনের জ্বালায় ছটফট করতে থাকে।

শেষে সে স্থির করলো, গুরুদেবের সঙ্গে এ বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করবে।

আত্রেয় সেদিন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। পূব গগনে ঊষার আলোর আভাস। উঁচু এক পাহাড়ী ভূমির ওপর গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

এমন সময় জীবক গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলো।

আত্রেয় চমকে ওঠেনঃ তুমি?

জীবক কথা বলে না। নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিছু বলবে?—আত্রেয় জিজ্ঞেস করেনঃ অসঙ্কোচে বলতে পার।

মৃদুকণ্ঠে জীবক বলে,—গুরুদেব, কিছুকাল যাবৎ বড় অন্তর্জ্বালায় জ্বলছি আমি।

—অন্তর্জ্বালা! কেন কি হয়েছে?

তেমনি বিনীত কণ্ঠে জীবক বললে,—গুরুদেব, আপনি আমার পিতৃপ্রতিম। পিতার মতোই মনেপ্রাণে আপনাকে ভক্তি করি। সন্তান যদি অজ্ঞানে পিতার কাছে কোন অপরাধ করে, তার কি ক্ষমা নেই?

বলতে বলতে সে হাঁটু গেড়ে বসে আচার্যের দুই পা জড়িয়ে ধরে মাথা রাখলো পায়ের ওপর।

আত্রেয় যেমন বিস্মিত, বিচলিতও তেমনি। শশব্যস্তে বললেন,—এ কী! এ কী! ওঠ, ওঠ! আরে, তুমি কাঁদছো? কি হয়েছে, খুলে বলো। কোন দোষই তো তুমি করো নি। ওঠ বাবা, ওঠ।

করি নি? দোষ করি নি?—জীবকের কণ্ঠে স্বস্তি। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে সজল চোখে সবিস্ময়ে সে বললেঃ তাহলে গুরুদেব, আমার শিক্ষার প্রতি বর্তমানে আপনি উদাসীন কেন? শল্য-চিকিৎসার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় বিশেষতঃ কপাল-মোচনী বিদ্যা কেন আমায় শেখাচ্ছেন না? আপনার স্নেহাস্পদ পুত্রের শিক্ষা অসমাপ্ত থাক, এ তো আপনি অকারণে চাইতে পারেন না!

জীবকের কাছে এভাবে ধরা পড়ে যাবেন, আত্রেয় স্বপ্নেও ভাবেন নি। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। মুখে কথা নেই। পাষাণ-মূর্তি যেন। কিন্তু মনে চলেছে দারুণ ঝড়।

শেষে ধীরে ধীরে তিনি তাকালেন জীবকের দিকে। প্রথম অরুণোদয়ের রক্তিমচ্ছটা এসে পড়েছে জীবকের মুখে। আত্রেয় যেন আজ প্রভাতে নতুন করে দেখলেন তাকে—চোখ ফেরাতে পারেন না। সুগঠিত বলিষ্ঠ কী অপূর্ব প্রতিভাদীপ্ত রূপ! নিষ্পাপ সরল তারুণ্যের দীপ্ত আলোক-শিখা যেন।

আত্রেয়ের হঠাৎ নিজেকে বড় ছোট বড় হীন মনে হলো। জীবককে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি আকুল কণ্ঠে বললেন,—বাবা, অপরাধী তুমি নও, অপরাধী আমি। গুরুতর অপরাধ করেছি। আজ তোমার কাছে অকপটে সে অপরাধ স্বীকার করে নিজের মনের পাপ লাঘব করবো।

বলতে বলতে আত্রেয়ের গণ্ড বেয়ে নামে তপ্ত অশ্রু-ধারা। তারপর ধীরে ধীরে তিনি বিস্ময়বিমূঢ় জীবকের কাছে খুলে ধরেন তাঁর মনের কপাট।

বেশ কিছুক্ষণ জীবক কথা বলতে পারে না। শেষে গুরুদেবের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর পা ছুঁয়ে সে বললে,—গুরুদেব, আজ এই প্রভাতে সূর্য সাক্ষী করে আপনার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, জীবনে আমি কোন দিন অধ্যাপনা করবো না। শিক্ষা সম্পূর্ণ হলেই গন্ধার-রাজ্য ত্যাগ করবো। তার মধ্যে যদি কোন রোগীর চিকিৎসা করতে বাধ্য হই, আপনার অনুমতি ছাড়া করবো না এবং তার সমস্ত পারিশ্রমিক আপনার চরণে নিবেদন করবো গুরুদক্ষিণা হিসাবে।

না! না! না, পুত্র!—আর্তকণ্ঠে বললেন আত্রেয়ঃ

তোমার প্রতিজ্ঞা ফিরিয়ে নাও। আমার অবশিষ্ট জ্ঞানভাণ্ডার তোমায় উজাড় করে দিয়ে আমি পাপমুক্ত হবো, বেঁচে থাকবো তোমার মধ্যে। আমিই অপরাধী জীবক, আমিই অপরাধী!

জীবকের শিক্ষা দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে এর পর থেকে। মনপ্রাণ ঢেলে আত্রেয় অবশিষ্ট বিদ্যা দান করছেন তাকে। কপালমোচনী বিদ্যা সমেত শল্য-চিকিৎসার কোন বিষয়ই আর বাদ থাকে না।

জীবকের চতুষ্পাঠী জীবনের সপ্তম বর্ষ শেষ হবার মুখে। তার শিক্ষাও সমাপ্ত হয়। আত্রেয় নিঃসন্দেহ, চিকিৎসা-শাস্ত্রে এমন কিছুই আর নেই, যা তার শিখতে বাকি আছে। চৌদ্দ বছরের শিক্ষা সাত বছরের শেষ, এটা অবিশ্বাস্য হলেও এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই। শুধু তাই নয়, চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধিকাংশ বিষয়েই প্রিয়তম ছাত্রটির জ্ঞান তাঁর চেয়ে অনেক বেশী গভীর ও ব্যাপক।

তবু শেষ আর একটা পরীক্ষা তিনি নিতে চান। আর সেই সঙ্গে তাঁর অন্য ছাত্রদেরও দেখাতে চান, জীবকের শিক্ষা-সমাপ্তি সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত কত নির্ভুল।

সেদিন সবাইকে ডাকলেন তিনি। বললেন,—তোমাদের শিক্ষা কার কতদূর এগিয়েছে আমি দেখতে চাই। তক্ষশিলার চারপাশে দুই ক্রোশের মধ্যে যত গাছ-পালা লতাপাতা, উদ্ভিদ আছে, তোমরা প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবে গিয়ে তা থেকে এমন কিছু উদ্ভিদ আমায় এনে দাও, যার কোন ভেষজগুণ নেই, অর্থাৎ যা কোন ওষুধে কাজে লাগে না। এজন্যে তোমাদের সাত দিন সময় দিচ্ছি।

সবাই বেরিয়ে পড়লো।

একে একে ছয় দিন কেটে যায়। সপ্তম দিনও শেষ হতে চলেছে। সব ছাত্রই ফিরে এসেছে—প্রত্যেকের হাতেই কম-বেশী কিছু-না-কিছু উদ্ভিদ। অনেকে গাছপালা, লতাপাতার বিরাট বিরাট বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ফিরেছে। ফেরে নি শুধু জীবক।

সূর্য প্রায় ডোবে-ডোবে। এমন সময় জীবক ফিরলো। শ্রান্তক্লান্ত শুকনো মুখ, ফিরলো সে খালি হাতে। বিষণ্ণ কণ্ঠে বললো,—গুরুদেব, আজ সাত দিন ধরে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তন্নতন্ন করে সমস্ত অঞ্চল খুঁজলাম, কিন্তু এমন একটা উদ্ভিদ পেলাম না, যার কিছু-না-কিছু ভেষজ গুণ নেই।

আচার্য আত্রেয় খুশী। শান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, —বাবা, তোমার দুঃখিত হবার কারণ নেই। তোমার বক্তব্যই ঠিক। সত্যি, জগতে এমন একটা উদ্ভিদ পাবে না, যার কোন ভেষজ গুণ নেই। বৎস, তোমার শিক্ষা শুধু সমাপ্তই নয়, এই শেষ পরীক্ষা দ্বারা এটাও প্রমাণিত হলো যে, পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে তোমাকে আর নতুন কিছু শেখাতে পারে। চোদ্দ বছরের শিক্ষণীয় বিষয় তুমি সাত বছরে শেষ করলে, এ কৃতিত্বের তুলনা নেই। আশীর্বাদ করছি, কর্মজীবনে তুমি সর্বোত্তম সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করো।

হাসিমুখে জীবক গুরুদেবকে প্রণাম করলো।

এবার তার ফেরার পালা। তারই তোড়জোড় চলেছে। এমন সময় গন্ধাররাজ পুষ্করসারীর কাছ থেকে সেদিন ডাক এল তাঁর ভগিনী পাণ্ডবাকে চিকিৎসা করার জন্য।

জীবক অবাক হয়ে ঘটনাটা আত্রেয়কে জানাতে তিনি বললেন,—হ্যাঁ আমারই পরামর্শে গন্ধাররাজ তোমায় আহ্বান করেছেন। তাঁর বোন পাণ্ডবা দীর্ঘকাল দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী। দূর-দূরান্তের বহু দেশের বহু খ্যাতনামা চিকিৎসক তার চিকিৎসা করেছেন; আমি তো করেইছি। কিন্তু কোনই ফল হয় নি। তাই তুমি একবার যাও। দেখ, তাকে নিরাময় করতে পার কিনা।

জীবক গিয়ে গন্ধাররাজের সঙ্গে দেখা করলো। বললে,—আপনার ভগিনীর চিকিৎসার দায়িত্ব আমি নিতে পারি একটা শর্তেঃ গুরুদেব আত্রেয় আমার সঙ্গে থাকবেন।

তাই হলো। নতুন করে শুরু হলো পাণ্ডবার চিকিৎসা। জীবকের ব্যবস্থাপত্র দেখে আত্রেয় চমকে যান। চমকের পর চমক। এমন অনেক ওষুধের ব্যবস্থা জীবক করছে, যার নামই তিনি শোনেন নি। কি করেই বা শুনবেন? সবই যে জীবকের নিজের উদ্ভাবিত! অভিভূত আচার্য মনে মনে বলেন,—হ্যাঁ, তুমি গুরু আমি শিষ্য। সার্থক আমার শিক্ষক-জীবন!

পাণ্ডবা সুস্থ হতে থাকে অতি দ্রুত। জীবকের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে তক্ষশিলা নগরে, সারা গন্ধার-রাজ্যে। তার প্রশংসায় গোটা দেশ উচ্ছ্বসিত।

শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরাময় হলো পাণ্ডবা। পুষ্করসারীর আনন্দের সীমা নেই। জীবককে তিনি যে পারিশ্রমিক ও পারিতোষিক দেবার ব্যবস্থা করলেন, তা বর্ণনাতীত। সে এক বিরাট রাজসিক ব্যাপার!

কিন্তু জীবক তার কিছুই গ্রহণ করলো না। সমস্তই নিবেদন করলো গুরুদেবের চরণে। আত্রেয় চমকে উঠলেন। তাঁর মনে পড়লো জীবকের সেই প্রতিজ্ঞা। অপরিসীম ক্ষোভে ও লজ্জায় নিজের কাছেই তিনি যেন মুখ দেখাতে পারেন না।

গুরু-শিষ্যের মধ্যে এবার শুরু হলো এক বিচিত্র দ্বন্দ্ব ঃ শিষ্য দেবে গুরুকে, কিন্তু গুরু তা নেবেন না, ফিরিয়ে দেবেন শিষ্যকে।

শেষ পর্যন্ত অনেক তর্কবিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণের পর স্থির হলো, দীর্ঘ যাত্রার জন্য জীবক সঙ্গে নেবে মাত্র দুজন রক্ষী, তিনটি ঘোড়া আর পাথেয় হিসাবে কিছু অর্থ, অবশিষ্ট সমস্ত অর্থ, ধনরত্ন, মহার্ঘ পোশাক-পরিচ্ছদ, হস্তী, অশ্ব, রথ, দাসদাসী প্রভৃতি সবকিছু আত্রেয়ই গ্রহণ করবেন।

তারপর এক শুভ দিনে গুরু ও গুরুপত্নী এবং অন্য সকলের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা মাথায় নিয়ে পথে নামলো জীবক।

॥ পাঁচ ॥

গন্ধাররাজ্যের সীমানা পার হয়ে জীবক চলেছে পূব দিকে। গন্তব্যস্থলের কোন স্থিরতা নেই। কোথায় গিয়ে যাত্রা শেষ হবে, সে জানে না।

মানুষের সেবাকেই যখন সে জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছে, তখন আধিব্যাধিতে আর্ত মানুষ যেখানেই তাকে আহ্বান করবে, সে যাবে সেখানে। সেদিক থেকে দেখলে, সমগ্র বিশ্বই তার ঘর, সব মানুষই তার আপন।

তবু বাল্য ও কৈশোরের মধুর স্মৃতিবিজড়িত রাজগৃহ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। ছাত্রজীবনে বারবার তার কল্পনায় ভেসে উঠেছে রাজগৃহের ছবি, বারবার স্বপ্ন দেখেছে পিতা অভয়কে। পালক-পিতা তিনি সন্দেহ নেই. কিন্তু তাঁর স্নেহের বুঝি শেষ নেই। পিতৃস্নেহের সে বাঁধভাঙা বন্যা তার মনকে সজল শ্যামল রেখেছে চিরদিন।

পরক্ষণে তার মনে জাগে কলঙ্কের ভয়। জন্মপরিচয়হীন জীবন—বাবা-মার পরিচয় নেই। অজ্ঞাতকুলশীল অবজ্ঞাত থাকতে হবে তাকে চিরকাল। এই অপরিসীম লজ্জা ও কলঙ্কই তো তাকে ঘরছাড়া করেছে! যতদিন বাঁচবে, এ থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। পরিচিতজনের সংশ্রম তাকে এড়িয়ে চলতে হবে চিরদিন।

পথ চলতে চলতে জীবক ভাবে আর ভাবে। রাজগৃহের স্মৃতি মুছে ফেলার চেষ্টা করে মন থেকে। কিন্তু অত সহজে কি তা যাবার! মনে প্রশ্ন জাগে আবার, জন্ম-পরিচয়ই কি মানুষের জীবনে সব? কর্ম-পুরুষকার, এ সবের কি কোনই মূল্য নেই? মহাকালের বুকে কার আসন পাতা? কার জয়ডঙ্কা বাজে সেখানে? জন্মপরিচয়হীন কীর্তিমানের, না উচ্চবংশজাত কীর্তিহীনের? এ মহাপ্রশ্নের উত্তর খোঁজে সে।

স্মৃতিতে তার ভেসে ওঠে কাষ্ঠফলকের সেই লেখাটা। আজো সে ওটা পরম যত্নে সংগোপনে রক্ষা করে চলেছে। আজো তা তেমনি অটুট, তেমনি উজ্জ্বল। লেখাটা যেন তার জীবনের ধ্রুবতারা। নৈরাশ্য ও অবসাদ তার মনের আকাশকে যখনি আচ্ছন্ন করতে চেয়েছে, সে সামনে ধরেছে লেখাটা, সঙ্গে সঙ্গে মেঘ কেটে গেছে, আবার সে ফিরে পেয়েছে পথের নিশানা আর চলার শক্তি।

কিন্তু সত্যিই কি সে জন্মপরিচয়হীন? অজ্ঞাতকুলশীল? না, না, তা হতে পারে না। তাহলে কে লিখলো ওটা? কেন লিখলো? কে তিনি? মা! হ্যাঁ, মা! মা-ই হবে। তার বুভুক্ষু মন হৃদয়ের সমস্ত আকুতি ও ভালবাসা দিয়ে কল্পনায় গড়তে চায় এক অপূর্ব মাতৃমূর্তি।

ধীরে ধীরে জীবকের অশান্ত মন শান্ত হয় সাময়িকভাবে। রাজগৃহের দুর্বার আকর্ষণ সে রোধ করতে পারে না। রাজগৃহকে সে ভালবাসে, ভালবাসে তার দেশবাসীকে—রাজগৃহ ও মগধের মানুষকে। দেশবাসীর সেবা করবে, এ বুঝি তার আবাল্যের স্বপ্ন। জীবক যেন নতুন করে আবিষ্কার করে নিজেকে।

কিন্তু দ্বন্দ্ব ও সংশয় চলতে থাকে। অন্য রাজ্যের অন্য নগরে গিয়ে ঘর বাঁধলে কেমন হয়? কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তী, সাকেত বা বারাণসী? বৎস রাজ্যের রাজধানী কৌশাম্বী? বৃজি-লিচ্ছবি রাজ্যের রাজধানী বৈশালী? বা অঙ্গরাজ্যের রাজধানী চম্পা? কিংবা আরো দূরে দক্ষিণে অবন্তী রাজ্যের রাজধানী উজ্জয়িনী? মানুষের সেবাই যখন মূল প্রশ্ন, তখন রাজগৃহ কেন, যে কোন স্থানে গিয়েও তো তা করা যায়!

জীবক মন স্থির করতে পারে না। অন্তর ক্ষতবিক্ষত হয়। সে ছটফট করে। দেহের সবরকম ব্যাধির চিকিৎসা সে আয়ত্ত করেছে বটে, কিন্তু মনের এই ব্যাধির চিকিৎসা কোথায়? এ ব্যাধি তাকে সারা জীবন

তিলে তিলে যন্ত্রণা দেবে, তাড়া করে ফিরবে শিকারী কুকুরের মতো।

গতি পূব দিকে হলেও জীবক সোজা পথ ধরে চলে না। ফেরার তাড়া নেই, পথ তাই আঁকাবাঁকা। এ জনপদ থেকে ও জনপদ, ও নগর থেকে সে নগর— এমনি করে এঁকেবেঁকে চলে তার পথ-পরিক্রমা। কিন্তু যেখানেই যায়, রোগগ্রস্ত মানুষের সেবা করে প্রাণ দিয়ে। সেখানে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য নেই, অর্থের প্রত্যাশা নেই।

তার চিকিৎসায় নৈরাশ্যপীড়িত জীবনে ফোটে আশার আলো, নিরানন্দ জীবনে জাগে খুশির বন্যা। যে জীবন-দীপ নিবু-নিবু, দেশের বৈদ্যসমাজ যাকে জবাব দিয়ে গেছেন, তা আবার জ্বলে ওঠে নতুন তেজে।

জীবকের চিকিৎসা চলে সম্পূর্ণ নিজস্ব পন্থায়। নতুন নতুন বিচিত্র ওষুধের উদ্ভাবনে কোন ব্যাধিই দুরারোগ্য থাকে না তার কাছে। পক্ষাঘাত, আন্ত্রিক রোগ, শিরঃপীড়া, গুল্মরোগ, শোথ, কর্কটরোগ, চোখ কান ও মুখের পীড়া, দুষ্ট ক্ষত ও ব্রণ-- হেন রোগ নেই যা তার চিকিৎসার বাইরে।

যে পথ দিয়ে যায় জীবক, সেখানেই নবীন চিকিৎসকের অসামান্য ক্ষমতা ও সেবাব্রতী মনের পরিচয় পেয়ে নগর-জনপদের অধিবাসীরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় উদ্বেল হয়ে ওঠে।

আর মাথায় হাত দিয়ে বসেন দেশের চিকিৎসক সমাজ। তাঁদের কাছে জীবক এক মহাবিস্ময় ঃ কোথা থেকে এল এই চিকিৎসক? কোন ব্যাধিই তো এর কাছে দুরারোগ্য নয়! কে এই কন্দর্পকান্তি নবীন চিকিৎসক? কে? কে?

শেষ পর্যন্ত তাঁরা বাঁচার পথ বের করেন। মুখে মুখে রটাতে থাকেন ঃ নবীন চিকিৎসক মানুষ নন, দেবতা। দেব-চিকিৎসক ধন্বন্তরি। মর্তে আবির্ভূত হয়েছেন স্বর্গরাজ্য থেকে।

জনরব যত ছড়াতে থাকে, মানুষের মধ্যে ততই শুরু হয় আলোড়ন। মানুষের বিপুল জনতা কাতারে কাতারে ভেঙে পড়ে দেবতার দর্শন-লাভের জন্য।

জীবক বোঝে, তাকে দেশছাড়া করার জন্যই চিকিৎসকদের এই রটনা। নিজেদের খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও স্বার্থ রক্ষার জন্য নিরুপায় হয়ে তারা অবলম্বন করেছে এই পথ। তাকে দেবতার আসনে বসাতে পারলে নিজেদের অক্ষমতা-পরাজয় মানুষের চোখে আর তত-খানি বড় হয়ে উঠবে না।

জীবক মনে মনে হাসে। তারপর সংগোপনে আবার একদিন ত্যাগ করে সে অঞ্চল।

এমনি করে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে, আর্যা-বর্তে তুমুল আলোড়ন তুলে, ঘুরতে ঘুরতে জীবক একদিন এসে উপস্থিত হলো সাকেতে। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ছয়টি শহরের অন্যতম সাকেত—ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছে সরযূ নদীর তীরে। তার সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি সহজেই মানুষের মন আকর্ষণ করে।

সেদিন সাকেতের এক পান্থশালায় জীবক বসে আছে, এমন সময় শুনলো—নগরের এক বিশিষ্ট অভি-জাত পরিবারের কর্ত্রী, বয়স্কা মহিলা একজন, দীর্ঘকাল যাবৎ নিদারুণ শিরঃপীড়ায় কষ্ট ভোগ করছেন। অগাধ ঐশ্বর্যের তাঁরা অধিকারী। তাই হেন বৈদ্য নেই, যাকে ডাকা হয় নি এবং হেন চিকিৎসা নেই, যা করা হয় নি। দেশ-দেশান্তর থেকে কত চিকিৎসক এসেছেন, অর্থও নিয়েছেন প্রচুর। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। দিনে দিনে রোগ আরও বৃদ্ধির দিকে। তাই মহিলার স্বামী ও আত্মীয়স্বজন সবাই ধরে নিয়েছেন, এ রোগ সারবার নয়—দুরারোগ্য।

সাকেতে জীবক নবাগত—অপরিচিত। তাই লোক মারফৎ সংবাদ পাঠাল, রোগিনীকে সে দেখতে চায়।

আমন্ত্রণ এল।

কিন্তু জীবককে দেখে সবাই শুধু অবাক নয়, হতাশ হয়। বিরক্তিভরা কণ্ঠে মহিলাটি বললেন,—তুমি! তুমি কি করবে? নিতান্ত বালক তুমি! দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা প্রবীণ চিকিৎসকরা যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানে তুমি করবে চিকিৎসা!

মৃদু হেসে ধীর সংযত কণ্ঠে জীবক বললো,—মা, বয়স দিয়ে আপনি কি করবেন? জ্ঞানের ক্ষেত্রে বয়সের নবীনত্ব প্রাচীনত্ব নেই। বয়স বেশী হলেই যে জ্ঞান বেশী হবে, এমন কি কারণ আছে? আপনার রোগ নিরাময় হওয়া নিয়ে কথা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাকে সম্পূর্ণ সুস্থ না করতে পারলে আমি এক কপর্দকও নেব না।

মহিলাটিকে সে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলো। জিজ্ঞাসাবাদও করলো। বুঝলো--রোগ অত্যন্ত কঠিন। শেষপর্যন্ত শল্য-চিকিৎসার আশ্রয় নিতে হতে পারে, করোটি খুলতে হতে পারে। কিন্তু সে পরের কথা।

তিন রকমের ওষুধ সে তৈরি করলো। সম্পূর্ণ অভিনব তিনটি ওষুধ। একটা দিল খাওয়ার জন্য, আর একটা দুই কানে ফোঁটা ফেলার জন্য, বাকিটা একধরনের

অতি মিহি গুঁড়ো—নস্যের মতো নাকে টানার জন্য। যাবার সময় বলে গেল, তিন দিন পরে তাকে যেন সংবাদ দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় দিন বিকালে জীবক পান্থশালায় বসে আছে, ভাবছে রোগিনীর কথা, এমন সময় রথ-অশ্বের এক সুসজ্জিত মিছিল এসে পান্থশালার দরজায় দাঁড়ালো। মিছিলের লোকজন প্রায় সবাই সম্ভ্রান্ত-বংশীয়। সবার আগে একজন প্রবীণ নাগরিক—সোজা এগিয়ে এলেন জীবকের দিকে। জীবক চিনতে পারে তাঁকে। মহিলাটির স্বামী!

প্রবীণ নাগরিক তাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে তার দুই হাত চেপে ধরলেন, বললেন,—রথ এনেছি, আপনাকে আমাদের গৃহে যেতে হবে। এটা বিশেষতঃ আমার স্ত্রীর অর্থাৎ আপনার রোগিনীর অনুরোধ।

বিস্ময়ে জীবক উঠে দাঁড়ায়, বিব্রত কণ্ঠে বলে,—কেন কি হয়েছে? রোগিনী কেমন আছেন?

কেমন আছেন মানে!—আবেগকম্পিত কণ্ঠে নাগরিক বললেনঃ সম্পূর্ণ সুস্থ সে। নিদারুণ শিরঃপীড়ার যন্ত্রণা তার কাছে আজ অতীতের বস্তু, ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মতো। সত্যিই, মর্তের ধন্বন্তরি আপনি! দয়া করে উঠুন। মর্তের ধন্বন্তরির স্থান সাকেতের নগণ্য এক পান্থশালায় নয়। এটা কিন্তু আপনার রোগিনীরই কথা।

হ্যাঁ, এবার আর দেবলোকের নয়, মর্তের ধন্বন্তরি হিসাবে জীবকের খ্যাতি নগর-জনপদ-দেশ-রাজ্যের সীমানা পার হয়ে ছড়িয়ে পড়ে দূর-দূরান্তে। সাকেত মহানগরী তাকে বিপুল সম্বর্ধনা জানায়। বিপুল তার খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও অর্থাগম।

তার আহ্বানে আসে শ্রাবস্তী থেকে, বারাণসী থেকে, আসে চম্পা, বৈশালী ও কৌশাম্বী থেকে। ব্যাধিগ্রস্ত আর্ত মানুষ নবজীবনের আশায় কাতর আহ্বান জানায় মর্তের ধন্বন্তরিকে।

মহিলাটির স্বামীর কাছ থেকে জীবক পারিশ্রমিক ও পারিতোষিক হিসাবে পেয়েছে অপর্যাপ্ত অর্থ। এ ছাড়াও তার উপার্জন বিরাট। সমস্ত অর্থ সে একদিন দুভাগ করলো। একভাগ পাঠিয়ে দিলে মহাশ্রেষ্ঠী তিরীট-বৎসের কাছে। জানালো, এ শুধু তার ঋণ-পরিশোধ নয়, অশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনও বটে।

দ্বিতীয় অংশ সে পাঠালো রাজগৃহে—বাবা অভয়ের কাছে। লিখলো—অসীম পিতৃস্নেহে আপনি আমায় প্রতিপালন করেছেন। সে ঋণ শোধ করার নয়। আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তির এই সামান্য অর্ঘ্য আপনার চরণে নিবেদন করছি। অনুগ্রহ করে গ্রহণ করবেন।

॥ ছয় ॥

রাজগৃহ। দুপুর গড়িয়ে গেছে।

শালবতীর কক্ষ। মুখোমুখি বসে আছেন দুজন মানুষ—অভয় ও শালবতী। কারো মুখে কথা নেই। বিষণ্ণ চিন্তাচ্ছন্ন দুজনেই।

কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে শালবতীর! শীর্ণ কঙ্কালসার—অতীত তিলোত্তমার ছায়ামূর্তি যেন। দীর্ঘ সাত-সাড়েসাত বছর আগে সেই যে অসুস্থ হয়েছিলেন শালবতী, তারপর আর সুস্থ হন নি। স্বাস্থ্য দিন দিন ক্ষয় হতে হতে এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

চিকিৎসাও কম হয় নি। অভয়ের পীড়াপীড়িতে হেন চিকিৎসক নেই, যাকে ডাকা হয় নি। কিন্তু রোগ ধরতে পারেন নি কেউই। বলে গেছেন, এটা এমনি এক দুরারোগ্য ব্যাধি যার নিদান আজও অজ্ঞাত। আর তার ফলে সমস্ত চিকিৎসাই বন্ধ।

এ নিয়ে অভয় বা অন্য কেউ অনুযোগ করলে, ম্লান হেসে শালবতী বলেন,—আর কেন? এ রোগ সারার নয়। পরপারের ডাক শুনতে পাচ্ছি, তার জন্যে তৈরী হতে হবে তো!

অভয় ও শালবতী বসে আছেন। ঘরে বিষাদ ও দুশ্চিন্তার ছায়া। জীবকের বিপুল যশ ও খ্যাতির তরঙ্গ রাজগৃহেও এসে আঘাত করেছে। কত আশা ও আনন্দ নিয়েই না অভয় তার ফেরার পথ চেয়ে বসে-ছিলেন! মনে মনে দিন গুণেছেন, সাকেতে যখন সে এসে গেছে, তখন সোজা রাজগৃহে ফিরতে আর দেরী হবে না।

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর কৃতী সন্তানকে বুকে তুলে নেবার কামনাই শুধু নয়, আরো একটা বাসনা ছিল অভয়ের। জীবককে দিয়ে তিনি শালবতীর চিকিৎসা করাবেন। তার এ কঠিন ব্যাধির চিকিৎসা আর কে করবে মর্তের ধন্বন্তরি ছাড়া!

কিন্তু জীবকের পত্র ও অর্থ পাওয়ার পর তাঁর সমস্ত আশা আজ চুরমার হবার মুখে। সংক্ষিপ্ত পত্রখানা থেকে আর কিছু না হোক এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শীঘ্র সে রাজগৃহে ফিরছে না। যে কলঙ্কের ব্যথা নিয়ে সে রাজগৃহ ছেড়েছিল, তাতে আদৌ ফিরবে কিনা কে জানে!

শালবতীও দেখেছেন সে পত্র। জীবক যে টাকা

পাঠিয়েছে, তাও শুনেছেন অভয়ের কাছ থেকে।

অভয় কথা বললেন। ব্যথায় ভরা কণ্ঠ। বললেন,—কত আশা, কত আনন্দ! সবই খান খান হয়ে গেল, শালবতী। ভাবছি, আমি একবার যাই—দেখি, যদি তাকে ফিরিয়ে আনতে পারি।

না, তা হয় না।—ম্লান কণ্ঠ শালবতীরঃ হয়তো হিতে বিপরীত হবে। এমনও হতে পারে যে, সে এল তো না-ই, উপরন্তু এমন ভাবে আত্মগোপন করলো যে, ভবিষ্যতে তার আর কোন সংবাদই পেলেন না।

—তাহলে কি করতে বলো? আচ্ছা, তোমার রোগের কথা জানিয়ে তাঁকে আসার অনুরোধ জানালে কেমন হয়?

মাথা নাড়েন শালবতী। মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ঝিলিক দিয়ে যায়। বড় বিষাদ-করুণ সে হাসি। বলেন,—কি যে বলেন, কুমার! আজ সে খ্যাতির উচ্চ শিখরে—মর্তের ধন্বন্তরি। দূর-দূরান্ত থেকে তার আহ্বান আসছে। সেখানে কে এক শালবতী, তার জন্যে কী তার এমন মাথাব্যথা যে, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ছুটে আসবে রাজগৃহে—যে রাজগৃহ সে একদিন ত্যাগ করেছিল কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে!

শালবতীর কথা মোটেই অসঙ্গত নয়। অভয় তা বুঝলেও মানসিক চাঞ্চল্যে সুস্থির থাকতে পারেন না।

কিছুক্ষণ কেটে যায়। শেষে শালবতী বললেন,—দেব, আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু ধৈর্য হারালে তো চলবে না! ধীর মস্তিষ্কে আজ আমাদের পথ খুঁজে বের করতে হবে। একটা উপায় আমার মাথায় এসেছে, জানি না সেটা কার্যকরী করা সম্ভব হবে কিনা।

উন্মুখ দৃষ্টিতে অভয় তাকালেন শালবতীর দিকে। শালবতী বলেন,—মহারাজ বিম্বিসার এক দুষ্ট ক্ষত রোগে দীর্ঘ দিন কষ্ট পাচ্ছেন। কত চিকিৎসকই তো তাঁকে চিকিৎসা করেছেন। এখনও করছেন। কিন্তু শুনছি, ক্ষত নিরাময় হওয়া তো দূরের কথা, ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে। আপনি গিয়ে মহারাজকে বলুন না, তিনি চিকিৎসার জন্য জীবককে ডেকে পাঠান। মহারাজের বার্তা পেলে সে না এসে পারবে না, তা তার যত কাজই থাক।

উত্তেজনায় অভয় ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন,—ঠিক বলেছ, শালবতী। এটা আমার মনেই হয় নি। এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব আর হতে পারে না। সত্যি শালবতী, তোমার বুদ্ধির তুলনা হয় না। বুদ্ধিতে তোমার কাছে আমি নিতান্ত শিশু। আচ্ছা চললুম মহারাজের কাছে।

বিশ্রাম-কক্ষে মহারাজ বিম্বিসার পালঙ্কে অর্ধশয়ান। চোখেমুখে রোগ-যন্ত্রণার ছাপ পড়লেও, দেহে শক্তি, শৌর্য ও সৌন্দর্যের অপূর্ব সমন্বয় আজো অটুট। জরা সে দেহকে স্পর্শও করতে পারে নি।

তাঁর সামনে অভয় বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। কক্ষে আর তৃতীয় প্রাণী নেই।

বিম্বিসার বলছেন,—তোমার প্রস্তাব অসঙ্গত নয়। কিন্তু শুনেছি, চিকিৎসকটি নাকি বয়সে খুবই তরুণ। এই বয়সেই সে মর্তের ধন্বন্তরি আখ্যা পেল! আশ্চর্য ব্যাপার! অবশ্য রাজগৃহের অভিজ্ঞ প্রবীণ চিকিৎসক-মণ্ডলী এ রটনায় মোটেই গুরুত্ব আরোপ করছেন না। তবু তোমার প্রস্তাব মতো একবার পরীক্ষা করে দেখতে দোষ নেই। কত চিকিৎসাই তো করছি! আচ্ছা তুমি না বলছিলে, একে তুমি চেন? কে সে?

—জীবক।

জীবক!—বিস্মিত কণ্ঠে বিম্বিসার বললেনঃ কোন্ জীবক? তোমার সেই পালিত পুত্র, যে বহুকাল আগে রাজগৃহ থেকে অদৃশ্য হয়েছিল? এত দিন কোথায় ছিল সে?

অভয় ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা খুলে ধরলেন বিম্বিসারের কাছে। শেষে বললেন,—চিকিৎসক হিসাবে তার কৃতিত্বের যে সব ঘটনা আমি শুনেছি, তাতে যিনি যাই বলুন, এ সব কিছুকে মিথ্যা রটনা বলে আমি উড়িয়ে দিতে পারি নে।

বিম্বিসার বললেন,—সে যাই হোক, জীবককে অবিলম্বে এখানে ডেকে পাঠানো প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কালই আমি পত্র দিয়ে উপযুক্ত লোক ও যানবাহন পাঠাচ্ছি। তারা শ্রাবস্তী থেকে কোশলরাজ প্রসেনজিতের অনুমতি নিয়ে সাকেতে যাবে। জন্মস্থান রাজগৃহ হলেও জীবক বর্তমানে কোশলরাজ্যে বাস করছে।

জীবক যাত্রা করেছে শ্রাবস্তীর পথে। জোরে রথ ছুটছে। সঙ্গে চারজন অশ্বারোহী সশস্ত্র রক্ষী, আর দুজন ভৃত্য। শ্রাবস্তীতে কিছুদিন কাটিয়ে সে যাবে বারাণসী, সেখান থেকে বৈশালী। তারপর? তারপর সে জানে না। অসুস্থ আর্তের আহ্বান আসবে যেখান থেকে, যাবে সেখানেই। ভবিষ্যৎ বড় অস্পষ্ট।

কুয়াশাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে জীবক গভীর চিন্তায় মগ্ন।

হঠাৎ তার চিন্তায় বাধা পড়লো। দশজন সশস্ত্র অশ্বারোহী তাদের পথ রোধ করেছে। তাদের সাজ-পোশাক অস্ত্রশস্ত্র দেখে জীবকের বুঝতে কষ্ট হয় না যে, তাদের নজন সৈনিক—সামরিক বিভাগের লোক আর দলের যিনি অধিনায়ক, তিনি উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারী।

রাজকর্মচারীটি এগিয়ে এসে জীবককে অভিবাদন করে জিজ্ঞাসা করলেন,—কিছু মনে করবেন না. আপনারা কি সাকেত থেকে আসছেন ? জরুরী প্রয়োজনেই এভাবে পথ রোধ করে আপনাদের বিরক্ত করছি। এজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

হ্যাঁ সাকেত থেকে।—জীবক বললেঃ কিন্তু কেন বলুন তো?

কর্মচারীটি বললেন,—বৈদ্যরাজ জীবকের দর্শন-লাভের আশায় দূর রাজগৃহ থেকে শ্রাবস্তী হয়ে আমরা আসছি। মহারাজ বিম্বিসার অসুস্থ। নিজের চিকিৎসার জন্য তাই তিনি বৈদ্যরাজকে রাজগৃহে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। শ্রাবস্তী থেকে রওনা হয়ে পথে এক বণিকদলের কাছে শুনলাম, বৈদ্যরাজ নাকি শ্রাবস্তীর পথে সাকেত ত্যাগ করেছেন, অথবা করার মুখে। এ সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন কি ?

জীবকের মুখে কথা নেই। থাকার কথাও নয়। ঘটনার আকস্মিকতায় সে এমনি হতভম্ব হয়ে গেছে যে, বাক্‌রোধ হবার মতো অবস্থা। বিস্ময়ে আনন্দে বুক তোলপাড়। মাথার মধ্যে ঘুরছে শুধু কয়েকটি কথাঃ মহারাজ বিম্বিসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন! মহারাজ অসুস্থ! তার স্বপ্নের রাজগৃহ!

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে জীবক সামলে নেয় নিজেকে। বলে,—আমিই জীবক। দেখি মহারাজের বার্তা।

আপনিই বৈদ্যরাজ!—বলতে বলতে রাজকর্ম-চারীটি ঘোড়া থেকে নেমে সসম্ভ্রমে এগিয়ে দেয় বার্তাটি।

লিপি পড়ে জীবক চমকে যায়। মহারাজ তাকে নাম ধরে লিখেছেন, সম্বোধন করেছেন তুমি বলে। পিতা অভয়ের কাছ থেকে তিনি নিশ্চয়ই জেনেছেন তার পরিচয়। লিখেছেন, দুষ্ট ক্ষতরোগে তিনি দীর্ঘ-দিন অসুস্থ। সে যেন পত্র পাওয়া মাত্র রাজগৃহে রওনা হয়।

মুহূর্তে জীবক মন স্থির করে বললে,—বেশ চলুন, এখুনি রওনা হওয়া যাক।

বিনীত কণ্ঠে কর্মচারীটি বললেন,—মহারাজ আপনার জন্য রথ পাঠিয়েছেন। দয়া করে ঐ রথে আরোহণ করুন।

জীবক এতক্ষণ লক্ষ্য করে নিঃ অদূরে দাঁড়িয়ে আছে চারঘোড়ায়-টানা প্রকাণ্ড রাজকীয় রথ।

জীবককে নিয়ে রাজকীয় রথ ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে রাজগৃহের দিকে। আর ভৃত্যদের নিয়ে পেছনে আসছে অশ্বারোহী দল।

জীবকের বুক উদ্বেল। মনে খণ্ডছিন্ন নানা বিক্ষিপ্ত চিন্তার আনাগোনা। দীর্ঘ আট বছর আগে—হ্যাঁ আট বছর তো হবেই—সে রাজগৃহ ত্যাগ করেছিল, আজ আবার ফিরছে। রাজগৃহ তাকে কিভাবে গ্রহণ করবে কে জানে! তার জন্ম-পরিচয়ই কি সেখানে মুখ্য হয়ে দাঁড়াবে? তাহলে কি হবে?

কিন্তু রাজগৃহে পৌঁছে জীবক স্তম্ভিত হয়ে গেল। এ কী! হাজার হাজার নাগরিক পথে নেমে এসেছে, অট্টালিকার অলিন্দে অলিন্দে নরনারীর ভিড়। দেবকান্তি তরুণ বৈদ্যশ্রেষ্ঠ মর্তের ধন্বন্তরির কথা তারা বহুবার শুনেছে, অলৌকিক শক্তির তিনি অধিকারী। তাই তাঁকে দেখার জন্য মানুষের এত ভিড় ও ব্যগ্রতা।

লাজ ও পুষ্প বৃষ্টি আর জয়ধ্বনির মধ্যে অভিভূত জীবক রথে বসে থাকে স্থাণুর মতো—স্বপ্নাবিষ্ট সম্মোহিত যেন।

তার ঘোর কাটলো, যখন রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে অভয় তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর চোখে জল। জীবক তাঁকে প্রণাম করলো।

মহারাজ বিম্বিসারের কাছ থেকেও সে পায় স্নেহের অভ্যর্থনা।

বিম্বিসারের চিকিৎসা শুরু হয়। ক্ষত পরীক্ষা করে ওষুধ লাগিয়ে জীবক বললে,—সাত দিনের মধ্যে এ ক্ষত নিরাময় হবে।

সাত দিন! মাত্র সাত দিন! বিম্বিসারের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

তাই-ই হলো। সাত দিনের মধ্যে ক্ষত শুধু আরোগ্য নয়, তার চিহ্নও রইল না।

এ অবিশ্বাস্য ব্যাপার দেখে রাজগৃহের চিকিৎসক-সমাজ স্তম্ভিত। আর জীবকের প্রশংসায় উদ্বেল উচ্ছ্বসিত শুধু রাজগৃহই নয়, গোটা মগধরাজ্য। সর্বত্র

সবার মুখে শুধু অলৌকিক শক্তিধর জীবকের আলোচনা।

কিন্তু মহারাজ বিম্বিসারের মুখ চিন্তাকুটিল। জীবকের অলৌকিক ক্ষমতা ও অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখে তিনি সন্ত্রস্ত। ভাবেন—ও যেরকম বুদ্ধিমান ও প্রতিভাধর এবং এই অল্প সময়েই যেরকম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তাতে ওকে পরীক্ষা না করে রাজধানীতে রাখা কখনই নিরাপদ হবে না। মনের কোথাও যদি কোন খারাপ অভিসন্ধি বা অন্যায় ক্ষমতালিপ্সা থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে ওর কাছ থেকে গুরুতর বিপদে পড়ার সম্ভাবনা।

কিন্তু কি ধরনের পরীক্ষা হবে?

জীবককে তিনি পারিতোষিক দেবার ব্যবস্থা করলেন। তার মধ্যে মহামূল্য নানা রাজপোশাক, অলঙ্কার-আভরণ ও একখানা তরবারি অন্যতম।

জীবক কিন্তু তার কিছুই গ্রহণ করলো না। শুধু শুভ্র সুগন্ধি একটা ফুল তুলে নিয়ে বললো,—মহারাজ ক্ষমা করবেন, আমার মতো সামান্য লোকের পক্ষে রাজ-পরিচ্ছদ ব্যবহার করা ধৃষ্টতামাত্র। আর তরবারি দিয়েই বা আমি কি করবো? চিকিৎসার মাধ্যমে মানুষের সেবা করাকেই আমি জীবনের বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছি। আপনার স্নেহ ও অনুগ্রহ লাভ করতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো—সে-ই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আর কোন পুরস্কার চাই না।

বিম্বিসার শুধু নিশ্চিন্তই হলেন না, অত্যন্ত সন্তুষ্টও হলেন। আদেশ দিলেন, রাজবৈদ্য-পদে জীবককে অভিষেক করা হোক।

জীবকের অভিষেক—বিরাট সে রাজকীয় আয়োজন। রাজধানীর পথে পথে তোরণ তৈরী হয়। উৎসবে মেতে ওঠে নাগরিকরা। রাজগৃহের সন্তান রাজবৈদ্য জীবককে নিয়ে তাদের গর্ব ও গৌরবের বুঝি অন্ত নেই।

জীবক মগধের রাজবৈদ্য-পদে অভিষিক্ত হয়। মহা-রাজ বিম্বিসার তার বসবাসের জন্য দান করেন এক সুরম্য প্রাসাদ আর ভরণপোষণের জন্য বহু উদ্যান ও গ্রাম।

মানুষ এত দিন জীবকের ভেষজ-চিকিৎসাই শুধু দেখেছে, এবার রাজ-অমাত্য অশ্বকের চিকিৎসার মধ্য দিয়ে তারা সবিস্ময়ে দেখলো তার শল্য-চিকিৎসার অপূর্ব ক্ষমতা।

মগধ-রাজসভার অন্যতম প্রভাবশালী অমাত্য অশ্বক—কিছুদিন থেকে শিরঃপীড়ায় ভুগছেন। নানা চিকিৎসা সত্ত্বেও রোগের কোন উপশম তো হয়ই না, শেষ পর্যন্ত তা এমন অবস্থায় গিয়ে পেঁছিলো যে, নিদারুণ যন্ত্রণায় অশ্বকের অবস্থা পাগলের মতো। তাঁর মনে হয়, তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে তাঁর মাথার ভেতরটা কে যেন টুকরো টুকরো করে কাটছে।

খ্যাতনামা প্রবীণ চিকিৎসকরা বলে গেলেন,—দুরা-রোগ্য এ ব্যাধি চিকিৎসার বাইরে। কিছু দিনের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু অবধারিত।

সংবাদটা বিম্বিসারের কানে যেতে তিনি অত্যন্ত অবাক হলেন। অশ্বকের শিরঃপীড়ার কথা তিনি শুনেছেন বটে, কিন্তু তা যে এত গুরুতর দাঁড়িয়েছে, সে কথা তো কেউ তাঁকে বলে নি। তৎক্ষণাৎ তিনি জীবককে পাঠালেন অশ্বকের চিকিৎসার জন্য।

রোগ পরীক্ষা করে ও লক্ষণাদি দেখে জীবক বুঝলো, রোগ এত গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ভেষজ-চিকিৎসায় তা নিরাময় হবার নয়। রোগীর নিকটতম পরিজনদের একান্তে ডেকে নিয়ে রোগের বর্তমান অবস্থা জানিয়ে শেষে সে বললে,—শল্য-চিকিৎসার দ্বারা রোগীর করোটি উন্মুক্ত করতে হবে। তা ছাড়া পথ নেই।

সবাই শিউরে ওঠে রাজবৈদ্যের কথায়। কিন্তু এ ছাড়া আর করারই বা কি আছে?

সুতরাং জীবকের অস্ত্রোপচার শুরু হয়। নিজের উদ্ভাবিত শস্ত্রের সাহায্যে সে ক্ষিপ্রহাতে রোগীর করোটি খুলে ফেলে। দেখে, মস্তিষ্কের এক স্থানে একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে, অল্প অল্প রক্ত ঝরছে সেখান থেকে।

ক্ষতস্থানে ভাল করে এক প্রকার মলম লাগিয়ে আবার সে করোটি সেলাই করে ফেললে আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে। বললে, আর ভয় নেই।

কয়েক দিনের মধ্যেই রোগী সুস্থ হলো।

জীবকের জন্য অভয়ের গর্ব ও আনন্দের সীমা নেই। মগধবাসী আবালবৃদ্ধবনিতাও সে গর্ব ও আনন্দের সম-অংশভাগী। সুখী শালবতীও।

কিন্তু যাকে নিয়ে এই আনন্দ-উচ্ছ্বাস, তার মনে শান্তি নেই। বিষণ্ণ নিঃসঙ্গ সে। দুর্নিবার এক অভাব-বোধ তাকে দহন করে দিনরাত। মাথার মধ্যে অবিরত ঘোরে সেই চিন্তা—জগতে সম্পূর্ণ একলা সে। সবারই মা-বাবার পরিচয় আছে, নেই শুধু তার। রাজগৃহের সবাই তো জানে এ কথা, এ নাগরিক-সমাজে কোথায় তার স্থান? একলা সে—নিঃসঙ্গ!

ভয়ঙ্কর এ চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার

জন্য জীবক ছটফট করে, ভুলে থাকার চেষ্টা করে। সেখানেও সে একা—কেউ নেই তাকে সাহায্য করার।

দিনরাত সে কাজে ডুবে থাকে। সূর্যোদয়ের আগেই পিতা অভয়কে গিয়ে প্রণাম করে এসে সে কাজ শুরু করে। নতুন নতুন ভেষজ ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের জন্য চলে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তারপর আরম্ভ হয় রোগীর সেবা—চিকিৎসা। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচের প্রভেদ নেই সেখানে।

কিন্তু তবু রেহাই নেই সে চিন্তার হাত থেকে।

এ সময়ে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে আর্যাবর্তে জেগেছে বিপুল উল্লাস, নতুন চিন্তার প্রাণবন্যায় জন-জীবন আলোড়িত।

বৈদিক ধর্মে যে জটিলতা ও অবনতি দেখা দিয়েছিল, তার সংগে তুলনায় বুদ্ধের শিক্ষা আশ্চর্য সহজ সরল বলিষ্ঠ ও হৃদয়গ্রাহী। সমাজে জাতিভেদ প্রথা তিনি মানেন না, উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ নেই তাঁর কাছে।

সবাইকে ডাক দিয়ে বলছেন তখন বুদ্ধ তথাগত,— জীবনে প্রকৃত শান্তি ও মুক্তি যদি পেতে চাও, তাহলে যাগযজ্ঞ, পশুবলি, মন্ত্রতন্ত্র ও আচার-অনুষ্ঠানের নিষ্ফল আড়ম্বর ত্যাগ করো। শরীরকে কষ্ট দিয়ে যে তপশ্চর্যা, ত্যাগ করো সে পথ। ত্যাগ করো বিলাস-ব্যসন। অবলম্বন করো মধ্য পন্থা—সেখানে আড়ম্বর ও বিলাস-ব্যসনের যেমন আতিশয্য থাকবে না, তেমনি থাকবে না দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়াস। সর্বপ্রকার আতিশয্য বর্জন করতে হবে, সৎপথে বিচরণ করতে হবে, ত্যাগ করতে হবে অসত্য, অন্যায়, অসদাচরণ, চৌর্য ও জীব-হিংসা। তবেই মিলবে প্রকৃত শান্তি ও মুক্তি পথের সন্ধান।

শিষ্য-শিষ্যাদের নিয়ে বুদ্ধদেব এ সময় রাজগৃহের বেণুবন বিহারে বাস করছেন। মহারাজ বিম্বিসার বৌদ্ধসংঘকে দান করেছেন এই বেণুবন।

মানুষ সেখানে যাচ্ছে দলে দলে। যাচ্ছে রাজা ও বণিক, যাচ্ছে বিরুদ্ধ-মতের পণ্ডিত, সবচেয়ে বেশী যাচ্ছে সাধারণ মানুষ।

তাদেরই কথ্য ভাষায় তাদের মতো করে বুদ্ধদেব বুঝিয়ে বলেন নিজের শিক্ষা। অপূর্ব মনীষা ও মানব-প্রেমে দীপ্ত সে মহান প্রতিভার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে-পুলকে রোমাঞ্চিত মানুষ শোনে সেই বাণী। সামাজিক নির্যাতন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠোরতা ও নিপীড়ন থেকে তারা বুঝি মুক্তির পথ খুঁজে পায়।

কিন্তু এ সব ব্যাপারে জীবকের বিশেষ আগ্রহ নেই। বুদ্ধদেব বর্তমানে বেণুবনে বাস করছেন, সে শুনেছে। মহারাজ বিম্বিসার বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট, তাও সে জানে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বুদ্ধকে দর্শন করার বা তাঁর বাণী শোনার কোন আগ্রহ বা সাড়া সে বোধ করে না অন্তর থেকে।

এমনি সময়ে বিম্বিসার তাকে একদিন ডেকে পাঠালেন, বললেন,—গুরুতর কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগে শাস্তা তথাগত কষ্ট পাচ্ছেন। তুমি তাঁর চিকিৎসা করো।

রাজার আদেশে চিকিৎসা করতে গিয়ে জীবক সেই প্রথম দেখলো বুদ্ধদেবকে, তাঁরই মুখ থেকে শুনলো তাঁর শিক্ষা, দেখলো সঙ্ঘের ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের। বুদ্ধের অপূর্ব দ্যুতিময় করুণাঘন মূর্তি ও তাঁর বাণী জীবকের অন্তরে সৃষ্টি করলো গভীর আলোড়ন।

পরম যত্নে তিনটি পদ্মের মধ্যে অতি অল্প পরিমাণ ওষুধ রেখে জীবক বুদ্ধদেবকে দিল আঘ্রাণ নেবার জন্য। দ্বিতীয়বার ওষুধ দেবার আর দরকার হলো না। বুদ্ধ-দেব সুস্থ হলেন।

জীবক সেদিন ফিরে এল বটে, কিন্তু পরদিনই সন্ধ্যার পর আবার গিয়ে হাজির হলো বেণুবনে। শুধু সেদিনই নয়, সন্ধ্যা হলেই কি এক দুর্নিবার আকর্ষণ যেন জীবককে প্রতিদিনই টেনে নিয়ে যায় শাস্তা তথা-গতের চরণতলে।

তথাগতের স্নেহসিঞ্চনে মন তার অনেকটা শান্ত। তাঁর সেই উপদেশ জীবকের কানে বাজে সর্বক্ষণঃ বিমর্ষ কেন, জীবক? আমি জানি, কোথায় তোমার ব্যথা। কিন্তু মনে রেখ, সত্য চিরদিন চাপা থাকে না, একদিন তা সূর্যের মতো প্রতিভাত হবেই। নিজের মনকে শক্ত করো। পুরনো সমাজের অন্যায়, অবিচার, রীতিনীতি ও কুসংস্কারকে অগ্রাহ্য করার মানসিক দৃঢ়তা অর্জন করো। ভুলে যেও না, গঙ্গা, যমুনা, সরযূ, অচিরবতী প্রভৃতি মহানদীগুলি যেমন সমুদ্রে পড়ে নিজ নিজ নাম হারায়, তেমনি যারা আমার শিক্ষা ও নির্দেশ পুরোপুরি মেনে চলে, এই শ্রমণ-সঙ্ঘের দৃষ্টিতে তাদের আর কোন জন্মগত বা জাতিগত পার্থক্য থাকে না।

জীবক বড় খুশী হয়, যখন দেখে, পিতা অভয়ও বুদ্ধের শরণাগত।

জীবকের দিন কাটছে মন্দ নয়। সারা দিন কাজ আর সন্ধ্যার পর বেণুবন বিহারে গমন। বুদ্ধের শরণ নেবার পর থেকে নিজের জন্ম-রহস্য জীবককে আর ততখানি বিচলিত করে না। নিতান্ত বাধ্য না হলে

সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগদান করা থেকে সে বিরত থাকে, সর্বপ্রযত্নে এড়িয়ে চলে ওসব।

এই যখন অবস্থা, তখন ঘটলো এমন একটি ঘটনা, যা জীবকের জীবনের মূল ধরে টান মারলো গভীরভাবে।

মহারাজ বিম্বিসার সেদিন তাকে ডেকে পাঠালেন নিজের বিশ্রামকক্ষে। একথা-সেকথার পর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন,—আচ্ছা জীবক, তোমার কোন ঘোরতর শত্রু যদি গুরুতর অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য তোমার শরণাপন্ন হয়, তুমি কি করবে?

প্রশ্ন শুনে জীবক অবাক হয়। সহজ কণ্ঠে বিনীত-ভাবে বলে,—এ প্রশ্ন কেন করছেন মহারাজ, জানি না। আমি চিকিৎসক, মানুষের সেবাকেই জীবনের পরম ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছি। সেখানে শত্রু-মিত্র, ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্রের কোন পার্থক্য নেই।

হেসে বিম্বিসার বললেন,—আমি তা জানি। তবু বড় সুখী হলাম তোমার মুখ থেকে শুনে। এবার তাহলে শোন। তোমার এককালের সতীর্থ যশঃপাণির পুত্র গুপ্তিলকে নিশ্চয়ই মনে আছে, তোমার সঙ্গে তার ব্যবহার ভুলবার নয়। কিছুকাল যাবৎ গুপ্তিল গুরুতর অসুস্থ—বলতে গেলে মরণাপন্ন। কোথায় কার সঙ্গে মারামারি করতে গিয়ে পেটে দারুণ আঘাত খেয়েছিল, তারপর থেকে এই অবস্থা। যশঃপাণির একমাত্র ছেলে গুপ্তিল, আর এক মেয়ে। ছেলের কোন চিকিৎসাই যশঃপাণি বাকী রাখে নি। তার এবং তার স্ত্রী ও মেয়ের একান্ত ইচ্ছা, তুমি গুপ্তিলের চিকিৎসার ভার নাও। সোজা তোমার কাছে যেতে তাদের সাহস হয় নি। তাই আমায় ধরেছে। আমারও ইচ্ছা জীবক, তুমি গুপ্তিলের চিকিৎসা করো।

—আপনার আদেশ শিরোধার্য, মহারাজ।

পাশের ঘরে যশঃপাণি দুরুদুরু বক্ষে অপেক্ষা করছেন। বিম্বিসার সংবাদ পাঠাতেই, এসে ঘরে ঢুকলেন। গুপ্তিলের চিকিৎসায় জীবক সম্মত আছে শুনে দু-হাত দিয়ে তিনি চেপে ধরলেন জীবকের ডান হাতখানা। চোখের কোণে জল চিকচিক করছে, আবেগে হাত দুখানা কাঁপছে থরথর করে।

মৃদু কণ্ঠে জীবক বললে,—আপনি শান্ত হোন। এখানে আমি চিকিৎসক, গুপ্তিল রোগী, শত্রু-মিত্রের প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া কৈশোরের সে ঘটনায় আমার লাভ বই ক্ষতি তো হয় নি, তা যে মন নিয়েই গুপ্তিল তা করে থাকে।

জীবককে নিয়ে যশঃপাণি বাড়ি আসতেই তাঁর স্ত্রী এসে জীবককে সাদরে নিয়ে গেলেন ওপরে। বললেন,—গুপ্তিল এইমাত্র একটু ঘুমিয়েছে, বাবা। চোখে ওর ঘুম নেই। ওকে কি এখুনি দেখতে চাও?

না, আমি অপেক্ষা করছি।—জীবক বলে।

গুপ্তিলের রোগ সম্বন্ধে আলোচনা চলে তিনজনের মধ্যে। একসময় যশঃপাণি বললেন,—আচ্ছা, শর্মিষ্ঠা গেল কোথায়? জীবককে দিয়ে চিকিৎসা করানোয় যার উৎসাহ ও আগ্রহ সবচেয়ে বেশী, তারই এখন দেখা নেই। আশ্চর্য মেয়ে বটে!

যশঃপাণির স্ত্রী বললেন,—সত্যি, ওর কথাই কিন্তু ঠিক হলো। বুঝলে বাবা, তোমার কাছে যাওয়ার প্রশ্নে আমাদের দ্বিধা-সঙ্কোচ ছিল, কিন্তু ওর ছিল না। সেদিন বিরক্ত হয়ে আমি ওকে বলেছিলাম, তুই কি করে জানলি যে জীবক আমাদের প্রত্যাখ্যান করবে না? তুই কি ওকে চিনিস নাকি যে, অত জোর দিয়ে বলছিস? তার উত্তরে ও বললো, তাঁকে আমি যতবার দেখেছি, তার থেকে আমার মন বলছে, এ জাতীয় ক্ষুদ্রতা তাঁর মধ্যে নেই, অনুরোধ করলেই দাদার চিকিৎসার ভার তিনি নেবেন। সত্যি, মেয়ের বুদ্ধি আছে!

নত চোখে জীবক মৃদু হাসলো।

পাশেই আর একখানা ঘর। দু ঘরের মাঝে একটা জানালা। তার দিকে পেছন ফিরে বসেছেন যশঃপাণি ও তাঁর স্ত্রী।

হঠাৎ সেই জানালার দিকে নজর পড়তেই জীবক চমকে উঠলো ঃ এ কী অপরূপা! সে চোখ ফেরাতে পারে না। জানালার ধারে একটি তরুণী দাঁড়িয়ে আছে, নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তার চোখে চোখ পড়তেই তরুণীর মুখে যেন সিঁদুর ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্যুৎপ্রভার মতো ক্ষণিকের হাসির ঝিলিক দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। পরক্ষণে জানালা থেকে সরে যায় সে।

আর স্থাণুর মতো বসে থাকে জীবক। মন তার উত্তাল। এ কী দেখলো সে! পৃথিবীর মাটিতে কি সম্ভব এমন রূপ! এ লাবণ্য, এ রূপ-সুষমা—এ যে স্বপ্নজগতের, রূপকথার রাজ্যের! এ কী সত্যি! না, তার চোখে কেউ মায়াকাজল পরিয়ে দিয়েছে—সে জেগে স্বপ্ন দেখছে!

হঠাৎ তার কানে এল আশ্চর্য এক মধুর কণ্ঠ ঃ বাবা, আমার খোঁজ করছিলেন?

কে? শর্মিষ্ঠা?—যশঃপাণি বললেন ঃ এস মা, বৈদ্যরাজ জীবক এসেছেন, গুপ্তিলের চিকিৎসার দায়িত্ব

নিয়েছেন তিনি।

শর্মিষ্ঠার নত চোখ। আরক্তিম মুখে হাসির আবার সেই বিদ্যুৎ ঝিলিক। ধীর মন্থর পদে এসে সে প্রণাম করে জীবককে। তার দীর্ঘ আলুলায়িত মেঘ-বরণ কেশরাশি লুটিয়ে পড়ে জীবকের পায়ের ওপর।

জীবক কথা বলতে পারে না—যেন বাহ্যজ্ঞানহারা। সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত। বাস্তব জগতের কোন শব্দই তার কানে ঢুকছে না, আর কোন দৃশ্যই চোখে পড়ছে না।

এমন সময় সংবাদ এল, গুপ্তিল জেগে গেছে, মাকে ডাকছে।

জীবককে দেখে গুপ্তিল দারুণ চমকে যায়। শরীর তার অতি শীর্ণ। চোখ বড় বড় করে সে তাকিয়ে থাকে জীবকের দিকে। করুণ অসহায় দৃষ্টি সে চোখে।

গভীর স্নেহে তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে জীবক বললে,—বিচলিত হয়ো না, ভাই। তুমি নিশ্চয়ই সুস্থ হবে। অতীতের সেই তুচ্ছ ঘটনাটা ভুলে যাও।

গুপ্তিলের দু-চোখে নামে নীরব অশ্রুধারা। সে অশ্রু শুধু গভীর কৃতজ্ঞতার নয়, বুঝি হৃদয়-নিংড়ানো অনুতাপেরও।

গুপ্তিলকে পরীক্ষা করে ও তার রোগের আনুপূর্বিক ইতিহাস শুনে জীবক বেরিয়ে এল, তার মা-বাবাকে বললো,—আপনারা ভয় পাবেন না, গুপ্তিলের পেটে অস্ত্রোপচার করতে হবে। মনে হয়, অন্ত্রে গুরুতর কিছু ঘটেছে। ভেষজ-চিকিৎসায় তা নিরাময় হবার নয়।

পরদিন গুপ্তিলের পেটে অস্ত্রোপচার হলো। দেখা গেল, পেটের ভেতরে অন্ত্র জড়িয়ে গেছে, যার ফলে কোন আহার্যই সে গ্রহণ করতে পারছে না।

অস্ত্রোপচার শেষে জীবক বললে,—আর ভয় নেই। কয়েক দিনের মধ্যেই ও সুস্থ হবে।

তাই হলো। দিন দশেকের মধ্যে গুপ্তিল সুস্থ হলো বটে, কিন্তু জীবকের মানসিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। মনে তুমুল ঝড়। মাথায় শুধু শর্মিষ্ঠার চিন্তা— আর কোন ভাবনা নেই। রোগীর চিকিৎসা ছাড়া সব কাজই বন্ধ। এমন কি বেণুবনে বুদ্ধসকাশে যাওয়াও সে ত্যাগ করেছে।

যত দিন যায়, জীবকের অস্থিরতা ততই বাড়তে থাকে। সে ও শর্মিষ্ঠা, দুজনেই চায় দুজনকে আপন করে পেতে, বিয়ে করতে। কিন্তু এ তো কখনই সম্ভব নয়। সে রাজবৈদ্যই হোক বা যত কীর্তিমানই হোক, জন্ম যার রহস্যাবৃত, অজ্ঞাত যার মা-বাবার পরিচয়, তার সঙ্গে শর্মিষ্ঠার বিবাহের প্রস্তাব যশঃপাণি ও গুপ্তিলের কাছে উন্মাদের কান্ড হিসাবেই গণ্য হবে। সুতরাং অসম্ভব এ কল্পনা—কোনদিনই বাস্তবে রূপ পাবার নয়।

তাহলে? তাহলে?—অস্থির বিপর্যস্ত জীবক। দিনে স্বস্তি নেই, রাতে ঘুম নেই। শেষ পর্যন্ত সে স্থির করলো, সব কিছু পেছনে ফেলে রাজগৃহ ত্যাগ করে সে চলে যাবে চিরকালের মতো। দুর্ভাগ্য ও কলঙ্কের বোঝা নিয়ে তার পক্ষে আর রাজগৃহে বাস করা সম্ভব নয়। ব্যর্থ জীবনের এই জ্বালা নিয়ে কোথায় সে যাবে জানে না, তবে দূরে বহুদূরে কোথাও।

জীবকের এই চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা কিন্তু অভয়ের দৃষ্টি এড়ায় না। নিদারুণ দুশ্চিন্তার সমুদ্রে হাবু-ডুবু খাচ্ছেন তিনিঃ কি হলো? আবার কি হলো?

এমনিতেই শালবতীকে নিয়ে তাঁর দুর্ভাবনার সীমা নেই। শালবতীর স্বাস্থ্যের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে যে কোন দিন বিপদ ঘটতে পারে। অথচ শালবতী সেদিকে নির্বিকার।

জীবক ফিরে এলে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে-ছিলেন দুই কারণেঃ এক, সুদীর্ঘ কাল পরে পুত্রকে আবার কাছে ফিরে পেলেন। দুই, পুত্র তাঁর মর্তের ধন্বন্তরি, তাকে দিয়ে তিনি শালবতীর চিকিৎসা করাবেন।

কিন্তু এ প্রস্তাবে শালবতী কিছুতেই রাজী হয় নি। এবং শত অনুরোধেও আপত্তির যুক্তিসংগত কারণও কিছু দেখায় নি। বিষম পীড়াপীড়ির ফলে একদিন শুধু বলেছিল,—কুমার, কেন অকারণে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন? নিয়তিকে মেনে নিন। আপনার পুত্র মর্তের ধন্বন্তরি, খ্যাতি তার বিশ্বব্যাপী। আমার চিকিৎসার ভার তাকে দিয়ে কেন তার ঐ খ্যাতি ক্ষুণ্ণ করবেন? আমার এ রোগ সে কখনই নিরাময় করতে পারবে না—এ ধন্বন্তরিরও অসাধ্য।

ব্যস্ ঐ পর্যন্ত। ও সম্বন্ধে আর কোন কথা তার মুখ থেকে আর কোন দিনই বের করা যায় নি।

শালবতীকে নিয়ে এই যখন অভয়ের মনের অবস্থা, তখন জীবকের অস্থিরতা তাঁকে অকূল পাথারে ফেললো।

তিনি গোপনে অনুসন্ধান শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত জানতেও পারেন সব কিছু। কিন্তু তাতে সমস্যার জটিলতা বাড়লো বই কমলো না। যশঃপাণির কাছে জীবকের সঙ্গে শর্মিষ্ঠার বিবাহের প্রস্তাব করা বাতুলতা মাত্র। তাহলে উপায়?

নিরুপায় অভয় ছটফট করেন। পথ খোঁজেন অন্ধকারে। কিন্তু কোন সমাধানই চোখে পড়ে না।

এমন সময় জীবক একদিন জানিয়ে গেল, শীঘ্রই দু-চার দিনের মধ্যে সে রাজগৃহ ত্যাগ করে যাচ্ছে চিরতরে। কোথায় যাবে, তার স্থিরতা নেই।

তার চোখমুখের দিকে তাকিয়ে অভয় আর একটা কথাও বলতে পারলেন না, স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন নিশ্চল পাষাণমূর্তির মতো। যখন হুঁশ হলো, দেখলেন জীবক চলে গেছে।

ক্লান্ত অভয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীর মন্থর পদে চললেন শালবতীর গৃহে।

শালবতীর কক্ষে অভয় ও শালবতী বসে আছেন। দুজনেই নির্বাক। গভীর চিন্তামগ্ন। অভয়ের কাছে শালবতী সবই শুনেছেন।

শেষে এক সময় শালবতীর বুঝি চমক ভাঙলো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বললেন,—দেব, জীবক রাজগৃহ ছেড়ে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবার সিন্ধান্ত নেবে ভাবি নি। তাই আপনাকে বলি নি কিছু। আপনি জানেন না, জীবকের জন্মরহস্য উদ্ঘাটনের পরিকল্পনা আমার বহু কালের। রহস্যের সমাধানও প্রায় শেষ, আগামী—

বলছো কি, শালবতী?—বিস্ময়ে আনন্দে অভয় ফেটে পড়েন ঃ জীবকের জন্মরহস্যের সমাধান করেছ?

ম্লান হেসে শালবতী বললেন,—হ্যাঁ, আগামী চার-পাঁচ দিনের মধ্যে সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে। এতদিন আপনাকে বলি নি। ভেবেছি, রহস্য উদ্ঘাটিত হলেই সব জানতে পারবেন। যাই হোক, জীবককে গিয়ে বলুন, আজ থেকে সপ্তম দিবসে সে নিজের জন্ম-পরিচয় জানতে পারবে, জানবে কারা তার বাবা-মা।

স্বভাবতঃই অভয়ের উত্তেজনার সীমা নেই। কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, শালবতী বাধা দিলেন,—শুনুন কুমার, দয়া করে আজ কোন প্রশ্ন করবেন না। নির্ধারিত দিনে ছাড়া কোন কিছু প্রকাশ না করতে আমি প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ। শুধু শুনে রাখুন, অত্যন্ত উচ্চ বংশে জীবকের জন্ম। হ্যাঁ, আর একটা কথা। অনেক চিন্তাভাবনার পর স্থির হয়েছে, জীবকের বাবা-মা ঐ দিন আমার বাড়িতেই আত্মপ্রকাশ করবেন।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বিষণ্ন কণ্ঠে শাল-বতী আবার বললেন,—আপনার উত্তেজনা ও কৌতূহল বুঝতে পারছি। কিন্তু আজ আমি নিরুপায়। এজন্য আমায় মার্জনা করুন। ঐ দিন যাঁরা যাঁরা এ বাড়িতে উপস্থিত থাকবেন, তাঁদের মধ্যে আপনি ও জীবক ছাড়াও মহারাজ বিম্বিসার, যশঃপাণি, গুপ্তিল, শর্মিষ্ঠা, অশ্বক এবং আরও কয়েকজন গণ্যমান্য নাগরিক থাকবেন। জীবকের বাবা-মা'র পক্ষ থেকে আমিই অবশ্য সবাইকে নিমন্ত্রণ করবো।

নির্দিষ্ট দিন। সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। শালবতীর প্রাসাদের দ্বিতলে সবচেয়ে প্রশস্ত কক্ষে নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের বসার ব্যবস্থা হয়েছে। কক্ষটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। অভ্যাগতদের জন্য আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে কক্ষের দক্ষিণ অংশে। বাকী অংশ ফাঁকা।

সুসজ্জিত কক্ষের দুধারে সোনার দীপাধারে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলছে। কিন্তু উত্তরাংশে আলো অত্যন্ত কম।

অভ্যাগতদের মধ্যে কারো আর আসতে বাকি নেই। মহারাজ বিম্বিসার, অভয়, জীবক, যশঃপাণি, গুপ্তিল, শর্মিষ্ঠা, অশ্বক প্রভৃতি সবাই উপস্থিত। অভয় ও জীবক বাদে অন্যদের কাছে শালবতীর যে আমন্ত্রণ-লিপি গিয়েছিল, তাতে আমন্ত্রণের দুটি কারণ বলা হয়েছে ঃ এক বৈদ্যরাজ জীবকের জন্মরহস্যের আবরণ উন্মোচন, দুই শালবতীর ব্রতভঙ্গ।

জীবকের জন্মরহস্য জানতে সবাই উদ্‌গ্রীব। কিন্তু জীবকের উত্তেজনার বুঝি তুলনা হয় না। তার জীবনের সমস্ত দুর্ভাগ্য-দুঃখবেদনার মূলে যে রহস্য, এতকাল পরে হঠাৎ তার যবনিকা উত্তোলনের সূত্র পাওয়া গেছে, এত কাল পরে আবার সে নতুন করে জন্ম নেবে, বাবা-মার সঙ্গে—শর্মিষ্ঠা পাশে—বিশ্বের বুকে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সে বলবে, মর্তের ধন্বন্তরি আমি বিশ্বের বিস্ময়!

এমনি সব চিন্তা ও কল্পনা গত সাত দিন তাকে যেন পাগল করে তুলেছে। সাতটা দিনের অধীর প্রতীক্ষা তার কাছে মনে হয়েছে যেন সুদীর্ঘ সাত বছর।

জীবকের পরেই এ রহস্য-উদ্ঘাটনে যাদের ব্যগ্রতা সর্বাধিক, তাঁরা দুজন—অভয় ও শর্মিষ্ঠা।

হঠাৎ কক্ষের উত্তর দিকের দরজা খুলে গেল আর সবাই সবিস্ময়ে দেখলো, কক্ষে প্রবেশ করছে সর্বাঙ্গ শুভ্রবসনে ঢাকা এক মনুষ্যমূর্তি। তার এক হাতে এক প্রদীপ।

দরজার পাশে দেওয়ালে একটি কুলুঙ্গি। কুলুঙ্গির নীচে উঁচু একটি ছোট চৌকি পাতা। মূর্তি এগিয়ে

এসে কুলুঙ্গির মধ্যে প্রদীপটি রাখলো। তারপর বসনের ভেতর থেকে বের করলো কি একটা জিনিস, দূর থেকে কাষ্ঠফলক বলেই মনে হয়। ওটা সে রাখলো চৌকির ওপর।

জীবক ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে—যেন বাহ্যজ্ঞান-রহিত। বিস্ময় ও উত্তেজনা তার চরমে পৌঁছেচে। সেই দৃশ্য! সেই ছায়ামূর্তি! প্রায় এগার বছর আগে কৈশোরে সেই গভীর রাতে আমবাগানে যে দৃশ্য দেখেছিল, সেই দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি।

হঠাৎ অস্ফুট চিৎকার করে জীবক ছুটলো ছায়ামূর্তি লক্ষ্য করে। ছায়ামূর্তি তাকে ডাকছে হাতছানি দিয়ে—ঠিক সেদিন যেমন ডেকেছিল!

দূর থেকে সে লক্ষ্য করে মূর্তিটি টলছে, বোধহয় এখুনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। ছুটে গিয়ে সে মূর্তিটিকে বাঁ হাতে জাপ্টে ধরে, আর ডান হাতে তুলে নেয় কাষ্ঠফলকটি। শুভ্র কাষ্ঠফলকের উপর ছোট ছোট রক্তাক্ষরে লেখাঃ
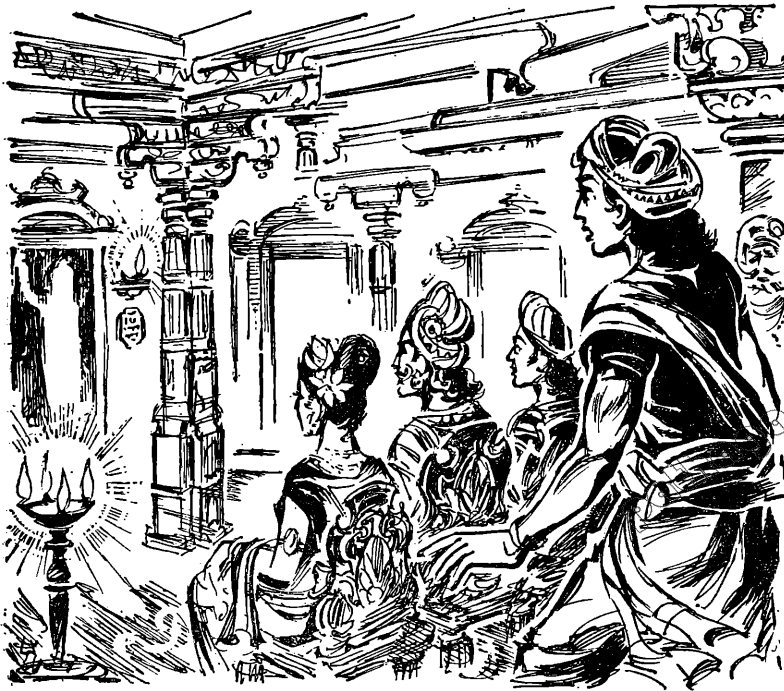
জীবক, বাবা আমার!

আমিই তোর মা। রাজকুমার অভয় তোর বাবা। তাঁর সঙ্গে গোপনে আমার বিয়ে হয়েছিল। বিবাহ করা ও সন্তান হওয়া রাজনর্তকীর পক্ষে গুরুতর দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই তোর জন্মও সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হয়েছিল, বাবাও জানতেন না। তাঁর আমবাগানে আমিই তোকে রেখে আসি। শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত তোকে আমি কখনই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে যেতে দেইনি। তোর সবকিছুই আমি জানি। কিন্তু কেউ জানে না, কিভাবে তিলে তিলে আমি দগ্ধ হয়েছি, ক্ষয় হয়েছি। আশীর্বাদ করি, শর্মিষ্ঠাকে নিয়ে তুই জীবনে সুখ ও শান্তি লাভ কর্, অর্জন কর্ আরো অনের মহত্তর কীর্তি। ইতি—

অভাগিনী

শালবতী

অভূতপূর্ব আনন্দের বন্যায়, জীবকের মনে হয়, তার চেতনা বুঝি ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে চলেছে, অবশ হয়ে হয়ে আসছে দেহ-মন-চিন্তাশক্তি। তার মা শালবতী, বাবা অভয়!—বারবার অস্ফুট কণ্ঠে সে উচ্চারণ করে কথাটা।

হঠাৎ তার খেয়াল হলো, কাঁধের ওপর এলিয়ে আছে বসনে ঢাকা সেই মানুষটি—নিস্পন্দ। সঙ্গে সঙ্গে তাকে কোলে নিয়ে সে বসে পড়লো মেঝের গালিচার ওপর। পরক্ষণে মানুষটির মুখের আবরণ সরিয়ে ফেলতেই ভয়ঙ্কর চমকে উঠলো সেঃ এ কী! মা!

স্তম্ভিত হতভম্ব সে কয়েক মুহূর্ত। তারপরই কেঁদে উঠলো আকুল কণ্ঠেঃ মা! মা! মাগো—

অন্যেরা আগেই ছুটে এসেছে। সবারই চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন। গুপ্তিল এসে দাঁড়িয়েছে প্রাণদাতা বন্ধুর পেছনে। তার দুচোখে অশ্রু টলোমলো। অভয় কাঁপতে কাঁপতে দেয়াল ধরে কোনমতে টাল সামলে বসে পড়লেন মেঝের ওপর। অদূরে চোখে আঁচল দিয়ে শর্মিষ্ঠা কাঁদছে হাপুস নয়নে।

আর জীবক! অস্থিরভাবে সে মায়ের বুক পরীক্ষা করছে, হৃৎস্পন্দন শোনার চেষ্টা করছে, নাড়ি দেখছে, পরীক্ষা করছে চোখের ভেতরটা।

হঠাৎ সে পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলো,—হতে পারে না! এ হতে পারে না! আমি জীবক! মর্তের ধন্বন্তরি আমি! আমার মাকে এ ভাবে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে যেতে দেব না, দেব না, দেব না—

নিজে করো ইলেকট্রনিক্ টাওয়ার লাইট ফ্লাশার

অমল মজুমদার

লাইট হাউসের নাম তোমরা নিশ্চয় শুনেছ। বড় বড় জাহাজ বন্দরের কাছে এই লাইট হাউস থাকে। এগুলি দেখতে উঁচু মিনারের মত। এই লাইট হাউসের মাথায় একটি উজ্জ্বল আলো লাগানো থাকে, যা রাত্রে পর্যায়-ক্রমে জ্বলে এবং নেভে। দূর থেকে জাহাজের নাবিক এই আলো দেখতে পেয়ে বন্দরের অবস্থান বুঝতে পারে।

আগে এই আলো জ্বলা-নেভার কাজটি সাধারণ স্বয়ংক্রিয় সুইচের দ্বারা করা হত। কিন্তু বর্তমানে এই কাজ ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে করা হচ্ছে। যন্ত্রটি 'ইলেকট্রনিক্ টাওয়ার লাইট ফ্লাশার' নামে পরিচিত। এই যন্ত্রটি তৈরি করার একটি সহজ কৌশল তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি।

প্রথমে নীচে লেখা জিনিসগুলি কোন রেডিওর দোকান থেকে কিনে নাও।

১।(ক) ট্রানজিস্টর AC 127—একটা
(খ) ট্রানজিস্টর 2 SB 77—একটা

২। রেজিস্টেন্স ঃ—(ক) 1000 ওম্স্ (1KΩ) —একটা
(খ) 10,000 ওম্স্ (10KΩ) —একটা
(গ) 330,000 ওম্স্ (330KΩ) —একটা

৩। ইলেকট্রোলিটিক্ কন্‌ডেনসার 10MFD. 6v.—একটা

৪। ট্যাগ ঃ—(ক) 3 Way—একটা
(খ) 5 Way—একটা

৫। দুই ব্যাটারীর (2·5v. ·2 Amp.) এভারেডী বাল্ব—একটি

৬। ঐ বাল্ব বাগাবার হোল্ডার—একটা

৭। এভারেডী ব্যাটারী, ৯৫০ সাইজ—চারটা

৮। ২″×৩″ কাঠের টুকরা —একটা

৯। টিনের পাত, প্লাস্টিক তার, পেরেক স্ক্রু ইত্যাদি।

এইবার কাজ আরম্ভ করা যাক। প্রথমে ট্যাগ দুইটিকে ২″×৩″ কাঠের সাথে স্ক্রু দিয়ে এঁটে দাও। ১নং ট্যাগটি 3 Way এবং ২নং ট্যাগটি 5 Way (ছবি দেখ)। পূর্বে ট্রানজিসটর রেডিও তৈরি করার সময় তোমরা যে ভাবে টিনের পাতের সাহায্যে চারটি ব্যাটারী লাগাবার ব্যবস্থা করেছিলে, সেইভাবে আলাদা একটি কাঠের উপর চারটি ব্যাটারী লাগাবার ব্যবস্থা কর। এই চারটি ব্যাটারীর মিলিত শক্তি হবে ৬ ভোল্ট। এইবার 330,000 ওম্‌স্ রেজিটেন্সের একটি প্রান্ত এবং 10,000 রেজিটেন্সের একটি প্রান্ত একত্র করে ১নং ট্যাগের A প্রান্তের সঙ্গে লাগাও। 330,000 ওম্‌স্ রেজিটেন্সের অপর প্রান্ত ২নং ট্যাগের G প্রান্তে এবং 10,000 ওম্‌স্ রেজিটেন্সের অপর প্রান্ত ২নং ট্যাগের D প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত কর। 10MFD. 6v. কন্‌ডেন্‌সারের পজেটিভ্ প্রান্ত (+ চিহ্নিত) ২নং ট্যাগের D প্রান্তে এবং নেগেটিভ্ প্রান্ত E প্রান্তের সাথে লাগিয়ে দাও। 1000 ওম্‌স্ রেজিটেন্সের একটি প্রান্ত ১নং ট্যাগের C প্রান্তে এবং অপর প্রান্ত ২নং ট্যাগের F প্রান্তে যুক্ত কর। ট্রানজিসটরের সঙ্গে তোমরা পূর্বেই পরিচিত হয়েছ। এইবার AC 127 ট্রানজিসটরের Collector (ফোঁটা চিহ্নিত) ১নং ট্যাগের C প্রান্তে, Base (মাঝের তার) A প্রান্তে, এবং Emitter (তৃতীয় তার) B প্রান্তে লাগাও। সেইভাবে 2SB 77 ট্রানজিস-টরের Collector (ত্রিভুজ চিহ্নিত) ২নং ট্যাগের E প্রান্তে, Base (মাঝের তার) F প্রান্তে, এবং Emitter (তৃতীয় তার) G প্রান্তে যুক্ত কর। এইবার বাল্ব-হোল্ডারের সঙ্গে দুইটি প্লাষ্টিক তার লাগাও এবং একটি তার ১নং ট্যাগের B প্রান্তের সঙ্গে এবং অপর তারটি ২নং ট্যাগের E প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত কর। এখন হোল্ডারে বাল্ব লাগাও এবং ১নং ট্যাগের B প্রান্তের সঙ্গে ব্যাটারীর নেগেটিভ্ প্রান্ত এবং ২নং ট্যাগের G প্রান্তের সঙ্গে ব্যাটারীর পজেটিভ্ প্রান্ত যুক্ত কর। তোমাদের যন্ত্র তৈরী শেষ হল।

এবার দেখ বাল্বটি কেমন জ্বলছে আর নিভছে। ব্যাটারীর যে কোন একটি প্রান্তের তার খুলে দিলেই যন্ত্রটি বন্ধ হয়ে যাবে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

সলিল মিত্র

জলের কাচ

জলকে ঠাণ্ডা করে বরফে পরিণত করা যায়, এতো সকলেরই জানা কথা। কিন্তু জল থেকে কাচ তৈরী হয়—এ কথা বললে সহজে বিশ্বাসই হয় না! কিন্তু বিজ্ঞান তা-ও প্রমাণ করেছে। ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব টেকনোলাজির ডঃ জাম্মাস বলেন, জলকে জমতে না দিয়ে মাইনাস ১৪৬ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে ঠাণ্ডা করে আনলেই তরল পদার্থ এই জল কঠিন কাচে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। তিনি বলেন, শুধু জল কেন, অন্য আরো তরল পদার্থকেই কাচে পরিণত করা যেতে পারে। এ্যালকোহলকে মাইনাস ১৭৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ঠাণ্ডা করলেও কাচ হয়ে যায়।

মরচে ধরা

লোহার কোন জিনিস বাইরে সযত্নে পড়ে থাকলে মরচে ধরে নষ্ট হয়ে যায়। তাই লোহার জিনিসকে আমরা যত্ন করে রেখে দেবার চেষ্টা করি। কি করলে লোহায় মরচে ধরবে না—এই ব্যাপার নিয়ে নানান্ দেশে গবেষণার শেষ নেই। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান মরচেকে কাজে লাগাবে বলে নকল মরচে সৃষ্টির কাজে লেগেছেন। প্রতিষ্ঠানটির কাজ হল, বিভিন্ন লোহা শিল্পের কারখানা থেকে লোহা চূর্ণ বা ছোট ছোট টুকরো জোগাড় করে নিয়ে সেগুলো এ্যাসিডে গলিয়ে নিয়ে নানান্ পদ্ধতিতে মরচেতে পরিণত করা।

ঐ মরচে কি কাজে লাগে জানো? টেলিভিশন, রেডিও, রাডার যন্ত্র তৈরি করার কাজে লাগানো হয় এই নকল মরচেকে।

পরিচালক ঃ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভেবে দেখ—সম্ভব কিনা

অমরনাথ রায়

১। একটা সিগারেট পাকাতে যতটুকু কাগজ লাগে, ঠিক ততটুকু এক টুকরো চৌকোণা কাগজ নাও। ১নং ছবিতে ঐ কাগজের টুকরোর আকার ও আয়তন দেখানো হয়েছে। এখন বল দেখি—ঐ কাগজের টুকরোটাকে কেটে তার মধ্যে দিয়ে তুমি গলে বেরিয়ে যেতে পারবে কিনা। মনে রাখবে, কাগজটা দুটুকরো না হয়ে যায়।
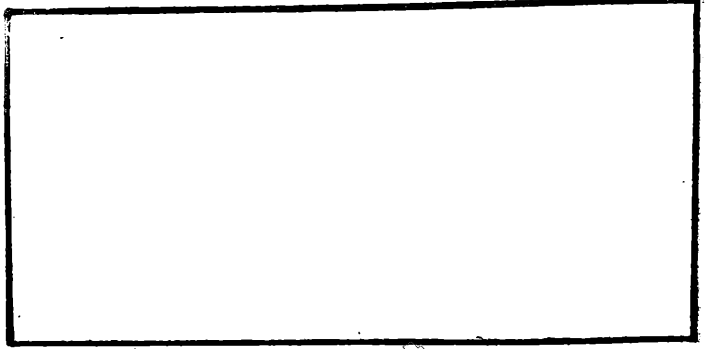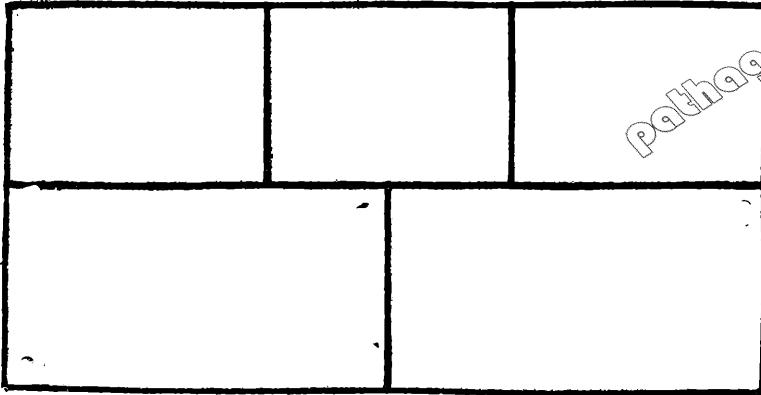
২নং ছবি

১নং ছবি

জানি, তুমি বলবে—এটা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু যদি বলি যে এটাও সম্ভব, তাহলে তুমি বিশ্বাস করবে কি?

বিশ্বাস না করলে ২৮১নং পৃষ্ঠায় ৪নং ছবি দেখ।

২। ২নং ছবিটা একটা বড় চতুর্ভুজের। দাগ টেনে চতুর্ভুজটাকে আবার ছোট ছোট পাঁচটা চতুর্ভুজে ভাগ করা হয়েছে।

এখন বলতো, একটিমাত্র বক্ররেখার সাহায্যে ঐ পাঁচটি চতুর্ভুজের সব কয়টি বাহুকে বাহুকে ছেদ করা যায় কিনা। বক্ররেখাটি যে কোন বাহুর ঠিক উপর দিয়ে যেতে পারে, কিন্তু কোন বাহুকে দুবার ছেদ করবে না।

ভাবছ—কেমন করে রেখাটা টানবে, তাই না?

২৮১নং পৃষ্ঠায় ৫নং ছবিটা দেখলেই কৌশলটা বুঝতে পারবে।

৩। এবারে ৩নং ছবিটার দিকে তাকাও। কি মনে হচ্ছে বল তো? ছবিটাকে কতগুলো জ্যামিতিক চিত্র অর্থাৎ বৃত্ত, চতুর্ভুজ, ত্রিভুজ ইত্যাদির সমষ্টি মনে হচ্ছে, তাই না?

আসলে কিন্তু তা নয়।

ঐ একটিমাত্র ছবিতেই ইংরাজী বর্ণমালার সব কটি অক্ষর এবং ০ থেকে ৯ পর্যন্ত সব কটি ইংরাজী সংখ্যা লেখা আছে।

বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? ভালভাবে খুঁজে দেখ—পেয়ে যাবে।
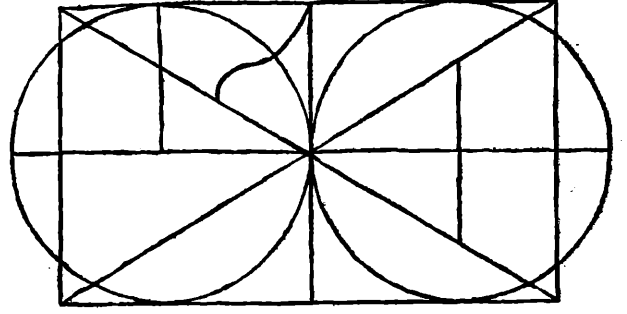
৩নং ছবি

"ভেবে দেখ—সম্ভব কিনা"-এর উত্তর

১। ৪নং ছবিতে যেমনটি দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে কাগজটার উপরে দাগ টেনে নাও। তারপর ঐ দাগ বরাবর ছবির মত করে কাগজটাকে কাঁচি দিয়ে কাট। এমনভাবে কাটবে কাগজটা যেন দু-টুকরো হবে না যায়। এভাবে ঠিকমত কাটতে পারলে কাগজের মস্ত বড় একটা বৃত্ত পাবে যার মধ্যে দিয়ে তুমি অনায়াসে গলে যেতে পারবে।
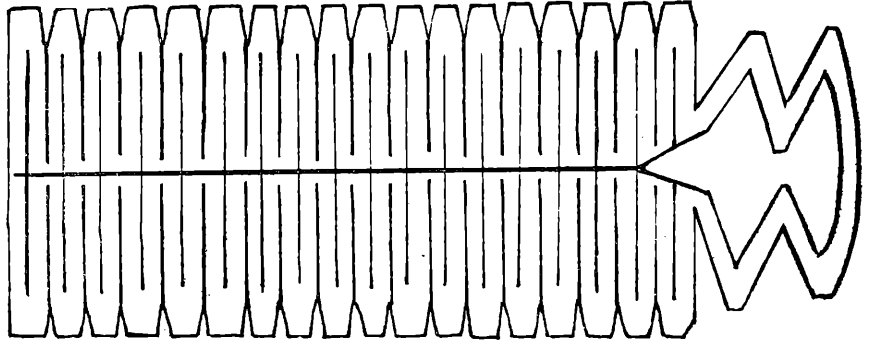
৪নং ছবি

২। ৫নং ছবিটা দেখলেই কৌশলটা বুঝতে পারবে। এ সমস্যাটার সমাধান সর্বপ্রথম কে করেছিলেন, জান? বিশ্ববিখ্যাত গণিতজ্ঞ অয়লার (Euler)।
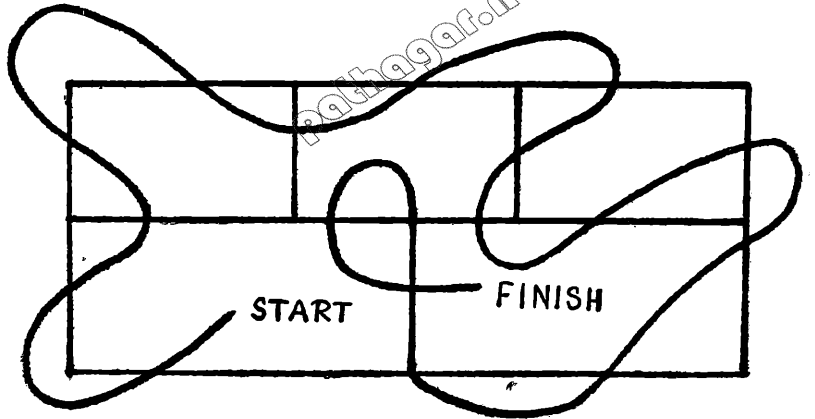
৫নং ছবি

সর্বশ্রেষ্ঠ তাসের জাদু

জাদুবিদ্যা অঙ্কের সাহায্যে কিভাবে দেখানো যায়, এ বিষয়ে আগের কয়েকটি সংখ্যায় বলা হয়েছে। এবার যে জাদুবিদ্যার কথা বলছি একমাত্র অঙ্কের সাহায্যেই এই খেলাটা দেখানো সম্ভব।

জাদুকর ঘোষণা করলেন,—তিনি আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে যে কোন মানুষের মনের কথা বলতে পারেন; এবং তা প্রমাণ করতে তিনি একটা তাসের খেলা দেখাচ্ছেন।

সাধারণতঃ তাসগুলোতে নম্বরসহ তাস বাদে টেক্কাকে ১, গোলামকে ১১, রাণী ১২ এবং রাজাকে ১৩ নম্বর ধরা হয়—একথা জানিয়ে জাদুকর দর্শকদের যে কোন একজনকে একখানা তাসের রং এবং নম্বর মনে মনে চিন্তা করতে বললেন।

এবার ঐ নম্বর বা সংখ্যার সঙ্গে তার পরের সংখ্যা যোগ দিতে বললেন। তারপর যে যোগফল হল তাকে ৫ গুণ করতে নির্দেশ দিলেন।

এরপর জাদুকর ঐ দর্শককে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি অর্থাৎ দর্শকমশাই ব্রীজ খেলা জানেন কিনা। যদি না জানেন, তবে ব্রীজ খেলায় তাসের রংয়ের যে সব নম্বর বা সংখ্যা দেওয়া থাকে, জাদুকর তা ঐ দর্শককে বুঝিয়ে দিলেন। যথা, চিড়িতন=৬, রুহিতন=৭, হরতন=৮ এবং ইস্কাবন=৯।

এবার জাদুকর উক্ত দর্শককে তাঁর মনে-করা তাসের রং-এর নম্বর ঐ ৫ গুণ করা সংখ্যাটির সঙ্গে যোগ করে যোগফলটা জাদুকরকে জানাতে বললেন।

দর্শক জানালেন—যোগফল ১৪১।

জাদুকর তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে করা তাসটি বলে দিলেন। অর্থাৎ তাসটি চিড়িতনের রাজা।

জাদুকর কিভাবে বলতে পারলেন, জানো?

মনে কর, দর্শকমশাই চিড়িতনের রাজা অর্থাৎ ১৩ মনে করেছেন।

১। এবার তিনি পরের সংখ্যাটি যোগ করলেন, —অর্থাৎ ১৩+১৪=২৭;

২। তারপর জাদুকরের নির্দেশমত ৫ দিয়ে গুণ করলেন,—অর্থাৎ ২৭×৫=১৩৫;

৩। ঐ ১৩৫-এর সঙ্গে জাদুকর তাসের রংয়ের নম্বরটি যোগ দিতে বললেন; অর্থাৎ চিড়িতন =৬ যোগ করতে হবে ১৩৫-এর সঙ্গে,—১৩৫ +৬=১৪১।

এই সংখ্যাটি অর্থাৎ ১৪১ জাদুকর দর্শকের কাছ থেকে শোনামাত্রই সংখ্যাটি থেকে মনে মনে ৫ বাদ দিয়ে (১৪১–৫=১৩৬) ১৩৬ পেলেন।

১৩৬-এর ডানদিকের সংখ্যাটি অর্থাৎ ৬ হচ্ছে তাসের রং—চিড়িতন। আর বাঁদিকের বাকী সংখ্যা অর্থাৎ এক্ষেত্রে ১৩ বা রাজা হচ্ছে তাসের নম্বর।

অদৃশ্য বন্ধন

তোমাদের মধ্যে অনেকে হয়ত এ খেলাটা দেখেছ। রাস্তা-ঘাটে যারা ম্যাজিক দেখায়, তারাই এ খেলাটা দেখিয়ে থাকে।

জাদুকরের বাঁ হাতে দুটো সরু বাঁশের চোঙ ইংরাজী V-এর মত করে ধরা রয়েছে। আর ঐ চোঙ দুটোর মাথার দিকের গায়ে একটা করে ফুটো করা

আছে। ফুটো দুটো থেকে একটা করে সুতো ঝুলছে এবং সুতোর প্রান্ত দুটিতে লাল-নীল কাপড়ের টুকরো দিয়ে তৈরী ফুল বাঁধা।

জাদুকর সুতোর এক প্রান্ত ধরে ধীরে ধীরে যেই টানতে লাগলেন, দেখা গেল—সুতোর অপর প্রান্তটি অমনি চোঙের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। অর্থাৎ ঐ চোঙ দুটিতে একটিমাত্রই সুতো আছে, যেটা প্রথম চোঙের ফুটো দিয়ে ভিতরে ঢুকে চোঙের নিচে দিয়ে দ্বিতীয় চোঙের ভিতরে ঢুকে ঐ দ্বিতীয় চোঙের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। আর নিচদিকটা যাতে না দেখা যায়, জাদুকর সেজন্যে চোঙ দুটোর নিচটা হাতের মুঠোয় ঢেকে রেখেছেন—এ তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।
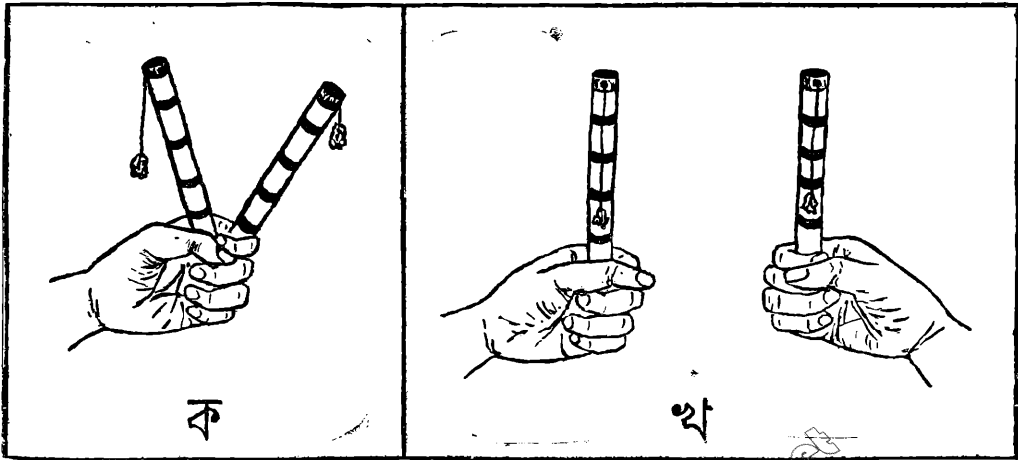
জাদুকর এভাবে ম্যাজিকটা দেখিয়ে যতই বাহবা নেবার চেষ্টা করুন না কেন—দর্শকমণ্ডলী জাদুকরের বোকামিতে হোঃ হোঃ করে হাসবেন মাত্র।

দর্শকমণ্ডলীর এই বিদ্রূপাত্মক হাসি দেখে জাদুকর বেয়াকুব বনে গেলেন নাকি? না, তা নয়—সমগ্র দর্শক-মণ্ডলীকে বিস্মিত করে জাদুকর তাঁর মুঠোয় ধরা চোঙ দুটোকে সম্পূর্ণ পৃথক অবস্থায় দুহাতে নিলেন। কই—কোন সুতোর সংযোগ ত নেই! তাহলে......?

তাহলে ব্যাপারটা তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই ম্যাজিকটা তৈরি করা খুবই সোজা। ঐ চোঙ দুটোর মধ্যেই যা একটু কারসাজি। একই উপায়ে দুটো চোঙ তৈরি করতে হবে। সুতরাং একটা চোঙ কিভাবে তৈরি করা যায়, তা বললেই তোমরা দুটি চোঙই তৈরি করতে পারবে।

৬″ লম্বা বাঁশের সরু চোঙ যোগাড় করে চিত্রের ন্যায় মাথার দিকে একটা ফুটো কর। এবার একটা সুতোর একপ্রান্তে একটা মাটির ঢেলা আটকে দাও। মাটির ঢেলাটা এমনভাবে তৈরি করবে, যা ঐ চোঙের মধ্যে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। এখন সুতোয় বাঁধা মাটির ঢেলাটা চোঙের ভিতরে ঢুকিয়ে সুতোটার অপরপ্রান্ত চোঙের ফুটো দিয়ে বের করে নাও। ঐ প্রান্তে রঙ-বেরঙের কাপড়ের টুকরো দিয়ে একটা ফুল তৈরি করে আটকে দাও। এরপর চোঙের মাথায় এবং নিচে খোলা মুখদুটি বহুরঙা কাগজ দিয়ে এঁটে দাও এবং চোঙের গায়েও রঙ-তুলি দিয়ে নানারকম চিত্র-বিচিত্র করে দাও। দুটো চোঙই এইভাবে তৈরী হবে।

ম্যাজিকটা দেখাবার সময় চোঙ দুটিকে এমনভাবে কাত করে ধরবে যেন প্রথম চোঙের সুতোয় বাঁধা ফুলটা ধরে আস্তে আস্তে টানলে এবং সংগে সংগে ঐ চোঙটার মাথাটা ধীরে ধীরে নিচু করলে দ্বিতীয় চোঙটায় মাথা আস্তে আস্তে উপরের দিকে ওঠে। ফলে, দ্বিতীয় চোঙের ভিতরে অবস্থিত মাটির ঢেলাটিও নিম্নগামী হবে এবং ঢেলাটির সঙ্গে বাঁধা সুতোটিও ভিতরে ঢুকতে থাকবে অর্থাৎ ফুলটা ফুটোর দিকে এগোবে। আবার এইভাবে দ্বিতীয় চোঙের ফুলটা টানলে প্রথম চোঙের সুতোটা ভিতরে ঢুকতে থাকবে এবং তার সঙ্গে বাঁধা ফুলটাও ফুটোর দিকে এগোবে।

এই ম্যাজিকটা একটু দূরে থেকে দেখানো ভাল। অন্যথায় ম্যাজিকের মূল কৌশলটা দর্শকমণ্ডলী ধরে ফেলবে অর্থাৎ তাঁরা মাটির ঢেলার উঠা-নামার শব্দ শুনতে পাবেন।

খেলাটা দেখাবার আগে নিজে ভালভাবে কয়েকবার প্রাকটিস করে নেবে।

অজ্ঞাত নায়ক

ঘোষক

সিনেমায় অনেক সময় সব ভয়ঙ্কর রোমহর্ষক দৃশ্য দেখা যায়। নায়ক হয়তো একজন বৈমানিক, আকাশে চারিদিক হতে তাকে শত্রুপক্ষের এরোপ্লেন ঘিরে ফেলেছে, তাদের মেসিনগানের গুলিতে নায়কের প্লেন ঝাঁঝরা হয়ে যায়, বিকল প্লেন ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে আছড়ে পড়ে ভেঙে যায়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আহত নায়কের প্রাণটা কোন রকমে রক্ষা পেয়ে যায়। অথবা এক বাড়িতে আগুন লেগে গেছে, তেতলার এক ঘরে নায়িকা আটকা পড়ে গেছে, দমকলের লোকেরা তাকে উপরে উঠে উদ্ধার করতে পারছে না, কারণ আগুনে সিঁড়ি ভেঙে পড়েছে, শেষে নায়িকা জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ল আর দমকলের লোক তাকে চাদর পেতে লুফে নিল।

তোমরা হয়তো ভাববে সিনেমার নায়ক-নায়িকারা নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করে কী সুন্দর অভিনয় করে। কত সাহসী কত কৌশলী তারা! কিন্তু শুনলে অবাক হবে এই সব বিপজ্জনক দৃশ্যে অভিনয় সাধারণতঃ নায়ক-নায়িকারা করে না। তাদের বদলে অন্য দুঃসাহসী অভিনেতা নায়ক বা নায়িকার সাজ-পোশাক পরে রূপ-সজ্জা নিয়ে এই দৃশ্যগুলিতে অভিনয় করে থাকেন। ফিল্মরাজ্যের ভাষায় এই ধরনের দৃশ্যগুলিকে 'স্টান্ট-সিন' আর অভিনেতাকে 'স্টান্ট ম্যান' বলা হয়।

সাধারণ দর্শকেরা এই অজ্ঞাত নায়কদের পরিচয় পায় না, তারা খুশি থাকে তাদের প্রিয় নায়িকা-নায়িকার চমকপ্রদ কৃতিত্বে। সব প্রশংসা তারাই কুড়িয়ে নেয়, সেটা প্রকৃতপক্ষে যার প্রাপ্য তাকে বঞ্চনা করে।

তাই আমেরিকার সবচেয়ে দুঃসাহসী এক স্টান্ট-ম্যানের অভিনয় কৃতিত্বের কথা বলবো। নাম তাঁর ডিক গ্রেস। পর্দার দর্শকদের আনন্দ দানের জন্য তিনি বহুবার মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়েছেন। অবিশ্বাস্য হলেও দেহে ছত্রিশটা লোমহর্ষক বিমান দুর্ঘটনার ক্ষতচিহ্ন নিয়ে তিনি বেঁচে ছিলেন। ন'বার তাঁর পাঁজরার হাড় ভেঙেছে। এক মারাত্মক দুর্ঘটনায় তাঁর ঘাড় ভেঙেছিল, মেরুদণ্ডের হাড় সরে গিয়েছিল। প্রতি দুর্ঘটনারই পরিসমাপ্তি হতে পারতো মৃত্যুর মধ্যে।

আমেরিকার সিনেমা-জগৎ হলিউডে ছবির পর্দায় বিমান-দুর্ঘটনার দৃশ্য দেখাবার জন্য 'ডেথ-স্কোয়াড্রন' নামে এক বৈমানিকের দল সৃষ্টি করা হয়েছিল, যাদের কাছে জীবন মৃত্যু ছিল পায়ের ভৃত্য। এই বৈমানিক-দলের নায়ক ছিলেন ডিক গ্রেস।

ডিকের ছেলেবেলা থেকেই আকাশে ওড়ার ঝোঁক। পাখিদের ওড়া সে তন্ময় হয়ে দেখত আর ভাবত কবে সে বড় হয়ে পাখিদের মতোই বিমান নিয়ে আকাশে ভেসে বেড়াবে। বাল্যকালেই সে সংকল্প করে বৈমানিক হবার। যৌবনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তাকে বৈমানিক হবার সুযোগ দিল। আমেরিকার বিমান-বাহিনীতে যোগ দিয়ে সে বিমান চালনায় দক্ষতা অর্জন করল।

যুদ্ধের পর প্রায় কপর্দক শূন্য অবস্থায় সে হলিউডে আসে। সেখানে এক বন্ধুর সাহায্যে স্টুডিওর মালপত্র রক্ষকের কাজ সে পেল।

একদিন সে দেখল এক স্টান্ট-ম্যান পঁয়তাল্লিশ ফিট উঁচু থেকে এক জালের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এই উত্তেজক দৃশ্য যুবক ডিকের মনে দোলা দেয়। দৃশ্যটি তোলার সব কিছু প্রস্তুতির পর পরিচালক যখন নির্দেশ দিলেন ঝাঁপ দেবার তখন লোকটি বিপদের আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে গেল। সে কম্পিতকণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল, আমি পারব না ঝাঁপ দিতে। আমার ভয় করছে।

লোকটির জন্য গ্রেসের মনে অনুকম্পা জাগে। ইতিপূর্বে যুদ্ধের সময় সে দেখেছে বহু মানুষকে বিপদের সামনে ঘাবড়ে যেতে। ডিক হঠাৎ স্থির করল এই স্টান্টটা সে নিজে চেষ্টা করে দেখবে। মই বেয়ে উপরে উঠে সে পরিচালকের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল,

রেডি আপনারা?

সবাই নবাগত লোকটার কাণ্ড দেখে অবাক! পরিচালক এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলেন, জালের ওপর পড়ার আগে শূন্যে দুবার ডিগবাজি খেতে হবে। পারবে তুমি?

—হ্যাঁ। ডিক গ্রেস জবাব দিল। নিচের দিকে চেয়ে সে শুধু একগাদা মাথা দেখতে পায়। সকলের বিস্ফারিত দৃষ্টি তার উপরই নিবদ্ধ। যে লোকটা ভয় পেয়েছিল তার মানসিক অবস্থা সে উপলব্ধি করে। ভাবে হঠাৎ এভাবে ঝুঁকি না নিলেই ভাল হতো। কিন্তু তখন আর পেছনো চলে না। ডিক লাফ মারল।

—অপূর্ব! পরিচালক আনন্দে চিৎকার করেন। বলেন, এমন স্বাভাবিক ভাবে পড়া আমি দেখিনি।

সেই দিন থেকেই ডিক গ্রেস হলিউডের স্টান্ট-ম্যান।

শীঘ্রই দুঃসাহসিক কার্যে সে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করল। তার দুঃসাহসিক স্ট্যান্টের বেশির ভাগই ছিল বিমান চালনা সম্পর্কীয়। শূন্যে সব রকম ঝুঁকি নিতে সে সর্বদা প্রস্তুত। লোমহর্ষক বিমান চালনা, প্লেন-ক্র্যাশ, প্লেন নিয়ে আকাশে ডিগবাজি খাওয়া, ঘণ্টায় নব্বই মাইল বেগে ধাবমান দুটি প্লেনের একটি হতে অন্যটিতে লাফিয়ে পড়া, প্রবল বাতাসের মুখে প্লেনের ডানায় নিশ্চিন্তে হেঁটে বেড়ানো,—এই ধরনের সব কাজ ডিক চলচ্চিত্রের জন্য করত।

একদিন হলিউডের বিখ্যাত পরিচালক উইলিয়াম ওয়েলম্যানের কাছে তার ডাক পড়ে। তিনি তখন 'উইংস' নামে একটি যুদ্ধচিত্র নির্মাণের কাজ সবে শুরু করেছেন।

তিনি ডিক গ্রেসকে বললেন, এই ফিল্মে আমার এমন কয়েকটি প্লেন-ক্র্যাশ চাই যা ইতিপূর্বে আর কোন ফিল্মে দেখান হয়নি। নকল কিছু আমি চাই না, একবারে সত্যিকারের প্লেন-ক্র্যাশ দরকার।

—প্রথম প্লেন-ক্র্যাশটি হবে দুটি জার্মান বিমানের গুলি বর্ষণের ফলে। নো-ম্যান'স ল্যান্ডে আছাড় খেয়ে পড়ে প্লেনটা চূর্ণবিচূর্ণ হবে। নো-ম্যান'স ল্যান্ড দৃশ্যের মধ্যেও ফাঁকি থাকবে না। কাঁটা-তার আর শেলের গর্ত চারদিকে। তোমার পক্ষে কাজটা রীতিমতো শক্ত, কারণ প্লেন নিয়ে ওড়ার আগে তোমায় একটা স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে হবে এবং সেই নির্দিষ্ট স্থানেতেই প্লেন নিয়ে পড়তে হবে। এদিক-ওদিক করা চলবে না। কারণ চারিদিকে কাঁটা-তার থাকবে। তাছাড়া ক্যামেরা থেকে পঞ্চাশ ফিটের মধ্যে থাকতে হবে। দূরে পড়লে ছবি ভাল আসবে না, সমস্ত ক্র্যাশটাই ব্যর্থ হবে। হ্যাঁ, পড়ার সময় প্লেনটা কিন্তু উল্টে পড়বে।

অন্য ক্র্যাশগুলি কি ধরনের?—গ্রেস জিজ্ঞাসা করল।

—দ্বিতীয়টা হচ্ছে প্লেনটা গিয়ে এক ইঁটের বাড়িতে ধাক্কা মারবে। আর তৃতীয়টি হচ্ছে একটা প্লেন মাটি ছেড়ে আকাশে উঠেই পড়ে যাবে। চতুর্থ একটা দুর্ঘটনাও থাকবে, তবে সেটা কি ধরনের হবে তা আমি এখনও স্থির করিনি।

গ্রেস কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। শেষে বলে, ফরমাশগুলো বেশ কঠিন। আমি একটু ভেবে দেখব।

বলা বাহুল্য সে সম্মত হয় এই কাজে। ভাবার সময় যা নিয়েছিল সেটা প্ল্যানিং করার জন্য, ভয় কাটাবার জন্য নয়। সেকালের যুদ্ধের সময়ের প্লেনের গড়ন সে ভালভাবে পরীক্ষা করে কিছু অদল বদল করে নিল আঘাতের সম্ভাবনা কমাবার জন্য। যেমন পেট্রোল ট্যাঙ্কের জায়গাটা সে সরিয়ে দিল আগুন লাগার সম্ভাবনা এড়াতে এবং ককপিট বা চালকের কেবিনের মধ্যে কিছু ইস্পাতের টিউব তৈরী করে লাগিয়ে নিল সংঘাতের ফলে সেটা যাতে মুচড়ে দুমড়ে তালগোল পাকিয়ে না যায়।

এই ছবির 'স্ট্যান্ট' দৃশ্যগুলিতে অভিনয় করার ফলে তাকে ডাক্তারের কাছে ছুটতে হয়। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেন যে, তার ঘাড় ভেঙেছে, সারভিক্যাল ভার্টিব্রার ষষ্ঠ হাড়টি সরে গেছে। চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী তার মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল। তার বেঁচে থাকাটাই স্টান্ট!

এই ঘটনার পর গ্রেসকে বলা হয় আর কখনও 'স্ট্যান্ট' অভিনয় না করতে। সামান্য আঘাতেই তার মৃত্যু হতে পারে। গ্রেস ডাক্তারের কথা মতো কর্ম হতে অবসর গ্রহণ করে। কিন্তু শীঘ্রই কর্মহীন জীবনের একঘেয়েমি তাকে অধৈর্য করে তোলে। সে আবার হলিউডে ফিরে যায় এবং স্ট্যান্ট-ম্যান হিসাবে আরও বিপজ্জনক কাজ গ্রহণ করে।

আগুনের দৃশ্যেও গ্রেসকে কয়েকবার বেশ বিপদে পড়তে হয়।

একবার এক জ্বলন্ত বাড়ির পাঁচতলার কার্নিশ থেকে তাকে নিচে দমকল কর্মীদের জালে লাফিয়ে পড়তে হবে। কাজটিতে বিশেষ বিপদের ঝুঁকি আছে বলে ডিকের প্রথমে মনেই হয়নি। একমাত্র অসুবিধা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে বাড়ির কাছে টেলিফোনের পোল ও তারের অবস্থান।

বাড়িটা অবশ্য স্টুডিওর মধ্যে তৈরী করা নকল

বাড়ি। সমস্ত দৃশ্যটা বাস্তবসম্মত করার জন্য এবং আগুনের লেলিহান শিখা সৃষ্টির জন্য নকল বাড়ির মধ্যে রাখা ছিল গাদা গাদা কাগজ, পুরানো ফিল্মের রাশি আর টিন টিন কালো পাউডার। এই সব আবার পেট্রোলে ভেজান হয়েছিল।

গ্রেস পাঁচতলার কার্ণিসে দাঁড়িয়ে ইঙ্গিতে জানায় যে সে প্রস্তুত।

পরিচালক চিৎকার করলেন, আগুন লাগাও!

জ্বলন্ত মশাল দাহ্য বস্তুগুলির উপর কর্মীরা ছুঁড়ে দিল। সকলের ধারণা ছিল সমস্ত বাড়িটা জ্বলে উঠতে কয়েক মিনিট সময় লাগবে। কিন্তু তাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। অকস্মাৎ এক বিস্ফোরণ হলো এবং মুহূর্তের মধ্যে সারা বাড়ি আগুনের করাল গ্রাসে পড়ল।

গ্রেস দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়ায় আগুনের শিখার হাত থেকে বাঁচার জন্য। তাকে ঘিরে আগুনের শিখা নৃত্য করে। উত্তাপে তার গায়ে বড় বড় ফোস্কা হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে মাটিতে যারা ছিল তাদের সকলেরই প্রায় বুদ্ধিভ্রংশ হয়। দমকল কর্মীরা এই ভয়াবহ আগুনের সঙ্গে যুঝে উঠতে পারে না। প্রচণ্ড উত্তাপের ফলে তারা বাড়িটার কাছাকাছি গিয়ে জালটি ঠিকমতো ধরতে পারে না যাতে গ্রেস ষাট ফিট উপর থেকে লাফিয়ে পড়তে পারে। দুবার তারা চেষ্টা করে, কিন্তু আগুনের তেজের জন্য দুবারই তাদের পিছিয়ে আসতে হয়।

ডিক গ্রেস নিজে তাঁর এক বইয়ে এই দুর্ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন—

"কয়েক মুহূর্ত আগের শান্ত পরিবেশে এখন নরকের আগুন জ্বলে উঠল। মেয়েরা কাঁদে, পুরুষেরা চিৎকার করে। পরিচালকও তাঁর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন। আমি তাঁর অসহায় চিৎকার শুনতে পাই—ঈশ্বরের দোহাই, জালটা ঠিক জায়গায় ধরো! কিছু একটা করো!

"শেষবারের প্রাণপণ চেষ্টায় ফায়ার-ম্যানরা জালটা প্রায় ঠিক জায়গায় ধরে। ঠিক টেলিফোন তার গুলির নিচে। সেগুলি তিন তলার জানলার কাছাকাছি ছিল। যাহোক, এই আমার শেষ সুযোগ।

"আমি নিচের দিকে মাথা করে লাফ মারি। ভয়ে শিউরে উঠি যখন দেখি মাটিও যেন লাফ মেরে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। টেলিফোনের তারগুলির কাছ দিয়ে পড়ার সময় আমি আমার হাত দুটো ছড়িয়ে দিই। বাহুর মাংসপেশীতে তারের ঘসড়ানি টের পাই। একটা ঝাঁকুনি লাগে। পলকের জন্য আমার পতনের বেগ তারগুলির দ্বারা একটু বাধাপ্রাপ্ত হয়। তারপর তার ছিঁড়ে জালের উপর এসে পড়ি। কয়েক সেকেন্ড পরে বাড়ির সমস্ত দেওয়াল ধ্বসে পড়ল।"

এ এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা। তবু ডিক গ্রেস বারবার এই ধরনের সব মারাত্মক দৃশ্যে অভিনয় করতে ভয় পায় না। একবার এক নায়িকার 'ডবল' তাকে সাজতে হয়। গল্পে ছিল এক নাচের আসরে মাতালদের মারামারির ফলে নায়িকার পোষাকে আগুন ধরে যাবে। কাহিনীকার তো এই ধরনের ঘটনা লিখেই খালাশ। তাঁকে যদি এমন দৃশ্যে অভিনয় করতে হতো তাহলে এমন নাটকীয় দৃশ্য সহজে লিখতেন না।

ডিক নর্তকীর পোষাকে সেটে আসে। যদিও তাকে মোটেই মেয়েদের মতো দেখতে নয়, তাহলেও খুব লম্বা নয় বলে পরিচালক তাকে দিয়ে এই ফাঁকিবাজির কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন। হট্টগোলের দৃশ্যে দর্শকদের মনে হবে একটি মেয়েই বুঝি আগুনের খপ্পরে পড়েছে।

কর্মীদের একজন দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে পরিচালকের নির্দেশ মতো ডিকের পাৎলা ঘাঘরায় আগুন লাগিয়ে দিল। এক সেকেন্ডের মধ্যেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আগুনের শিখা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আবার সমস্ত কিছু গোলমাল হয়ে যায়।

সকলে ভয়ে নিশ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায়, যখন গ্রেস চিৎকার করে ওঠে—বাঁচাও! বাঁচাও! পুড়ে মরছি!

ভিড়ের মধ্যে একজন সহকারী পরিচালক ঘাবড়ে না গিয়ে ছুটে কাছে গিয়ে জ্বলন্ত গ্রেসকে ল্যাং মেরে মাটিতে ফেলে দেয়, তারপর চেঁচায়—কম্বল আনো!

প্রপার্টি-রুম থেকে তাড়াতাড়ি কয়েকটা কম্বল এনে তাই চাপা দিয়ে গ্রেসকে সেবার বাঁচানো হয়।

এমনি ধারা অসংখ্য দুর্ঘটনার মধ্যে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অভিনয় করেন হলিউডের সর্বশ্রেষ্ঠ স্টান্ট-ম্যান ডিক গ্রেস। তাঁর জীবন কাহিনীর কিছু নিয়ে পরবর্তী কালে একটি ছবি তোলা হয়। ছবিটির নাম 'লষ্ট স্কোয়াড্রন।' হলিউডের এক বিখ্যাত তারকা এতে অভিনয় করেন এবং ডিক গ্রেস স্বয়ং অভিনয় হতে চিরতরে অবসর নেবার আগে এই ছবির স্টান্ট-সিনগুলি করেন।

নায়কদের যদি তারকা বলা হয়, তাহলে ডিক গ্রেসকে বলা উচিত ধূমকেতু।
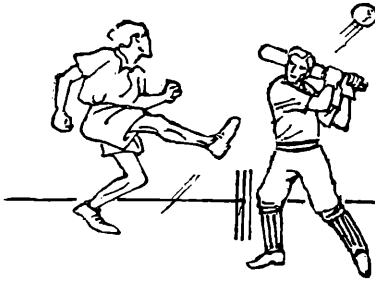
শুধু নয় মজার—কিছু আছে শেখার

সেদিন মাঠে গিয়েই বিরক্ত হলেন রণজি।

রণজি তখন বুড়ো হয়ে গেছেন। খেলা ছেড়ে দিয়েছেন অনেকদিন। অপারেশনের পরে একটা হাতে আর জোর নেই। তা ছাড়া চোখও খারাপ। একটা চোখে তো একদম দেখতেই পান না। তবু ক্রিকেট মাঠে তিনি রোজই আসেন। নিজের খরচে তাঁর রাজ্যের ছেলেদের তিনি ক্রিকেট খেলা শেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এক একদিন তো তিনি নিজের হাতেই তাদের ব্যাট করা শেখান। তাঁর আশা, তাঁর দেশের ছেলেরা নামকরা ক্রিকেট খেলোয়াড় হবে। আর তার জন্যে তিনি সব কিছুই করতে রাজী।

কিন্তু সেদিন মাঠে গিয়ে ছেলেটির কথা শুনে রণজি ভীষণ রেগে গেলেন। রাগের চেয়ে দুঃখই ছিল বোধহয় বেশী।

বোলার সেই ছেলেটি এসে তাঁকে বলেছিল যে, সে আজকাল এমন সুন্দর বল করছে আর বোলিং-এর যে সব কায়দা শিখেছে তাতে দু-এক ওভারের মধ্যে পৃথিবীর যে-কোন সেরা ব্যাটসম্যানকে সে আউট করে দিতে পারে।

শুনে রণজি থ। তিনি যেন ঠিক বিশ্বাসও করতে পারছিলেন না। ক্রিকেট খেলায় কোন বোলার কি কখনো হলফ করে ব্যাটসম্যানকে আউট করতে পারে? কখনই পারে না—তা সে যতো বড় বোলারই হোক না কেন।

তার আত্মম্ভরিতায় প্রথমটায় দুঃখ পেলেও পরে ছেলেটার ওপর রীতিমত বিরক্ত হয়ে উঠলেন রণজি। কারণ তিনি বেশ ভালো ভাবেই বুঝতে পেরেছেন যে, ছেলেটি আসলে তাঁকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। কিন্তু হায়! আজ তাঁর হাতে জোর নেই, চোখেও দেখতে পান না তিনি!

তবু ছেলেটিকে একটু শিক্ষা না দিলেই নয়। চারটে স্টাম্প আর একটা বল নিয়ে তাকে তাঁর সঙ্গে মাঠে নামতে বললেন। তারপর তিনটি স্টাম্প পুঁতে উইকেট বানিয়ে আর একটা স্টাম্প ব্যাটের মতো করে ধরে উইকেটের সামনে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন রণজি। তারপর ছেলেটিকে বললেন বল করতে।

ছেলেটি বোলিং শুরু করলো। বোলিং-এর যতো রকম কায়দা সে শিখেছিল সবই ফলাতে লাগলো। কিন্তু রণজি অবিচল। তিনি খুব সহজভাবে নিপুণ হাতে তার প্রত্যেকটি বল কাট করে, ড্রাইভ করে, পুল করে, হুক করে বাউন্ডারীতে পাঠাতে লাগলেন।

ছেলেটি প্রাণপণ চেষ্টা করল রণজিকে হারাতে। কিন্তু হারাতে তো নয়ই, হার এড়াতেই পারল না সে। রণজির হাতে ব্যাটের মতো করে ধরা উইকেটটির আঘাতে বলগুলি প্রত্যেকবারই বারুদের গোলার মত ছুটে যেতে লাগলো বাউন্ডারী সীমানার দিকে।

ছেলেটির মুখ চুন। ভুল তার চিরতরে ভেঙেছে। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানকে সে চ্যালেঞ্জ জানাতে গিয়েছিল। তার যোগ্য উত্তর সে হাতে হাতে পেয়েছে।

তাকে তখন কাছে ডাকলেন রণজি। বুঝিয়ে বললেন যে, ক্রিকেট খেলা অতো সোজা নয়। দিনের পর দিন মন-প্রাণ ঢেলে অনুশীলন করলে তবেই পারদর্শিতা লাভ করা যায়। আর কিছু না শিখেই যারা নিজেদের

সম্বন্ধে বড় বড় কথা ভাবে, তারা কোন দিনই ভালো ক্রিকেটার হতে পারে না।

এবার যে ঘটনার কথা আমরা বলতে যাচ্ছি, তার নায়ক হলেন স্যার জন বেরী হবস। হবসকে বলা হতো 'গ্রেটেস্ট স্পোর্টসম্যান অফ দি ওয়ার্ল্ড'! তাঁর মতো খেলোয়াড় কখনো হয় নি, আর বোধহয় হবেও না কখনো।

১৯২৬ সালের কথা। ওভাল মাঠে সেদিন অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সারের খেলা। সারেই প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছে। আর সারের ইনিংস সুরু করতে হবসই চললেন মাঠে। হবসের ব্যাটিং দেখার আনন্দে তখন দর্শকরা মাতোয়ারা।

হবসের বিরুদ্ধে বল করবেন অস্ট্রেলিয়ার সেরা বোলার জ্যাক গ্রেগরী। অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক ওল্ড-ফিল্ড একটু পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি জানেন, হবসের জয়নাভিরাম ব্যাটিং-এ এখনই সমস্ত ওভাল মাঠ নেচে উঠবে। দর্শকদের সঙ্গে তিনিও বুঝি দেখতে চান হবসের খেলা।

ওদিকে লম্বা-চওড়া সুন্দর চেহারার গ্রেগরী ছুটে এসে বল করলেন। বলটা অফ স্টাম্পের একটু বাইরে দিয়ে চলে গেল। হবস মোটে খেলার চেষ্টাই করলেন না। বলটা ধরে ওল্ডফিল্ড ফেরত পাঠিয়ে দিলেন গ্রেগরীর কাছে। দ্বিতীয় বলটাও ঠিক একই ভাবে স্টাম্পের বাইরে দিয়ে গিয়ে সোজা পড়ল উইকেটরক্ষকের হাতে।

এরপর তৃতীয় বল......আর তৃতীয় বলটাই বিরাট এক অঘটন ঘটিয়ে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু সে কথা কেউ বুঝতেও পারলেন না।

দ্বিতীয় বলের পরে ওল্ডফিল্ড এসে দাঁড়িয়েছিলেন উইকেটের খুব কাছে। প্রতি মুহূর্তে তিনি ভাব-ছিলেন, এইবার বুঝি হবস হাত খুলে মারতে শুরু করবেন।

গ্রেগরী ছুটে এসে বল করলেন। প্রথম দুটি বলের মতো তৃতীয় বলটাও একই ভাবে চলে গেল। কিন্তু সেই মুহূর্তে কে একজন চিৎকার করে উঠলো, হাউ'জ দ্যাট!

আবেদনের কারণ কেউই বুঝতে পারলেন না। আম্পায়ারও না। তাই তিনি সেই আবেদন তখনই নাকচ করে দিলেন। ক্রিকেট খেলার এ এক অতি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু......

হবসও বুঝতে পারেন নি আবেদন জানাবার কারণ। তাই কৌতূহল চাপতে না পেরে তিনি ওল্ডফিল্ডকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি ব্যাপার বার্ট, আবেদন জানালে কেন?"

হবসের দিকে তাকিয়ে হাসলেন ওল্ডফিল্ড। তারপর বললেন, "জ্যাক, তুমি কিন্তু আউট হয়ে গেছ। বলটা উইকেটের পাশ দিয়ে যাবার সময় বেল ফেলে দিয়ে গিয়েছে। কেউ দেখতেও পান নি, বুঝতেও পারেন নি। আমি উইকেটের খুব কাছে আছি তো—তাই আম্পায়ার বোধহয় ভেবেছেন যে উইকেট থেকে বেল আমিই ফেলে দিয়েছি।"

ওল্ডফিল্ডের কথা শুনে লজ্জায় যেন মাটিতে মিশে যেতে চাইলেন হবস। বিড়বিড় করে বললেন, "তাহলে তো আমায় ফিরে যেতে হয়। আমি যে সত্যিই আউট হয়ে গেছি।"

হবসের কথা শুনে হাঁ হাঁ করে উঠলেন ওল্ডফিল্ড। "আরে না না—ফিরে যাবে কেন—আম্পায়ার তো আর তোমাকে আউট দেন নি!"

"তা হয় না বার্ট! আম্পায়ার দেখতে পান নি। কিন্তু তুমি তো ঠিকই দেখেছ যে আমি আউট হয়ে গেছি...."

কথা শেষ করার আগেই গ্লাভস খুলতে খুলতে প্যাভেলিয়নের পথে এগিয়ে চললেন হবস। ফেরার পরে আম্পায়ারের কাছে গিয়ে বললেন, "আমি প্যাভে-লিয়নে ফিরে যেতে চাই। আপনি অনুমতি দিন।"

ব্যাপারটা যে কি দর্শকরা তার কিছুই বুঝতে পারলেন না। তারপর যখন সবাই সব কিছু জেনে গেলেন তখন সম্বর্ধনার আনন্দে তার হাততালিতে সমস্ত ওভাল মাঠ যেন ভেসে গেল।
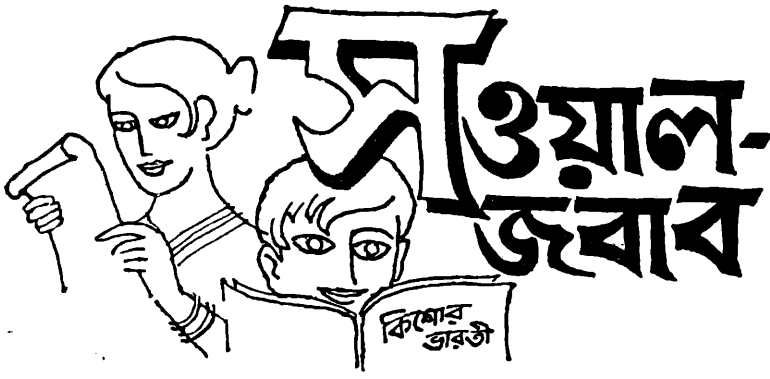
বাণী মৌলিক

নূপুর মাহাতো, পুরুলিয়া
—কিশোর ভারতীর গত আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যার প্রচ্ছদপট খুব ভাল লেগেছে। শিল্পীর পরিচয় জানতে পারি কি?
ঃ শুধু গত আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যারই নয়, কিশোর ভারতীর এযাবৎ প্রকাশিত সব কয়টি সংখ্যারই প্রচ্ছদপট এঁকেছেন যে যশস্বী শিল্পী, তাঁর নাম সূর্য রায়।

প্রদীপ আইচ, বঙ্গাইগাঁও, আসাম
—সওয়াল জবাব আমার খুব ভাল লাগে। কিশোর ভারতীতে কিশোর যাদুকরের যাদুগুলি পড়তে খুব ভাল লাগে। আমিও একজন যাদুকর। আমি যদি কয়েকটি যাদু দিই, গ্রহণ করবেন কি?,
ঃ দিয়েই দেখ না!

মনোজকুমার ব্যানার্জী, মরিয়ানী, আসাম
—কি করে যে আপনারা কিশোর ভারতীকে আমাদের মনের মত করে গড়ে তুলেছেন তা অতি আশ্চর্যের বিষয়। সত্যিই আমার কাছে কিশোর ভারতী অত্যন্ত প্রিয় বই।
ঃ জেনে গর্ব অনুভব করছি।

অপূর্ব গাঙ্গুলী, কলিকাতা-৫৩
—যে কোন আত্মকাহিনী এই পত্রিকায় দেওয়া যায় কি?
ঃ কীর্তিমান ব্যক্তির ভিন্ন অন্য কারো আত্মকাহিনী পাঠককে কৌতূহলী করে কি? এই সংখ্যায় নটসূর্যের আত্মকথা পড়েছ আশা করি।

অমিতকুমার সেন, কলিকাতা-৪
—গত বছর (১৩৭৬) পূজায় অন্য বইয়ের পরিবর্তে কিনি শারদীয়া কিশোর ভারতী। সেই থেকেই কিশোর ভারতীর আমি ভক্ত। সেই শারদীয়া সংখ্যার রূপ-রস-গন্ধ মোহিত করেছিল আমাকে। শুধু আমাকেই নয়, আমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন প্রত্যেককেই। যারা পড়েছিল তারা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল আপনাদের পত্রিকার অলৌকিক অসামান্য সৌন্দর্যে। কিশোরদের জন্য এই অপূর্ব জিনিস তৈরি করার জন্য আপনাদের দিই অজস্র ধন্যবাদ। আচ্ছা বলতে পারেন, কি যাদুমন্ত্র আপনারা লাভ করেছেন যার দ্বারা দেশের সমগ্র কিশোর তথা তরুণদের মনে আপনাদের এই পত্রিকা তার এই অল্প দিনের আয়ুতেই বিস্তার করতে পেরেছে তার আধিপত্য? কি সে যাদুমন্ত্র?
ঃ যাদের মুখপত্র এই কিশোর ভারতী, সেই কিশোর ও তরুণ সমাজের প্রতি আমাদের অন্তহীন ভালোবাসাই কিশোর ভারতী-র সাফল্যের চাবিকাঠি। তোমাদের ভালবাসি বলেই না তোমাদের মনের মত সব মণিরত্নে কিশোর ভারতীকে সাজাতে চেষ্টা করি আমরা। যখন দেখি কিশোর ভারতী তোমাদের মন জয় করেছে, সাফল্যের আনন্দে তখন আমাদের বুক ভরে ওঠে।

সঞ্জিতকুমার সিংহ, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫
—বইয়ের দোকানে প্রথম যখন কিশোর ভারতী আমি দেখেছিলাম, তখন মনে হয়েছিল যে, দামের তুলনায় এতে সার বস্তু কিছুই নেই। এখন স্বীকার করতে কোন বাধা নেই যে কিশোর ভারতীতে যা থাকে তাকে দাম দিয়ে পরিমাপ করা যায় না।
ঃ আজকাল মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপনে পঞ্চাশ টাকার বই মাত্র পাঁচ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে বলে ঘোষণা করা হয়। কিশোর ভারতী-র বেলায় ঐ ধরনের চটকদার 'মনোহারী' বিজ্ঞাপন কেন দেওয়া হয় না, এ প্রশ্ন কারো মনে জেগে থাকলে তোমার শেষ কথায় সে তার উত্তর পেয়ে যাবে।

সুব্রত মজুমদার, খাগড়া, বহরমপুর
—একটা কথা জানাই, কিশোর ভারতীর জুলাই ১৯৭০/আষাঢ় ১৩৭৭ সংখ্যায় আপনারা এক পত্র লেখকের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন যে, কিশোর ভারতীর দাম বাড়ান সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়? গ্রাহকদের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি, কিছু পাতা বাড়িয়ে দাম প্রতি সংখ্যা ১৲ অর্থাৎ বছরে ১২৲ চাঁদা করলেও আমাদের আপত্তি নেই।
ঃ গ্রাহকদের পক্ষ থেকে এই যে তুমি জানালে, এ বিষয়ে সকল গ্রাহক-গ্রাহিকার দৃষ্টি আকর্ষণ ও মতামত আহ্বান করছি।

সুধীর দাস, কলিকাতা-৬
—কিশোর ভারতী আমার খুবই ভাল লাগে। কিন্তু আর একটি বিভাগ চাই। আর তা হ'ল—ব্যায়াম চর্চা।
ঃ উত্তম প্রস্তাব।

মধুমিতা সর্বজ্ঞ, শিলং
—কিশোর ভারতীতে যদি "মঙ্গলগ্রহের অভিযাত্রী"র মত কোনও বিজ্ঞান নির্ভর ধারাবাহিক কাহিনী দেওয়া হয়, তবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব।
ঃ ততোধিক আনন্দিত হব আমরা।

শিবাংশু দে, জামসেদপুর

—গ্রাহক-গ্রাহিকাদের আসরে প্রকাশিত রচনাগুলির মধ্যে বছরে একবার শ্রেষ্ঠ এক বা একাধিক রচনার জন্য পুরস্কার দিলে কেমন হয়?

ঃ তোমার এ প্রস্তাবটি খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

অমলরঞ্জন শাসমল, মেদিনীপুর

—যাদুকর যেমন যাদু দেখিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করে দিয়ে আনন্দ দান করেন—ঠিক তেমনই কিশোর ভারতীও যেন পাঠক-পাঠিকাদের নিকট যাদুর মতো মুগ্ধ করে দিয়ে আনন্দ দান করে। কিশোর ভারতীর সেই যাদুকরকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবেন।

ঃ তথাস্তু।

দীপককুমার মণ্ডল, আসানসোল

—বিশ্ব-সাহিত্যের বিখ্যাত গল্পগুলির অনুবাদের জন্য ধন্যবাদ। আশা করি, এরূপ গল্প প্রতি মাসেই দেওয়া হবে।

ঃ চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

অরূপকুমার মুখোপাধ্যায়, দুমকা

—না আছে মুকুট, না আছে ঢাল, তবু তিনি আমাদের মহারাজ। সেই মহাবিপ্লবী নায়ক স্বর্গত মহারাজ ত্রৈলোক্য-নাথ চক্রবর্তীর জীবন কাহিনী কিশোর ভারতীর পাতায় প্রকাশিত হলে বিশেষ আনন্দিত হব।

ঃ দেখা যাক।

সুধীরকুমার দাস, ব্যারাকপুর

—দেশবিদেশের প্রিয় ও নামকরা সাহিত্যিকদের লেখার অনুবাদ এই আমাদের একমাত্র সর্বাঙ্গসুন্দর পত্রিকায় স্থান করে দেওয়ার জন্য অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের এই দিগ্বিজয়ী পত্রিকার গ্রাহক হিসাবে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করি। এই পত্রিকা সকলে আমার হাত থেকে লুফে নেয়।

ঃ কি বলব, বাণী স্তব্ধ তীব্র উল্লাসে!

সন্দীপ সেনগুপ্ত, কলিকাতা-২৮

—কিশোর ভারতীর পৃষ্ঠা ও আকার কি আর একটু বৃদ্ধি করা যায় না? বিজ্ঞানীর দপ্তরটা আর একটু বড় করুন না।

ঃ পৃষ্ঠা বৃদ্ধির ব্যাপারটা না হয় বুঝলাম, কিন্তু আকার আরো বাড়ালে একটু কিমাকার হবে না সেটা?

নন্দদাস বৈরাগ্য, পলাশীপাড়া, নদীয়া

—লটারীর টিকিজ কাটা খারাপ না ভাল? ইতিপূর্বে আমি অনেক লটারীর টিকিট কেটেছি—কিন্তু ফল পাই নাই।

ঃ আর কেটো না। মানুষের কাজের প্রবৃত্তিকে ওসব জিনিস ক্রমশ অকেজো করে ফেলে আকাশকুসুমের স্বপ্ন দেখিয়ে।

বিমানকুমার ঘোষ, ভক্তিনগর, শিলিগুড়ি

—গত পূজা সংখ্যার পর ভবঘুরের আর কোন চিঠি পাইনি। কবে নাগাদ তাঁর পরবর্তী চিঠি পাবো?

ঃ না লিখলে বলি কি করে? তবে শিগ্‌গিরই পাবে, আশা করছি।

আশীষ দত্ত, ধানবাদ

—গ্রাহক-গ্রাহিকাদের পক্ষে কিশোর ভারতী কার্যালয়ে গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করে পত্র ও রচনাদি পাঠাবার উদ্দেশ্য কি? গ্রাহক নম্বর না পেলে কি ভাবে পাওয়া যায় জানাবেন কি?

ঃ নম্বর না থাকলে অজস্র গ্রাহকের ভিড়ে নাম খুঁজে বার করতে অনেক সময় লেগে যায়। গ্রাহক-গ্রাহিকাদের কাছে কিশোর ভারতী প্রতি মাসে যে খামে পাঠানো হয়, তার উপর গ্রাহকের নামের ঠিক বাঁ ধারে একটি সংখ্যা বসানো থাকে। ওটাই গ্রাহক-নম্বর।

পঞ্চশীল দত্ত, কলিকাতা-৩১

—কিশোর ভারতীর অগণিত পাঠকের মধ্যে আমি একজন। এই অধিকারে আমি যদি লেখা পাঠাই তবে তা ছাপা হবে কি? সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাব। মনোনীত না হলে ফেরত পাঠাবেন তো?

ঃ অবশ্যই। অবশ্যই।

রান্নার ইতিকথা

আদিম যুগ

তখন মানুষ
সব পুড়িয়ে খেতো।
কিন্তু স্বাদ গন্ধ ভাবতো না!

কুকমী নিজস্ব মিলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত

দ্বিতীয় যুগ

তখন মানুষ
প্রথম স্বাদ
ও গন্ধের
খবর পেলো!
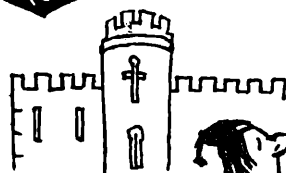
কুকমী সর্ব্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা

তৃতীয় যুগ

তখন মানুষ পালতোলা
জাহাজে ভারতের দিকে
মশলা আনতে ছুটলো!

কুকমী মাসিক বিক্রয় — পনেরো লক্ষ প্যাকেট

বর্ত্তমান যুগ

এখন মানুষ
মশলা তৈরীর
ঝঞ্ঝাট ছেড়ে
তৈরী গুঁড়ো মশলা
ব্যবহার করতে
শিখলো!

বাজারের সেরা গুঁড়ো মশলা

© 2.67.